GIFT

বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে নারীশ্রম ও ইসলাম

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

465191

গবেষক

মোঃ রশিদ আহমেদ হোসাইনী

পিএইচ. ডি গবেষক

রেজি নং-৪৫/২০০৯-২০১০

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

Dhaka University Library
465191

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০১২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

B
RB
331.4887
HUB

Selina

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **মোঃ রশিদ আহমেদ হোসাইনী** কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত **"বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে নারীশ্রম ও ইসলাম"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত। আমার জানা মতে এটি একটি তথ্যবহুল ও গবেষণাধর্মী কর্ম এবং ইতিপূর্বে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য এ শিরোনামে কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। আমি পাণ্ডুলিপিটি পড়েছি এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপনের সুপারিশ করছি।

(ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

465191

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে নারীশ্রম ও ইসলাম"** অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার এই গবেষণা পূর্ণ অথবা অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশ হয়নি কিংবা অন্য কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয়নি।

মোঃ রশিদ আহমেদ হোসাইনী
পিএইচ.ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

465191

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে আমার এ গবেষণাকর্মটি **(বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে নারীশ্রম ও ইসলাম)** সম্পন্ন করতে পেরে তাঁর দরবারে অশেষ প্রশংসা জ্ঞাপন করছি এবং অসংখ্য দরূদ ও সালাম পেশ করছি তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ভাজনে আবদ্ধ হয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ রুহুল আমিন। কর্মব্যস্ততা ও শারীরিক অসুস্থ্যতা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণাকর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে এবং তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। আমার এ গবেষণা কর্মের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায়, উপাধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাব সৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতায়। এজন্য আমি তাঁর প্রতি চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। আমি তাঁর দীর্ঘায়ূ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আমার বিভাগের অন্যসব শিক্ষকের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ করে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ এবং ব্যবসায়িক বন্ধু ও সাথী নেক্সাস গ্রুপের মালিক এটিএম মতিন-এর প্রতি। কারণ তাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমাকে আমার গবেষণায় পরামর্শ দিয়েছেন এবং উদ্বুদ্ধ করেছেন।

আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা মরহুম মাওলানা মোশারফ হোসেন আনসারীকে তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তার দোয়া আজও আমার জীবন চলার একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। আমার সুখ সমৃদ্ধি কামনায় তার নিরন্তর প্রয়াস আমার জীবনে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। তার অপরিসীম আত্মত্যাগের কারণেই আজ আমি জীবনের এতটুকু পথ এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। আজ এমনই এক স্মরনীয় মুহূর্তে মহান আল্লাহর দরবারে তার আত্মার শান্তি ও মুক্তি কামনা করছি।

আমি গভীর চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা আনোয়ারা বেগমকে। আমার গবেষণাকর্মে বিভিন্নভাবে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দানে তার জুড়ি নেই। আমার জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় কাতর আমার মা তার জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের একটা বড় অংশ ছাড় দিয়েছেন। মহান আল্লাহর দরবারে তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ূ কামনা করছি।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার স্ত্রী উম্মে কুলসুম রোকেয়া করিম, ছেলে মোঃ আশরাফ আনসারী, মেয়ে ফাবিয়া নওশিনকে। গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে তাদেরকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারিনি। আমি আল্লাহর দরবারে তাদের জীবনে সুখ-শান্তি উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করছি।

আমার এই গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করার জন্য যে সকল বন্ধু বান্ধব, সহকর্মী, শ্রদ্ধাভাজন ও স্নেহস্পদ এবং আপনজনেরা নানাভাবে আমাকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং দুস্প্রাপ্য তথ্যাদি ও শ্রম দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন তাদের সবাইকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সর্বোপরি আমার এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান ও সুধীজন বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

মোঃ রশিদ আহমেদ হোসাইনী
পিএইচ.ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

আ.	=	আরবী
আ.	=	আলাইহিস সালাম
আ.	=	আব্দুল
ইং	=	ইংরেজী
উঃ	=	উত্তর
খৃ.	=	খৃষ্টাব্দ/খৃষ্টাব্দে
খ্রী.	=	খ্রীষ্টাব্দ/খ্রীষ্টাব্দে
খ্রি.	=	খ্রীষ্টাব্দ/খ্রিষ্টাব্দে
খৃ. পূ	=	খৃষ্টপূর্ব
জ.	=	জন্ম
দ.	=	দক্ষিণ
দ্র.	=	দ্রষ্টব্য
ড.	=	ডক্টর (পি.এইচ.ডি)
প.	=	পশ্চিম
পুন.	=	পুনরায়
পুন. পুন	=	বারবার
প্রাগুক্ত	=	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
বাং	=	বাংলা
মৃ	=	মৃত, মৃত্যু
মাও.	=	মাওলানা
রহ.	=	রাহমাতুলাহি আলায়হি
রেজি.	=	রেজিষ্টার্ড
রা.	=	রাদিয়ালাহু তায়ালা আনহু
স./সা.	=	সালালাহু আলায়হি ওয়া সালাম
হি.	=	হিজরী
A.H	=	হিজরী সন
A.D	=	খ্রীষ্টাব্দ
ইফাবা	=	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
অনু.	=	অনুবাদ/অনুদিত
সম্পা.	=	সম্পাদনা/সম্পাদিত
তা.বি.	=	তারিখবিহীন
বি. দ্র.	=	বিস্তারিত/বিশেষ দ্রষ্টব্য
P.	=	Page.
Opcit	=	Open Cito.
Ed.	=	Edition/Editor/Edited.
JASB	=	Journal of Asiatic Society of Bangal
Ibid	=	(Ibidem) in the same place, from the same source.
Vol	=	Volume

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলাদেশে রপ্তানীমুখী শিল্পগুলোর মধ্যে পোশাকশিল্পের অগ্রগতি সর্বাধিক। ১৯৭৬-৭৭ সালে এক জার্মান রপ্তানীকারকের সহযোগে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে মাত্র গুটিকয়েক কারখানা দিয়ে রপ্তানী ক্ষেত্রে এ শিল্পের গোড়াপত্তন হয়। বর্তমানে এ শিল্পের কারখানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫০০টিতে। সময়ের চাহিদায় এ শিল্প আজ অতি পরিচিত ও ব্যাপক আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এর অবস্থান বর্তমানে বাংলাদেশে প্রথম।

মূলত ৭০-এর দশকের শেষদিকে মাত্র ৯টি কারখানা দিয়ে এই খাতের যাত্রা শুরু। ১৯৭৮ সালে রিয়াজ গার্মেন্টস তাদের ৬৯ হাজার ডলারের রপ্তানি পণ্যের প্রথম চালান মার্কিন মুল্লুকে পাঠায়। এরপর থেকে সস্তা শ্রমের কার্য-কারণের প্রেক্ষাপটে তৈরি পোশাক শিল্প খাতের বার্ষিক ১৫ শতাংশ হারের ঈর্ষণীয় ও বিস্ময়কর অগ্রগতি সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। তবে কোটা ও জিএসপি সুবিধা এক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য শাপেবর হয়। শুধু অর্থনৈতিকভাবে নয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও আজ গার্মেন্টস খাতের অবদান অনস্বীকার্য। কর্মসংস্থানের দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষমতায়নের (বিশেষত নারীর) ক্ষেত্রেও গার্মেন্টস শিল্পের রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানি থেকে আয় করেছিল মাত্র ১৩ লাখ মার্কিন ডলার। আর ২০০৩–২০০৪ অর্থ বছরে দেশের মোট রপ্তানি ৭৬০ কোট ডলারের মধ্যে তৈরি পোশাক খাতের অংশ ৫৬৯ কোটি মার্কিন ডলার। যা মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৭৬ শতাংশেরও বেশি। জিডিপিতে গার্মেন্টস খাতের অবদান এখনও ৫ শতাংশ। এক শ্রমঘন শিল্প হিসাবে ৮০ দশকের মাঝামাঝি এখানে কর্মসংস্থানের পরিমাণ ছিল ১ লাখ (০.১ মিলিয়ন), আর পরবর্তী ২০ বছরে তা উন্নীত হয় প্রায় ২০ লাখে। আরো ৩০ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই খাতের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদন বা ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থানের ৩৫–৪০ শতাংশ এখন আসে গার্মেন্টস শিল্পখাত থেকে। ১৯৮০–২০০৪ এই সময়কালে গার্মেন্টস খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ছিল প্রতি বছর ২৪ শতাংশ। সামষ্টিক অর্থনীতিতে অবদান রেখে বাণিজ্য ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার ক্ষেত্রেও এই খাতের ভূমিকা যথেষ্ট ইতিবাচক। বর্তমানে আমেরিকা ও ইউরোপে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের স্থান যথাক্রমে ৭ম ও ৮ম। শুধু তাই নয়, আজ বাংলাদেশ যে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর দেশ থেকে বাণিজ্য নির্ভর দেশে পরিণত হয়েছে তার পেছনেও গার্মেন্টস খাতের অবদান কম নয়।

এ শিল্পে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৩৫ লক্ষাধিক। যাদের মধ্যে শতকরা ৮৫ জনই হচ্ছে নারী। নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে এ শিল্পের ব্যাপক অবদান রয়েছে। এক জরিপে দেখা যায়, এ শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের প্রায় ৭৪ শতাংশ গৃহাভ্যন্তরে গৃহের সাধারণ কাজে নিয়োজিত ছিল। ৬৪ শতাংশ গ্রাম থেকে আগত। এদের অনেকেই বয়সে তরুণ ও অবিবাহিতা। তাই সমাজে ব্যাপক ধারণা রয়েছে পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকেরা ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থায় এটা স্বাভাবিক ও সত্য ধারণা হলেও এটা অনস্বীকার্য ও সত্য যে, পোশাকশিল্পে নিয়োগ পেয়ে নারী শ্রমিকদের শতকরা ৭০ জনই তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমর্থ হয়েছে। আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি বহু ক্ষেত্রে তাদের সামাজিক মান-মর্যাদাও উন্নত করেছে। বর্তমানে পোশাকশিল্পে ইসলামী নীতিমালা ও মূল্যবোধ বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে রয়েছে বিচ্ছিন্ন কিছু অনৈকিতার অভিযোগ এবং নারী শ্রমিকের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, এমনকি জীবনের নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ। ইসলাম, শ্রম, শ্রমিক ও মালিকানা সম্পর্কিত যে নীতিমালা, আদর্শ ও মূল্যবোধ পেশ করেছে তার যথার্থ বাস্তবায়ন ঘটলে এ অবস্থার উদ্ভব ঘটতনা। তবু আশার কথা যে, আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা থাকার পরেও পোশাক কারখানার কাজ নারী শ্রমিকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর চমৎকার ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এই

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব নিঃসন্দেহে আরও শক্তিশালী এবং ব্যাপকতর হবে যদি পোশাক শ্রমিক এবং মালিক উভয়ের সমস্যাগুলো ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে সমাধান করা যায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে জীবিকা অর্জনের অন্যতম উপায় হচ্ছে শ্রম। ইসলামে শ্রমিক আর মালিকের কোন দ্বন্দ্ব ও সংঘাত নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধান অনুসারে এ দুনিয়ার কল্যাণ বা পরকালের কল্যাণের জন্য প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করতে হবে। মালিকের কর্তব্য হচ্ছে সময় ও মজুরী নির্ধারণ করে শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করা। অন্যথায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিবে এবং উৎপাদন বিঘ্নিত হবে। এ কারণেই মহানবী (স.) শ্রম রিনিয়োগের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে কাজ শেষ করা মাত্রই শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক প্রদান করা মালিকের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। রাসূল (স.) শ্রমিকের মজুরী সম্বন্ধে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। অপর এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহতা'আলা তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ উত্থাপন করবেন, তারমধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন যে ব্যক্তি কাউকে মজুর হিসাবে খাটিয়ে ও তার দ্বারা পূর্ণ কাজ আদায় করা সত্ত্বেও শ্রমিকের মজুরী দেয় না। এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, 'শ্রমিকের মজুরী নির্ধারণ না করে তাকে নিয়োগ করতে রসূলুল্লাহ (স.) নিষেধ করেছেন।

ইসলামী অর্থনীতির মজুরী নির্ধারণ সূত্র হলো, ন্যূনতম মজুরী প্রত্যেক শ্রমিকের প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রমিককে কমপক্ষে এমন মজুরী দিতে হবে, যেন সে এর দ্বারা তার ন্যায়ানুগ ও স্বাভাবিক চাহিদা মেটাতে পারে। রসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, অধীনস্থদের খোরপোষ দিতে হবে। রসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেছেন, "শ্রমিকের পারিশ্রমিক ও ঋণ পরিশোধ নিয়ে ধনী ব্যক্তিদের টালবাহানা করা যুলুম।

উপরোক্ত হাদীসসমূহের আলোকে একথা বোঝা যায় যে, ইসলাম শ্রমিকের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে এবং এর জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ঘোষণা করেছে। ইসলামের নীতিমালা হল মালিক শ্রমিকদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিবে অথবা এমন জরুরী দিবে, যাতে তাদের প্রয়োজন মিটে যায়। কারণ তারা তাদের নিজেদের এবং পরিবারবর্গের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য এ পরিশ্রম করে এবং এই মজুরীই তাদের একমাত্র উপায়। এ ব্যাপারে ইসলামের প্রথম কথা হল শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী দিতে হবে। কোনরূপ টালবাহানা করা যাবে না। তার প্রতি তার ক্ষমতার অধিক কোন দায়িত্ব চাপানো যাবে না। তাদের সন্তানদের শিক্ষার অধিকারও নিশ্চিত করতে হবে। এমনিভাবে তাদের বাসস্থানের বিষয়টিও নিশ্চিত করা মালিক বা সরকার পক্ষের কর্তব্য।

ইসলাম মূলত: এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়, যেখানে সবার অধিকারই সংরক্ষিত থাকে এবং চাওয়ার আগেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রত্যেকের অধিকার আদায় করে দিতে সকলেই উদ্বুদ্ধ থাকে। এভাবে ইসলাম যেমন একদিকে মালিককে তার কর্মে নিযুক্ত শ্রমিককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে নির্দেশ করেছে। অন্যদিকে শ্রমিককেও আপন মালিকের নির্ধারিত কাজে নিজের একনিষ্ঠ শ্রমটুকু নিয়োগ করতে বলেছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর শ্রমিক কাজে কোনরূপ গাফলতী করতে পারবে না। সৎ কর্মশীল একজন শ্রমিক যে আল্লাহর ও মালিকের হক আদায় করে থাকে সে ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হয়। রসূল (স.)-এর পেশকৃত শ্রমনীতিতে এমন ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক পারিশ্রমিক বা মজুরী প্রদানের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে যাতে প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনাদি সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করা যায়।

পোশাকশিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। দেশের স্বার্থে এই শিল্পের শ্রমিকদের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ মজুরী নির্ধারণ জরুরী। ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে শুধু শ্রমিক নয় মালিকপক্ষেরও ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। মালিক শ্রমিক দ্বন্দ্ব বহাল থাকলে গার্মেন্টস শিল্পগুলোতে

Dhaka University Institutional Repository

অস্থিরতা চরম আকার ধারণ করবে। সমাজে একজনের কর্তব্য অন্য জনের অধিকার নিশ্চিত করে। শ্রমিকের চরম আকার ধারণ করবে। সমাজে একজনের কর্তব্য অন্যজনের অধিকার নিশ্চিত করে। শ্রমিকের যেমন কর্তব্য সঠিক শ্রম প্রদানের মাধ্যমে কারখানার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে মালিকের অধিকারকে নিশ্চিত করা। অন্যদিকে মালিকের কর্তব্য হচ্ছে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা যা শ্রমিকের অধিকার তথা মানবাধিকার হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। এক্ষেত্রে সরকার, মালিক ও শ্রমিক-এই তিন পক্ষের সমন্বিত ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৬ সালের শ্রম আইনের পূর্ণ বাস্তবায়নের পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতি ও শ্রমনীতির আলোকে শ্রমের যথাযথ মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এ শিল্পকে পূর্ণ সাম্য ও সমতার ভিত্তিতে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। তবেই শ্রমিকদের জীবন মানের উন্নয়নের স্থিতিশীল পরিবেশে এ শিল্প দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

একমাত্র শ্রমকে পুঁজি করেই বাংলাদেশে পোশাকশিল্প গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের শ্রম বিশেষ করে নারী শ্রম অত্যন্ত সস্তা। শ্রমের সহজ ও সুলভ প্রাপ্তির জন্যই এত দ্রুতগতিতে এশিল্পের বিকাশ ঘটেছে। দারিদ্র বাংলাদেশে একটি প্রকট সমস্যা। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত গ্রামের হতদরিদ্র মেয়েরা তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনের লক্ষে ছুটে আসছে শহরে এবং কাজের সংস্থান করে নিচ্ছে পোশাক কারখানাগুলোতে। কিন্তু এতে তাদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা কতটুকু অর্জিত হচ্ছে, কাজের উপযুক্ত পরিবেশ তাদের আছে কিনা; তাদের নিরাপত্তা কতটুকু আছে; তার পরিমাপ করা, তাদের নিরাপত্তাহীনতার কারণসমূহ উদঘাটন; ইসলামের মূল্যবোধের আলোকে তার সমাধান, পোশাকশিল্পের মালিকদের সাথে নারী শ্রমিকদের সম্পর্ক পর্যালোচনা ও ইসলামী নীতিমালার প্রয়োগ, বিদ্যমান শ্রমিক মালিক সম্পর্ক ও তার সমাধানে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রায়োগিক পর্যালোচনা সম্পর্কিত আলোচনা করতে গিয়ে একে পাঁচটি প্রধান অধ্যায়ে বিভক্ত করে সাজানো হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়েঃ পোশাক শিল্পের ইতিবৃত্ত আলোচনা করতে গিয়ে-পোশাকের ঐতিহাসিক পটভূমি, বিভিন্ন দেশের প্রচলিত পোশাক, ভারতীয় উপমহাদেশের পোশাক, আঞ্চলিক পোশাকের স্থানীয় কাচাঁমাল, তুলা, পাট, রেশম, আঞ্চলিক প্রাচীন পোশাক, শাড়ি কাপড়, ঢাকাই মসলিন, ঢাকাই জামদানি, টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি, বেনারশি শাড়ি, কুমিল্লার খাদি কাপড়, কুমারখালীর কাপড়, রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজারের শাল, উপজাতীয় পোশাক, পোশাককেন্দ্রিক আঞ্চলিক শিল্প, পাট শিল্প, রেশম শিল্প, সূচী শিল্প, তাঁত শিল্প, নকশি কাঁথা শিল্প, ছাপা শিল্প, এমব্রয়ডারী শিল্প, হোসিয়ারি শিল্প, আদি কুঠির শিল্প থেকে তৈরি পোশাক শিল্প, হস্তচালিত তাঁত থেকে মেশনারী বুনন তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়েঃ বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নারী শ্রমঃ প্রকৃতি ও অবস্থান তুলে ধরতে গিয়ে পোশাকশিল্প ও জাতীয় অর্থনীতি, দেশের শ্রমজীবী নারী ও পুরুষ, রাষ্ট্রীয় খাতে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান, বাংলাদেশের বর্তমান দারিদ্র পরিস্থিতি ও নারী শ্রম, বাংলাদেশের নারী শ্রমিক ও অর্থনীতির মুক্তি, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, শ্রম বাজারে নারী-পুরুষ বৈষম্য, পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকদের অবস্থা ও অধিকার আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ে: পোশাক শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের আর্থ-সামাজিক অবস্থান আলোচনা করতে গিয়ে পোশাক কারখানার কাজে নারী শ্রমিকের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, নারী শ্রমিকের অর্থনীতির নিরাপত্তা ও মজুরী, নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মুজরী বৈষ্যমের কারণ, নারী ও পুরুষ শ্রমিকের পদোন্নতির বিভাজন, নারী শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা, বাসস্থান ও স্বাস্থ্যগত অবস্থান, নারী শ্রমিকের শ্রম,পরিবেশ ও শ্রমিকের অধিকার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে: ইসলামে শ্রম ও কর্মসংস্থান নীতিতে নারীর অবস্থান তুলে ধরতে গিয়ে ইসলামে শ্রম ও শ্রমের প্রকারভেদ, শ্রম ও শ্রমিক বিষয়ক মতবাদ, ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা, ইসলামে শ্রম নীতির উৎস, ইসলামে শ্রম নীতির বৈশিষ্ট্য, ইসলামে শ্রমনীতির তাৎপর্য, কর্মী সংগ্রহ, নির্বাচন ও কর্মসংস্থান, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন, মজুরী নির্ধারণ, ইসলামিক দৃষ্টিতে শ্রমিক মালিক সম্পর্ক, শ্রমিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, শ্রমিকের অধিকার, ইসলামের দৃষ্টিতে নারীদের কর্মসংস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে: বাংলাদেশের পোশাক শিল্প : নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থান, সমস্যা নিরসন ও ইসলামী বিধান আলোচনা করতে গিয়ে পোশাকশিল্পে কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা, গার্মেন্টস শিল্পের কোটামুক্ত পরিবেশে পোশাকশিল্প, পোশাক শিল্পের সংকট ও সম্ভাবনা, সংকট ও আন্তর্জাতিক বাজার, পোশাক শিল্পকে বাচাতে প্রয়োজন, পোশাক শিল্পে নারী-শ্রমিক প্রাসঙ্গিক অবস্থা, পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের অর্থনৈতিক উন্নয়নে করণীয়, নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থান নীতি, পোশাকশিল্পে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের জন্য সুপারিশমালা, বাংলাদেশে নারীদের কর্মসংস্থান ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ, পোশাকশিল্পের শ্রমিকের মজুরী ও ইসলামের নীতি, বাংলাদেশে প্রচলিত মজুরী আইন ও বাস্তবতা, মজুরী সমস্যা ও ইসলাম, বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে দুর্ঘটনা, প্রচলিত আইন ও ইসলাম, বাংলাদেশে পোশাকশিল্পে দুর্ঘটনার চিত্র, সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ, পোশাকশিল্পে দুর্ঘটনা পরবর্তী আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয়ে পূর্বের ও বর্তমান শ্রম আইনসমূহ, শ্রমিকের স্বার্থে আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবতা, পোশাক শিল্পে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কতিপয় প্রস্তাবনা, ইসলামে শ্রমের মর্যাদা ও বিধান আলোচনা করা হয়েছে।

পরিশেষে উপসংহার ও সুপারিশমালা পেশ করে গ্রন্থপঞ্জি নামে সহায়ক গ্রন্থাবলির একটি তালিকা প্রদান করে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

মোঃ রশিদ আহমেদ হোসাইনী
পিএইচ.ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রত্যয়নপত্র ২

অঙ্গীকারনামা ৩

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ৪

শব্দ সংকেত ৫

ভূমিকা ৬

অধ্যায়ের নাম	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়:	**পোশাক শিল্পের ইতিবৃত্ত :**	(১৩ - ৮৬)
	* পোশাকের ঐতিহাসিক পটভূমি	১৪
	* বিভিন্ন দেশের প্রচলিত পোশাক	১৫
	* ভারতীয় উপমহাদেশের পোশাক	১৮
	* আঞ্চলিক পোশাকের স্থানীয় কাচাঁমাল	২২
	* তুলা	২৫
	* পাট	২৫
	* রেশম	২৭
	* আঞ্চলিক প্রাচীন পোশাক	৩০
	* শাড়ি কাপড়	৩১
	* ঢাকাই মসলিন	৩২
	* ঢাকাই জামদানি	৩৫
	* টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি	৪১
	* বেনারশি শাড়ি	৪৫
	* কুমিল্লার খাদি কাপড়	৪৯
	* কুমারখালীর কাপড়	৪৯
	* রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজারের শাল	৫১
	* উপজাতীয় পোশাক	৫২
	* পোশাককেন্দ্রিক আঞ্চলিক শিল্প	৫২
	* পাট শিল্প	৫৭
	* রেশম শিল্প	৫৯
	* সূচী শিল্প	৬৫
	* তাঁত শিল্প	৬৮
	* নকশি কাঁথা শিল্প	৭০
	* ছাপা শিল্প	৭৫
	* এমব্রয়ডারী শিল্প	৭৯
	* হোসিয়ারি শিল্প	৮০
	* আদি কুঠির শিল্প থেকে তৈরি পোশাক শিল্প	৮০
		৮১
		৮২

Dhaka University Institutional Repository

	* হস্তচালিত তাঁত থেকে মেশনারী বুনন	৮৫
দ্বিতীয় অধ্যায়:	**বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নারী শ্রমঃ প্রকৃতি ও অবস্থান**	(৮৭-১২৯)
	* পোশাকশিল্প ও জাতীয় অর্থনীতি	৮৮
	* দেশের শ্রমজীবী নারী ও পুরুষ	৯৩
	* রাষ্ট্রীয় খাতে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান	৯৫
	* বাংলাদেশের বর্তমান দারিদ্র পরিস্থিতি ও নারী শ্রম	৯৬
	* বাংলাদেশের নারী শ্রমিক ও অর্থনীতির মুক্তি	১০১
	* বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ	১০৭
	* শ্রম বাজারে নারী-পুরুষ বৈষম্য	১১৩
	* পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকদের অবস্থা ও অধিকার	১২৮
তৃতীয় অধ্যায়:	**পোশাক শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের আর্থ-সামাজিক অবস্থান:**	(১৩০-১৭৩)
	* পোশাক কারখানার কাজে নারী শ্রমিকের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা	১৩১
	* নারী শ্রমিকের অর্থনীতির নিরাপত্তা ও মজুরী	১৩৪
	* নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মুজরী বৈষ্যমের কারণ	১৪২
	* নারী ও পুরুষ শ্রমিকের পদোন্নতির বিভাজন	১৪৫
	* নারী শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা	১৪৯
	* বাসস্থান ও স্বাস্থ্যগত অবস্থান	১৫৬
	* নারী শ্রমিকের শ্রম,পরিবেশ ও শ্রমিকের অধিকার	১৬১

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়:	**ইসলামে শ্রম ও কর্মসংস্থান নীতিতে নারীর অবস্থান:**	**(১৭৪-২১০)**
	* ইসলামে শ্রম ও শ্রমের প্রকারভেদ	১৭৫
	* শ্রম ও শ্রমিক বিষয়ক মতবাদ	১৭৭
	* ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা	১৭৯
	* ইসলামে শ্রম নীতির উৎস	১৮৪
	* ইসলামে শ্রম নীতির বৈশিষ্ট্য	১৮৫
	* ইসলামে শ্রমনীতির তাৎপর্য	১৮৬
	* কর্মী সংগ্রহ, নির্বাচন ও কর্মসংস্থান	১৮৭
	* শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন	১৯২
	* মজুরী নির্ধারণ	১৯২
	* ইসলামিক দৃষ্টিতে শ্রমিক মালিক সম্পর্ক	১৯৭
	* শ্রমিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৯৯
	* শ্রমিকের অধিকার	২০৯
	* ইসলামের দৃষ্টিতে নারীদের কর্মসংস্থান	
পঞ্চম অধ্যায়:	**বাংলাদেশের পোশাক শিল্প: নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থান, সমস্যা নিরসন ও ইসলামী বিধান:**	**(২১১-২৬২)**
	* পোশাকশিল্পে কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা	২১২
	* পোশাকশিল্পে সামাজিক সুফল	২১৪
	* গার্মেন্টস শিল্পের কোটামুক্ত পরিবেশে পোশাকশিল্প	২১৫
	* পোশাক শিল্পের সংকট ও সম্ভাবনা	২১৮
	* সংকট ও আন্তর্জাতিক বাজার	২২০
	* পোশাক শিল্পকে বাচাতে প্রয়োজন	২২০
	* পোশাক শিল্পে নারী-শ্রমিক প্রাসঙ্গিক অবস্থা	২২২
	* পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের অর্থনৈতিক উন্নয়নে করণীয়	২২৯
	* নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থান নীতি	২৩১
	* পোশাকশিল্পে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের জন্য সুপারিশমালা	২৩৩
	* বাংলাদেশে নারীদের কর্মসংস্থান ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ	২৩৫
	* পোশাকশিল্পের শ্রমিকের মজুরী ও ইসলামের নীতি	২৩৮
	* বাংলাদেশে প্রচলিত মজুরী আইন ও বাস্তবতা	২৪০
	* মজুরী সমস্যা ও ইসলাম	২৪৫
	* বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে দুর্ঘটনা	২৪৯
	* প্রচলিত আইন ও ইসলাম	২৫০
	* বাংলাদেশে পোশাকশিল্পে দুর্ঘটনার চিত্র	২৫২
	* সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ	২৫২
	* পোশাকশিল্পে দুর্ঘটনা পরবর্তী আর্থ-সামাজিক অবস্থা	২৫৩
	* শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয়ে পূর্বের ও বর্তমান শ্রম আইনসমূহ	

Dhaka University Institutional Repository

	* শ্রমিকের স্বার্থে আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবতা * পোশাক শিল্পে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কতিপয় প্রস্তাবনা * ইসলামে শ্রমের মর্যাদা ও বিধান	২৫৮ ২৫৯ ২৬১
	উপসংহার ও সুপারিশমালা	**(২৬৩-২৭৫)**
	গ্রন্থপঞ্জি.....	**(২৭৬-২৮২)**

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পোশাক শিল্পের ইতিবৃত্ত

* ভূমিকা (Introduction)
* পোশাকের ঐতিহাসিক পটভূমি
* বিভিন্ন দেশের প্রচলিত পোশাক
* ভারতীয় উপমহাদেশের পোশাক
* আঞ্চলিক পোশাকের স্থানীয় কাঁচামাল
* তুলা
* পাট
* রেশম
* আঞ্চলিক প্রাচীন পোশাক
* শাড়ি কাপড়
* ঢাকাই মসলিন
* ঢাকাই জামদানি
* টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি
* বেনারশি শাড়ি
* কুমিল্লার খাদি কাপড়
* কুমারখালীর কাপড়
* রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজারের শাল
* উপজাতীয় পোশাক
* পোশাককেন্দ্রিক আঞ্চলিক শিল্প
* পাট শিল্প
* রেশম শিল্প
* সূচী শিল্প
* তাঁত শিল্প
* নকশি কাঁথা শিল্প
* ছাপা শিল্প
* এম্ব্রয়ডারী শিল্প
* হোসিয়ারি শিল্প
* আদি কুঠির শিল্প থেকে তৈরি পোশাক শিল্প
* হস্তচালিত তাঁত থেকে মেশনারী বুনন
* উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা (Introduction)

পোশাক সভ্য মানব সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য নিত্য প্রয়োজনীয় আবশ্যকীয় উপাদান। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষ সমাজবদ্ধ ও গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে শুরু করলে বিভিন্ন প্রকার চাহিদা সৃষ্টি হতে থাকে। পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে যুগে যুগে মানুষের প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়। এ বিভিন্ন প্রকার চাহিদার মধ্যে পোশাক অন্যতম। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর প্রথম মানব আদম (আ.) ও বিবি হাওয়া (আ.)-এর সৃষ্টির পরপরই পোশাকের প্রয়োজন হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের মাধ্যমে মানব জাতিকে সভ্য জাতিরূপে আবির্ভূত করতে পোশাকের ব্যবস্থা করেন। তাই পোশাকের ইতিহাস মানব জাতির ইতিহাসের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। পৃথিবীতে মানবজাতির আর্বিভাবে কোন এক মূহুর্ত হতে শুরু করে বৃক্ষের পাতা, গাছের ছাল, বাকল, পশুর চামড়া ও লোম ইত্যাদি দিয়ে আদিকালের পোশাক ব্যবহার শুরু হয়। মানুষ ক্রমান্বয়ে বস্ত্রের প্রয়োজন নানাভাবে উপলব্ধি করতে শুরু করে। এভাবেই বর্তমান সময় পর্যন্ত পোশাকের প্রয়োজনীয়তা হেতু মানুষ বিভিন্ন রকমারী পোশাক উৎপাদন করেছে।

ভারতীয় উপমহাদেশ বিশেষত বাংলাদেশে পোশাক শিল্প বিকাশের ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রাক্-মুগল মূসলিম বাংলার ঢাকা ও তার সন্নিহিত কয়েকটি এলাকায় একটি শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে ওঠে। হস্তশিল্প, তাঁতের কাজ, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি বানানো, অলঙ্কার নির্মাণ ইত্যাদিতে তাদের নিপুণ দক্ষতা ছিল। দূরাতীত কালেও বাংলা নানা ধরনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ ছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশ উন্নত ছিল। বাংলার পুরানো শিল্পের মধ্যে সূক্ষ্ম মসলিন, চিনি, লবণ ইত্যাদির উৎপাদন ছিল। দূরপ্রাচ্য ও ইউরোপে এসব বহুল পরিমাণে রপ্তানি হতো। ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। ফলে বাংলায় শিল্প বিকাশের পথ বেশ সুগম হয়। আরব দেশসমূহ থেকে আসা অনেক ব্যবসায়ী বাংলায় বিভিন্ন ধরনের কারবার হাতে তুলে নেয় এবং পাশ্চাত্যের সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগ স্থাপন করে। আবার তারা স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মিলেমিশেই ব্যবসায় পরিচালনার নীতি অনুসরণ করায় স্থানীয় জনগণও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশে তথা শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসে।

রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করার পর এই অঞ্চলের রাজনৈতিক গুরুত্ব বেড়ে যায়। বাণিজ্যিকভাবে ঢাকা গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত হয় এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম প্রধান বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। এ সময়ে ইউরোপীয়, বিশেষ করে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ব্রিটিশ এবং ফরাসি ব্যবসায়ীরা অধিক সংখ্যায় ঢাকা আসতে শুরু করে। দিল্লির মুগল বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকার মসলিন শিল্প নতুন উদ্যমে বিকশিত হয়ে ওঠে। মসলিন ছাড়া সোনা, রুপা বা রেশমি সুতায় বোনা জমিন ও পাড়ের সাধারণ বা ফুলেল ডিজাইনের জামদানি শাড়িও বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এসব বস্ত্র হেজাজ, মরক্কো, তিউনিসিয়া ও দিল্লিতে বাজার লাভ করে।

স্বাধীনাত্তোর বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের জন্য বিশ্ববাজারে বিশেষ করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে অধিক পরিমাণে পোশাক রফতানির সম্ভাবনা দেখা দেয়। সত্তরের দশক থেকে রপ্তানিমুখী খাত হিসেবে তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়ন ঘটতে শুরু করে। ধীরে ধীরে এ শিল্পের অভ্যন্তরীণ বাজারও দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে। তখন থেকেই এ পোশাক শিল্প কর্মসংস্থানের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত লোকের কর্মসংস্থানের এক দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। সুযোগ-সুবিধার কারণে অনেক শিক্ষিত তরুণ পোশাক শিল্পে তাদের ক্যারিয়ার জীবন শুরু করছে। দেশের ক্রমবিকাশমান এ শিল্পে শুধু যে শিক্ষিত লোকের কর্মসংস্থানের

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে তা নয়। গ্রাম থেকে আসা অল্পশিক্ষিত নারীরা দ্রুত কাজ শিখে পেশায় জড়িয়ে পোশাকশিল্পকে আন্তজার্তিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অর্ধশিক্ষিত এবং দেশের পিছিয়ে পড়া অনেক বেকার নাগরিকের শ্রম ও উদ্যোক্তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে পোশাক একটি রপ্তানী শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মানবজাতির উন্নতি ও সভ্য হয়ে উঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন যুগে পোশাকের রকমারি সাজ-সজ্জার মধ্যে দিয়ে এ শিল্পের বিকাশ ঘটে। বিভিন্ন সময়ের চাহিদানুযায়ী অন্যান্য স্থানের মতো ভারতীয় উপমহাদেশ বিশেষ করে বাংলাদেশে পোশাক উৎপাদন শিল্পে পরিণত হয়। বর্তমানে উহা একটি রপ্তানী শিল্পে পরিণত হয়েছে। কৃষিভিত্তিক সমাজে ব্যবহৃত আদিম পোশাক হতে বর্তমান যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পোশাক উৎপাদনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে মানুষের জীবনযাপনের বিভিন্ন পর্যায়ে পোশাকের চাহিদা মিটানোর ক্ষেত্রে গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও পোশাক শিল্পের ইতিহাস বলা চলে। বর্তমান অধ্যায়ে আদিম সমাজে পোশাকের চাহিদা সৃষ্টির বিভিন্ন কারণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে পোশাকের প্রাচীন ইতিহাস, ভারতীয় উপমহাদেশের পোশাক উৎপাদনের কাচাঁমাল, ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের প্রাচীন পোশাক, পোশাক বুননের পদ্ধতি ও বাংলার প্রচলিত তাঁতনির্ভর কুঠির শিল্প হতে যান্ত্রিক উপায়ে বস্ত্র উৎপাদনের বৃহৎ ইতিহাসকে সংক্ষেপে আলোচিত হবে।

পোশাকের ঐতিহাসিক পটভূমি

পোশাক মানুষের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে খাদ্যকে প্রথম পর্যায়ে ফেলা হয়। কিন্তু আদিকালের ইতিহাস এবং মানুষের জন্মেও পর মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, মানুষ পৃথিবীতে আগমনের পর পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে সর্বপ্রথম যা ধারণ কওে সেটি হলো বস্ত্র। বস্ত্রের মাধ্যমে একটি নবজাত শিশু পৃথিবীর পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ায়। পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করার সময় সব কিছুর মায়া ত্যাগ করলেও মানুষ বস্ত্রটি সাথে করে নিয়ে যায়। তবে প্রাচীনকালে বর্তমানকালে সৌন্দর্যময় পোশাকের ন্যায় মানুষের পোশাক বলতে কিছু ছিল না। তখন মানুষ সেলাই করতে জানতো না। শীতকালে তাদের অসুবিধায় পড়তে হতো। বিশেষ করে রাতেরবেলা যখন ঘন শীতের তীব্রতা বেড়ে যেত তখন আদিম মানুষদের বেশ ঝামেলার মধ্যে পড়তে হতো। শীত থেকে বাঁচার জন্য তারা গাছের বাকল, জীবজন্তুর চামড়া, পাখির পালক, গাছের শুকনো পাতা, পশুর লোম এসব সংগ্রহ করে করত। আদিম মানুষের বুদ্ধি যত বাড়তে লাগল নিজেদের বেশভূষা, পোশাক-আশাকের ব্যাপারে আরো সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করল। গাছের পাতা দিয়ে পোশাক বুনতে শুরু করল। পাতা দিয়ে তৈরি পোশাকে চমৎকারভাবে তারা নিজেদের রূপ সচেতনতাকে আবিষ্কার করতে শিখল।

প্রাচীনকালে পোশাক হিসেবে তারা ব্যবহার করতো গাছের বাকল, পাতা, পশুর চামড়া ইত্যাদি। ক্রমান্বয়ে সুতি বস্ত্রেও প্রচলন হয়। আধুনিক যুগে বস্ত্র হিসেবে বিভিন্ন প্রকার তন্তুর ব্যবহার হচ্ছে। প্রাচীনকালে আদিম অধিবাসীরা সুন্দর পোশাক কোনো বিশেষ উৎসব উপলক্ষে ব্যবহার করতো। এক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ দেখিয়েছে। এস্কিমোরা পশমের সবচেয়ে জটিল বুননী ও উল্লেখযোগ্য নকশার কারুকার্যখচিত বস্ত্র ব্যবহার করতো। কারিগর হিসেবে তাদের দক্ষতা সামাজিক মর্যাদা অর্জন করেছে। এস্কিমোরা সিল মাছের চামড়া দিয়ে পোশাক প্রস্তুত করতো। এ চামড়া তৈরি সাজ-সরঞ্জাম বহু শতাব্দি পর্যন্ত চলে এসেছিল। সে যুগে পদমর্যাদা অনুযায়ী পোশাক পরিধানের একটি নিয়ম তালিকা ছিল। পর্দমর্যাদা অনুযায়ী তারা দাঁত. থাবা, পালক, বিপদজনক

Dhaka University Institutional Repository

পশুর লেজ ইত্যাদি পোশাক হিসেবে ব্যবহার করতো। ভারতের অধিবাসিরাও নিজেদের পদবি অনুযায়ী পোশাক পরতো। প্রাচীনকালে বস্ত্রের প্রয়োজনীতা বিভিন্ন রকমের ছিল।

বস্ত্র ইতিহাসে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানব ইতিহাসের প্রথম দিকে অন্তঃদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষগুলোকে অন্য মানুষের কাছ হতে আলাদা করার জন্য ব্যতিক্রম পোশাক ব্যবহার করা হতো। তারা চিকিৎসাশাস্ত্রের দক্ষতা অর্জন করে। ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধদের পোশাকের গঠন তাদের পরিচয় চিহ্নিত করে। এসব ধর্মীয় ব্যক্তিরা ছিল শক্তিশালী, তারা পোশাক হিসেবে এমন কতকগুলো প্রতীক ব্যবহার করতো যা কখনো শান্তি আবার কখনো শ্রদ্ধা প্রদর্শন হিসেবে কাজ করতো।[১]

ক. শালীনতা রক্ষা: আদিকালে মানুষ যখন সভ্যতার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল তখন তার গোষ্ঠীবদ্ধ হল। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে শালীনতাবোধ দেখা দিল। শালীনতা রক্ষার জন্য প্রথমদিকে তার বৃক্ষের পাতা দিয়ে দেহকে আচ্ছাদন করে নিজের লজ্জা নিবারণ করত। ক্রমান্বয়ে তারা প্রকৃতি হতে উৎপন্ন তন্তু দিয়ে প্রস্তুত পোশাক ব্যবহার শুরু করল। এর পরিপ্রেক্ষিতে পোশাক অত্যন্ত অপরিহার্য হয়ে উঠলো। শালীনতা রক্ষার জন্য পোশাকের গুরুত্ব আদিকাল থেকে চলে আসছে।

খ. শীতাতপ হতে রক্ষা: প্রাচীনকালে মানুষ গুহায় বসবাস করত। বুদ্ধি বিকাশের সাথে সাথে তারা নানা প্রকার কাজে নিয়োজিত হয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাতায়াত করতে হয়। প্রকৃতির নিয়মে শীত ও গ্রীস্মের আগমনের সাথে সাথে তাদের শরীরের চামড়ার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল। প্রচণ্ড শীতও যেমন কষ্টদায়ক আবার প্রচণ্ড গ্রীস্মের তাপও অত্যন্ত কষ্ট ও বেদনাদায়ক ছিলো। এ কারণে তারা তাদের দেহকে রক্ষা করার জন্য গাছের লতাপাতা দিয়ে তৈরি পোশাক, জীব-জন্তুর চামড়া দিয়ে তৈরি পোশাক ব্যবহার করতে শুরু করল। এ প্রক্রিয়ায় তারা দেহকে আবৃত ও বিপদমুক্ত করত। দেহের আচ্ছাদনের সাথে সাথে চামড়ার তৈরি জুতাও তারা ব্যবহার করতে শুরু করল।

গ. কীটপতঙ্গ ও হিংস্র জীব থেকে রক্ষা: মানুষ শালীনতা ও শীতাতপ থেকে রক্ষা পাওয়া ও গাত্র আচ্ছাদনের জন্য যে পোশাক পরিধান করতে শুরু করল তার আগে বিভিন্ন কীটপতঙ্গ ও হিংস্র জন্তু প্রায় সরাসরি দেহের চামড়ায় আক্রমণ করতে পারত এবং এতে কখনো কখনো ব্যক্তির মৃত্যুও হত। আবার কখনো সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হত পোশাক ব্যবহারের ফলে সরাসরি দেহ বা চামড়ার আক্রমণ কম হতে লাগল।আদি যুগের মানুষেরা আরো অনুভব করল বাঘ, হরিণ ও আরো বিভিন্ন জন্তুর চামড়ার পোশাক ব্যবহার করে বনে জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করলে অনেক সময় বিভিন্ন হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এভাবে প্রাচীনকালে মানুষ ধীরে ধীরে আত্মরক্ষার জন্য পোশাকের প্রয়োজন অনুভব করলো ও পোশাক ব্যবহারে সচেতন হল।[২]

ঘ. ক্ষমতা প্রদর্শন: মানুষ যখন গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করতে শিখল তখন নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং গোষ্ঠীর মানসম্মান, আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য কিছু কিছু ব্যক্তির উপর দায়িত্ব অর্পিত হল। এর ফলে তাদের পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন প্রকার কার্যাবলী দেখা দিল। এ কার্যাবলী সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার জন্য নেতার প্রয়োজন অর্পিত হল। তাদের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে

---

১. বস্ত্র ও পরিচ্ছদ : ব্যবহারিক শিল্পকলা, পৃ. ৫৪

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

তোলার জন্য এবং গোত্রের মধ্যে চিহ্নিত করার জন্য কিছু ব্যতিক্রমধর্মী পোশাক ব্যবহার শুরু হল। ঐ পোশাক পরিধানকারী ব্যক্তিদের দেখলেই তৎকালীন লোকের ক্ষমতা ও কার্য সম্পর্কে অনুধাবন করা যেত। উদাহরণস্বরূপ ধরা যায় গোষ্ঠী নেতা বিচারক। এদের পোশাক অন্যান্য সাধারণ মানুষের চেয়ে আলাদা। মাথার মুকুট, পোশাকের গঠন ও নকশা এবং দেহের বিভিন্ন অংশে নানা রকম নকশার অঙ্কন। বর্তমান যুগে বা আধুনিককালে সেনাবাহিনী ও পুলিশদের পোশাকও উদাহরণ হিসেবে ধরা হয়। তাদের পোশাক যেমন তাদের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বোঝায়, তেমনি প্রাচীন যুগেও মানুষ ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদর্শন করার জন্য এ ধরনের পোশাক ব্যবহার করত।

ঙ. **বৈবাহিক মান তুলে ধরা:** তৎকালীন যুগে বিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের ব্যক্তিগত জীবন ব্যবস্থা ও সামাজিক জীবন ব্যবস্থা পোশাকের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করা হত। বিবাহিত ব্যক্তিদের পোশাকের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হত। পোশাকের সাথে তাদের অঙ্গসজ্জা ও অলঙ্কারের পার্থক্য ছিল। আধুনিক যুগে বিশেষ করে বিবাহিত মহিলাদের চিহ্নিত করার জন্য পোশাকের ব্যবস্থা আছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মেয়েরা বিবাহিত হলে শাড়ি পরিধান করে এবং সিঁদুর ও শাখা বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার করে থাকে। মুসলিম মেয়েদেরও শাড়ি ও নাকফুল ব্যবহার দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। তবে বর্তমান যুগে এসবের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

চ. **নেতৃত্ব শনাক্তকরণ:** গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক মানুষেরা ক্রমে ক্রমে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে জীবনধারণ করার অভ্যাস শুরু করতে লাগল। এর ফলে তাদের পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন প্রকার কার্যাবলী দেখা দিল। এ কার্যাবলী সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার জন্য নেতার প্রয়োজনও দেখা দিল এবং কিছু ব্যতিক্রমধর্মী পোশাকের ব্যবহার শুরু হল। নেতারা একেক স্থানে একেক ধরনের দায়িত্ব ও কার্য পরিচালনা করে থাকে। গৃহকর্তা এক ধরনের নেতা, রাজনীতিবিদ, সমাজের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী আর এক ধরনের নেতা। কার্যের প্রকৃতি অনুযায়ী পোশাকের নকশা, রঙ, ডিজাইন প্রস্তুত করা হত। এমনকি বস্ত্র হিসেবে যে তন্তুও পোশাক, পাখির পালক, পশুর চামড়া, গাছের পাতা বা বাকল যা-ই ব্যবহার হোক না কেন সেটি নেতার কার্যের প্রকৃতি বুঝে ব্যবহৃত হত। নেতার অলঙ্কার, দেহে চিহ্নিত নকশাও অন্য ব্যক্তি থেকে আলাদা হত। ফলে গোষ্ঠীর নেতা চিহ্নিতকরণে অসুবিধা হত না।[৩]

ছ. **নিজেকে ভয়ঙ্করূপে প্রকাশ:** প্রাচীনকালে গ্রামভিত্তিক জীবন ছিলো এবং অধিকাংশ স্থান বনজঙ্গলে ভরা ছিল। এ জঙ্গলে হিংস্র জীবজন্তু বসবাস করত। সুযোগ পেলেই বিভিন্ন জনপদে খাদ্যের অন্বেষণে চলাচল করে মানুষের উপর আক্রমণ চালাত। এতে তাদের নিরাপত্তা বলতে কিছুই ছিল না। এ হিংস্র জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পোশাকগুলো এমনভাবে তৈরি হত যেন, যে ব্যক্তি ঐ পোশাকগুলো পরিধান করত তাদের হিংস্র পশু থেকেও ভয়ঙ্কর লাগত। এর ফলে হিংস্র পশু থেকে আত্মরক্ষা সহজ হত।[৪]

এভাবে আদিকালে নানা প্রকার ঘটনা, দুর্ঘটনা, প্রয়োজন ইত্যাদির কারণে পোশাক যেমন ব্যবহার শুরু হয়েছিল আবার নানা প্রকার কাজেও ব্যবহার দেখা গিয়োছিল। প্রাচীনকালে পোশাকের প্রয়োজনীয়তা তাদের যেমন অবস্থানের উপর নির্ধারণ করা হয়েছিল বর্তমানেও স্থান, কাল, পরিবেশ, চাহিদা ও গুরুত্বের উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে পোশাকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়। শালীনতা

---

৩. বস্ত্র ও পরিচ্ছদ : ব্যবহারিক শিল্পকলা, পৃ. ৫৬

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষা, শীত ও তাপ হতে রক্ষা পাওয়া, জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পাশাপাশি সৌন্দর্য বিকাশের উদ্দেশ্যে বর্তমানে পোশাকের ব্যবহার করা হয়। কারণ মানব জীবনের সভ্যতা যতো বিকাশ লাভ করেছে সৌন্দর্যবোধ মানুষের মধ্যে ততো দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন ব্যক্তির সৌন্দর্য বিকাশের জন্য পোশাক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিভিন্ন দেশের প্রচলিত পোশাক :

মানুষ সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই সৌন্দর্যপ্রিয়। সুন্দর পোশাকের প্রতি সর্বোপরি বেশভূষার প্রতি প্রাচীনকাল থেকে ছিল মানুষের বিপুল আগ্রহ আর কৌতূহল। আস্তে আস্তে আদিম মানুষ তাদের সাজসজ্জার ব্যাপারে অতিমাত্রায় আগ্রহী হয়ে উঠল। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে সভ্যতার দিকে। আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আমেরিকা, গ্রীনল্যান্ড এবং আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের নানা দ্বীপের মানুষজনরা ছিল সবচেয়ে অদ্ভুত পোশাক-আকাশ ও রীতি-নীতি সমৃদ্ধ। আজো আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে এসব আজব রীতি-নীতি ও পোশাক-আশাকসমৃদ্ধ মানুষজন ও গোত্র দেখা যায়। সভ্যতার হাওয়া একটু দেরিতে হলেও তাদের উন্নত বেশভূষার প্রতি প্রভাবিত করছে। গত কয়েক শতাব্দীতে পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রে মানুষ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাচীনকাল থেকে বিচিত্র বেশভূষা, পোশাক-আশাক, রীতি-নীতি এবং বিভিন্ন চালচলন চলে এসেছে।

গ্রিস:

প্রাচীনকালে গ্রিসের লোকেরা এক ধরনের লম্বায় বড় কিন্তু চওড়ায় কিছুটা ছোট পশুলোমের পোশাক ব্যবহার করত। এর নাম ছিল হিমেশন। এই হিমেশন পরার বেশ কয়েকটি পদ্ধতি ছিল। যাদের বয়স বেশি তারা হিমেশন পরত ভেতরে কাঁধ পর্যন্ত আঁটা কিটন নামের অন্তর্বাস পরিধান করে। তখনকার গ্রিসের মেয়েরাও এই হিমেশন পরত তবে একটু অন্যভাবে। মেয়েরা কোমরে আঁটোসাঁটো করে একটা বেল্ট পরত। তাদের পোশাকে কুঁচি দেওয়া থাকত। মেয়েরা শেমিজের মতো করে হিমেশনের তলায় অন্তর্বাস (বক্ষবন্ধনী!) ব্যবহার করত। তখনকার গ্রিসের মানুষজন বেশিরভাগ খালি পায়ে থাকত। তবে কোনো কোনো মেয়ে নরম জুতো বা স্যান্ডেল ব্যবহার করত। পর্যটক কিংবা শিকারিরা হিলঅলা উঁচু ধরনের জুতো ব্যবহার করত।

প্রাচীন মিসর ও অ্যাসিরিয়া:

সে সময় প্রাচীন মিসর ও অ্যাসিরিয়া অঞ্চলের ধনী লোকেরা লিনেন বা ছনের কাপড় ব্যবহার করত। তখন জীবজন্তুর লোম থেকেও তৈরি হতো পোশাক। কিন্তু তা পছন্দ করত না তৎকালীন ধনী লোকজনেরা। লিনেনের তৈরি পোশাকগুলো অনেকটা আজকালের ফ্রকের মতো দেখাত। এই পোশাক পরার সময় কয়েক জায়গায় বিশেষ ভাঁজ হতো। তাতে হাতে-করা নানান নকশা থাকত।

তখনকার পারস্যের প্রাচীন অধিবাসীরা চামড়া দিয়ে তৈরি এক রকম কোট ও পাতলুন ব্যবহার করত। গ্রিসের অদূরে ক্রিট দ্বীপের মেয়েরা গায়ে আঁটোসাঁটো করে বডিস আর একইভাবে কোমরে বেল্ট পরত। বেল্টের তলায় থাকত ঘণ্টার মুখের মতো নিচের ঘেরঅলা (Bellbottom) ঘাগরা। আর তখনকার ফ্যাশন ছিল ছুঁচল মুখ বুটজুতোর ব্যবহার।

রোম:

রোমবাসীদের সাধারণ পোশাকের নাম ছিল টোগা। এর আকৃতি ছিল বৃত্তের একটি কাটা অংশের মতো। গ্রিকদের কাঁধের ওপর যেমন হিমেশন থাকত তেমনি রোমানদের টোগাও পরা হতো

Dhaka University Institutional Repository

ভাঁজ-করা অবস্থায়। টোগার তলায় টিউনিক পরত রোমানরা। অবশ্য যারা খুবই গরিব তাদের ভাগ্যে আর টোগা পরার সৌভাগ্য হতো না। তখনকার গরিব রোমানদের পোশাক ছিল টিউনিক। কালক্রমে প্যালিয়াস (Pallius) পরার ফ্যাশন রোমানদের ভীষণভাবে আকৃষ্ট করল। এই প্যালিয়াস ছিল রোমান শিক্ষিতদের একমাত্র পোশাক। প্যালিয়াস দেখতে ছিল অনেকটা জাদুকরদের আলখাল্লার মতো। গ্রিসের মেয়েরা যেমন হিমেশনের তলায় কিটন পরত, রোমান মেয়েরাও তেমনি প্যালিয়াসের নিচে পরত স্টোলা।

ইউরোপ

ইউরোপের পোশাক-আশাক, বেশভূষা সম্বন্ধে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কোনো কিছু জানা যায়নি। তবে ইউরোপের অধিবাসীরা ডেন, ভাইকিং ও নরম্যানদের পোশাক-আশাকের হুবহু নকল করতে ওস্তাদ ছিল। জেরুসালেম দখল করার জন্য ধর্মযুদ্ধ করতে গিয়ে কৌশলগত কারণে ইউরোপিয়ানরা পুবের দেশের পোশাক নকল করেছিল। প্রাচ্যদেশ থেকে রেশমি, পশমি, কিংখাব প্রভৃতি বস্ত্র আমদানি ইউরোপের বেশভূষাকে আমূল পালটে দিয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপের মানুষজন শার্ট বা খাটো জ্যাকেট পরত। এ ছাড়া সবাই হাতওয়ালা আলখাল্লা পরত। যার আলখাল্লা যত বেশি ঢিলেঢালা থাকত সমাজে তার আভিজাত্য ও সম্মান তত বেশি। তখনকার ইউরোপের মেয়েদের পোশাক পুরুষের পোশাক থেকে আলাদা করা যেত না। তবে মেয়েদের পোশাক পুরুষদের পোশাকের তুলনায় আরো ঢিলেঢালা ও রং-বাহারি ছিল। গথিক যুগ থেকে শুরু হলো ইউরোপের পোশাক-আশাকে ব্যাপক পরিবর্তন। এ সময় পোশাক তৈরি হতে শুরু করল শরীরের আকৃতি-প্রকৃতি অনুযায়ী। হাতা সেলাই করা এবং মাথা গলিয়ে পোশাক পরার রেওয়াজ দেখা দিয়েছিল তখন। এ সময়টাতে ইউরোপের মেয়েদের পোশাকে এসেছিল নতুনত্ব। চোখ ঝলসানো পোশাকে ইউরোপের মেয়েরা হয়ে উঠল আরও সুন্দরী। স্যুটের প্রচলন হয় তখন থেকে।

চতুর্দশ শতাব্দীর ইউরোপে পুরুষ আর নারীরা একেবারে ভিন্ন ধরনের রূপ পেল। মেয়েরা খাটো ঘেরের সিল্কের গাউন পরা শুরু করল। গাউনের হাতা ভাঁজে-ভাঁজে ফোলানো থাকত নতুবা লম্বা হয়ে ফুলে থাকত। কোমরে ফিতার মতো বেল্ট জড়ানো থাকত। মোজা দিয়ে পা আবৃত থাকত। কাঁধের অংশটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উন্মুক্তই থাকত। টুপির নিম্নাংশ দিয়েও কেউ কেউ কাঁধ ঢেকে রাখত। রানী এলিজাবেথের সময় (১৫৩৩-১৬০৩) এক বিশেষ ধরনের বিচিত্র গাউনের প্রচলন হলো। এই গাউন সে সময় আভিজাত্যের প্রতীক ছিল। ইউরোপের নানা দেশে মেয়েদের এ রকম গাউনে লম্বা লেজুড় ব্যবহার করা হতো। রানী ও সম্ভ্রান্ত ধনী মহিলাদের বেলায় এ লেজুড়ের দীর্ঘতা বৃদ্ধি পেত। এমনকি কখনো লেজুড়ের দীর্ঘতা এতই বৃদ্ধি পেত যে, দুজন করে বালক-ভৃত্যকে দুপাশ থেকে এই গাউনের লেজুড় ধরে রাখার কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো! রানী গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলেও বালক-ভৃত্যদের লেজুড় ধরে থাকতে হতো। দেখা গেল রানী হয়তো দোতলায় উঠে গেছেন তখনো গাড়ি থেকে লেজুড় বার করতে ব্যস্ত সময় কাটাতে হতো বালক-ভৃত্যদের। এই-ই ছিল তখনকার গাউনের অবস্থা। ক্রমে ক্রমে পোশাকের ব্যাপারে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসতে লাগল। পোশাক পরে আরাম করা যায় কীভাবে সেদিকে পোশাক নির্মাতারা ঝুঁকে পড়ল। পোশাক পরে কীভাবে স্বাভাবিক কাজ-কর্ম, ঘোরাফেরা, ভ্রমণ করা যায় সেদিকে নজর দিতে থাকল পোশাক নির্মাতারা। ফলে পোশাকের ক্ষেত্রে ঘটতে লাগল রূপান্তর। পরিবর্তন।

বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকার সাধারণ মানুষজন মাথায় টুপি, পায়ে জুতো-মোজা, কোমর থেকে পা পর্যন্ত ট্রাউজার, গায়ে পুরো হাতওয়ালা কোট ব্যবহার করে। কোটের সামনের ওপরের

Dhaka University Institutional Repository

অংশ ভাঁজ করে খোলা। ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ভেতরকার শার্ট আর তার কলার ঘিরে জড়িয়ে থাকে টাই। শার্টের ওপরে কোটের তলায় ওয়েস্ট কোট পরার রেওয়াজ আগেই ছিল। এক সময় টাইয়ের বদলে ইউরোপীয়রা ক্র্যাভাট বাঁধত।

এশিয়া:

অধিকাংশ আরবীয় এখনো হাতাহীন আলখাল্লা ও মাথায় নানা রঙের সূতোর বা সিল্কের টুপি পরে থাকে। এসব টুপিতে ফোলানো থাকে ট্যাসেল। দেখতে ভারি সুন্দর ও মনোরম মনে হয়। তুরস্ক ও ইসরায়েলের অধিবাসীরা বেশ আগে থেকে মুসলমান ও ইহুদি পোশাক ছেড়ে ইউরোপীয় পোশাক পরা শুরু করেছে।

তিব্বত ও চীন:

তিব্বত প্রধানত শীতের দেশ। আর এ কারণে তিব্বতীয়দের পোশাক-আশাক ঢিলেঢালা এবং তা দিয়ে শরীরের পুরোটাই ঢাকা যায়। তিব্বতীয়রা এ ঢিলেঢালা পোশাকের নাম দিয়েছে ছুপা। ছুপার সঙ্গে মানানসই করে এক ধরনের টুপিও তিব্বতীয়রা পরে, যাতে তাদের আরো সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলে। চীন দেশের মানুষজন একটু আলগা ধরনের কোট পরে। কোটের সঙ্গে থাকে সিল্ক বা সুতোর তৈরি পাজামা। মেয়েরা পরে সুতোর কাজ করা নানান রং-বাহারি কোট। চীনের মেয়েরা চুলের সাজসজ্জায় ভীষণ সিরিয়াস। জনশ্রুতি আছে, দীঘল কালো চুলের জন্য চীনার মেয়েরা নাকি সবকিছুই করতে পারে। কালো চুলে তারা কাঁটা ও ফুল গুঁজে রাখে। বিচিত্রভাবে চিরুনি বা বন্ধনী দিয়ে চুল বেঁধে রাখতে চীনা মেয়েদের জুড়ি মেলা ভার।

জাপান:

জাপান ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ইউরোপের পোশাক ব্যবহার করতে শুরু করেছে। ইউরোপের পোশাক ব্যবহার করা শুরু করলেও জাপানিরা তাদের ঐতিহ্যবাহী কিমোনো (Kimono) এখনো ত্যাগ করেনি। হয়তো ভবিষ্যতেও করবে না। এই কিমোনো পোশাক পরে জাপানিরা গর্ববোধ করে। চীনের তাং রাজবংশের সময় থেকে ঐতিহ্যবাহী কিমোনোর প্রচলন শুরু হয়েছে। জাপানি ছেলেমেয়েরা বিচিত্র রঙের চোখ-ঝলসানো সুন্দর সুন্দর ফুলতোলা কিমোনো ব্যবহার করে। কোমরে একটা চাদরের মতো চওড়া কাপড়ের বন্ধনী পরে, যার নাম অবি (obi)। জাপানি মেয়ে ও শিশুরা এই অবি পোশাক দারুণ পছন্দ করে।

নিউগিনি:

পোশাক-আশাকের ব্যাপারে নিউগিনির অধিবাসীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রং চং, বিচিত্র অলঙ্কার আর উদ্ভট সাজসজ্জার উপকরণে নিজেদের জবরজং করে রাখতেই বেশি পছন্দ করে। এজন্য নিউগিনির আদিম অধিবাসীদের যুদ্ধের সাজসজ্জা এবং পাপুয়ার ডিকদের মাথার রং-বাহারি টুপি দেখা যায়।

বার্মা :

অধিকাংশ বার্মার মেয়ে ও পুরুষ লৌঙ্গি পরিধান করে। গায়ে থাকে খাটো হাতা কোট, যার নাম এঙ্গি। লৌঙ্গি ও এঙ্গির মধ্যে মূলত পার্থক্য খুব কম। লৌঙ্গি ও এঙ্গি এই দুই পোশাকের মাথায় থাকে নানান কারুকার্যমতি টুকরো কাপড়ের কটি। পায়ে থাকে স্ট্র্যাপওয়ালা চটি। এর নাম ফানা। সাম্প্রতিককালে বার্মার পোশাক-আশাকের ওপর ইউরোপীয়দের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

মেক্সিকো :

মেক্সিকোর উত্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত নিউ মেক্সিকোর পুষোলো উপজাতির লোকজনরা মাথায় পালকখচিত পাগড়ি ব্যবহার করে থাকে। তাদের গায়ে থাকে মস্ত ঝুলন্ত আলখাল্লা। গলায় থাকে একসঙ্গে তিন-চারটে রংবেরঙের টাই। উপজাতির মধ্যে যিনি সরদার-গোছের তার গলায় থাকে অতিরিক্ত কয়েকটি টাই।

ফিজি দ্বীপপুঞ্জ:

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ফিজি দ্বীপপুঞ্জের মেয়েরা নানা রঙের নকশাওয়ালা শাড়ি ব্যবহার করে। ফিজি দ্বীপের মেয়েদের কাছে পোশাকটা হলো সবকিছু। সবসময় ভালো করে সেজেগুজে থাকতে পছন্দ করে তারা। চুলের পরিচর্যার ব্যাপারে ফিজির মেয়েরা খুব হিসাবি। আয়নার সামনে বসে বারবার তারা তাদের নিজের চেহারা ভালো করে দেখে। সৌন্দর্য চর্চায় অনেকটা সময় ব্যয় করে তারা। ফিজির মেয়েরা বরাবর সৌন্দর্যপ্রিয়।

তাইওয়ান:

তাইওয়ানের মেয়েদের রূপচর্চার ধরনটা অদ্ভুত! ঘাসের তৈরি এক ধরনের বিশেষ পোশাক পরতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে তাইওয়ানের মেয়েরা। এসব পোশাক রঙিন কাঠি সাজিয়ে জাদুকরের মতো করে বোনা। পুরুষদের গায়ে থাকে জালের মতো এক ধরনের পোশাক। পরনে নেংটি।

অস্ট্রেলিয়া:

অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে এক শ্রেণীর বিশেষ জাদুকর আছে যাদের কাজ হলো এমু পাখি ধরা। এমু পাখি ধরার জন্য এসব জাদুকর বিচিত্র ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়। গাছের পাতা ও পাখির পালক দিয়ে বানানো টুপি পরে তারা এমু পাখি ধরতে যায়। জাদুকরের মাথায় এমন ধরনের একটি টুপি থাকে যা আকাশমুখো। অনেকটা জেব্রার গলার মতো। এ অবস্থায় জাদুকরকে দেখায় ঠিক এমুপাখির মতো। জাদুকর এমু পাখি ধরার জন্য বেশ দরদ দিয়ে সুরেলা গলায় গান ধরে। এমু পাখি সে গান শুনে জাদুকরের কাছে আসতেই জাদুকর খপ করে ধরে ফেলে এমু পাখিকে। গানপাগল এমু পাখি গান শুনতে এসে চতুর জাদুকরের হাতে ধরা পড়ে।

রেড ইন্ডিয়ান :

রেড ইন্ডিয়ান নারীরা পোশাক-আশাক, বেশভূষার ব্যাপারে অত্যন্ত উদার। সংসার-কাজকর্ম সবকিছু সেরে সময় বের করে তারা মেতে ওঠে সৌন্দর্য চর্চায়। রেড ইন্ডিয়ান নারীরা জমকালো ও রংচটা পোশাক পরতে দারুণ ভালবাসে। অনেককে আবার পুরো হাতওয়ালা জামা পরতে দেখা যায়। জামার ঘের বেশ লম্বা যা কিনা লুটিয়ে পড়ে পা অবধি। গায়ে যে ওড়না থাকে তা নানান নকশাখচিত। চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো রেড ইন্ডিয়ান নারীদের আরো একটি বিশেষ গুণ।

সামোয়া দ্বীপ:

প্রশান্ত মহাসাগরের সামোয়া দ্বীপের যোদ্ধাদের পোশাক সবার নজর কাড়বে। যোদ্ধাদের গায়ে কোনো পোশাক থাকে না, তবে তাদের থাকে একটি পাগড়ি। পাগড়ির সঙ্গে কোমরে থাকে অসংখ্য লতাপাতায় আচ্ছাদিত আবরণ। তাদের গলায় আবার হাঁসুলির মতো ভারী ধাতবের তৈরি গয়নাও থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সলোমন দ্বীপ:

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের বিখ্যাত দ্বীপপুঞ্জ সলোমন। এ দ্বীপপুঞ্জকে ঘিরে অনেক কাহিনী জড়িয়ে আছে। এই সলোমন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের সাজসজ্জা এখনো অত্যন্ত প্রাচীন ঘরানার। এরা হাঁটুর ওপরে ছোট এক টুকরো কাপড় পরে থাকে। গায়ে কাপড়-চোপড় বলতে কিছুই থাকে না তাদের। মাথায় নানা বর্ণের পাতায় তৈরি টুপি থাকে। সে টুপি বড় অদ্ভুত।

এস্কিমো:

এস্কিমোদের পোশাক আবহাওয়াজনিত কারণে বৈচিত্রময় হয়ে উঠেছে। এস্কমোদের পোশাক-আশাকের অধিকাংশ তৈরি হয় জীবজন্তুর চামড়া দিয়ে। এরা খুব ঢিলেঢালা ধরনের জামা-কাপড় পরে।

বলিভিয়া:

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত বলিভিয়ার নারীদের মাথায় বটের ঝুরির মতো অসংখ্য বিনুনি ঝুলে থাকে। এ রকম বটের ঝুরির মতো বিনুনি বানাতে নারীদের কখনো কখনো সারাদিনও ব্যয় করতে হয়। তবু সৌন্দর্য চর্চায় এই বিনুনি তাদের করা চাই-ই চাই। একবার বিনুনি বানালে সেই বিনুনিটাকে কয়েকদিন আগলে রাখে তারা।

পৃথিবীর নানা দেশের পোশাক-আশাক বেশভূষায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো তা হলো প্রতিটি দেশের পোশাক-আশাকে রয়েছে সেই দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য, গর্ব, অহঙ্কার আর স্বতন্ত্র ধারার পরিচয়। এক দেশের পোশাকে অন্য দেশের প্রভাব পরিস্ফুট হলেও তাতে লজ্জার কিছু নেই। এই প্রভাবকে এক সময় পাশ কাটিয়ে তৈরি হয়েছে আজকের বিভিন্ন দেশের জাতীয় পোশাক।

ভারতীয় উপমহাদেশের পোশাক:

ভারতবর্ষের অধিবাসীরা পোশাকের ব্যাপারে সবসময় স্বতন্ত্র। ভারতীয় পুরুষের পোশাক-আশাকে ইউরোপের স্বল্প প্রভাব থাকলেও নারীরা নানান রঙের নানান ডিজাইনের শাড়ি ব্যবহার করে থাকে। অনেকে আবার বিচিত্র নকশার কামিজ-সালোয়ারও পরে থাকে। ভারতবর্ষের মেয়েরা প্রাচীনকাল থেকে অলঙ্কারের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত রকমের দুর্বল ছিল। কাচের নানারকম চুড়ি, রুপোর ভারী ভারী গয়না, সোনার গয়না, হীরের মুক্তা বসানো গয়না পরতে তারা ভীষণ ভালবাসে। বস্তুত এই সব গয়নায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিল্পকর্মে ভারতবর্ষের আবহমানকালের শিল্প-সংস্কৃতির পরিচয় প্রকাশ পেত। হিমালয় অঞ্চলের লোকজনের পোশাক ওজনে ভারী থাকত।

বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করতে হলে পাকভারতের বস্ত্রশিল্পের পটভূমির আলোচনাই প্রাধান্য পাবে। কারণ এক সময় পাকিস্থান, ভারত ও বাংলাদেশ একত্রে একটি রাষ্ট্র ছিল। পোশাকের বা বস্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এদেশগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।[৫] খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দিতে ভারতে রেশম বস্ত্র ব্যবহারের প্রচলন হয়। সর্বপ্রথম তারা বন্য রেশম দিয়ে বস্ত্র প্রস্তুত করতো। সেসময় পর্যন্ত ভারতে গুটিপোকার চাষের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি। আদি ভারতীয়রা ভিন্ন আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বাস করতো। তাই তারা যেডার (Jader) বৃক্ষের বাকর ব্যবহার করতো। এ বাকর দিয়ে প্রস্তুত বস্ত্র টাওয়াল হিসেবে ব্যবহার করতো। বাকলটি এমনভাবে বিন্যাস করা হতো যে এর প্রান্তদেশ ও

---

৫. বস্ত্র ও পরিচ্ছদ : ব্যবহারিক শিল্পকলা, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রভাব রেইন বেল্টের আকৃতি ধারণ করতো। এর ফলে এটি পানি সংরক্ষণের কাজ করতো। কম্বলের জন্য প্রচুর পরিমাণ পার্বত্য ছাগলের পশম যোগাড় করে বিভিন্ন কৌশলে কম্বলের মতো আচ্ছাদন প্রস্তুত করতো। একাজটি ছিল দীর্ঘস্থায়ী এবং কষ্টকর।[৬] ভারতীয় বস্ত্রের আরেকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হলো ঐতিহ্যবাহী পোশাক। সামাজিক দিক, বর্ণশ্রম প্রথা, জাতিভেদ আঞ্চলিক প্রথার ব্যতিরেকে পোশাক প্রস্তুত করার কথা ভাবাই যায় না। বর্তমান আধুনিক যুগেও আঞ্চলিক পোশাক এবং ঐতিহ্যবাহী পোশাকের প্রচলন যথেষ্ট। বস্ত্র প্রস্তুতের কতকগুলো কলাকৌশলের পরিবর্তন ঘটায় দীর্ঘসময় পর্যন্ত এ প্রচলন ছিল।[৭]

ঋগ্বেদ (আনু. খ্রি.পূ ২৫০০-১৫০০), কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব দেড় হাজার বছর আগে রচিত উপনিষদে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য থেকে গাঙ্গেয় সমভূমিতে পোশাক ব্যবহারের সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারতে (খ্রি.পূ ৪র্থ-খ্রি ৪র্থ) বিখ্যাত পৌরাণিক নায়কদের বেশভূষা ও পোশাক-পরিচ্ছদের গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ রয়েছে, যেমন ধর্মীয় কৃত্যে, উৎসবাদিতে, শিকার উপলক্ষে, পূত ক্রিয়াকর্মে এবং নববধূর সাজসজ্জাতে ব্যবহৃত পোশাকের বর্ণনা। ভারতীয় গাঙ্গেয় সভ্যতার প্রাচীন কেন্দ্রগুলির খননকার্যের ফলে সুতো কাটার ও বস্ত্রবয়নের ছোট ছোট কল এবং কাপড় রং করার চৌবাচ্চার সন্ধান পাওয়া গেছে। একই জায়গাতে প্রাপ্ত মাটির ও পাথরের ছোট ছোট মূর্তি এবং ভাস্কর্য মূর্তিগুলি সাধারণ নরনারীর ও রাজরানীদের পরিধেয় পোশাকের পরিচয় তুলে ধরে। বাংলাদেশে দুই চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (পঞ্চম শতক) ও হিউয়েন-সাঙের (সপ্তম শতক) ভ্রমণ বৃত্তান্তে ঐ সময়ের মানুষদের পরিধেয় পোশাকের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের দিনাজপুর ও ময়নামতীতে (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) প্রাপ্ত পোড়ামাটির চমৎকার ফলকসমূহ ঐ সময়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় প্রদান করে।[৮]

সাঁচি, ভরত, অমরাবতী ও উড়িষ্যাতে অবস্থিত প্রাচীন ভারতীয় প্রস্তর নির্মিত ও পোড়ামাটির ভাস্কর্যসমূহ এবং বাংলাদেশের দিনাজপুরের কান্তনগরে ও কুমিল্লার ময়নামতী এলাকায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির চমৎকার সূক্ষ্ম কাজ প্রাচীন ও মধ্যযুগের সামাজিক অবস্থার ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। প্রস্তর ও মৃত্তিকা নির্মিত এইসব আলঙ্কারিক কাজ সে সময়ের সাধারণ ও অভিজাত মানুষদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সমৃদ্ধ তথ্যাবলি তুলে ধরে। দেখা যায়, নারী মূর্তিগুলি দড়ি বা কোমর-বেষ্টনী দিয়ে আঁটকানো বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের কটিবস্ত্র পরিহিতা এবং অন্য নারীমূর্তিগুলি কাঁধ পর্যন্ত বস্ত্রাবৃত। ক্ষুদ্রাকৃতির পুরুষমূর্তিগুলির পরিধানে বেশ শক্তভাবে আঁটা ধুতি এবং তা কখনও কখনও কাঁধ পর্যন্ত প্রলম্বিত, মস্তকের উষ্ণীষ ও দৈবৎ ব্যবহৃত অলঙ্কার বিশদ শৈলীর পরিচায়ক। কিছু পোশাকে লক্ষণীয় সূক্ষ্ম সূচিকর্ম ও বয়নের রীতিকৌশল। রাজপুরুষদের অনুচরবৃন্দ ও সৈন্যদের পোশাকের মধ্যে রয়েছে আঁটো জামা, লম্বা আলখাল্লা, কোমরবন্ধ, পাগড়ি, মাথায় বাঁধার রুমাল এবং ঝালরওয়ালা ঘাগরা জাতীয় কাপড়। অনেক মূর্তিতে পোশাকের স্বল্পতা থাকলেও সেগুলিতে আভরণ হিসেবে রয়েছে প্রচুর সংখ্যক চুড়ি, বাহুবন্ধনী, পায়ের মল, গলার হার এবং কানের মাকড়ি।[৯]

সপ্তম শতকে হিউয়েন-সাঙের বর্ণনাতে যে পোশাকগুলির বিবরণ রয়েছে সেগুলি দরজি দিয়ে তৈরি নয় কিংবা সেলাই করা নয়। দীর্ঘ গ্রীষ্মকালের তাপ প্রতিরোধের জন্য অধিকাংশ মানুষ শাদা কাপড় পরত। পুরুষরা একটা লম্বা কাপড় কটি বেষ্টন করে বাহুর নিচে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে শরীর

---

৬ বস্ত্র ও পরিচ্ছদ : ব্যবহারিক শিল্পকলা, পৃ. ৬১

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৮. বাংলাপেডিয়া, ৫ম খ. পৃ. ৪৬১

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬১

Dhaka University Institutional Repository

পেঁচিয়ে ডান দিকে ঝুলিয়ে দিত। মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদও শরীরকে আচ্ছাদন করে কাঁধ ও মাথার উপর পর্যন্ত প্রসারিত হতো। তাদের কেশ পরিচর্যার ধরন ছিল শঙ্কুসদৃশ খোঁপা, সাধারণ খোঁপা এবং শিথিল অলকগুচ্ছ। পুরুষরা বয়নকৃত অথবা সূচিকর্মযুক্ত টুপি এবং জপমালা পরত।[১০]

কালিদাসের (আনু. খ্রি.পূ ১ম/খ্রিষ্টীয় ৪র্থ শতক) রচনাতে শিকারের পোশাক, সন্ন্যাসীর পোশাক ও ভিক্ষুকের পোশাকের উল্লেখ রয়েছে। তাঁর উল্লিখিত বস্তুসমূহ থেকে উষ্ণ ও শীতল আবহাওয়ার উপযোগী পোশাকের ধারণা লাভ করা যায়। চীনাংশুক নামক রেশমি বস্ত্রের উল্লেখ আছে, যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্দেশ দেয় যে, এ বস্ত্র চীন থেকে আনা হয়েছিল। এমনও সূক্ষ্ম কাপড়ের বিশেষ বর্ণনা রয়েছে যাতে জানা যায় প্রাচীন কালে গাঙ্গেয় উপত্যকায় উৎপন্ন মসলিন ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যেত। পনেরো শতকে উপমহাদেশের পোশাক ও সংস্কৃতিতে মুসলিম প্রভাব দেশের দূরবর্তী এলাকাগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে।[১১]

প্রাক্-মুগল মুসলিম অভিযানকারীরা, যেমন সুলতান ও খানেরা আঁটসাট পাতলুন, কোমরের দিকে সরু ও নিচের দিকে ক্রমশ প্রসারিত পূর্ণ ঘাগরা-সদৃশ আঁটো আস্তিনের একটি লম্বা কোট পরত। মাথাকে বেষ্টন করে পাগড়ি বাঁধা হতো এবং পাগড়ির কাপড় ছিল পাঁচ হাত লম্বা। মেয়েরা ছেলেদের মতো একই পোশাক পরত এবং মাথায় একই রকম টুপি পরত। এইসব পোশাককে বলা হতো তাতারিক (তাতারিয়াত)। মেয়ে ও ছেলে উভয়ের টুপির আকৃতি ছিল চৌকোণ এবং তাতে থাকত মণিমুক্তা; এ শৈলীটি তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান ও অন্যান্য মধ্য এশীয় দেশগুলিতে এখনও প্রচলিত রয়েছে। মেয়েরা যেভাবে চুলের বিনুনি করে রেশমি সূত্রগুচ্ছ (টাসল) দিয়ে চুল বাঁধত তা তুরস্ক, মিশর, সিরিয়া ও মধ্য এশিয়াতে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। নারী ও পুরুষ উভয়েই সোনা ও রুপার সূক্ষ্ম সুতায় কারুমণ্ডিত কোমরবন্ধনী ও জুতো পরত।[১২]

কাজী ও আলেম সম্প্রদায় ঢিলে আলখাল্লা জাতীয় পোশাক (ফারাজিয়াত) এবং আরবীয় পোশাকও পরত। শাসক সম্প্রদায়ের বেশভূষা স্থানীয় লোকজনদেরও ক্রমশ প্রভাবিত করেছিল। শাসকরা পরত পারস্য দেশীয় পোশাক, আঁটসাঁট পাতলুন, একটি লম্বা কোর্তা কোমরে সাঁটানো ঘাগরার মতো নিচের দিকে ক্রমপ্রসারিত। সোনার বা রুপার কোমরবন্ধনী দিয়ে তা ধরে রাখা হতো এবং আস্তিন মণিবন্ধে দৃঢ়ভাবে লাগানো থাকত।[১৩]

পোশাকে ছিল সূচের সূক্ষ্ম কারুকাজ ও মূল্যবান পাথরের অলঙ্করণ। মধ্য এশিয়া থেকে আগত মুসলমানরা পাগড়ি পরত, তুর্করা পরত ছুঁচালো টুপি। টুপিগুলি ছিল বিভিন্ন আকারের চোঙাকৃতি, প্রলম্বিত প্রান্ত, বর্গাকৃতি ও আয়তাকার। পূর্ববর্তী অভিযানকারীর পোশাক ও ভারতীয় জনসাধারণের রুচির সঙ্গে পারস্য প্রভাবের মিশেলে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতার জন্য বিচিত্র পোশাকশৈলী গৃহীত হয়েছিল।

মুগল সম্রাট মুহম্মদ জালালউদ্দিন আকবর (১৫২৬) কর্তৃক দিল্লির ক্ষমতা গ্রহণের পর পোশাকে, বিশেষ করে মেয়েদের পোশাকের ক্ষেত্রে, লক্ষণীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। মঙ্গোলীয় মহিলাদের মাথায় পরার পোশাক মণিমুক্তায় আচ্ছাদিত পাখাসদৃশ মুকুট এবং মেয়েদের পাগড়ি আকৃতির ইরানি টুপির স্থান গ্রহণ করে রাজপুত মহিলাদের নেকাব বা দোপাট্টা। ঘাগরা এবং কাঁচুলি

---

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬১
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২

Dhaka University Institutional Repository

বা চোলিও পরিধান করা হতো। জামদানি সূচিশিল্পের পোশাকরীতিতে, যেমন কশিদাজরি, জারদজি ও চিক্কন সূচিকর্মের পোশাকে ইরানি প্রভাবের প্রাধান্য ছিল। পুরুষদের পশ্চিমি প্রভাবজাত মুসলিম পোশাকের একটি উদাহরণ হলো আচকান বা শেরওয়ানি। এটি ওভারকোটের মতো হাঁটুর নিচে নামানো এবং সম্মুখভাগ নিচ পর্যন্ত বন্ধ একটি লম্বা পোশাক।[১৪]

আঞ্চলিক পোশাকের স্থানীয় কাচাঁমাল:

সাধারণত বস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে কাচাঁমাল হিসেবে তন্তু-ফসল ব্যবহৃত হয়। তন্তু-ফসলের মধ্যে নানা ধরনের আঁশ-উৎপাদক উদ্ভিদ আছে যেগুলি একটি দেশের বিশেষ আবহাওয়া ও জলবায়ুগত অবস্থায় বর্ষজীবী ও মৌসুমি ফসল হিসেবে জন্মায়। এসব ফসল গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্য হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের প্রধান তন্তু-ফসল তুলা, পাট, মেস্তা ও শণপাট। নারিকেল ছোবড়ার আঁশ, আনারস পাতার আঁশ, কলাগাছের কাণ্ডের আঁশ এবং শিমুল তুলার আঁশও বিভিন্ন কাজে লাগে।[১৫] অর্থকরী আঁশ-উৎপাদক ফসলগুলি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বার্ষিক উৎপাদন, গুণাগুণ ও উৎপন্ন দ্রব্যের নিরিখে তন্তু-ফসলকে নরম ও শক্ত, লিগনিনযুক্ত ও লিগনিনবিহীন, এবং মুখ্য ও গৌণ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। মিহি পোশাক, পরিধেয় বস্ত্র, শিল্পে ব্যবহৃত মোড়ক হিসেবে চট, বস্তা, থলে, গালিচার তলা, পাকানো সুতা, সজ্জাবস্ত্র, মাদুর, ওয়াল-কভার, হস্তশিল্প, জুটন ও পাটমিশ্রিত পণ্য, শোভাবর্ধক ও নান্দনিক সামগ্রী, সেলুলোজ-জাত বস্তু, মিশ্র-সামগ্রী, আকরিকজাত ও কৃত্রিম বস্ত্র, চিকিৎসায় ব্যবহার্য কাপড়, কাঠের বিকল্প, মণ্ড ও কাগজ প্রভৃতি তৈরিতে প্রাকৃতিক আঁশ ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে বস্ত্র প্রস্তুতে ব্যাপক ব্যবহৃত অন্যতম কিছু উপাদান নিম্নে বর্ণিত হলো।

তুলা:

তুলা Malvaceae গোত্রের *Gossypium* গণের আঁশ উৎপাদক অর্থকরী ফসল। তুলা গাছ থেকে তুলার আঁশ উৎপন্ন হয়। বস্ত্র তৈরির উপাদান হিসাবে তুলাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। বস্তুত বয়নশিল্পের মধ্যে তুলাশিল্পই সর্ববৃহৎ এবং এ থেকে পৃথিবীজুড়ে লাখ লাখ মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। একমাত্র তুলার আঁশকেই ভিজিয়ে নরম করতে হয় না বা তার জন্য অন্য কোনো রকম ব্যয় বহুল প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিতে হয় না। শুধু ব্যবহারের আগে বীজ ছাড়িয়ে নিতে হয়। প্রায় ২০টি বিভিন্ন স্পেসিস (spacies)-এর তুলা গাছ আছে কিন্তু তার মধ্যে চারটিই চাষ করা হয়। তুলা উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবে রাশিয়া ও চীনের পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় স্থানের অধিকারী। এসব দেশ ছাড়াও ভারতবর্ষ, পেরু, ব্রাজিল, মিসর, পাকিস্তান এবং অন্যান্য উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ তুলার চাষ হয়। চীনের তুলা তেমন উন্নতমানের নয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলা খুবই উন্নতমানের। মিশরের নীল নদের অববাহিকায় প্রচুর উচ্চমানের তুলার চাষ হয়ে থাকে। বিশ্বের প্রায় ৫০ শতাংশ তুলা বস্ত্র তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। বাকি ২৫ শতাংশ কার্পেট, পর্দা, গৃহস্থালির রকমারি জিনিস তৈরির জন্য এবং অবশিষ্ট তুলা শিল্পের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তুলার বীজ থেকে তেল পাওয়া যায়। তুলা গাছের কাঠ নরম, হালকা, টেকসই নয়। দিয়াশলাই বাক্স ও কাঠি তৈরিতে এ কাঠ ব্যবহৃত হয়। এছাড়া প্যাকিং বাক্স, খেলনা, নিম্নমানের পেনসিল ইত্যাদি তৈরিতে তুলা গাছ ব্যবহৃত হয়।

---

১৪. বাংলাপিডিয়া, পৃ. ৪৬১-৪৬৬
১৫. বাংলাপিডিয়া, পৃ. ২৩০

Dhaka University Institutional Repository

তুলা গাছগুলো সাধারণত এক থেকে দুই মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। তাদের খাড়াভাবে প্রোথিত লম্বা মূল শিকড় থাকে এবং কানের লতির মতো প্রশস্ত পাতা থাকে। তাদের ফুল সাদা এবং মাত্র একদিন বেঁচে থাকে। ফুলগুলো মরে যাওয়ার পরই ফল জন্মায়। তুলার গোলাকার কোষগুলোর ৫ সেন্টিমিটার ব্যাস পরিমাণ গোলাকার সবুজ আকৃতি লাভ করতে প্রায় দুইমাস সময় লাগে। এই গোলাকার কোষের মধ্যে অনেক বীজ এবং তুলার আঁশ থাকে। এ আঁশগুলো প্রায় ৩ সেন্টিমিটার লম্বা এবং তার ৯০ শতাংশ হলো সেলুলোজ।

বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র, রাগ, শিট, ব্যান্ডেজ তৈরিতে এবং বই বাঁধানোর কাজে তুলার আঁশ ব্যবহৃত হয়। তুলার বীজকে নিংড়ে তৈল বের করা যায় এবং তা ম্যাঙ্গারিন, স্যালাড ওয়েল এবং মেলোরিনে ব্যবহার করা হয়। সাবান উৎপাদনেও এটা ব্যবহৃত হয়। তুলার বীজ থেকে তেল বের করার পর যে শক্ত অংশ থাকে তাকে বলা হয় কলোসিন মিল। এটা জীবজন্তুর খাবার হিসাবে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়।

তুলা সাধারণত ক্রান্তীয় ও উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলে ভাল জন্মে। ৪০° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২০° দক্ষিণ অক্ষাংশে অবস্থিত অঞ্চলে তুলার চাষ বেশি হয়।[১৬] সমতল বা ঢালু জমি তুলা চাষের উপযোগী। তুলা চাষের জন্য উর্বর দো-আঁশ মাটি প্রয়োজন। প্রাথমিক পর্যায়ে তাপ ও পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত উভয়ই প্রয়োজন হয়। তুলার বোল বের হলে আর্দ্র ও শুষ্ক রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ার প্রয়োজন। সামুদ্রিক আবহাওয়া তুলা চাষের সহায়ক। তুলা লাগানোর সময় জুলাই মাসের মাঝামাঝি আর ফসল তোলা হয় শেষ মধ্য-জানুয়ারিতে। পরিণত গাছ থেকে তিনবার ফসল তোলা যায়। অতঃপর এই জমিতে শীতের শাকসবজি, পাট বা আউশ ধান ফলানো যায়।

বাংলাদেশে উৎপন্ন তুলার জাত (cultivar) হলো আমেরিকান তুলা (*Gossypium hirsutum*)। এটিকে মেঠো-তুলাও বলে, কেননা সমতলে জন্মে। শিমুল তুলা চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের বন ছাড়াও দেশের সর্বত্র জন্মে। অন্যদিকে কুমিল্লা-তুলা (*Gossypium arboreum*) চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় জন্মে। উল্লেখ্য যে পাহাড়িরা তুলার জন্য মুগল সরকারকে রাজস্ব প্রদান করত। পাহাড়ি নারীরা তুলা থেকে সুতা করে নানারকম কাপড় বুনতো। নিজের কাপড় নিজে বুনন করার প্রথা এখনও লক্ষ্য করা যায়। পাহাড়ি জাতের এই তুলা আদিবাসীরা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে, অর্থাৎ রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, ও বান্দরবান জেলাসমূহে সীমিত পরিমাণে চাষ করে। এই তুলার সুতা উৎকৃষ্ট মানের না হওয়ায় এটি মূলত কুটির শিল্পে ব্যবহৃত হয়, যদিও কিছুটা রপ্তানি করা হয়। উৎপন্ন ফসলের পরিমাণও খুব কম, হেক্টরপ্রতি মাত্র ১০ কিলোগ্রাম।

উত্তরবঙ্গের কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রায় ৩৫,০০০ হেক্টর জমিতে মেঠো-তুলার চাষ হয়। দেশে বার্ষিক উৎপন্ন তুলার পরিমাণ প্রায় ৩৫,০০০ মে টন যা অভ্যন্তরীণ চাহিদার মাত্র ১৬% মেটায়। তুলা চাষের দায়িত্বে রয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ তুলা উন্নয়ন বোর্ড । এই সংস্থা চাষিদের ভাল বীজ ও তুলা চাষের প্রয়োজনীয় পরামর্শ যোগানের জন্য তিনটি বীজ উৎপাদন কেন্দ্র পরিচালনা করে, তবে বেশির ভাগ চাষিই নিজ ক্ষেত থেকে বীজ সংগ্রহ করে।[১৭]

তুলা *Gossypium* গণভুক্ত একাধিক প্রজাতির বীজলগ্ন আঁশ দিয়ে গঠিত নরম, সাদা ও তুলতুলে পদার্থ যা সুতা, কাপড় প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। তুলার আঁশ বস্ত্রকলগুলোতে সুতা

---

১৬. বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা-২০০৩, ৪র্থ খ. পৃ. ২৩১

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

Dhaka University Institutional Repository

তৈরির প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বর্জ্য তুলা (গার্মেন্ট শিল্প ও জুট) লেপ-তোষক ও শতরঞ্চি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। তুলাগাছ সাধারণত ১-২ মিটার উঁচু, ফুল সাদাটে এবং শুঁটি বা বোল তুলতুলে আঁশে ভরে উঠলে ফেটে যায়। বোল সংগ্রহের পর তুলা থেকে বীজ ছড়ানো ও পরিষ্করণের মাধ্যমে আঁশ পৃথক করা হয়। তুলায় প্রায় ৯৫% সেলুলোজ এবং সামান্য পরিমাণ প্রোটিন, পেক্টিন ও মোম থাকে। আঁশের দৈর্ঘ্য, পুরুত্ব ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আঁশকে বাণিজ্যিকভাবে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়।[১৮]

তুলার আঁশ হালকা, টেকসই ও চকচকে, নানা ধরনের পোশাক, সজ্জা ও অন্যান্য সামগ্রী প্রস্তুতে ব্যবহার্য। তুলাবীজচূর্ণ থেকে প্রাপ্ত তেল, মারজারিন, ভোজ্যতেল, সাবান প্রভৃতি তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহার হয়। বর্তমানে স্থানীয় বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত বেশিরভাগ তুলা আমদানি করা হলেও দেশে প্রায় ৩৫,০০০ হেক্টর জমি থেকে প্রায় ৭৪,০০০ বেল তুলা উৎপন্ন হয়। বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, ঢাকা, টাঙ্গাইল, যশোর, কুষ্টিয়া ও রাজশাহী বাংলাদেশের প্রধান তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চল। এখানে উৎপন্ন তুলার আঁশের দৈর্ঘ্য মধ্যম থেকে খাটো-মধ্যম ধরনের। একটি বিশেষ ধরনের খাটো আঁশের তুলা কুমিল্লায় ফলানো হয়।[১৯]

শিমুল তুলা (*Bombax* species) নামে পরিচিত আরেক ধরনের স্থানীয় তন্তুসামগ্রী (কাপক) সারাদেশে, বিশেষত বৃহত্তর ময়মনসিংহে বেশি পাওয়া যায়। এটি সাধারণত বালিশ ও তোশক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। শিমুলকাঠে দিশলাইয়ের কাঠি তৈরি হয়। নারিকেলের (*Cocos nucifera*) ছোবড়ার আঁশ মাদুর, রশি প্রভৃতি তৈরিতে লাগে। এ ধরনের উন্নতমানের তন্তু দিয়ে ব্রাশ বানানো হয়। অতিসম্প্রতি ছাঁকনি, মালচিং ম্যাট ইতাদি ছোবড়ার আঁশভিত্তিক সামগ্রী কৃষিকাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। নারিকেল গাছ প্রধানত দক্ষিণাঞ্চলের খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে জন্মে। মাদুর ও রশি তৈরির জন্য দেশে কয়েকটি ছোবড়া-শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। ছোবড়া থেকে আঁশ পৃথকীকরণে ছোবড়া লবণাক্ত পানিতে রাখলে পচনক্রিয়া তরান্বিত হয়। ছোবড়া নরম হওয়ার পর হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে, ধুয়ে ও শুকিয়ে আঁশ আলাদা করা হয়।[২০]

পাট:

পাট Tiliaceae বর্গের *Corchorus* গণভুক্ত দ্বিবীজপত্রী আঁশযুক্ত উদ্ভিদ। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পাট আঁশ প্রধানত দুটি প্রজাতি, সাদাপাট (*Corchorus capsularis*) ও তোষাপাট (*Corchorus olitorius*) থেকে উৎপন্ন হয়। সাদা ও তোষা পাটের উৎপত্তিস্থল যথাক্রমে দক্ষিণ চীনসহ ইন্দো-বার্মা এবং ভূমধ্যসাগরীয় আফ্রিকা। সম্ভবত উড়িয়া শব্দ Jhuta বা Jota থেকে Jute শব্দটির উদ্ভব। অবশ্য, 'জুটা' ও 'পট্ট' বস্ত্র ব্যবহারের কথা যথাক্রমে বাইবেল এবং মনুসংহিতা ও মহাভারতে উল্লেখ আছে যা এতদঞ্চলে পাটদ্রব্যের সুপ্রাচীন ব্যবহারের সাক্ষ্যবহ।[২১]

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে পাটের চাষ হয়ে আসছে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, নেপাল, মায়ানমার, চীন, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ক্যাম্বোডিয়া, ব্রাজিল এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি দেশে পাটের আবাদ হয়। উষ্ণমণ্ডল ও উপ-উষ্ণমণ্ডলীয় বিভিন্ন জলবায়ুর পরিবেশে পাট জন্মে। মার্চ, এপ্রিল ও মে পর্যন্ত প্রতি মাসে সর্বনিম্ন ২৫০ মিমি বৃষ্টিপাতসহ যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত

---

১৮. বাংলাপিডিয়া, ৪র্থ খ. পৃ. ২৩১
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১
২১. প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৩২৬

Dhaka University Institutional Repository

১৫০০ মিমি বা ততোধিক সেখানে পাট ভাল ফলন দেয়। প্রয়োজনীয় তাপমাত্রার সীমারেখা ১৮°-৩৩° সে। পাট বর্ষাকালীন ফসল।[২২]

বাংলাদেশ এক সময়ে এটি বাগানের উদ্ভিদ হিসেবে বিবেচিত হতো। তখন এর ব্যবহার ছিল সীমিত; কেবল পাতা সবজি ও চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হতো। বাণিজ্যিক দিক থেকে বাংলাদেশ এক সময়ে একচেটিয়া সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ হিসেবে বিবেচিত হতো এবং ১৯৪৭-৪৮ সাল পর্যন্ত বিশ্ববাজারে এদেশ থেকে প্রায় ৮০% পাট রপ্তানি হতো। কিন্তু ১৯৭৫-৭৬ সাল নাগাদ এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং বর্তমানে বিশ্ব চাহিদার শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ পাট বাংলাদেশ থেকে বাইরে যায়। এ অবনতির বড় কারণ পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং সেসঙ্গে বিশ্ববাজারে কৃত্রিম তন্তুর আবির্ভাব। বাংলাদেশে সাধারণত বীজবপন শুরু হয় ফেব্রুয়ারির শেষে এবং প্রজাতিভেদে মে মাসের শেষ পর্যন্ত চলে। পাটচাষ প্রাক-বর্ষা মৌসুমের বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। সাদাপাট অধিকতর পানিসহিষ্ণু বিধায় সাধারণত নিচুজমি, এমনকি জলাবদ্ধ জমিতেও চাষ করা যায়। অন্যদিকে জলবদ্ধতা তোষাপাটের জন্য ক্ষতিকর, তাই মাঝারি থেকে নিম্ন-মাঝারি জমিতে চাষ করা হয়। কয়েক ধরনের জমিতে, কর্দম থেকে বেলে-দোআঁশ পর্যন্ত ভাল উর্বরতাসহ ৫.০-৮.৬ পর্যন্ত অম্লমানের (pH) মাটিতে পাট ফলানো যায়।[২৩]

পাট চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জলবায়ু বাংলাদেশের গ্রীষ্ম মৌসুমে বিদ্যমান থাকায় উক্ত সময়েই এর আবাদ হয়। উচ্চ তাপমাত্রা, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত, পরিচ্ছন্ন আকাশ পাটের দ্রুত বৃদ্ধিতে সহায়ক। দেশী পাটের চেয়ে তোষাপাট কিছুটা পরে বুনতে হয়। তবে জমিতে জুন-জুলাই মাসে পানি জমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সে জমিতে পাট কিছুটা আগাম বপন করা উচিত।

বাংলাদেশের প্রধান তন্তু-ফসল পাট উৎপাদন, শিল্পজাতকরণ, রপ্তানি, চাষাধীন এলাকা, প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও শিল্প ইত্যাদি দিক বিবেচনায় পাট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এক সময়ে কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি থেকে বাংলাদেশ পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করত। সাদা ও তোষা পাট হিসেবে পরিচিত যথাক্রমে *Corchorus capsularis* ও *C. olitorious* প্রজাতি দুটির কাণ্ড থেকে প্রাপ্ত লিগনিনযুক্ত বাস্ট-আঁশই পাট। *Hibiscus cannabinus* প্রজাতির আঁশ কেনাফ নামে পরিচিত।[২৪]

স্বপরাগায়িত এবং ১৪ জোড়া ক্রোমোজোমবহ এই ফসলের বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘ আলোক-দিবসের প্রয়োজন। বীজবপনের পর আঁশের জন্য ফসল তুলতে ৪ থেকে ৫ মাস সময় লাগে। ফুল আসার সময়ই পাট কাটতে হয়। আঁশ পাওয়া যায় কাণ্ডের বাস্ট বা ফ্লোয়েম স্তর থেকে। পাটচাষ শ্রমঘন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাষীরা প্রান্তিক, দরিদ্র ও ক্ষুদ্র খামারি। সফল চাষাবাদের জন্য জমিপ্রস্তুত খুব গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ৩-৫টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি মসৃণ করা এবং জমিতে ২০ শতাংশের বেশি জীববস্তু থাকা আবশ্যক। মাটির ধরন অনুযায়ী সাধারণত নাইট্রোজেন-ফসফরাস-পটাশিয়ামের যথানুপাতে গোবরও ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে কৃষকরা পাটচাষে সচরাচর কোন রাসায়নিক সার ব্যবহার করে না। অবশ্য, ব্যবহৃত হলে তিন পর্যায়ে করা হয়: জমি প্রস্তুতের সময় একবার এবং যথাসময়ে টপড্রেসিং হিসেবে দু'বার। পরিচর্যার সময় অতিরিক্ত পাটগাছ তুলে ফেলা ছাড়াও আগাছা পরিষ্কার আবশ্যক। ছিটিয়ে বপনে সাধারণত প্রতি হেক্টরে লাগে ১০-১২ কেজি বীজ। সারিতে বপনে

---

২২. বাংলাপিডিয়া, ৫ম, পৃ. ৩২৬
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭

Dhaka University Institutional Repository

বীজ লাগে কিছুটা কম। কৃষকেরা বীজের জন্য বীজ পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত (অক্টোবর-নভেম্বর) ফসলের কিছুটা রেখে দেয়। পাট কাটার পর নির্দিষ্ট সংখ্যক গাছ দিয়ে আঁটি বেঁধে পাতা ঝরানোর জন্য তারা সেগুলিকে ৫-৭ দিন জমিতে দাঁড় করিয়ে রাখে। তারপর আঁটিগুলি পানিতে ডুবানো হয়। স্বচ্ছ ও মন্দবহ পানি পাট জাগ দেওয়ার জন্য সর্বোত্তম। বারো থেকে ১৫ দিন পর জাগ সম্পন্ন হলে হাত দিয়ে কাঠি থেকে আঁশ পৃথক করে ধুয়ে রোদে শুকানো হয়। শুকানোর পর কৃষকরা স্থানীয় বাজারে পাট বিক্রি করে।

বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলাতে পাট উৎপন্ন হলেও ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, যশোর, ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও জামালপুরই প্রধান পাটচাষ অঞ্চল। পাটচাষাধীন মোট জমির পরিমাণ প্রায় ৫,৫৯,৮৩৮ হেক্টর এবং মোট উৎপাদন প্রায় ৫৩,১০,৫০০ বেল। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত ২৭টি উচ্চফলনশীল ও উন্নত মানের পাটের জাত (cultivar) উদ্ভাবন করেছে।[২৫]

শণপাট Leguminosae গোত্রের *Crotalaria juncea* প্রজাতির বাকলযুক্ত তন্তু-ফসল। শণগাছের পাতা সবুজ সার হিসেবে মাটির উর্বরতা বাড়ায়। শণের আঁশ নরম ও অপেক্ষাকৃত কম লিগনিনযুক্ত হওয়ায় এর ব্যবহার প্রধানত পাকানো সুতা, রশি, কাগজ ও মাছের জাল তৈরিতেই সীমাবদ্ধ। এর চাষাবাদ পদ্ধতি পাটের মতোই। সাধারণত রাজশাহী, রংপুর, যশোর ও বগুড়ায় শণচাষ হয়। দুই মৌসুমেই এটি ফলে এবং তদনুযায়ী এ ফসল ভাদই-শণ ও রবি-শণ নামে পরিচিত। এই ফসলের চাষ হয় এমন জমির পরিমাণ প্রায় ১৬৪ হেক্টর এবং বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৭৪৫ বেল।[২৬]

পাট ও পাটজাত সামগ্রী বহুল ব্যবহৃত। প্রাচীনকাল থেকে প্যাকেজিংয়ের কাঁচামাল হিসেবে পাট ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার আগে এটি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে রশি, হাতে তৈরি কাপড়, শিকা ও গৃহসজ্জার সামগ্রীসহ গৃহস্থালি ও খামারে উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মধ্যযুগে বাংলায় পাটজাত দ্রব্যের মধ্যে গানিবস্তা ও পাটশাড়ির বহুল ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায়। আঠারো শতক থেকে বিদেশে গানিব্যাগ রপ্তানি হয়েছে। পাটের পাতা ও মূল স্থানীয় লোকেরা ভেষজ ও সবজি হিসেবে ব্যবহার করে। শণের বিকল্প হিসেবে পাটের বাণিজ্যিক ব্যবহার আরম্ভ হয় পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষত ডান্ডিতে। পাটজাত দ্রব্যের প্রথাগত ব্যবহার প্রধানত পাকানো সুতা, শক্ত কাপড়, চটের ব্যাগ, টুইল কাপড়, কার্পেট ব্যাকিং, উল-প্যাক, মাদুর, মোটা কাপড়, দেয়াল-আচ্ছাদন, গালিচা ও বিভিন্ন ধরনের গৃহসজ্জার বস্ত্র প্রভৃতিতে সীমাবদ্ধ।[২৭]

বাংলাদেশের পাটকলে উৎপাদিত প্রধান তিনটি পণ্যের **পাট কার্পেট**, চট এবং বস্তা। কার্পেট একটি মূল্য-সংযোজন শিল্প। কাগজের ব্যাগের ব্যবহার ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধির জন্য মোড়কজাতীয় পণ্য হিসেবে পাটের তৈরি বস্তার চাহিদা অতিমাত্রায় কমে যায় এবং এর ফলে পাট থেকে বিপুল পরিমাণে কার্পেট উৎপাদন শুরু হয়। ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে কার্পেট তৈরির কাজে ৬৭৪টি এস্টাবলিশমেন্ট ছিল এবং এগুলির মধ্যে ৩টি বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিচালিত হতো। কার্পেট তৈরির কাজ মূলত কুটির শিল্পের আওতাভুক্ত।[২৮]

---

২৫. বাংলাপিডিয়া, ৫ম, খ. পৃ. ৩২৭
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮

Dhaka University Institutional Repository

রেশম:

রেশম বমবিকস মোরি বর্গভুক্ত রেশমপোকার গুটি থেকে তৈরি সুতা দিয়ে বোনা একপ্রকার সূক্ষ্ম ও কোমল তন্তু। বাংলায় দীর্ঘদিন থেকে তিন ধরনের রেশম তৈরি হয়ে আসছে: মালবেরি, এণ্ডি এবং তসর। প্রথমটি তৈরি হয় *বমবিকস* বর্গের রেশমপোকার গুটি থেকে, যে পোকা মালবেরি বা তুঁত গাছের পাতা খায়; দ্বিতীয়টি তৈরি হয় *কিলোসেমিয়া* বর্গের রেশমগুটি থেকে যারা ক্যাস্টর গাছের পাতা খায় এবং তৃতীয়টি *অ্যানথেরি* বর্গভুক্ত রেশমগুটি থেকে যারা ওক গাছের পাতা খায়। সচরাচর মালবেরি রেশম সবচেয়ে মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত।[২৯]

বাংলায় ঠিক কখন থেকে মালবেরি রেশম প্রস্তুত শুরু হয় এ-বিষয়ক কোন তথ্য জানা যায় নি। তবে এটা নিশ্চিত যে, একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ শিল্প এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ হিসেবে এই রেশম তৈরি প্রক্রিয়ার ইতিহাস শুরু হয়েছিল বহু শতাব্দী আগেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুদূর ইতালিতে এই রেশম গাঙ্গেয় সিল্ক নামে পরিচিত ছিল। বাংলায় রেশম উৎপাদনের দীর্ঘ ইতিহাস থেকে দেখা যায়, গ্রামের গৃহস্থরা রেশম উৎপাদনের প্রথম তিনটি পর্যায় সম্পন্ন করে: মালবেরি বা তুঁত চাষ, রেশমগুটি লালনপালন এবং সুতা কাটা। তারপর সেই সুতা নিকটবর্তী গ্রাম বা শহরে বিভিন্ন প্রকার রেশম বস্ত্র তৈরির জন্য দক্ষ তাঁতিদের কাছে বিক্রয় করা হয়। বাংলায় এত বেশি রেশম উৎপাদিত হতো যে তা স্থানীয় চাহিদা পূরণ করার পর প্রচুর পরিমাণে বাইরে রপ্তানি হতো। এই সিল্কের বাজারই প্রথম ইউরোপীয় বণিকদের বাংলায় আসতে আকৃষ্ট করে। ছোট আকারে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে পরিণতিতে ইউরোপীয় বণিক কোম্পানিগুলি বাংলার বস্ত্রশিল্পের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে।[৩০]

১৯০৮ সালে সরকার রেশমপোকা চাষের জন্য একটি বিভাগ চালু করে। এটাই ছিল রেশম শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার ক্ষেত্রে প্রথমবারের মতো একটি দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ। কিন্তু শেষপর্যন্ত এ উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বাংলায় তুঁতগাছ চাষের এলাকা ১৮৯৬ সালে ছিল ৫৪,০০০ হেক্টর, ১৯১৪ সালে তা দাঁড়ায় ৭,০০০ হেক্টরে এবং ১৯৩৭ সালে ৪,০০০ হেক্টরে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পরে অধিকাংশ রেশম উৎপাদক এলাকা ভারতের মধ্যে পড়ে। বাংলার তুঁতচাষ এলাকার ১০ ভাগেরও কম অংশ পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং প্রায় ২,০০০ লোক জীবিকার জন্য রেশম উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল হয়।[৩১]

রেশম উৎপাদন একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। রেশমগুটি থেকে রেশম তৈরি করা হয়। রেশমগুটি আসলে রেশম মথের শুঁয়াপোকা; এদের একমাত্র খাদ্য তুঁতপাতা। রেশমকীট ডিম থেকে জন্মায় এবং গুটিতে রূপান্তরিত হওয়ার পর্যায় শেষ করে তারা রেশম মথ হিসেবে আবির্ভূত হয়। স্ত্রী মথ তখন কালচক্র পুনরায় শুরু করার জন্য ডিম পাড়ে। গুটিবদ্ধ অবস্থায় রেশম পিউপা বা কীটগুলিকে মেরে ফেলে সেগুলিকে সেদ্ধ করে সুতা ছাড়ানো হয় এবং পরে তা গোটানো হয়। এর এই সুতা বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র তৈরির জন্য নানাভাবে প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশে প্রায় সবধরনের রেশমগুটিই গ্রামের হাটগুলিতে বাঁশের ট্রেতে করে প্রতিপালন করা হয়। রেশমগুটি পালন খুবই পরিশ্রমসাপেক্ষ, বিশেষ করে মৌসুমের শেষে যখন হাজার হাজার রেশমপোকা গোগ্রাসে পাতা খায় তখন তাদের পালনের জন্য পর্যাপ্ত শ্রমের প্রয়োজন হয়। আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে একটি রেশম মৌসুম ৩০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বাংলাদেশে বছরে চার থেকে পাঁচটি রেশম মৌসুম হয়ে

---

২৯. বাংল্যাপিডিয়া, ৯ম খ. পৃ. ১২৯-১৩০

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯-১৩০

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। প্রধান প্রধান মৌসুমগুলি হচ্ছে চৈত্র, জ্যৈষ্ঠ এবং অগ্রহায়ণ। রেশম রং করা, বোনা ও ছাপা প্রভৃতি কাজ গ্রামের ছোট কারখানা এবং শহরের উন্নত ফ্যাক্টরিতে সম্পন্ন হয়। বাংলায় যারা সিল্ক তৈরি করে (তবে সচরাচর নিজেরা পরতে পারে না), তাদের মধ্যে রেশমের ভিন্ন ধরনের নাম প্রচলিত আছে। উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ের ওপর নির্ভর করে এই নামকরণ করা হয়। যেমন রেশমগুটি পালনকারীকে বলা হয় বোসনি, রেশমগুটিকে পোলু, গুটির সুপ্তাবস্থাকে চোঞ্চ বা বিজন গুটি, গুটি মেলার বাঁশের চালনকে বলে চন্দ্রোকি, ১,২৮০টি রেশমগুটিকে কাহন, রেশমকীটের মহামারী রোগকে কোটা রোগ এবং জীবাণু সংক্রামক মাছিকে বলা হয় উজি।

বাংলাদেশের রেশম বাজার পুরোপুরি স্থানীয়। কখনও কখনও স্থানীয় সরবরাহের বাইরেও রেশমের চাহিদা দেখা যায় এবং বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রধানত ভারত থেকে রেশমবস্ত্র আমদানি হয়ে থাকে। বাংলাদেশের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর জীবনে রেশমের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। একখানি রেশম শাড়ির আভিজাত্য একটি দামি সুন্দর পোশাকের চেয়ে অনেক বেশি। রেশম শাড়ি বিত্ত, সভ্যতা, বাঙালি রমণীর ঐতিহ্যগত সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক। সিল্কের বিভিন্ন নমুনা এবং ডিজাইনের জন্য বাংলা ভাষায় বিশেষ বিশেষ নাম প্রচলিত, যেমন গরদ, মটকা, বেনারসি প্রভৃতি।[৩২]

আঞ্চলিক প্রাচীন পোশাক:

বাঙালিদের পোশাক ছিল মূলত ধুতি আর চাদর। এক সময় চোগা-চাপকানের ব্যবহার ছিল ধনীদের মধ্যে। কোঁচানো ধুতি, কোঁচানো চাদর, গিলে-করা পাঞ্জাবি ধনী মানুষের নির্ধারিত পোশাক ছিল। অনেক সময় সভা-সমিতিতে লোকজনকে পাগড়িও পরতে দেখা যেত। বর্তমানে বাঙালি নারী-পুরুষের মধ্যে পোশাকের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিচিত্র ফ্যাশনের প্যান্ট, বাহারি জামা, টি-শার্ট, বর্মিদের লুঙ্গি, মিনি স্কার্ট, ম্যাক্সি ইত্যাদি। ইদানীং বাঙালি মেয়েদের অনেককে প্যান্ট-শার্ট পরতে দেখা যায়।

প্রাক্-শিল্পবিপ্লব যুগে বঙ্গদেশের গোটা প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র তৈরি হতো। বস্ত্র তৈরি ও বাণিজ্যের প্রধান স্থান ছিল ঢাকা, সুবর্ণগ্রাম, ডেমরা, তিতবদী, জঙ্গলবাড়ি ও বাজিতপুর। তাই প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর সুসভ্য দেশ থেকে এসব অঞ্চলে বণিকদের আগমন ঘটেছিল। বণিকগণ ভারতীয় উপমহাদেশ বিশেষত বাংলাদেশকে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠতম বস্ত্রশিল্প কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে। খ্রিষ্টাব্দ-পূর্ব কাল থেকেই এদেশে বস্ত্রশিল্পের বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। ঢাকা, কাপাসিয়া, সোনারগাঁও, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, নোয়াখালী, কুষ্টিয়া, খুলনা, কুমিল্লা বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। *রিয়াজুস সালাতিন* গ্রন্থে (গোলাম হোসাইন সলিম, ১৭৮৮) সোনারগাঁয়ে মসলিন উৎপাদিত হতো বলে উল্লেখ আছে। দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও মালদা নিয়ে গঠিত অঞ্চল ঘোড়াঘাটে গঙ্গাজলী বস্ত্র উৎপাদনের খ্যাতির কথা উল্লেখ আছে। সাদুল্লাপুর, নিশ্চিন্তপুর, আমিনপুর জেলায় বিখ্যাত 'পাবনাই পাড়' কাপড় তৈরি হতো। নোয়াখালীর যুগদিয়া লক্ষ্মীপুর ও কলিন্দার বস্ত্রের জন্য খ্যাত ছিল। কুমারখালি ও সাতক্ষীরার শাড়িও সুনাম অর্জন করেছিল। মগ রমণীদের সুতি ও রেশমি বস্ত্রবয়নের কথা হাস্টারের ও বার্ডউডের গ্রন্থে লেখা আছে।[৩৩]

---

৩২. বাংলাপিডিয়া, ৯ম খ. পৃ. ১৩১

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মসলিন ও জামদানির খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। সুতিবস্ত্রের মতোই বিখ্যাত হয়েছিল বাংলার রেশমি বস্ত্রও। এসব ছাড়াও ঢাকায় নানা ধরনের কাপড় বোনা হতো। টেলরের মতে, ১৮৪০ সালে বস্ত্রশিল্প যখন ধ্বংসের মুখে তখনও ঢাকায় ৩৬ রকমের কাপড় বোনা হতো। কালক্রমে যান্ত্রিক উৎপাদনের প্রসার ও নানা জটিলতায় সুচিশিল্প ও তাঁতশিল্প প্রভৃতি সীমিত হয়ে পড়ে। নিম্নে বাংলাদেশের উৎপাদিত প্রাচীন কিছু বস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ তুলে ধরা হলো।

শাড়ি কাপড় :

ভারতীয় উপমহাদেশের নারীর পরিধেয় বস্ত্রের মাঝে শাড়ী প্রাচীন পোশাক। কখন কীভাবে শাড়ি উদ্ভূত হয়েছিল সে ইতিহাস খুব একটা স্পষ্ট নয়। তবে আবহমান বাংলার ইতিহাসে শাড়ির স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে নারীদের শাড়ি পরার প্রচলন ছিল। যদিও নাম ও পরার ধরন ছিল অন্যরকম এবং সেই প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের একেক অঞ্চলের নারীরা একেকভাবে শাড়ি পরে আসছেন।

পন্ডিতদের মতে-প্রাকৃত ভাষার 'সাট্টিকা' শব্দ থেকে শাড়ি শব্দের উদ্ভব। আদি বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে 'সাট্টিকা' শব্দটি পাওয়া যায়। প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতার অধিবাসীদের পোশাকের যে বর্ননা পাওয়া যায়-তা অনেকটা শাড়ির মতোই, বিশেষ করে পুরোহিতদের পরিধেয় বসনের বর্ননা থেকে সেরকমই মনে হয়। যুগে যুগে শাড়ির পাড়-আঁচল, পরার ধরন আর বুনন কৌশল বদলেছে । 'শাড়ি' শব্দের উৎস সংস্কৃত 'শাটী' শব্দ থেকে। 'শাটী' অর্থ পরিধেয় বস্ত্র। ইতিহাসবিদ রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রাচীন ভারতের পোশাক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে তখন মেয়েরা আংটি, দুল, হার এসবের সঙ্গে পায়ের গোছা পর্যন্ত শাড়ি পরিধান করত। পাহাড়পুরের পাল আমলের কিছু ভাস্কর্য দেখেই অনুমান করা যায় যে অষ্টম শতাব্দীতে শাড়ি ছিল প্রচলিত পোশাক।[৩৪]

ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সেলাই করা কাপড় পরার রেওয়াজ আদিম কালে ছিল না। এই সেলাইবিহিন অখণ্ড বস্ত্র পুরুষের ক্ষেত্রে 'ধুতি' এবং মেয়েদের বেলায় 'শাড়ি' নামে অভিহিত হয়। বয়ন শিল্পের উৎপত্তির সঙ্গে শাড়ির সংযোগ রয়েছে। তখন যেহেতু সেলাই করার কৌশল জানা ছিল না তাই সেলাই ছাড়া টুকরা কাপড় পরাই ছিল শাস্ত্রীয় বিধান। এ সময়ে সেলাই ছাড়া কাপড় পরার রেওয়াজ উপমহাদেশের বাইরেও প্রচলিত ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতায়, যেমন মিশর, রোম, গ্রিস-এ সেলাই ছাড়া বস্ত্র ঐতিহ্য হিসেবেই চালু ছিল। সেলাই করার জ্ঞান লাভ হওয়ার পর এই অখণ্ড বস্ত্রই নানা এলাকায় বিচিত্ররূপে ও বিভিন্ন নামে রূপান্তরিত ও আদৃত হয়, যেমন ঘাগরা, সালোয়ার, কুর্তা, কামিজ প্রভৃতি। কিন্তু কয়েকটি এলাকায় ঐ বসনখণ্ড সেলাই ছাড়াই টিকে যায়। এসব এলাকা হচ্ছে আজকের বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম, কেরালা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রদেশ, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব এবং পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ ও পাঞ্জাব। তাই বলা যায়, শাড়ি একমাত্র বাঙালি নারীর পরিধেয় নয়, যদিও বর্তমান যুগে বিশেষভাবে বাঙালি রমণীর পোশাক হিসেবেই শাড়ির অধিক পরিচিতি।[৩৫]

আজকের শাড়ি অখণ্ড হলেও তার সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও সেলাই করা। শুধু শাড়ি পরার প্রথা আজ আর নেই, এর সঙ্গে অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে ব্লাউজ এবং সেই সঙ্গে পেটিকোট বা সায়া নামের অন্তর্বাস। আদিকালে বর্তমান যুগের মতো শাড়ি পরার কায়দা ছিল না। এ ভিন্নতা শুধু

---

৩৪. বাংলাপিডিয়া, ৯ম খ. পৃ. ২৮২

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

শাড়ির বৈচিত্র্যে নয়, শাড়ি পরার ধরনেও। এক কালে শাড়ি পরার দুটি ধরন ছিল, আটপৌরে ও পোশাকি। মেয়েরা শাড়ি পরত কোমর জড়িয়ে, পরার ধরন অনেকটা পুরুষের ধুতি পরার মতোই, যদিও পুরুষের মতো মেয়েদের পরিধেয়তে সাধারণত কোন কাছা থাকত না। আদিকালের বসনের মতো আজকের শাড়িও একখণ্ড দশ, এগারো কি বারো হাতের বস্ত্র। শাড়ি পরার ধরনও সব জায়গায় এক নয়। কেরালা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশ, বাংলাদেশ ইত্যাদি জায়গায় শাড়ি পরার কায়দায় নিজ নিজ এলাকার বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত। শাড়ি পরায় পার্থক্য আছে বিভিন্ন শ্রেণী ও জীবিকাধারীর মধ্যেও। শাড়ির ইতিহাসের মতোই আছে শাড়ি পরার ধরনেরও ইতিহাস।[৩৬]

মূলত শাড়ি পরার আদলে আমূল পরিবর্তন ঘটে সেলাই অর্থাৎ সিয়ান শিল্প আবিষ্কারের পর থেকে। প্রাচীনকালে নারীর অধোবাসের একটু অংশ (বা বাড়তি অংশ) সামনে অথবা পেছনে ঝুলিয়ে রাখা হতো। কালক্রমে তা-ই বক্ষাবরণের উপরে স্থাপিত হতে থাকে এবং আরও পরে অবগুণ্ঠনের প্রয়োজনে মাথায় স্থান পায়। সিয়ান শিল্প আবিষ্কারের পর ব্যবহৃত হয় ব্লাউজ। কিন্তু তারও আগে ছিল সেমিজ। সেমিজের দ্বিখণ্ডিত রূপ-ই ব্লাউজ ও পেটিকোট। এসবই অন্তর্বাস ও অনুষঙ্গ হিসেবে সংযোজিত। দুবার জড়িয়ে অর্থাৎ দুপ্যাঁচ দিয়ে পরার ধরনটি বলতে গেলে নগরাঞ্চল থেকে উঠেই যায়। সেমিজ বা পেটিকোটের উপর শাড়িটিকে গিঠ দিয়ে প্রথমে ডানে পরে বাঁয়ে লম্বা ভাঁজ দিয়ে জড়িয়ে টেনে এনে ডান হাতের নিচ দিয়ে আলগা করে বাঁ কাঁধে আঁচলের সামান্য অংশ রাখার যে ধরন, তার নাম 'এক প্যাঁচ'। এ ধরন চালু ছিল সুদীর্ঘকাল। 'এক প্যাঁচ' ধরনের শাড়ি পরার অনেক সুবিধা ছিল একদিকে পর্দা রক্ষা, অন্যদিকে সংসারের কাজের সুবিধা। প্রয়োজনে ঢিলা আঁচল কোমরে জড়িয়ে নেওয়া গেছে, সন্তান লালনে-পালনে ও শীত-বর্ষায় লম্বা আঁচল মায়ের কাজে লেগেছে।[৩৭]

পরবর্তীতে এ ধরনও পরিবর্তিত হয়েছে। পরার ধরনে এসেছে 'কুচি পদ্ধতি'। এ পদ্ধতিতে শাড়িকে কোমরে পেঁচিয়ে সামনের অংশে কুচি পেটের উপর দিয়ে লতিয়ে বুক ঘিরে ছন্দোময় ভঙ্গিতে উপরে তুলে বাঁ কাঁধ ছুঁয়ে আঁচলটিকে পিঠে ছেড়ে দেওয়া হয়। এভাবে পরা শাড়ির আঁচল দ্বারা অবগুণ্ঠনের কাজও হয়। একালের অবগুণ্ঠনের স্টাইল আগের মতো নয়। অবগুণ্ঠন মানে আর মুড়ি ঘোমটা নয়, তা আব্রুর মাধ্যমে সৌন্দর্য পরিস্ফুট করার পন্থা। এখন অবগুণ্ঠন মানে মাথার তালুর কাছে আলতো করে আঁচল তুলে দেওয়া। শাড়ির 'কুচি'র প্রাথমিক চিন্তা এসেছে অবাঙালির কাছ থেকে। ঘাগরার ঘেরাও কুচির প্রভাবই লক্ষ্য করা যায় শাড়ির কুচিতে। উল্লেখ্য, ঘাগরা কুচি দিয়ে সেলাই করা অধোবাস। শাড়িকে পরিধেয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন এমন অবাঙালিরাই প্রথমে কুচি পদ্ধতি চালু করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত শাড়ির কুচির এ স্টাইল চালু ছিল। আঁচল লম্বা করে রাখা হতো মাথায় ঘোমটা দেওয়ার জন্য। ক্রমে ক্রমে শাড়ির কুচির অংশ বাড়তে থাকে, শাড়ি গায়ের সঙ্গে টেনে পরা হতে থাকে, কমে আসতে শুরু করে শাড়ির ঢিলে-ঢালা কায়দাটি; কোমর, বুক পিঠ সর্বত্র শাড়ির অবস্থান হয়ে ওঠে টান টান, বিন্যস্ত, পরিপাটি, কুচির ধরনও পাল্টাতে থাকে। শাড়ির আদি পর্বে কুচি ছিল সামনের দিকে প্রস্ফুটিত ফুলের মতো ছড়িয়ে দেওয়া, পরে তার ভঙ্গি হয় একের পর এক ভাঁজ দিয়ে সুবিন্যস্ত করা।[৩৮]

বাংলাদেশে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত সব পরিবারের মহিলারা শাড়ি পরেন। তবে তাদের শাড়ি পরার ধরন এবং শাড়ির মানের মধ্যে ব্যবধান অনেক। বিষয়টি পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি, সামাজিক প্রতিপত্তি এবং ব্যক্তিগত রুচিবোধের ওপর নির্ভর করে। দেশে হরেক রকমের

---

৩৬. বাংলাপেডিয়া, পৃ. ২৮৩
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪

Dhaka University Institutional Repository

শাড়ির আবির্ভাব ঘটেছে। যেমন বেনারসি, জামদানি, সিল্ক, তাঁতের শাড়ি, মিলের শাড়ি, সুতি শাড়ি, জর্জেট, শিফন, টাঙ্গাইল শাড়ি, পাবনার শাড়ি, ঢাকাই শাড়ি, বিভিন্ন নামের প্রিন্ট শাড়ি ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে বাটিক, বুটিক, টাই-ডাই, ব্লক-প্রিন্ট, ফেব্রিক, নকশি কাঁথাসহ হাজারো রকম শাড়ি। এর মধ্যে সাধারণ ব্যবহার্য শাড়িগুলি হয় সুতির এবং জর্জেটের। সুতি শাড়ির মধ্যে অনেক মানসম্পন্ন শাড়ি এবং সাধারণ শাড়িও রয়েছে। বাংলাদেশের মেয়েরা শাড়ি ছাড়াও সালোয়ার-কামিজ, ম্যাক্সি ইত্যাদি পোশাক পরে। তবে অনুষ্ঠানাদিতে প্রায় সব পরিবারের মেয়েরাই শাড়ি পরে। সুতি শাড়ি সব মহলে সাধারণ ব্যবহার্য শাড়ি হিসেবে সমাদৃত। তবে তার মান ও আভিজাত্য নির্ভর করে উৎকৃষ্ট সুতা, বুনন এবং ডিজাইনের ওপর।[৩৯]

বাংলাদেশের অনেক জায়গায় বিভিন্ন মানের বিভিন্ন ডিজাইনের শাড়ি তৈরি হয়। বাংলাদেশের তৈরি শাড়ি জামদানি, কাতান, রাজশাহী সিল্ক, মণিপুরী শাড়ি, টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি, বালুচরি শাড়ি, পাবনার শাড়ি, ঢাকাই শাড়ি ইত্যাদি শুধু দেশে নয়, বিদেশেও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বিয়ে, বৌভাত, মেহেদি অনুষ্ঠান, গায়ে হলুদ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে শাড়িই অন্যতম পোশাক। বিয়ে এবং বৌভাত অনুষ্ঠানে বিয়ের কনেকে কারুকার্যমণ্ডিত উজ্জ্বল রঙের বেনারসি, কাতান শাড়ি পরিয়ে সাজানো হয়। আবার এসব অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত অতিথিরাও যার যার সাধ্যমতো দামি শাড়ি পরেন। তবে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে ছেলে পক্ষ এবং কনে পক্ষ একই রঙের অথবা সম্ভব হলে দুই রঙের বাহারি শাড়িতে নিজেদের সাজাতে চান। মীলাদ মাহফিল, ওয়াজ মাহফিল, ঈদুল আযহা, ঈদুল ফিত্‌র, শবে বরাআত, শবে কদর প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ধবধবে সাদা, হালকা এবং ধূসর রঙের শাড়ি পরা হয়। তরুণীরা ঈদের দিনে চটকদার সালোয়ার কামিজ, কুর্তা, স্কার্ট এবং রঙিন উজ্জ্বল শাড়ি পরে, কিন্তু বর্ষীয়সী মহিলারা হালকা রঙের বা সাদা শাড়ি পরেন।[৪০]

সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যেকোন ধরনের উজ্জ্বল শাড়ি পরার রেওয়াজ আছে। তবে বাংলা নববর্ষ, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি ইত্যাদি দিনে বিশেষ ধরনের শাড়ি পরা হয়। বাংলা নববর্ষে লাল পাড়ের সাদা শাড়ি পরার রীতি দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। অন্যান্য দিবসে উজ্জ্বল রঙের শাড়ি পরলেও একুশে ফেব্রুয়ারি কালো পাড়ের সাদা শাড়ি পরা হয়।[৪১]

বর্তমানে বাংলাদেশে শাড়ির মধ্যে তাঁতের শাড়িই প্রধান, পাশাপাশি ব্যবহৃত হচ্ছে মিলের শাড়িও। মসলিন এতকাল প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেলেও বর্তমানে নতুন আঙ্গিকে কিছু কিছু মসলিন তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জামদানি শাড়িতেও যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আনা হয়েছে বৈচিত্র্য এবং নিত্যনতুন নকশা। তবে শৌখিন মহিলাদের কাছে জামদানির বুননে পুরানো ডিজাইনের কদরও রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গাতেই শাড়ি তৈরি হচ্ছে তাঁতে এবং মিলে। এর মধ্যে ঢাকা, ডেমরা, রূপগঞ্জ, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, সোনারগাঁও, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, পাবনা, রাজশাহী, নাটোর, বগুড়া, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, রংপুর, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, মানিকগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চল প্রধান। বিশেষত টাঙ্গাইল ও পাবনার তাঁতের শাড়ি এবং ঢাকাই বিটি, কাতান, বেনারসি ও সিল্ক নতুন আঙ্গিকে আবির্ভূত হচ্ছে। এসব শাড়ি বাংলাদেশের বাইরেও অনেক জায়গায় সমাদৃত।[৪২]

---

৩৯. বাংলাপিডিয়া, পৃ. ২৮৪
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকাই মসলিন:

'ঢাকাই মসলিন' নামে খ্যাত সূতিবস্ত্রটির ইতিহাস অতি প্রাচীন। তবে এই বস্ত্রটি বহু প্রাচীন হলেও মসলিন নামটি সম্ভব পরবর্তীকালে দেয়া। অবশ্য বিক্রমপুরের ইতিহাসে এই বস্ত্রকে 'মসৃন নীল বস্ত্র' নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্য যুগে সমগ্র এশিয়ার মধ্যে তখনকার ঢাকা ছিলো বয়ন শিল্পের শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র। এ কারণেই বাংলার ইতিহাস মুলত মসলিন শিল্পের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সোনালী ইতিহাস। ঢাকার পার্শ্ববর্তি সোনারগাঁও কে ঘিরে গড়ে উঠেছিল মসলিন শিল্পের পল্লী। এখানেই তৈরী হতো মিহি সুতার সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র যা পুরো বিশ্বে সৃষ্টি আলোড়ন করেছিল। বাংলার মসলিন পৃথিবীর বড় বড় সম্রাট-সম্রাজ্ঞি, রাজা-রানী, ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর আকাঙ্খার ধন ও মর্যাদার প্রতিক ছিলো। এই মসলিন ঢাকা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্থানীয় কারিগরদের দ্বারা স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন সুতা থেকে তৈরি হতো।

ঢাকাই মসলিনের উৎপত্তি ও বিকাশ :

'মসলিন' শব্দের উৎপত্তির উৎস অস্পষ্ট। 'মসলিন' ফরাসী শব্দ। সংস্কৃত কিংবা বাংলা শব্দ নয়। কেউ বলেন, মসলিন শব্দটি ইরাকের একটি প্রাচীন ব্যবসাকেন্দ্র মসুল থেকে উদ্ভূত। হেনরি ইউল এর প্রকাশিত অভিধান 'হবসন জবসন' মসলিন শব্দের উদ্ভব মসূল থেকে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরাকের এককালের নামি ব্যবসা কেন্দ্র মসূলে তৈরি হত সূক্ষ্ম সব কাপড় । ইংরেজরা এই সূক্ষ্ম কাপড়কে মসলিন হিসেবে নামকরণ করে । কিন্তু ঢাকা ও আশেপাশের এলাকায় মুঘল আমলে সপ্তদশ শতকে মসলিন শিল্প বিকাশ লাভ করেছিল। ঢাকাই মসলিনের অনন্যতার কাহিনী ছড়িয়ে পরেছিল সর্বত্র। আবার কেউ কেউ মনে করেন, দক্ষিণ ভারতে ইউরোপীয় বণিক কোম্পানির এককালের সদর দপ্তর মসলিপট্টমের সঙ্গে মসলিন শব্দটি সম্পৃক্ত। মসলিন ফারসি, সংস্কৃত বা বাংলা শব্দ নয়। সম্ভবত ইউরোপীয়রা মসুল থেকে যে বস্ত্র আমদানি করত এবং প্রাচ্যের অপরাপর দেশ থেকে মসুল হয়ে যেসব বস্ত্র আনা হতো তারা তার নাম দিয়েছিল মসলিন। ঢাকার সূক্ষ্মবস্ত্র দেখে তারা সে বস্ত্রেরও নামকরণ করে মসলিন। মসলিন নামটি যে ইউরোপীয়দের দেওয়া সে সম্পর্কে তেমন কোন সন্দেহ নেই। কেবল ঢাকার সূক্ষ্মবস্ত্রকেই মসলিন বলা হতো না, গুজরাট, গোলকুন্ডা ও ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে ইউরোপীয়দের আমদানিকৃত যে কোন সূতিবস্ত্রকেই মসলিন নামে অভিহিত করা হতো।[৪৩]

খ্রিস্টপূর্ব ২০০ বছর আগে গ্রিকরা ভারতীয় কার্পাসের কথা উল্লেখ করেছেন। স্ট্যাটিটিয়াস (Statitius) কার্পাস তুলাকে 'কবোসম' বলেছেন। জে ফর্বেস রয়েল (J Forbes Rayle, M.D, F.R.S) তাঁর গ্রন্থ 'The Early History of Cotton' গ্রন্থে লিখেছেন। গ্রিকরা ঢাকার মসলিনকে 'গ্যাঙ্গেটিকা' নামে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু বস্তুটি গঙ্গা উপকূলে তৈরি হতো। বিখ্যাত গ্রিক পর্যটক প্লিনি থেকে শুরু করে ডা. উরে (Dr. Ure) এবং টেইলর পর্যন্ত বিখ্যাত ব্যক্তিরা মসলিন সম্পর্কে বহু লেখায় ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। প্লিনির সময়ে মসলিনের নাম ছিল 'কার্পাসিয়াম', যদিও এই শব্দটি সংস্কৃত ভাষার কার্পাস শব্দের অপভ্রংশ। অতীতকালে ঢাকার আশপাশে ভাওয়াল রাজার অধীনে কাপাসিয়া প্রধান কেন্দ্র ছিল। 'কার্পাসিয়াম' শব্দ থেকে 'কাপাসিয়া' অঞ্চলের নামকরণ করা হয়েছে।[৪৪] প্লিনি লিখেছেন, রোমে রাজপ্রাসাদের মেয়েরা মসলিন বস্ত্র পরিধান করে স্বীয় নগ্ন অবয়ব সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থাপন করত।

---

৪৩. বাংলাপিডিয়া, ৮ম খন্ড, পৃ. ৫১

৪৪. James Tailor, Topography of Dacca, Calcutta, 1840, P. 163

Dhaka University Institutional Repository

(A dress under whose slight veil our women continue to show their shapes to the public.) ডাক্তার উরে বলেছেন, 'রোমের স্বর্ণযুগে ঢাকার মসলিন রোমের রাজ মহিলাদের সবচেয়ে প্রিয় এবং বিলাস বসন হিসেবে আদৃত ছিল (cotton manufacturer of Great Britain by Dr. Ure) কবি ইয়েটস লিখেছেন, বঙ্গদেশের কার্পাস খ্রিস্টপূর্ব দুইশত বছর পূর্বে গ্রিক দেশে প্রচলিত ছিল।[৪৫]

মসলিন দেখে ভিনদেশী ভূগোলবিদ এবং পর্যটকরা অভিভূত হয়েছিলেন। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত লোকজন ঢাকা-সোনারগাঁও এর এই উঁচুমানের মসলিন দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। নবম শতকে ভূগোলবিদ সোলায়মান 'সিলসিলাত উত তাওয়ারীখ' একটি বই লিখেছিলেন। তাতে রুমী নামের এক দেশের কথা আছে যেখানে এত সূক্ষ কাপড় তৈরি হত যে চল্লিশ হাত লম্বা আর দুইহাত চওড়া কাপড়ের একটি পুরো টুকরো প্রবেশ করানো যেত একটি সাধারণ আংটির মধ্যে দিয়ে। ধারনা করা হয় রুমী হচ্ছে আজকের বাংলাদেশ। সবমিলিয়ে এ দেশের কাপড়ের ঐতিহ্য আজকের নয়-বহু শতকের পুরানো।

তবে প্রাচীন আমল থেকেই বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের সুখ্যাতি থাকলেও মূলত মুঘল আমলে ঢাকা যখন রাজধানী হয় তখন থেকেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাপড়ের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে । সম্রাট, নবাবেরা মসলিন কাপড় কেনা আরম্ভ করেন চড়া দামে। সে যুগে মসলিন তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল ঢাকা, ধামরাই, সোনারগাঁ, টিটবাদি, জঙ্গলবাড়ি আর বাজিতপুর। জঙ্গলবাড়ি অধিকাংশের পেশা তখন মসলিন বোনা। জঙ্গলবাড়ি থেকে মাইল কুড়ি দূরে বাজিতপুর- ওখানে জন্মাতো উচুঁমানের কার্পাস, যা থেকে তৈরি হতো উঁচুমানের মসলিন।

বাংলার বস্ত্রশিল্পের ঐতিহ্য বেশ প্রাচীন। এক সময় বাংলার সূতিবস্ত্র রোম ও চীন সাম্রাজ্যে রপ্তানি করা হতো। এর উল্লেখ রয়েছে টলেমির ভূগোলে, *Periplus of the Erythraean Sea* গ্রন্থে এবং প্রাচীন চীনা পরিব্রাজকদের বর্ণনায়। তবে মুগল আমলে বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি বেড়ে যায় এবং তা দূর-দূরান্তের বিদেশী ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে। মুগল সম্রাট ও অভিজাতগণ ঢাকার মসলিন শিল্পের প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূরজাহানের কাছে মসলিন অত্যন্ত প্রিয় ছিল। মোগল সম্রাটরা মসলিনের প্রতি এত ঈর্ষান্বিত ছিলেন যে মসলিনের প্রচার ও বিদেশ পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। নূরজাহানের সুরুচির কারণে ভারতের সব নগরীতে মসলিন একটি বিশেষ স্থান দখল করেছিল। সম্রাট, প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং পদস্থ কর্মকর্তা ও অভিজাতদের ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিমাণে সূক্ষ্মতম মসলিন বস্ত্র সংগ্রহ করা হতো। ১৮৫১ সালে লন্ডনের বিশাল প্রদর্শনীতে ঢাকাই মসলিন বিশেষ প্রাধান্য পায় এবং বিপুল সংখ্যক দর্শককে মুগ্ধ করে। ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা ঢাকাই মসলিন বস্ত্রের উৎকর্ষ ও সূক্ষ্মতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে।[৪৬] মিসরের রাজা এন্টোনিও (ক্লিওপেট্রার নন্দিতপ্রেমিক) তাঁর সৈন্যদের 'কার্বাসাম' বস্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। ট্রেভারনিয়ার লিখেছেন, মুহাম্মদ আলী বেগ ভারত বর্ষ থেকে ফিরে রাজা চাসেফিকে

---

৪৫. সৈয়দ লুত্ফুল হক, মসলিনের ইতিকথা, আমার দেশ ঢাকা, ১৫ নভেম্বর ২০১০

৪৬. বাংলাপেডিয়া, ৮ম খন্ড, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যবান প্রস্তরখচিত ডিম্বাকৃতির একটি নারিকেল উপহার দেন। তার মধ্যে ৬০ হাত দীর্ঘ একটি মসলিন কাপড় ছিল। কাপড়টি এতই পাতলা ছিল যে, হাতে রাখলে কোনো কিছু আছে বলে মনে হতো না।[৪৭]

মসলিন তৈরি করার জন্য দরকার হতো বিশেষ ধরনের কার্পাস বা তুলা। এ বিশেষ ধরনের কার্পাসটি জন্মাতো মেঘনা নদীর তীরে ঢাকা জেলার কয়েকটি স্থানে। একদম ভাল মানের কার্পাস মেঘনার পশ্চিম তীরে উৎপন্ন হত। এর সুতা থেকে সবচেয়ে সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র তৈরি হতো। শ্রীরামপুর, কেদারাপুর, বিক্রমপুর, রাজনগর ইত্যাদি স্থানগুলো ফুটি কার্পাসের জন্য বিখ্যাত ছিল। এমনিতেই মেঘনা সমুদ্রের কাছাকাছি খুব বড় নদী। আবার বর্ষাকালে নদীর দু'কূল ভেসে যেত। ফলে এসব স্থানগুলোতে পলি জমার কারণে ফুটি কার্পাসের উৎপাদন খুব ভাল হতো। কিন্তু একজন কার্পাস চাষী একবিঘা জমিতে ভালমানের মসলিন তৈরির জন্য মাত্র ছয় কেজির মতো তুলা পেত। তাই মসলিনের চাহিদা বেড়ে গেলে গুজরাট হতেও তুলা আমদানি করা হতো।

মসলিনের প্রকারভেদ:

বয়রাতি ও দেশী নামে পরিচিত অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের আরও দুই ধরনের তুলা ছিল। এগুলি উৎপন্ন হতো ঢাকার বিভিন্ন অংশে ও আশপাশের এলাকায়। এসব তুলা দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম সূক্ষ্ম ও মোটা কাপড় তৈরি হতো। তুলা ধুনা, সুতা কাটার প্রক্রিয়া ও বস্ত্র বয়নের সঙ্গে তাঁতি পরিবারের সবাই জড়িত ছিল। ছোট পরিবার হলে দুতিনটি পরিবার এক সঙ্গে মিলে কাপড় তৈরি করত। ঢাকার তাঁতিদের তৈরি কাপড়ের মান বিভিন্ন ধরনের হতো। সম্রাট, উজির, নওয়াব প্রমুখ অভিজাত শ্রেণীর জন্য বোনা হতো সূক্ষ্ম ও মিহি বস্ত্র এবং দরিদ্রদের জন্য মোটা ও ভারী কাপড়। কাপড়ের সূক্ষ্মতা ও স্বচ্ছতা, উৎপাদনের উৎস এবং ব্যবহার ভেদে ঢাকাই মসলিনের বিভিন্ন নাম দেওয়া হতো। নামগুলি ছিল মলমল (সূক্ষ্মতম বস্ত্র), ঝুনা (স্থানীয় নর্তকীদের ব্যবহৃত বস্ত্র), রঙ্গ (স্বচ্ছ ও জালিজাতীয় বস্ত্র), আবি-রাওয়ান (প্রবহমান পানির তুল্য বস্ত্র), খাস (বিশেষ ধরনের মিহি বা জমকালো), শবনম (ভোরের শিশির), আলাবালি (অতি মিহি), তনজিব (দেহের অলঙ্কার সদৃশ), নয়ন-সুখ (দর্শন প্রীতিকর), বদন-খাস (বিশেষ ধরনের বস্ত্র), শিরবন্দ (পাগড়ির উপযোগী), কামিজ (জামার কাপড়), ডোরিয়া (ডোরা কাটা), চারকোণা (ছক কাটা বস্ত্র), জামদানি (নকশা আঁকা) ইত্যাদি।[৪৮]

সবচেয়ে সূক্ষ্ম মসলিনের নাম ছিল মলমল। বিদেশী পর্যটকরা এই মসলিনকে কখনও কখনও মলমল শাহী বা মলমল খাস নামে উল্লেখ করেছেন। এগুলি বেশ দামি এবং এরকম এক প্রস্থ বস্ত্র তৈরি করতে তাঁতিদের দীর্ঘদিন, এমনকি ছয় মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেত। এই বস্ত্র সম্রাট ও নওয়াবগণই ব্যবহার করতেন। সম্রাটদের জন্য সংগৃহীত বস্ত্রের নাম ছিল মলবুস খাস এবং নওয়াবদের জন্য সংগৃহীত বস্ত্রের নাম ছিল সরকার-ই-আলা। মুগল সরকার সম্রাট ও নওয়াবদের ব্যবহার্য মসলিন প্রস্তুত-কার্য তদারকির জন্য দারোগা বা দারোগা-ই-মলবুস খাস উপাধিধারী একজন কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। দীউয়ান ও পদস্থ কর্মকর্তা এবং বিখ্যাত ব্যাঙ্কার জগৎ শেঠ এর জন্যও মলমল সংগ্রহ করা হতো। মলমল (বা মলবুস খাস ও সরকার-ই-আলা) ব্যতীত অন্যান্য মসলিন বস্ত্র ব্যবসায়ীরা রপ্তানি করত। স্থানীয় লোকেরাও কিছু কিছু মসলিন বস্ত্র ব্যবহার করত।[৪৯]

---

৪৭. সৈয়দ লুতফুল হক, মসলিনের ইতিকথা, আমার দেশ ঢাকা, ১৫ নভেম্বর ২০১০

৪৮. বাংলাপিডিয়া, ৮ম খন্ড, পৃ.৫২

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ.৫২

Dhaka University Institutional Repository

মসলিন সমৃদ্ধ বিভিন্ন অঞ্চল :

বৃহত্তর ঢাকা জেলার প্রায় সব গ্রামই উৎকৃষ্ট মানের মসলিন তৈরির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকা জেলার ঢাকা ও ধামরাই, গাজীপুর জেলার তিতাবদি, নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও এবং কিশোরগঞ্জ জেলার জঙ্গলবাড়ি ও বাজিতপুর। সোনারগাঁও এক সময় সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ ও তাঁর পুত্রের (১৩৩৮-১৩৫৩) রাজধানী ছিল। আবার মুগল যুগে ঈসা খান এর রাজধানীও ছিল এই সোনারগাঁও। ঢাকা থেকে বিশ মাইল পশ্চিমে বংশী নদীর তীরে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান ধামরাই। তিতাবদি গাজীপুরের কাপাসিয়া থানার একটি গ্রাম। জঙ্গলবাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বতীরে অবস্থিত। এই জঙ্গলবাড়ি থেকে ১৫/২০ মাইল দূরে বাজিতপুর। জঙ্গলবাড়ি দীর্ঘদিন ধরে ঈসা খানের পরিবারের আবাসস্থল ছিল। এসব জায়গায় উৎকৃষ্ট মানের মসলিন বস্ত্র তৈরি হতো, কারণ এসব স্থান ছিল মসলিন তৈরির উপযোগী তুলা উৎপাদনকারী স্থানের কাছাকাছি অবস্থিত। এ সকল স্থানে তৎকালীন মুসলমান বা হিন্দু শাসকদের প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। তাই এতদঞ্চলের তাঁতিরা শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর আনুকূল্য ও উৎসাহ লাভ করত।[৫০]

বুনন প্রক্রিয়া

মসলিন তৈরির কাজটি ছিল ভীষন জটিল, কঠিন, সময়সাধ্য- তারচেয়েও বড় কথা হলো সেটা তৈরির জন্য দরকার হতো অসামান্য নৈপুণ্য আর আসুরিক ধৈর্য। মোটামুটি যে ক'ধাপ পেরিয়ে তৈরি হতো মসলিন সেগুলো হলো; সুতা নাটানো, টানা হোতান, সান বাঁধা, নারদ বাঁধা, বু-বাধা, আর সবশেষে কাপড় বোনা । এসব শেষে একজন তাঁতি আর তার দু'জন সহকারীর লাগতো কমপক্ষে দু'তিন মাস। সাধারনত মহিলারাই সুতা কাঁটা আর সূক্ষ্ম সুতো তোলার মত পরিশ্রম এবং ধৈর্যেও কাজে নিয়োজিত ছিল। সুতো তোলার সময় কম তাপ এবং আর্দ্রতার দরকার হতো। তাই একেবারে ভোর বেলা এ কাজ করা হতো। আর্দ্রতার খোঁজে অনেক সময় নদীতে নৌকার ওপর বসে সুতা কাটত। একজন মহিলা এভাবে প্রতিদিন সুতো কেটেও মাসে মাত্র আধা তোলা সুতা তুলতে পারতেন। এই পরিশ্রমসাধ্য কাজের কারণে উনিশ শতকের শুরু থেকেই দক্ষ সুতা কাটুনির সংখ্যা অনেক কমে আসতে থাকে। এই রকম সূক্ষ্ম সুতো কাটার কাজ অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও এতোটা ভাল হতো না । এর কারণ ধরা হয় দু'টো- ঢাকার ফুটি কার্পাস আর শ্রমিকের দক্ষতা ও পরিশ্রম।

মসলিন তৈরি শেষে ওগুলো ধোয়া হতো। সম্রাট আকবর এর আমালে সোনারগাঁ'র কাছে এগোরো সিন্ধুর জল কাপড় ধোয়ার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। আসলে এটা যে শুধু জলের গুনে হতো তা নয়, এর সাথে ছিল ভাল ক্ষার বা সাবান আর ধোপার দক্ষতা। মসলিন ধোবার জন্য রীতিমতো একটা শ্রেনীর মানুষই তৈরি হয়েছিল। আঠারো শতকের গোড়ায় একখন্ড মসলিন ধোয়ার খরচ পড়তো দশ টাকা। আবার ধোয়ার সময় কাপড়ে কোন দাগ লাগলে বিভিন্ন ফলের রস দিয়ে সেটা তুলে দেয়া হত। কাপড় ধোবার সময় কোনো সুতো সরে গেলে সেটা ঠিক করতো দক্ষ রিফুকাররা, তাদেরকে বলা হতো নারোদিয়া। এরপর শঙ্খ বা ছোট মুগুর দিয়ে পিটিয়ে মোলায়েম করা হতো। মোলায়েম করার সময় ছিটানো হতো চাল ধোয়া জল। একাজে নিয়োজিতোদের বলা হতো কুন্ডুগার। তারপর সাবধানে ইস্ত্রি করা হতো মসলিন। কোন কোন মসলিনে সুঁচের বা চিকনের কাজও করা হতো। কোন কোন সময় রঙও করা হতো। ঢাকার চিকনের কাজেও যথেষ্ট সুনাম ছিল, এখনও আছে। এরপর কাপড়গুলোকে ভালমতো ঠোঙাবন্দী করা হতো, একাজ যারা করতো তাদের বলা হতো বস্তাবন্দ।

---

৫০. বাংলাপিডিয়া, ৮ম খন্ড, পৃ.৫২-৫৩

Dhaka University Institutional Repository

মসলিন ছিল নানা রকমের। এর পার্থক্য নির্ণীত হত সুতার সূক্ষ্মতা, বুনন আর নকশা বিচারে। সবচেয়ে সূক্ষ্ম সুতার তৈরি, সবচেয়ে কম ওজনের মসলিনের কদর ছিল সবার চেয়ে বেশি, দামটাও ছিল সবচেয়ে চড়া। "মলবুস খাস" ছিল সবচেয়ে নামী সেরা মসলিন। এই মসলিন সম্রাটের জন্য তৈরি হত। আঠারো শতকের শেষদিকে মলবুস খাস সম্রাটের দরবারে পাঠানো বন্ধ হলে তৈরি হয় "মলমল খাস"। দশগজ লম্বা আর একগজ চওড়া মলমল খাসের ওজন হত মাত্র ছয় তোলার মতো, যা অনায়াসে ছোট্ট একটা আংটির ভিতর দিয়ে গলে যেত! মলবুস খাসের সমগোত্রীয় আরেকটি মসলিন "সরকার-ই আলা"।

দশগজ লম্বা আর একগজ চওড়া 'সরকার-ই আলা'-র ওজন হত দশ তোলার মতো। ঝুনা মসলিনে সুতার পরিমান থাকতো কম- দেখতে হত অনেকটা জালের মত। ঝুনা হিন্দী শব্দ যার অর্থ 'সূক্ষ্ম'। নকশা করা মসলিনকে বলা হতো জামদানি, কিন্তু আজকের জামদানির সাথে আদি জামদানির আকাশ-পাতাল তফাৎ। মসলিন তৈরির প্রক্রিয়াটা এত জটিল আর সময় সাপেক্ষ ছিল যে সম্রাটদের জন্য উন্নত মসলিন তৈরি করেই দিন কাটতো তাঁতিদের- বাড়তি মসলিন তৈরি করার সময় মিলতো তাই কম।

ঢাকাই মসলিনের অতীত ও বর্তমান :

ঐতিহাসিক কাফি খাঁ মোগল অন্তঃপুরে মসলিনের কদরের কথা লিখেছেন। বস্ত্র শিল্পের ইতিহাসে মসলিন সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হয়েছে। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় মাত্র একটি ঘর তাঁতি মসলিন বয়ন করতে পারত, তা পরবর্তী সময়ে বিলীন হয়ে যায়। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে একখানি মসলিন ৬০ পাউন্ডে বিক্রি হতো। তার দৈর্ঘ্য ছিল বিশ গজ, ওজন ছিল সাড়ে সাত আউন্স। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে একখানি মসলিন ৪০০ পাউন্ডে বিক্রি হতো। টপোগ্রফি অব ঢাকায় ১৬০ হাত লম্বা একখানি মসলিনের ওজন ছিল চার তোলা। এই মসলিন সোনারগাঁয়ে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়েছিল।[৫১] ১৮৪৬ সালে এক পাউন্ড ওজনের এক ফৈতি মসলিন সুতার দৈর্ঘ্য মাপা হলে তা প্রায় আড়াইশো মাইল লম্বা হত।[৫২]

ইংরেজ শাসনামলে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাপড় প্রস্তুত করে ঢাকার মসলিনের সঙ্গে পাল্লা দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। ওয়াটসন লিখেছেন 'With all our machines and wonderful Intentions we have neither to been unable to produce a fabric which for fineness or utility can equal the woven air of Dacca.' আমাদের বস্ত্রের নানাবিধ অত্যাশ্চর্য উপায়গুলো থাকা সত্ত্বেও চারুশিল্প হিসেবে মসলিনের ঐন্দ্রজালিক সক্ষমতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিনি। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার ঢাকার মসলিন উৎপাদন ও বিক্রি নিষিদ্ধ করে এবং ব্রিটিশদের তৈরি কাপড় রফতানি শুরু করে। ফলে মসলিন উৎপাদন ক্রমে ক্রমে বিলোপ হতে থাকে। তাছাড়া মসলিন প্রস্তুতকারী তাঁতি ও সুতা তৈরির কারিগরদের ওপর নানা প্রকার নির্যাতন শুরু করা হয়। এমনকি মসলিন তৈরির সূক্ষ্ম কারিগরদের আঙুল কেটে দেয়া হয়।

ইংরেজরা মসলিন তাঁতীদের আঙুল কেটে এ অঞ্চলের পোশাক উৎপাদন হ্রাস ও ম্যানচেস্টারের কাপড় শিল্পের জন্ম দেয়। শোনা যায়, কম পারিশ্রমিকের কাজে বাধ্য না হতে তাঁতীরা নিজেরাই নিজেদের আঙুল কেটে ফেলতো। তবে কার্পাস কৃষক আর তাঁতীদের উপর কোম্পানী, ব্যবসায়ী, গোমস্তা আর পাইকাররা যে অমানুষিক অত্যাচার চালাত সেটি জাজ্বল্যমান সত্যি।

---

৫১. সৈয়দ লুত্‌ফুল হক, মসলিনের ইতিকথা, আমার দেশ ঢাকা, ১৫ নভেম্বর ২০১০

৫২. শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩১৯ বাংলা, পৃ. ১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

১৮৪৪ সালে ঢাকার কমিশনার আই. ডানবার কোম্পানীর সদর দপ্তরে মসলিন শিল্প বন্ধ হবার কারণ উল্লেখ করে একটি রিপোর্ট পাঠান। ডানবার সাহেবের মতে মূল কারণগুলো ছিলঃ

(১) ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে সস্তায় সুতা আর কাপড় উৎপন্ন হতে থাকে। ফলে দামি মসলিনের চাহিদা কমে যায়।

(২) বিলেতের সস্তা সুতা ঢাকায় ও ভারতে আসতে থাকে। সে থেকে কাপড় তৈরি হতে থাকে এবং মসলিন হারিয়ে যেতে থাকে।

(৩) বিলাতে ঢাকাই মসলিনের ওপরে উচ্চহারে কর আরোপ করা হয়। ফলে ওখানে অস্বাভাবিক হারে মসলিনের দাম বেড়ে যায় এবং স্বভাবতাই বিক্রি কমে যায় ।

মসলিনের পড়তির সময়টায় নবাব-সম্রাটদেরও পতন ঘটতে থাকে । তাঁরা বেশি টাকা দিয়ে মসলিন না কেনায় অভ্যন্তরীন বাজারেও চাহিদা কম ছিল। তাছাড়া মুঘল সম্রাট, নবাব, ব্যবসায়ী-কেউই এ শিল্প রক্ষা কিংবা প্রসারে কোন সময়ই তেমন কোন উদ্যোগ নেননি। এভাবেই ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় মসলিনের স্বর্ণযুগ। বর্তমান প্রজন্মের কাছে মসলিন একটি নাম এবং ইতিহাস বিশ্বখ্যাত এই মসলিন আমার ঐতিহ্যের সম্পদ।[৫৩]

মুগল বাদশা, নওয়াব ও পদস্থ কর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবই ঢাকাই মসলিন শিল্পের অবনতির কারণ। মুগলরা কেবল শাসন ক্ষমতা ও মর্যাদাই হারায় নি, একই সঙ্গে তাদের ক্রয় ও ব্যয় করার ক্ষমতাও লুপ্ত হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর (১৭৫৭) বাংলার ব্যবসাক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের ফলে ইউরোপের অন্যান্য কোম্পানি এবং বিভিন্ন দেশের বণিকদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। তবে মসলিন শিল্পের অবনতি ও চূড়ান্ত বিলুপ্তির সর্বপ্রধান কারণ ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব এবং আধুনিক বাষ্পশক্তি ও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার। এভাবে ইংল্যান্ডের শিল্প-কারখানায় উৎপাদিত সস্তা দামের পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যায় ঢাকার মসলিনের মতো দামি সূতিবস্ত্র।[৫৪]

বাস্তবে অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ প্রান্তে ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লব, ইংল্যান্ডের কলের প্রস্তুত সুতার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বাংলার শাসকদের ইংরেজ সরকারের কুটকৌশল, অত্যাচার নিপীড়নে বাংলার হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য এ শিল্পটি ক্রমবিলুপ্তির পথে দ্রুত এগিয়ে যায়। এ বিলুপ্তির কারণসমূহ নির্ণয় করতে গিয়ে ১৮৪৪ সালে ঢাকার ইংরেজ কমিশনার ডানবার যে প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন সে প্রতিবেদনের উপসংহারের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হলো- "ইংল্যান্ডের উৎপাদন ক্ষেত্রে বাষ্পচালিত ও যান্ত্রিক পদ্ধতির আবিষ্কার ও প্রয়োগের ফলে ঢাকাই মসলিনের বিদেশী বাণিজ্য লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।" ইউরোপের বিলাস প্রিয় রমণীরা মসলিনের বিলুপ্তিতে ক্ষুব্ধ হলেও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ উপমহাদেশে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সে রমণীদের প্রতিবাদে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। হাজার হাজার বাংলার জাতশিল্পীদের সর্বনাশ করে সাধন করে ম্যানচেস্টারে শিল্প কারখানা গড়ে তুলেছিল।

বেশকিছু পালিয়ে এসে উত্তর বঙ্গে এবং মুর্শিদাবাদে পুর্বাসিত হবো চেষ্ঠা করেছিলো। কিন্তু কাঁচামালের অভাবে তার মসলিন শিল্পকে আর পুর্নবাসিত করতে পারেনি। ইংরেজরা শুধু যে মসলিন তাঁতিদের উপর ক্ষুব্ধ ছিল না তারা মসলিন প্রস্তুতের প্রধান কাঁচামাল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সুতা যেন আর প্রস্তুত

---

৫৩. সৈয়দ লুতফুল হক, মসলিনের ইতিকথা, আমার দেশ ঢাকা, ১৫ নভেম্বর ২০১০

৫৪. বাংলাপিডিয়া, ৮ম খন্ড, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

করতে না পারে সেদিকেও তাদের দৃষ্টি ছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর নির্বিঘ্নে তাঁতশিল্পের প্রচলন শুরু হয়। তৎকালীন যুগের ন্যায় অত মসৃণ এবং পাতলা মসলিন না হলেও আবার মসলিন বস্ত্র প্রস্তুত করা শুরু করে। যেহেতু বস্ত্রটি পাতলা সে কারণে এক রঙ্গা মসলিনের চাহিদা তেমন দেখা যায়নি। ফলে বেশিদিন বাজার ধরে রাখা যায়নি।[৫৫]

ঢাকাই জামদানি:

জামদানি শাড়ি বাংলাদেশের এক ঐতিহাসিক ভৌগোলিক নির্দেশনা। মূলত 'ঢাকাই' বা 'ঢাকাইয়া জামদানি' নামে পরিচিত জামদানি শাড়ির জন্মভূমি বাংলাদেশের শীতলক্ষ্যা নদীর অববাহিকা। বস্ত্র-ইতিহাসে সূক্ষ্মতম কাপড় মসলিনের এক অনন্য বংশধর এই জামদানি দেশের ক্ষয়িষ্ণু তাঁতশিল্পকে এখনো পৃথিবীতে চিহ্নিত করে রেখেছে। খৃষ্টপূর্ব ৩২৭ বছর আগে আলেকজান্ডার অবিভক্ত ভারতীয় অঞ্চলের জামদানি তাঁতের কথা তাঁর বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। মোগল আমলে নারী-পুরুষের অভিজাত বস্ত্র হিসেবে জামদানির ব্যাপক প্রচলন ঘটে সর্বত্র। ঢাকা থেকে এই জামদানি তাঁতবস্ত্র আগ্রা-বুখারা-সমরখন্দসহ পশ্চিম এশিয়ার অনেক অঞ্চলে এক ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে। জামদানি বাংলাদেশের সূক্ষ্ম বুনন এবং নকশায় গড়া এক বৈশিষ্ট্যময় মসলিন তাঁত কাপড়। জামদানি নকশার প্রচলন ও মসলিন কাপড়ের বিকাশ পাশাপাশিই শুরু হয়েছিল। নকশি কাঁথার মতোই আজ জামদানি শাড়ি বাংলার অনিবার্য সংস্কৃতির প্রতীক হয়ে উঠলেও- এটি ঠিক নকশি কাঁথার মতন একান্ত দেশিও নয়, বরং মুগল-পারসিক ঐতিহ্যের এক সুন্দর নান্দনিক উত্তারাধিকার।

জামদানির উৎপত্তি ও বিকাশ :

মসলিন কাপড়ের পর ভারতীয় উপমহাদেশ বিশেষত বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রাচীন বস্ত্র জামদানী শাড়ী। জামদানী শায়েস্তা খানের সময় সৃষ্টি হয় এবং সম্ভবত চান্দেরী থেকে এর নমুনা আনা হয়েছিল। চান্দেরীও শায়েস্তা খানের জায়গীরের অর্ন্তভূক্ত ছিল।[৫৬] চান্দেরী সম্ভবত সোনারগাঁও এর একটি মহল আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখিত Chundyaher এর সঙ্গে অভিন্ন।[৫৭]

উনিশ শতকের প্রথম দিকে জেমস টেলর ফুলেল নকশার জামদানির বিবরণ দিয়েছেন। বিশিষ্ট গবেষক মোফাজ্জল হোসেন "আমাদের জামদানী" প্রবন্ধে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দে রচিত "পেরিপ্লাস অবদি এরিথরিয়ান" গ্রন্থে বাংলার মসলিন কাপড়ের কথা উল্লেখ করেছেন।[৫৮] পেরিপ্লাস শব্দটি গ্রিক। এর অর্থ সমুদ্রের বুকে পাল তুলে ভেসে বেড়ানো। পেরিপ্লাস হলো নৌপথে বানিজ্যিক বিবরণ। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে "পেরিপ্লাস অভ দ্য ইরিথ্রিয়ান সি" নামে একটি গ্রন্থরচিত হয়েছিল। সে গ্রন্থে বঙ্গের মিহিনবস্ত্রের কথা রয়েছে। তা ছাড়া আরব, চিন ও ইটালিয় পর্যটকর ও ব্যবসায়ীদের বৃত্তান্তেও বঙ্গের সূক্ষ কাপড়ের কথা বারবার উল্লেখিত হয়েছে। প্রাচীন সভ্যতার যুগে তাঁত বুনন প্রক্রিয়ার কার্পাস তুলার সুতা দিয়ে 'মুসলিন' নামে সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরী হতো। এই মসলিন কাপড়ের উপর যে জ্যামিতিক নকশাদার বা বুটিদান বস্ত্র বোনা হতো তারই নাম জামদানি। জামদানি বলতে সাধারণত শাড়ি বোঝানো হলেও প্রকৃতপক্ষে ঐতিহ্যবাহী নকশায় সমৃদ্ধ ওড়না, কুর্তা, পাগড়ি, ঘাগরা, রুমাল, পর্দা, টেবিল ক্লথ সবই জামদানির আওতায় পড়ে। সপ্তদশ শতাব্দীতে জামদানি নকশার কুর্তা ও

---

৫৫. বস্ত্র ও পরিচ্ছদ : ব্যবহারিক শিল্পকলা, পৃ. ৭৭

৫৬. হাকীম হাবীবুর রহমান, ঢাকা পঞ্চাশ বছর আগে, পৃ. ৯

৫৭. আইন-ই-আকবরী, ইংরেজী অনুবাদ, ফ্রান্সিস গ্লাডউইন, লন্ডন, ১৮০০, পৃ. ১৮৮

৫৮. মোফাজ্জল হোসেন, আমাদের জামদানী"

Dhaka University Institutional Repository

শেরওয়ানির ব্যবহার ছিল। মুগল আমলের শেষের দিকে নেপালে ব্যবহৃত আঞ্চলিক পোশাক রাঙ্গা-র জন্য বিশেষ ধরনের জামদানি কাপড় তৈরি হতো।[৫৯]

জামদানির নামকরণ নিয়ে সঠিক কিছু বলা কঠিন। জামদানির নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন ধরণের মতবাদ রয়েছে। একটি মত অনুসারে ফারসিতে জাম অর্থ এক ধরনের উৎকৃষ্ট মদ এবং দানি অর্থ পেয়ালা। জাম পরিবেশনকারী ইরানী সাকীর পরনের মসলিন থেকে জামদানি নামের উৎপত্তি ঘটেছে। আরেকটি মতে, 'জামদানি' শব্দটি ফার্সি ভাষা থেকে এসেছে। ফার্সি জামা অর্থ কাপড় এবং দানা অর্থ বুটি, সে অর্থে জামদানি অর্থ বুটিদার কাপড়। একারণে মনে করা হয় মুসলমানেরাই ভারত উপমহাদেশে জামদানির প্রচলন ও বিস্তার করেন। তোফায়েল আহমদ (১৯৬৪)-এর মতে ফারসি শব্দ জামা মানে কাপড়, দানা অর্থ বুটি; অর্থাৎ জামদানি অর্থ বুটিদার কাপড়। মুসলিমরা জামদানি প্রচলন করেছিল এবং দীর্ঘদিন যাবৎ এ শিল্প তাদের হতেই একচেটিয়াভাবে সীমাবদ্ধ ছিলো। তাই মুসলিমদের অন্যতম ভাষা ফার্সী থেকেই জামদানি নামের উৎপত্তি বলে অনেকেই মনে করেন।[৬০] তবে মসলিন সম্পর্কে জানা যায় বাংলার মুসলমান কারীগর ও শাসকদের তাঁত বুনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরী মসৃন কাপড়। সেই মসলিন এর বিকল্প হিসাবেই তৈরী হয়েছে জামদানী। মধ্যযুগের মুসলিম আমলেই জামদানি শাড়ির প্রকৃত অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছিল। জামদানি শাড়ি আসলে পারস্য ও মুগল - এই দুটি মিশ্র সংস্কৃতির ফসল। যার রসদ যুগিয়েছিল বাংলার উর্বর মাটি। জামদানি বলতে এখন শাড়ি বোঝালেও মুসলিম আমলে জামদানি বলতে স্কার্ফ ও রুমালও বোঝাত। মুসলমানরা বাংলায় এসে অনেক কিছুই বদলে দিয়েছিল। বাঙালি জীবন যাপনের ধারা পরিবর্তনের পরিক্রমায় অনিবার্যভাবেই পরিধেয় পোশাকেও বদলের ছাপ পড়েছিল। বাঙালির ফতুয়া দীর্ঘায়িত হয়ে পাঞ্জাবি হয়ে উঠছিল। শাড়ির পাশাপাশি উচ্চবিত্ত নারীরা পরছেন সালোয়ার-কামিজ। দীর্ঘদিন মুসলিমদের হাতেই এ শিল্প একচেটিয়াভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই মুসলিম সমাজের অন্যতম অভিজাত ভাষা ফারসি থেকেই জামদানি নামের উৎপত্তি বলে অনুমান করা হয়। যদিও সেকালে মসলিনের উপর বুটিং ও জ্যামিতিক কাজকেই জামদানী বলা হলেও বর্তমানে সেই মুসলিনের বিকল্প হিসাবে জামদানী তৈরী হচ্ছে। মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুর থেকে বাংলার রাজধানী প্রথমে সোনারগাঁও পরে ঢাকায় স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে ঐ কার্পাস তুলা উৎপন্ন এবং মসলিন বস্ত্র শিল্প উৎপন্ন হতো।

হাজার হাজার বছর আগে মসলিন আর জামদানী ছিলো দুই সহোদর। তবে বুনন নীতির তারতম্য মসলিন ও জামদানীকে পৃথক করা হতো। মসলিনশিল্পের জন্য সোনারগাঁ শিতলক্ষা নদীর তীরবর্তী এলাকা ছিলো অনুকুল পরিবেশ। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ পতনের পর মসলিনশিল্পের সাথে জড়িতদের বংশ ধররা আবারও হাত দেয় মসলিন তৈরীতে কিন্তু তারা ব্যর্থ হয় মসলিনতৈরী করতে। তাই ঐ মসলিনের আদলে তৈরী করে আজকের জামদানী।

গৌরব ও ঐতিহ্যবাহী মসলিন আজ শুধু স্মৃতির সোনালী ইতিহাস। তবে সেই ঐতিহ্যময় মসলিনের উত্তরাধিকার হিসেবে জামদানী কিছুটা হলেও স্থান করে নিয়েছে। এর বাহারী রঙ শৈল্পিক দক্ষতার সুনিপন বুননে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত জামদানী শাড়ীর সুখ্যাতি ও সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বজুড়ে। শুধু বাংলাদেশের শীতলক্ষা নদীর কিনারা ও এর পার্শ্ববর্তি কয়েকটি গ্রামেই সুবিখ্যাত জামদানী শাড়ি তৈরী হচ্ছে। দেশের অন্যান্য এলাকায় এর প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করেও সম্ভব হয়নী।

---

৫৯. বাংলাপিডিয়া, ৪ম খ. পৃ. ২৪

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

নবম শতাব্দীতে আরব ভূগোলবিদ সোলায়মানের সিল সিলাত-উত-তওয়ারিখে উল্লেখিত রুমি নামক রাজ্যে সূক্ষ্ম ও মিহি সুতিবস্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। রুমি রাজ্যকে বাংলাদেশের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইবনে বতুতা সোনারগাঁয়ের সুতিবস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরেজ পরিব্রাজক র‍্যালফ ফিচ এবং ঐতিহাসিক আবুল ফজল সোনারগাঁয়ে প্রস্তুতকৃত মসলিনের প্রশংসা করেছেন। সূক্ষ্ম বস্ত্রে জামদানি শিল্পকর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করে মুগল আমলে। উৎকৃষ্ট ধরনের জামদানি ও মসলিন তৈরির জন্য ঢাকা, সোনারগাঁও , ধামরাই, তিতাবাড়ি, জঙ্গলবাড়ি, বাজিতপুর প্রসিদ্ধ ছিল। ইউরোপীয়রা ছাড়া ইরানি, আর্মেনিয়ান, মুগল, পাঠান বণিকরা এসব ঢাকাই মসলিন ও জামদানি ব্যবসায়ে উৎসাহী ছিলেন। মুগল সম্রাট, বাংলার নবাব ও অন্যান্যদের ব্যবহারের জন্য উৎকৃষ্ট মসলিন ও জামদানি সংগ্রহের জন্য ঢাকায় তাদের গোমস্তা নিযুক্ত ছিল। ঢাকাই মসলিনের স্বর্ণযুগ আরম্ভ হয় মুগল আমলে। এ সময়ে শুধু যে মসলিন ও জামদানি শিল্পের উন্নতি হয় তা নয়, দেশে-বিদেশে জামদানি ও মসলিনের চাহিদাও তখন থেকেই বাড়তে থাকে। আঠারো শতকের ইংরেজ কোম্পানির দলিলে দেখা যায় যে, মলমল খাস ও সরকার-ই-আলি নামক মসলিন সংগ্রহ করার জন্য ঢাকায় একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল দারোগা-ই-মলমল। প্রত্যেক তাঁতখানায় একটি করে দপ্তর ছিল এবং সেখানে আড়ং -এর অত্যন্ত নিপুণ তাঁতি , নারদিয়া, রিপুকার ইত্যাদি কারিগরের নাম তালিকাবদ্ধ করে রাখা হতো। তাঁতখানায় তাঁতিদের কোন নির্ধারিত বেতন ছিল না। তারা যতখানি মসলিন বা জামদানি তৈরি করত ঠিক তাঁর বাজার মূল্য দেওয়ার নিয়ম ছিল। দারোগার প্রধান কাজ ছিল মসলিন বা জামদানি তৈরির প্রতি পদক্ষেপে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। এভাবে ঢাকা, সোনারগাঁও, জঙ্গলবাড়ি ইত্যাদি থেকে প্রায় প্রতিবছর এক লক্ষ টাকা মূল্যের মলমল-খাস মুগল দরবারে পাঠানো হতো।

১৭৪৭ সালের এক হিসাব অনুযায়ী দিল্লির বাদশাহ, বাংলার নবাব এবং জগৎ শেঠের জন্য সর্বমোট সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার জামদানি কেনা হয়। একই বছর ইউরোপীয় বণিক ও কোম্পানিরা মোট সাড়ে নয় লক্ষ টাকার মসলিন ক্রয় করে। আঠারো শতকের শেষের দিকে মসলিনের রপ্তানি অনেক কমে যায়। ১৭৬৫ সালে ইংরেজদের দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানির নিযুক্ত গোমস্তারা নিজেদের ব্যবসায় উন্নতির জন্য তাঁতিদের ওপর অত্যাচার শুরু করে। তারা নিজেদের ইচ্ছামতো কাপড়ের মূল্য নির্ধারণ করে কাপড় কিনত। তাঁতিরা কম মূল্যে কাপড় বিক্রয়ে অস্বীকৃত হলে তাদের নির্যাতন করা হতো। তাঁতিদের ওপর এই অত্যাচার বন্ধের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আইন প্রণয়ন করে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি জামদানি মসলিনের এক হিসাবে দেখা যায়, সাদা জমিনবিশিষ্ট কাপড়ের উপর ফুল করা ৫০,০০০ টাকার মূল্যমানের জামদানি মসলিন দিল্লি, লখনৌ, নেপাল, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি এলাকার নবাব-বাদশাহরা ব্যবহার করতেন। এই মসলিন সাধারণত ঢাকার কাটা সুতা দ্বারা তৈরি হতো। উনিশ শতকের মাঝামাঝি জামদানি ও মসলিন শিল্প সংকুচিত হওয়ার পিছনে কতিপয় কারণ কাজ করেছিল। প্রথমত, বিলাতে বস্ত্রশিল্পে মেশিন ব্যবহার, দ্বিতীয়ত, বিলাতি সস্তা সুতা আমদানি এবং তৃতীয়ত, তাঁতিদের প্রতি মুগল বাদশাহ ও তাদের অমাত্যবর্গের অমনোযোগ। উনিশ শ সাতচল্লিশ সালের দেশ বিভাগের পর জামদানি কিছুটা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পায়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ঢাকার অদূরে ডেমরায় জামদানি পল্লীর তাঁতিরা কিছুটা আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন। তবে মেধা ও শিল্পের সঠিক পারিশ্রমিক না পাওয়ায় অন্যান্য অঞ্চলের তাঁতিরা ইদানীং এ শিল্প টিকিয়ে রাখতে উৎসাহ বোধ করছেন না। কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার মাধুরাপুর গ্রামের অচল তাঁতগুলি তাঁর নীরব সাক্ষী। অথচ এখানেই এক সময় সূক্ষ্ম মিহি কাপড় থেকে শুরু করে ১০০/৩০০ কাউন্টের সুতার চাদর ও নকশি কাপড় অর্থাৎ জামদানি তৈরি হতো। জামদানি শিল্পখ্যাত কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়িরও একই দশা।[৬১]

---

৬১. বাংলাপিডিয়া, ৪ম খ. পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

বুনন পদ্ধতি :

সাধারণত সুতা কাটার ওপর নির্ভর করত জামদানি মসলিনের সূক্ষ্মতা। সুতা কাটার উপযুক্ত সময় ভোরবেলা। কেননা তখন বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকে। সুতা কাটার জন্য তাঁতিদের প্রয়োজন হতো টাকু, বাঁশের ঝুড়ি, শঙ্খ ও পাথরের বাটি। মাড় হিসেবে সাধারণত খই, ভাত বা বার্লি ব্যবহার করা হতো। জামদানি তৈরির আগে তাঁতিরা সুতায় মাড় ও রং করে নিতেন। রং হিসেবে বনজ ফলফুল-লতা-পাতার রং ব্যবহার করা হতো। ভাল জামদানির জন্য ২০০ থেকে ২৫০ নম্বরের সুতা ব্যবহৃত হতো। অবশ্য আজকাল তাঁতিরা বাজার থেকে নির্ধারিত কাউন্টের সুতা কিনে জামদানি তৈরি করেন এবং প্রাকৃতিক রঙের পাশাপাশি কৃত্রিম রং ব্যবহার করে থাকেন। জামদানি তৈরির ক্ষেত্রে প্রতি তাঁতে দুজন তাঁতি পাশাপাশি বসে কাজ করেন। দুটি সুচাকৃতি বাঁশের কাঠিতে নকশার সুতা জড়ানো থাকে। প্রয়োজনীয় স্থানে সুচ দুটি দিয়ে পরিমিত টানায় সুতার মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে রঙিন সুতা চালিয়ে দেওয়া হয়। এরপর পাশের সুতার মাকু একজন তাঁতি পাশ থেকে অন্য তাঁতির কাছে দিলে তা সেদিক থেকে বের করে দেওয়া হয়। এভাবে তাঁতে রেখে জামদানি নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। জমিনের সুতার তুলনায় নকশার সুতা মোটা হওয়ায় নকশাসমূহ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। জামদানি তৈরির প্রথম দিকে ধূসর জমিনে জাম নকশা করা হতো। পরবর্তীতে ধূসর রং ছাড়াও অন্য রঙের জমিনে নকশা তোলা হতো। ষাটের দশকে জমিনে লাল সুতার নকশা করা জামদানি অত্যন্ত সমাদৃত হয়। ইংল্যান্ডের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে সাদা জমিনে সাদা সুতার কাজের সুন্দর জামদানি রক্ষিত আছে।[৬২]

জামদানির প্রকারভেদ

জামদানি নকশার প্রধান বৈশিষ্ট্য এর জ্যামিতিক অলঙ্করণ। জামদানি নকশা কাগজে এঁকে নেওয়া হয় না। দক্ষ কারিগর স্মৃতি থেকে কাপড়ে নকশা তুলে থাকেন। নকশা অনুযায়ী বিভিন্ন জামদানি বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন পান্না হাজার, দুবলি জাল, বুটিদার, তেরছা, জালার, ডুরিয়া, চারকোণা, ময়ূর প্যাঁচ, কলমিলতা, পুঁইলতা, কচুপাতা, কাটিহার, কলকা পাড়, আঙুরলতা, সন্দেশ পাড়, প্রজাপতি পাড়, দুর্বা পাড়, শাপলাফুল, বাঘনলি, জুঁইবুটি, শাল পাড়, চন্দ্র পাড়, চন্দ্রহার, হংস, ঝুমকা, কাউয়ার ঠ্যাঙা পাড়, চালতা পাড়, ইঞ্চি পাড় ও বিলাই আড়াকুল নকশা, কচুপাতা পাড়, বাড়গাট পাড়, করলাপাড়, গিলা পাড়, কলসফুল, মুরালি জাল, কচি পাড়, মিহিন পাড়, কাঁকড়া পাড়, শামুকবুটি, প্রজাপতি বুটি, বেলপাতা পাড়, জবাফুল, বাদুড় পাখি পাড় ইত্যাদি। বর্তমানে শাড়ির জমিনে গোলাপফুল, জুঁইফুল, পদ্মফুল, কলারফানা, আদারফানা, সাবুদানা, ইত্যাদি নকশা করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে ঐতিহ্যবাহী জামদানি নকশাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস চলছে। ছোট ছোট বিভিন্ন ফুলের বুটি তোলা জামদানি বুটিদার নামে পরিচিত। জামদানি বস্ত্রে ছোট ছোট ফুলগুলি যদি তেরছাভাবে সারিবদ্ধ থাকে তাকে তেরছা জামদানি বলে। এ নকশা শুধু যে ফুল দিয়েই হবে তা নয়, ময়ূর বা লতাপাতা দিয়েও হতে পারে। ফুল, লতার বুটি জাল বুননের মতো সমস্ত জমিনে থাকলে তাকে জালার নকশা বলা হয়। সারা জমিনে সারিবদ্ধ ফুলকাটা জামদানি ফুলওয়ার নামে পরিচিত। ডুরিয়া জামদানি ডোরাকাটা নকশায় সমৃদ্ধ থাকে। বেলওয়ারি নামে চাকচিক্যপূর্ণ সোনারুপার জরিতে জড়ানো জামদানি মুগল আমলে তৈরি হতো। এ ধরনের জামদানি সাধারণত হেরেমের মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে বোনা হতো।[৬৩]

---

৬২. বাংলাপিডিয়া, ৪ম খ. পৃ. ২৬
৬৩. বাংলাপিডিয়া, ৪ম খ. পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

জামদানির অতীত ও বর্তমান:

ব্যয়বহুল জামদানির উৎপাদন একচেটিয়াভাবে বহুকাল মুগলদের হাতেই ছিল। ঢাকায় সদর মলমল খাস কুটির দারোগা জামদানি তৈরির জন্য তাঁতিদের দাদন দিয়ে শিল্পে নিয়োগ করতেন। এভাবে উৎপাদিত জামদানির মূল্য অনেক বেশি হতো। রাজাবাদশাহদের জন্য উচ্চমূল্যের জামদানি প্রস্তুত হতো রাজকীয় কারখানায়। অভিজাত ধনীরাও নিজেদের ব্যবহার্য জামদানি প্রস্তুতের জন্য উচ্চমূল্যের কারিগর নিয়োগ করতেন। বিশ্ববাজারেও এসব বহুমূল্য জামদানির ব্যাপক চাহিদা ছিল। এশিয়া ও ইউরোপের রাজন্যবর্গ প্রায়শ ঢাকাই জামদানির জন্য বিভিন্ন বণিক কোম্পানিকে অর্ডার দিতেন। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমদিক থেকে উচ্চমূল্যের জামদানি উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। তখন স্বল্পদামের মিলের কাপড় বিশ্ববাজার দখল করে নেয়।

বহু বাধা অতিক্রম করে জামদানি একবিংশ শতাব্দীতে এসেও তাঁর ঐতিহ্য রক্ষা করে টিকে আছে। বর্তমানে এর প্রধান সমস্যা, তাঁতিরা সঠিক পারিশ্রমিক পান না। একটি ভাল জামদানি শাড়ি তৈরি করতে তাদের এক থেকে দুই মাস সময় লেগে যায়। সে তুলনায় তারা মজুরি পান না। এছাড়া দালাল-মহাজনদের মাধ্যমে কাপড় বিক্রয় করে খুব একটা লাভের সম্ভাবনা থাকে না।[৬৪]

বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জামদানি তৈরিতে উৎসাহিত হওয়ায় উৎকৃষ্ট ধরনের জামদানি তৈরি হচ্ছে। 'জামদানি এখন আর শুধু শাড়িতেই সীমাবদ্ধ নেই। শাড়ি ছাড়াও এখন জামদানি দিয়ে তৈরি হচ্ছে আরও কিছু। বয়স্করা এখনো শাড়ি হিসেবে পরলেও তরুণ-তরুণীরা স্কার্ট, টপস, ফতুয়া, সালোয়ার, কামিজ, পাঞ্জাবি, শেরোয়ানি হিসেবে জামদানি পরছে। রূপগঞ্জের রূপসী, কাজীপাড়া, পবনকুল ও মোর্গাকুলের এ কয়টি গ্রামেই জামদানি শাড়ি তৈরি হয়। দেশের একমাত্র জামদানি পল্লীর ঘরে ঘরে শাড়ি তৈরির কাজ চলে। কাপড়ে সুতা তোলা, সুতা রঙ করা আর শাড়ি বুনন আর নকশার কাজে দিন-রাত ব্যস্ত জামদানি শিল্পীরা। পুরুষের পাশাপাশি নারীরা বৈ ঝি আর ছেলে বুড়ু সবাই সমান তালে শ্রম দেয়। তবে জামদানি উৎপাদনকারী শিল্পীরা হতাশাগ্রস্ত। তারা কাপড়ের সঠিক দাম পায় না। খরচের টাকা তুলতেই তাদের নাভিশ্বাস উঠে। অধিকাংশ তাঁতিই মহাজনদের কাছে দেনার দায়ে বাঁধা থাকে। ফলে শিল্পীদে পক্ষে মহাজনদের দাদন বুনা ও যৎসামান্য মজুরি পাওয়া ছাড়া অতিরিক্ত কোন লাভ থাকে না। সরাসরি তারা শাড়ি বাজারে নামাতে পারে না। তাঁতিরা মহাজনদের কাছ থেকে সুতা নিয়ে যায় এবং নক্সা অনুযায়ী শাড়ি তৈরি করে। শাড়ি প্রতি মজুরি হিসেবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে হাড়ভাঙা খাটুনির পর ২০০ থেকে ২৫০ টাকা পায়। ফলে জামদানি তৈরিতে শিল্পীরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও তাঁতিরা জামদানি উৎপাদন বন্ধ করেনি।

জামদানি তাঁতীদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। কেবল বংশানুক্রমিক হাতে-কলমে অর্জিত জ্ঞান দিয়ে শিল্পীরা ধীরে ধীরে আরো উন্নত এবং নতুন নতুন ডিজাইনের শাড়ি তৈরি করছেন। এখনো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে জামদানি শিল্প দেশের রপ্তানি খাতে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি :

টাঙ্গাইল একটি ঐতিহ্যবাহী জনপদ। বহু অতীত ঐতিহ্য আর বাংলার চির পরিচিত লোক-সংস্কৃতি ইতিহাসে ক্রমধারার উত্তরাধিকারী। প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্যে আর লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যে টাঙ্গাইল জেলার অবস্থান অনেক উঁচুতে। টাঙ্গাইলের লোক-ঐতিহ্য নিয়েও প্রবাদ বচন রচিত হয়েছে। যেমন: 'চমচম, টমটম ও শাড়ি, এই তিনে টাঙ্গাইলের বাড়ি।' টাঙ্গাইলের তৈরি

---

৬৪. বাংলাপিডিয়া, ৪ম খ. পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

চমচম মিষ্টি আর তাঁতের শাড়ি পৃথিবী খ্যাত। টাঙ্গাইল জেলার তাঁত শিল্পের ইতিহাস অতি প্রাচীন। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় টাঙ্গাইল জেলা সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। এই শিল্পের সাথে জড়িত আছে এদেশের সংস্কৃতি। আর তাঁত শিল্প আমাদের অন্যতম ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। দেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প বা লোকশিল্পও এটি। টাঙ্গাইল জেলার তাঁত শিল্প সেই সর্ব বৃহৎ শিল্পের অন্যতম অংশীদার। প্রাচীন কাল থেকে টাঙ্গাইলের দক্ষ কারিগররা তাদের বংশ পরম্পরায় তৈরি করছেন নানা জাতের কাপড়। আর কাপড় তৈরিতে লাগে সূতো। সূতো তৈরি হয় তুলো থেকে। টাঙ্গাইল জেলার প্রাচীন অঞ্চল মির্জাপুর উপজেলা বিখ্যাত গবেষক জেম্‌স টেলর মির্জাপুরের তুলোর কথা লিখেছেন। এখানে বাপ্তা হাম্মাম ও অন্যান্য পাঁচমিশালী বস্ত্রের সূতো কাটা হতো তুলো থেকে। তা ছাড়া বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ও হিউয়েন সাং- এর ভ্রমণ কাহিনীতে টাঙ্গাইলের বস্ত্র শিল্প অর্থাৎ তাঁত শিল্পের উল্লেখ রয়েছে। সে দিক থেকেও বলা যায় টাঙ্গাইলের তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। এটি আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। বর্তমানে টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ির জন্যই টাঙ্গাইলের সুনাম বা পরিচিতি দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী।

তাঁত শিল্পের বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে টাঙ্গাইলের সফট সিল্ক ও কটন শাড়ি। এই শাড়ি বুনন ও ডিজাইন দৃষ্টি কাড়ে। টাঙ্গাইলের শাড়ির বৈশিষ্ট্য হলো- পাড় বা কিনারের কারু কাজ। রেশমী সূতী মিশ্রনের সূতো শাড়ি ও লুঙ্গি প্রস্তুত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও টাঙ্গাইলের তাঁতিরা তাঁতের শাড়ির, লুঙ্গি, গামছা ও চাদর তৈরি করে থাকে। টাঙ্গাইলের তাঁতিরা একদা মসলিন শাড়ি বুনতেন বলে শোনা যায়। বিদেশী বণিক চক্রের বড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মসলিন কাপড় কালের প্রবাহে হারিয়ে গেলেও তার সার্থক উত্তরাধিকারী হয়ে আজও টিকে রয়েছে টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি।

মুসলমান তাঁতীদেরকে বলা হতো জোলা। এই জোলা তাঁতীদের সংখ্যাধিক্য ছিল টাঙ্গাইল, কালিহাতী ও গোপালপুর এলাকায়। আবার যুগী বা যুগীদের নাথপন্থী এবং কৌলিক উপাধি হিসেবে দেবনাথ বলা হয়। ক্ষৌম বস্ত্র বো মোটা কাপড় বোনার কাজে এদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। সূতো কাটার চরকা এদের প্রত্যেক পরিবারেই ছিল এবং পুত্র কন্যাসহ পরিবারের নারী-পুরুষ সবাই সূতো কাটা ও কাপড় বুনতে সারাদিন ব্যস্ত থাকতো। টাঙ্গাইল কালিহাতী ও গোপালপুর এলাকায় যুগী সম্প্রদায়ের বসতি ছিল। যুগীরা ক্ষৌম, গামছা, মশারী তৈরি করে প্রায় স্বাধীন ভাবেই ব্যবসা চালাত। আরো জানা যায় টাঙ্গাইলের হিন্দু তাঁতীদের মৌলিক উপাধি বসাক। বাজিতপুর ও নলসুন্দা গ্রামেই এদের সংখ্যাধিক্য। কিন্তু বল্লা ও রতনগঞ্জে মুসলিম কারিগর (জোলা) সংখ্যায় হাজার খানেক এবং অনেকেই বেশ ধন সম্পদশালী।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, বসাক সম্প্রদায়ের তাঁতিরাই হচ্ছে টাঙ্গাইলের আদি তাঁতি অর্থাৎ আদিকাল থেকেই এরা তন্তুবায়ী গোত্রের লোক। এদেরকে এক শ্রেণীর যাযাবর বলা চলে। শুরুতে এরা সিন্ধু অববাহিকা থেকে পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদে এসে তাঁতের কাজ শুরু করেন। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া শাড়ির মান ভালো হচ্ছে না দেখে তারা নতুন জায়গার সন্ধানে বের হয়ে পড়েন এবং বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে চলে আসেন। সেখানেও আবহাওয়া অনেকাংশে প্রতিকূল দেখে বসাকরা দু'দলে ভাগ হয়ে একদল কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর এবং অন্যদল ঢাকার ধামরাইয়ে চলে আসে। তবে এদের কিছু অংশ সিল্কের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজশাহীতেই থেকে যায়। ধামরাইয়ে কাজ শুরু করতে না করতেই বসাকরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে ভাগ হয়ে অনেক বসাক চলে যান প্রতিবেশী দেশের চোহাট্টা অঞ্চলে। এর পর থেকে বসাক তাঁতিরা চৌহাট্টা ও ধামরাইয়া' এ দু'গ্রুপে স্থায়ীভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ধামরাই ও চৌহাট্টায় তন্তুর কাজ ভালোই হচ্ছিল। তবে আরো ভালো জায়গায় খোঁজ করতে করতে অনেক বসাক টাঙ্গাইলে এসে

Dhaka University Institutional Repository

বসতি স্থাপন করেন। এখানকার আবহাওয়া তাদের জন্য অনকূল হওয়াতে পুরোদমে তাঁত বোনার কাজে লেগে পড়েন। টাঙ্গাইলে বংশানুক্রমে যুগের পর যুগ তারা তাঁত বুনে আসছেন। এক কালে টাঙ্গাইলে বেশির ভাগ এলাকা জুড়ে বসাক শ্রেণীর বসবাস ছিলো। তারা বসাক সমিতির মাধ্যমে অনভিজ্ঞ তাঁতিদেরকে প্রশিক্ষণ দান ও কাপড়ের মান নিয়ন্ত্রন করতেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগ ও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর অনেক বসাক তাঁতি ভারত চলে যান। এ সময় বসাক ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁত শিল্পের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। তারা বসাক তাঁতিদের মতোই দক্ষ হয়ে উঠেন।

টাঙ্গাইল জেলার ১১টি উপজেলা আর ১টি থানার মধ্যে টাঙ্গাইল সদর, কালিহাতী, নাগরপুর, সখীপুর উপজেলা হচ্ছে তাঁতবহুল এলাকা। তাছাড়া ভূঞাপুর উপজেলায়ও তাঁত শিল্প রয়েছে। সদর উপজেলার তাঁতবহুল গ্রামগুলো বাজিতপুর, সুরুজ, বার্থা, বামনকুশিয়া, ঘারিন্দা, গোসাইজোয়াইর, তারটিয়া, চন্ডি, নলুয়া, দেওজান, এনায়েতপুর, বেলতা, গড়াসিন, সন্তোষ, নলসুন্দা, কাগমারী প্রভৃতি প্রধান। কালিহাতী উপজেলার বল্লা, রামপুর, বাংরা, সহদেবপুর, ভূক্তা, আকুয়া, ছাতিহাটি, আইসরা, রতনগঞ্জ কোবডোরা প্রভৃতি প্রধান। দেলদুয়ার উপজেলা পাথরাইল, নলসোধা, চন্ডি, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি তাঁতপ্রধান অঞ্চল। এছাড়া গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলার কিছু কিছু গ্রামে তাঁত শিল্প আছে।

বুনন পদ্ধতি :

টাঙ্গাইলের তাঁতের সংখ্যা লক্ষাধিক। এই লক্ষাধিক তাঁতের সবগুলোতে শুধু টাঙ্গাইলের শাড়ি তৈরী হয় না। টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী শাড়ি তৈরি হয় এ রকম তাঁতের সংখ্যা টাঙ্গাইলে ২০ হাজারেরও কম। এই ঐতিহ্যবাহী শাড়ি তৈরি হয় প্রধানত বাজিতপুর, পাথরাইল, নলসুন্দা, চন্ডি, বিষ্ণপুর ও বিন্নাফৈর গ্রামে। এসব গ্রামে দিন রাত মাকুর মনোমুদ্ধকর খটখট শব্দ শোনা যায়। মাকুর খটখটির পাশাপাশি তাঁতিদের ব্যতিব্যস্ত নিরন্তর হাতে নিপুর শাড়ি বোনার দৃশ্যও সত্যিই মনোমুগ্ধকর। টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি খুব নিষ্ঠা, গভীর মনোসংযোগ এবং অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও সুদৃশ্য ভাবে তৈরি করতে হয়। পুরুষেরা তাঁত বোনে এবং বাড়ির মহিলারা চরকাকাটা, রঙকরা ও জরির কাজে সহযোগিতা করে। তাঁতিরা মনের রঙ মিশিয়ে শাড়ির জমিনে শিল্প সম্মতভাবে নানা ডিজাইন করে বা নকশা আঁকে এবং ফুল তোলে।

টাঙ্গাইলের শাড়ি বুনোনের মূল কাজ একেবারেই আলাদা। অনেক পুরোনো একটা ঐতিহ্যের ধারায় চলে একাজ। সেই জ্ঞান ও নিষ্ঠা ছাড়া আসল টাঙ্গাইলের শাড়ি তৈরি করা যায় না। আসল টাঙ্গাইলের শাড়ি তৈরির জন্য এর তাঁতী বা কারিগরদের শিল্পী হয়ে উঠতে হয়। টাঙ্গাইলে সেই শিল্পী তাঁতি আছে বলেই টাঙ্গাইলের তাঁত শিল্প ও তাঁতের শাড়ির এতো সুখ্যাতি।

শাড়ির বিভিন্ন নাম ও মান, হাতের কাজ, শাড়ির জমিনের রঙভেদে দাম ও ভিন্ন রকম-সর্বনিম্ন দু'শত টাকা থেকে শুরু করে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি হয়ে থাকে। এর মধ্যে জামদানি বা সফ্‌ট সিল্কের দাম সবচেয়ে বেশি। জামদানি শাড়ি তৈরি করা হয় আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ভাবে। এ শাড়ি তৈরি করার জন্য তাঁতিরা ১০০ কাউন্টের জাপানি সুতা ব্যবহার করে থাকেন। এ ছাড়া অন্যান্য শাড়ি তৈরি করতেও ১০০ কাউন্টের সূতা ব্যবহার করা হয়। মাঝে মাঝে নারায়নগঞ্জের সংযোগ শিল্পে প্রস্তুতকৃত ৮০, ৮২ ও ৮৪ কাউন্টের সূতাও ব্যবহার করে থাকে।

টাঙ্গাইল শাড়ি মানেই ভিন্ন সূতায়, আলাদা তাঁতে তৈরি আলাদা বৈশিষ্ট্যের শাড়ি। এর নকশা, বুনন, ও রংয়ের ক্ষেত্রে রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্রতা। অন্যান্য শাড়ি ১০ হাত থেকে সর্বোচ্চ ১১ হাত মাপে তৈরি হয়ে থাকে, আর টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি তৈরি হয় ১২ হাত মাপে। এ শাড়ি নরম মোলায়েম এবং পরতে আরাম ও অনেক টেকসই।

Dhaka University Institutional Repository

শাড়ির প্রকারভেদ ও অন্যান্য বস্ত্রঃ

টাঙ্গাইলের শাড়ির বৈশিষ্ট্য হলো- পাড় বা কিনারের কারুকাজ। টাঙ্গাইলের শাড়ি বোনার তাঁত দু'ধরনেরঃ (১) চিত্তরঞ্জন (মিহি) তাঁত, (২) পিটলুম (খটখটি) তাঁত। এ দু'ধরনের তাঁতেই তৈরি করা হয় নানা রং ও ডিজাইনের নানা নামের শাড়ি। যেমন- জামদানী বা সফ্‌ট সিল্ক, হাফ সিল্ক, টাঙ্গাইল বি.টি, বালুচরি, জরিপাড়, হাজারবুটি, সূতিপাড়, কটকি, স্বর্ণচুড়, ইককাত, আনারকলি, দেবদাস, কুমকুম, সানন্দা, নীলাম্বরী, ময়ুরকণ্ঠী এবং সাধারণ মানের শাড়ি।

টাঙ্গাইলের বাজিতপুর, নলসুন্দা, সন্তোষ ও কাগমারী গ্রামে ধূতি ও লুঙ্গি প্রস্তুত হয়। কালিহাতীর বল্লা রতন গঞ্জ ও কোবডোহরা গ্রামে লুঙ্গি, গামছা ও ধূতি। কোকডোহরার ধুতি মিহি ও মোলায়েম। রতন গঞ্জ গায়ের চাদও, বিছানার চাদর ও আলোয়ান তৈরি হয় । বৈন্নাফৈর গ্রামে উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড় প্রস্তুত হয়। টাঙ্গাইলের রেশমী সূতী ও মিশ্রনের সূতোর শাড়ি ,লুঙ্গি প্রস্তুর হয়ে থাকে। তবে গামছা ও মশারী তৈরিতে যুগী বা দেবনাথ সম্প্রদায় আজো একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখতে পেরেছে।

টাঙ্গাঈলের শাড়ীর অতীত ও বর্তমানঃ

দেশ ভাগের পূর্বে কলকাতায় টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ির বাজার বসতো। টাঙ্গাইলের বিভিন্ন অঞ্চলের তাঁতিরা চারাবাড়ি ঘাট, পোড়াবাড়ি ঘাট, নলছিয়া ঘাট ও সুবর্ণখালী বন্দর থেকে স্টিমার লঞ্চ ও জাহাজে চড়ে কলকাতায় যেতেন। কলকাতা তথা পুরোপশ্চিম বঙ্গের শাড়ি ব্যবসায়ীরা কিনে নিত এসব সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের তাঁতের শাড়ি। দেশ ভাগের পর হতে টাঙ্গাইল তাঁতের প্রধান হাট হচ্ছে টাঙ্গাইলের বাজিতপুর। বাজিতপুর হাট টাঙ্গাইল মূল শহর থেকে দেড় কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। সপ্তাহের প্রতি সোম ও শুক্রবার হাট বসে। ভোর রাত হতে এখানে হাট শুরু হয়। সকাল ৯-১০টা পর্যন্ত হাটের ব্যতিব্যস্ততা এবং বেচাকেনা চলে। এ হাটের বেশির ভাগ ক্রেতারাই মহাজন শ্রেণীর। মহাজনরা এই হাট থেকে পাইকারি দরে কাপড় কিনে নিয়ে সারা দেশের বিভিন্ন বড় বড় মার্কেটে, শপিং মলে, ফ্যাশন হাউস গুলোতে সাপ্লাই দেন। মহাজনদের পাশাপাশি বিভিন্ন জেলার উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও আমলাদের স্ত্রী-কন্যারাও এ হাট থেকে তাদের পছন্দের শাড়ী কিনে নিয়ে যান। তবে ঢাকা ও বিভিন্ন বিভাগীয় শহর ভিত্তিক ফ্যাশন হাউস গুলোই টাঙ্গাইল শাড়ির বড় ক্রেতা ও সরবরাহকারী।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, যেমন- ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশ, জাপান, সৌদিআরব, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসহ পশ্চিম বাংলায় টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ির ব্যাপক কদর থাকলেও এ শাড়ি আন্তর্জাতিক বাজারে মার খাচ্ছে নানা কারণে- (১) দামের জন্য (কাঁচামালের সরবরাহের সহজলভ্যতা না থাকা, কাঁচামালসহ তাঁত মেশিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে টাঙ্গাইল শাড়ি উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে যায়)। (২) ভারতীয় শাড়ির আগ্রাসন (সেখানে কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও সূতার স্বল্প মূল্যের জন্য টাঙ্গাইল তাঁতের শাড়ির চেয়ে ভারতের শাড়ি দামে সস্তা হয়ে থাকে বিধায় অনেক ক্রেতাই সে দিকে ঝুকে পড়েছে)। (৩) টাঙ্গাইল শাড়ি বিপণন ব্যবস্থাটি মহাজনি চক্রের হাতে বন্দি। ফলে বিপণন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের পর টাঙ্গাইল ছেড়ে ভারতে চলে যাওয়া বসাক তাঁতিরা সেখানে টাঙ্গাইল শাড়ির কারিকুলামে যে শাড়ি তৈরি করছে তা টাঙ্গাইল শাড়ির নাম ভাঙিয়ে বিশ্ববাজার দখলের চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে এতো প্রতিকূলতার পরেও টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি তার হারানো বাজার পুনরুদ্ধারে সক্ষম হচ্ছে। এছাড়া সময় ও চাহিদার সাথে তাল রেখে দিন দিন পাল্টে যাচ্ছে টাঙ্গাইল শাড়ির আকর্ষণ ও নক্‌শার ব্যঞ্জনা।

Dhaka University Institutional Repository

বেনারশি শাড়ি :

বেনারশি শাড়ি বাংলাদেশের উৎপাদিত একটি অতি পরিচিত বস্ত্র। ষোড়শ দশকে মুঘল শাসনামলে বেনারশি শাড়ি শিল্পের উদ্ভব হয়। ১৯৫০ সালে ভারত থেকে কিছু উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী ঢাকার মিরপুর ও মোহাম্মদপুরে এ শিল্প গড়ে তোলে। এক সময়ে এ শিল্পের সঙ্গে লাখেরও বেশি কর্মী নিয়োজিত ছিল। কিন্তু সরকারি সহযোগিতা, সঠিক পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার অভাবে বর্তমানে এ শিল্পে মাত্র ২৫ হাজার কর্মী কাজ করছেন।

ঐতিহ্যবাহি এ শিল্পের সঙ্গে প্রচুর নারী উদ্যোক্তা জড়িয়ে আছেন। এ শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা না করলে মসলিনের মতো ঐতিহ্যবাহী এ শিল্পটিও বাংলাদেশ থেকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কাচামালের উচ্চ মূল্য, ডিজাইনে বৈচিত্র না থাকা, বিদেশে রপ্তানির সুযোগ ও প্রচার না থাকায় ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বেনারশি শাড়ির অতীত ঐতিহ্য। যথাযথ প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়তা না থাকায় এ শিল্পের শ্রমিকরা শাড়ি ছাড়া অন্যকিছু তৈরি করতে পারে না। ফলে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা থাকা সত্বেও স্কার্ফ, ওয়ালম্যাট, স্টোলসহ অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য তৈরি হচ্ছে না। শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ও বিনিয়োগ করতে পারলে এ শিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের জীবনমান উন্নয়নসহ জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। । উজ্জ্বল সম্ভাবনা এবং বাজারে চাহিদা থাকা সত্বেও বাংলাদেশের ঐতিহ্যময় বেনারশি শাড়ি শিল্প এখন ধ্বংসের মুখে। এ শিল্পে ব্যবহৃত কাচামালের উপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার, সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মশালাসহ যথাযথ সহায়তার ব্যবস্থা করা সরকারের উচিত। এছাড়া বেনারশি শিল্পে ব্যবহৃত ডিজাইনের উপর কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত। তবে ইতোমধ্যে বাংলাদেশে রংপুর জেলার গঙ্গাচড়ায় বেনারশি পল্লীর উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিসিক)-এর উদ্যোগে গঙ্গাচড়া উপজেলাসহ বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। বিপণন ব্যবস্থা ও বুনন শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বেনারশি পল্লী উন্নয়ন রংপুর প্রকল্পে সরকার বরাদ্দ দিয়েছে। বিলুপ্ত প্রায় গঙ্গাচড়ার হাবু বেনারশি পল্লীর উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বুনন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ, উৎপাদিত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ও প্রান্তিক তাঁতিদের ঘর নির্মাণ এবং বেনারশি শাড়ির বিক্রয় ও প্রদর্শন কেন্দ্র স্থাপন।

কুমিল্লার খাদি কাপড়:

খাদি কাপড় আবহমান বাংলার ঐতিহ্য বলা চলে। এই খাদি বা খদ্দর কাপড় সরাসরি হাতে তৈরি হয়। কার্পাসতুলা থেকে সুতা বোনা হয় এবং সেই সুতা থেকে হাতে চালানো চর্কা বা তাঁতে বোনা হয় কাপড়। খাদি বলতে আমরা রাফ অ্যান্ড টাফ মোটা সুতি কাপড়কে বুঝি। দেশীয় তুলা থেকে হাতে কাটা সুতা দিয়ে যে কাপড় তৈরি হয় তাকে খাদি বলা হয়। একই প্রক্রিয়ায় চরকায় সুতা কেটে মসলিন কাপড় তৈরি হতো। মসলিনের বিলুপ্তির পর খাদির ইতিহাস।

খাদি যেমন বাংলাদেশের নিজস্ব বস্ত্রশিল্প তেমনি এর সঙ্গে মিশে রয়েছে একটি ঐতিহ্য। খাদির বিকাশের সাথে জড়িয়ে স্বদেশী আন্দোলনের কথা। ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত হয়ে পরাধীন ভারতীয়দের অনেকে স্বদেশি খাদির কাপড়ে তৈরি পোশাক পরতে শুরু করেন। গান্ধীজী আন্দোলনের সমর্থনে চরকায় সুতা কেটে কাপড় তৈরি এবং ব্যবহার করা একটা প্রধান কাজ ছিল। মহাত্মা গান্ধী একটি তৈরি শিল্পকে বিশেষ মর্যাদায় দাঁড় করিয়েছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি প্রথম স্বদেশী পণ্যের মাধ্যমে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য খাদি কাপড়ের গুরুত্ব সম্পর্কে তুলে ধরেন। মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে স্বদেশী পণ্যকে আগে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেন। এর শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ হিসেবে খাদি কাপড়ের গুরত্ব তুলে ধরেন। ফলে মহাত্মা গান্ধী খাদি কাপড়ের একজন প্রতিষ্ঠাতা। ইতিহাসের বার্তা বাহক এই খাদি যেন বহুকাল ধরে স্বাধিকারের চেতনাকে জাগ্রত রেখেছে। এই ঐতিহ্য স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত বরং এই খাদি কাপড় স্বদেশী আন্দোলনের বিজিত প্রতীক। তাছাড়া ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের সময় দেশি পোশাকের প্রতি টান বেড়ে যায়। তখন এ দেশের মানুষ খাদির কাপড়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সেই থেকে খাদির কাপড়ের কদর দিন দিন বেড়েই চলছে।

বাংলাদেশের দেশের ফেনী, কুমিল্লা, চট্টগ্রামের যোগী সম্প্রদায় এই পদ্ধতিতে কাপড় তৈরি করে নিজেদের প্রয়োজন মেটাত। রাঙামাটি, বান্দরবান, ফেনী, জোয়ারগঞ্জ এবং কুমিল্লার নানা জায়গায় উৎপাদিত হতো কার্পাস তুলা। এগুলো দিয়েই তৈরি হতো ভালো মানের সুতা। তবে কুমিল্লা খাদি কাপড়ের সর্বাধিক বিখ্যাত। মোঘল সময় থেকে এর ব্যবহার চলে আসছে। সতেরো শ' শতাব্দীর দিকে ত্রিপুরা রাজ্যে খাদি কাপড় বুননের কাজ বেশ প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে ময়নামতি, চান্দিনা, নবীনগর, গৌড়িপুরসহ বেশ কিছু জায়গায় খাদি বুননের কাজ চলত। রঙিন খাদি কাপড়ের লুঙ্গি, শাড়ি, গামছা সে সময় ময়নামতিতে তৈরি করা হতো এবং দুই থেকে পাঁচ টাকার মধ্যে এগুলো পাওয়া যেত সে সময়ে। তবে ধুতি, বিছানার চাদরের জন্য বিখ্যাত ছিল সরাইল, নবীনগর, ময়নামতি, গৌড়িপুর, চান্দিনা এবং মুরাদনগর খাদি কাপড় বুননের উল্লেখযোগ্য চারটি অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল।

উপমহাদেশের খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সমকালীন মুসলিম ও হিন্দু নেতৃবৃন্দ দেশের বিভিন্ন সমভিব্যাহারে ঘুরে বেড়ান এবং বড় বড় জনসভায় বক্তৃতা করেন, খেলাফতের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। উপমহাদেশে আজাদী অর্জনের লক্ষ্যে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার আহবান জানান। তখন কংগ্রেস, খেলাফত, স্বরাজ আর গান্ধী, মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী এ শব্দগুলো সমার্থক। ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লীতে হিন্দু-মুসলিমের এর এক যুক্ত সভায় গান্ধী ঘোষণা করেন যে, হিন্দুরাও খেলাফত আন্দোলনে সহযোগিতা করবে। ১৯২১ সালের ১৮ নভেম্বর লাহোরে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে জমীয়তে ওলামা-ই হিন্দের ৩য় অধিবেশনের বিলেতী বস্ত্র বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত হয়।[৬৫]

১৯২১-এর দিকে মহাত্মা গান্ধী কুমিল্লার চান্দিনা অঞ্চলে আসেন এবং বিদেশী কাপড় ছেড়ে দেশী কাপড় ব্যবহারে এবং তা সংরক্ষণে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি সেই সঙ্গে চর্কার ব্যবহার সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ দেন।[৬৬] ১৯৪৭ বঙ্গভঙ্গের কারণে কিছুটা বাধা আসলেও পরবর্তীতে একদল মানুষ এ বাধা অতিক্রম করে স্বদেশী ঐতিহ্যকে পুনরায় উজ্জীবিত করে।

অতীতে খাদি কাপড় সাদা বা মেটে রঙের কাপড় ছিল। এক সময় খাদি শুধুমাত্র পাঞ্জাবির ফ্যাশনেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর খাদির চাদরের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রঙের বৈচিত্র্যতা এসেছে। তবে বর্তমানে শাড়ি, সেলোয়ার-কামিজ, ফতুয়াসহ আরও অনেক পোশাকেই খাদি ব্যবহারের বৈচিত্র লক্ষণীয়। অতীতে কুমিল্লায় হাতে চালিত যন্ত্রের মাধ্যমে সুতা বের করা হতো। তা থেকে বোনা হতো খাদির কাপড়। পরবর্তী সময়ে খাদির সুতা তৈরিতে মেশিনের ব্যবহার শুরু হয়।

---

৬৫. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বাংলায় খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ২৩

৬৬. কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, কুমিল্লা জেলা পরিষদ, ১৯৮৪, পৃ. ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

পাঞ্জাবি ও পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে খাদির ফতুয়াও ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্রিক মর্যাদা পেয়েছে। এছাড়া মেয়েদের জন্য খাদির থ্রি-পিস, চাদর ও থানকাপড়ের রয়েছে।[৬৭]

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ডিজাইনার এবং মডেল বিবি রাসেলের খাদি ফ্যাশনের পেছনে অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৯৪-এ তিনি দেশীয় ঐতিহ্য জামদানী, মসলিন, চেক এবং খাদি কাপড়ের ব্যবহারের উপর জোর দেন এবং দেশে ও বিদেশে অনেক ফ্যাশন শো'র আয়োজন করেন, যেখানে শুধুই স্থান পায় এই সব দেশীয় কাপড়ে তৈরি পোশাক। এভাবেই খাদি হয়ে ওঠে ফ্যাশনজগতের এক অন্যতম প্রতীক। বিগত পনেরো বছরে এই ঐতিহ্যকে খুব চমৎকারভাবে ফ্যাশনের প্রতীকী হিসেবে তুলে ধরেছে এদেশের ফ্যাশন হাউসগুলো। আড়ং, কেক্রাফট, প্রবর্তনা, নিপুণ, অন্যমেলাসহ আরও অনেক ফ্যাশন হাউস খাদি কাপড়ের তৈরি পোশাক উপস্থাপন করছে, পোশাকে নিয়ে আসছে নানা বৈচিত্র্যের। খাদি এখন বাঙালীর ফ্যাশন প্রতীক হিসেবে স্থান পেয়েছে। প্রায় প্রতিবছরেই এদেশে খাদি উৎসবের আয়োজন করে থাকে এদেশের বিভিন্ন ফ্যাশন হাউসগুলো। সম্প্রতি ফ্যাশন হাউস আয়োজন করেছে তেমনি একটি উৎসব। এই আদি ঐতিহ্য যেন কখনই না হারায় তাই নতুনভাবে খাদি'র উপস্থাপনই এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য।[৬৮]

কুমারখালীর কাপড়ঃ

কুষ্টিয়া জেলার 'কুমারখালী' তাঁত শিল্পের জন্য দেশব্যাপী সুপরিচিত। একসময় এ অঞ্চলে প্রচুর পাট উৎপাদন হতো এবং উৎপাদিত পাটেরও সুখ্যাতি ছিল। মূলত এ পাট বা কষ্টা হতে উদ্ভব কুষ্টিয়া নামের। কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও রাজবাড়ী জেলার মধ্যে 'কুমারখালী' ঐতিহ্যবাহী একটি তাঁতসমৃদ্ধ শিল্প এলাকা। এ দেশে তাঁত শিল্পের গোড়াপত্তন এবং এর বিকাশের সঙ্গে কুমারখালীর নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কুমারখালীতে অবস্থিত। কুমারখালী উপজেলার সেরকান্দি, তেবাড়ীয়া, পান্টি, সদকি, যদুবয়রা, নাতুড়িয়া, গোপগ্রাম ও সাতপাখিবিহারা এলাকাগুলোই মূলত তাঁত প্রধান অঞ্চল। বর্তমানে বহুবিধ সমস্যা আর দেশী-বিদেশী চক্রান্তের শিকার হয়ে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পটি অনিবার্য ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। যার ফলে এ অঞ্চলের কয়েক লাখ তাঁতি পরিবার বর্তমানে চরম দুর্দিনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। আদি তাঁতিরা আজ এ পেশায় টিকতে পারছে না। অথচ এদের মধ্যে দক্ষতা রয়েছে, জনবল রয়েছে এবং কাজ করার আগ্রহ রয়েছে। শুধুমাত্র বিদ্যমান সমস্যাগুলোর করণে তারা এ পেশা থেকে ছিটকে পড়ছে। বেসিক সেন্টারের ১৯৯১ সালের জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী এ সেন্টারের আওতাভুক্ত চার জেলার ১৪ টি উপজেলা এলাকায় পিটলুম ও চিত্তরঞ্জন মিলে সর্বমোট হস্তচালিত সচল তাঁতের সংখ্যা ছিল ২৯ হাজার ৭৩টি। একযুগ পর ২০০৩ সালে বেসিক সেন্টার পরিচালিত সর্বশেষ জরিপে দেখা যায়, ওই চার জেলায় তাঁতের সংখ্যা আর বৃদ্ধি হয়নি। বরং হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে মোট ২৭ হাজার ৪শ' ৫৮টি। কুমারখালীতে শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, বেডশীট ও বেডকভার ইত্যাদি তৈরি হয়। তাছাড়া তাওয়াল, তোয়ালে, ডাক্তারী ব্যান্ডেজ, সোফার কাপড় আর শীতের চাদর সারাদেশের সিংহভাগ চহিদা পূরণ করে বিদেশেও রফতানি হয়।

---

৬৭. গাজীউল হক, শনিবারের বিশেষ প্রতিবেদন, দৈনিক প্রথম আলো, কুমিল্লা, ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল কুমিল্লার খাদি, তারিখ: ১৯-০৯-২০০৯

৬৮. আফলাহ্ হোসেন রাইতা, আদি ঐতিহ্য খাদি, দৈনিক জনকণ্ঠ,শুক্রবার, ২৮ জানুয়ারী ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজারের শাল:

রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজারের শাল উপজাতিরা প্রস্তুত করে থাকে। এটিও হস্তচালিত তাঁতের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়। এ শালের জন্য তারা নিজেরাই সুতা প্রস্তুত ও সুতা রঙ করে। সুতি সুতার সাথে এরা রেয়ন সুতা ব্যবহার করে। এ রেয়ন সুতাগুলো বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। সাধারণত জমিনে যে রঙের সুতা ব্যবহার করে তার বিপরীত রঙ নকশায় ব্যবহার করে। এ শালে প্রকৃতির নকশার চেয়ে বিভিন্ন আকারের সমন্বয়ে নকশা প্রস্তুত বেশি দেখা যায়। এ শালে জ্যামিতিক নকশার প্রচলন বেশি দেখা যায়। এ শালগুলো রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজারের উপজাতি মহিলারা প্রস্তুত করে। একসময় তারা শুধু নিজস্ব ব্যবহারের জন্য এ শাল প্রস্তুত করত। কিন্তু বর্তমানে এর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় তারা বাজারজাতকরণের মতো শাল প্রস্তুত করে। এর ফলে শীত মৌসুমে চট্রগ্রাম শহরের দোকানে এবং ঢাকা শহরের সৌখিন দোকানগুলোতে রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজারের শাল প্রচুর দেখা যায়।

এ শাল প্রস্তুত করার জন্য যে তাঁত ব্যবহার করা হয় তা অতি কম ব্যয়বহুল। মাটির উপর দু'পাশে বাঁশের খুঁটি পুঁতে বীমের সাহায্যে টানা সুতা স্থাপন করে পড়েন সুতা ব্যবহার করে তারা শাল বোনে। এভাবে বোনার জন্য বেশি লোকের প্রয়োজন হয় না। তবে রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজারে শুধু শালই বোনা হয় না। এরা ইদানিং বিছানার চাদর, নানা প্রকার পোশাক, টেবিলর কাপড় প্রস্তুত করে থাকে। অধিকাংশ বুনন সাদাসিধে। সাদাসিধে বুননের মধ্যে সাটিন বুননের সাহায্যে নকশা প্রস্তুত করে। শালের জন্য তারা সব ধরনের রঙ ব্যবহার করে। শালের জমীনে হালকা রঙ হলে নকাশায় গাঢ় রঙ ব্যবহার করে। তবে এদের শাল লাল ও সুতার নকশার সীমাবদ্ধতা নেই। এরা শালগুলো এমনভাবে প্রস্তুত করে যে শহরাঞ্চলের লোকেরাও এ শাল ব্যবহার করতে আগ্রহী হয়। রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজারের শাল বর্তমান বাজারে ফ্যাশন হিসেবে বিক্রি হয়। অনেকে এ শাল দিয়ে কোট ও জ্যাকেট প্রস্তুত করে।

উপজাতীয় পোশাক:

বাংলাদেশের আঞ্চলিক বস্ত্র হিসেবে উপজাতীয়দের মধ্যে কিছু কিছু বস্ত্র ও পোশাক কয়েকটি অঞ্চলে দেখা যায়। সিলেটের মণিপুরী পোশাক, পার্বত্য চট্রগ্রামের উপজাতীদের থামি ও ময়মনসিংহের উপজাতীদের পোশাক। এসব উপজাতিরা তাদের পোশাক ও বস্ত্র নিজেরাই সুতা প্রস্তুত, রঙ করা এবং বুনে থাকে। এরা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পোশাক তৈরি না করে প্রয়োজনে বস্ত্র বোনা ও পোশাক প্রস্তুত করে। এদের এসব পোশাক নানা প্রকার বুনন, রঙের বিন্যাস, পোশাকের গঠন নিজেরাই দিয়ে থাকে। তাদের পোশাক তারা নিজস্ব তাঁতে বুনে থাকে। এ তাঁতের গঠন ও প্রক্রিয়াও ভিন্ন ধরনের হয়। এদের পোশাকে রেখার গুরুত্ব বেশি। তবে প্রকৃতি থেকে এবং স্থাপত্য শিল্প থেকেও তারা কিছু কিছু নকশা গ্রহণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত উপজাতিরা চরকা ও তাঁতের সাহায্যে অত্যন্ত চাকচিক্যপূর্ণ বস্ত্র তৈরি করে। এর মধ্যে চাদর, গামছা, পরিধেয় বস্ত্র, কার্পেট, থলে ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উপজাতীয় বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল সাধারণত জুম ক্ষেতে উৎপাদিত তুলা ও প্রাকৃতিক উপকরণ থেকে তৈরি হলেও বর্তমানে বাজার থেকে কেনা মিলের সুতা ও রং-এর ব্যবহার ব্যাপক। পুরুষদের পোশাক-পরিচ্ছদে নকশার বৈচিত্র্য কিছুটা কম। মহিলাদের পোশাক-পরিচ্ছদে থাকে বর্ণাঢ্য রং ও নকশার সমাবেশ।[৬৯]

---

৬৯. বাংলাপিডিয়া, ৫ম খ. পৃ. ৪৬৪

Dhaka University Institutional Repository

চাকমাদের পোশাক:

চাকমা মেয়েদের পোশাক 'পিনন' অনেকটা লুঙ্গির মতো। এতে কোন সেলাই থাকে না, দৈর্ঘ্যে ৪.৫ হাত এবং প্রস্থে ২.৫ হাত। পিননের একদিকে নকশাসমৃদ্ধ আঁচল থাকে যাকে চাবুকি বলা হয়। চাকমাদের পিননের জমিন সাধারণত কালো; উপরে ও নিচে চওড়া রঙিন পাড় থাকে। আঁচলে বিভিন্ন নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। পিনন পরিধানের সময় চাবুকি বাঁ দিকে থাকে। চাকমা রমণীদের উপরের অংশের পোশাক খাদি বা বক্ষবন্ধনী দৈর্ঘ্যে ৩.৫ হাত এবং প্রস্থে ২.৫ হাত। খাদি দুই ধরনের: রাঙাখাদি এবং চিবিকটানা খাদি। রাঙাখাদিতে বিভিন্ন নকশা তোলা হয়। এ ধরনের খাদি যুবতীরাই পরিধান করে। আটপৌরে ব্যবহারের চিবিকটানা খাদিতে সাধারণত কোন নকশা হয় না। বর্তমানে চাকমা রমণীরা পিনন এবং খাদির সঙ্গে ব্লাউজের মতো জামা পরিধান করে। অনেক চাকমা মহিলা মাথায় খবং ব্যবহার করে। চাকমা পুরুষদের পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে তেমন বৈচিত্র্য নেই। এরা জামা (জুন্নাছিলুম), খবং এবং ধুতি জাতীয় কাপড় পরিধান করে। চাকমারা আলাম নামে একটি কাপড়ে তাদের ঐতিহ্যবাহী নকশা সংরক্ষিত করে রাখে। আলামের অনুকরণে পরবর্তী বংশধররা তাদের পোশাকে নকশা করে।[৭০]

চাক মহিলারা পিননের মতো নাফিই নামের পোশাক পরিধান করে। এই পোশাকের জমিন কালো এবং উপরে ও নিচে সাদা রঙের বর্ডার থাকে। মহিলারা ব্লাউজের মতো বৈদই পুজু ব্যবহার করে। এ ধরনের জামা সাদা ও কালো সুতায় তৈরি। চাক মহিলারা মাথায় বাংকেউবাং নামে এক ধরনের কাপড় জড়িয়ে রাখে। চাক পুরুষদের পোশাক লুঙ্গি ও জামা। এরা মাথায় খবং ব্যবহার করে।

মারমাদের পোশাক:

মারমা মেয়েদের প্রধান পোশাক থামি। থামি লুঙ্গির মতো, এতে কোন সেলাই থাকে না। নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী নকশায় থামির কারুকার্যে রং ও নকশার বৈচিত্র্য থাকে। মেয়েরা থামির সঙ্গে ফুলহাতা অথবা হাফহাতা ব্লাউজের মতো জামা (আঙ্গি) পরে। সাদা কাপড়ের পাগড়ি (খবং) পরতেও এরা পছন্দ করে। পুরুষরা মোটা কাপড়ের লুঙ্গি এবং কয়েকটি পকেটযুক্ত কলারবিহীন জামা পরে। বয়স্করা মাথায় সাদা রঙের পাগড়ি পরিধান করে।[৭১]

ত্রিপুরাদের পোশাক:

ত্রিপুরা রমণীদের বর্তমান পোশাক সেলাইবিহীন লুঙ্গির মতো রিনাই, দৈর্ঘ্যে ৪.৫ হাত এবং প্রস্থে ২.৫। রিনাই-এ চাকমাদের পিননের মতো আঁচল (চাবুকি) থাকে না তবে উপরে ও নিচে চওড়া পাড় থাকে। রিনাই-এর জমিন সাধারণত লাল এবং পাড় কালো রঙের হয়। রিসা ত্রিপুরা রমণীদের বক্ষবন্ধনী। এতে কোন সেলাই থাকে না, দৈর্ঘ্যে ৩ হাত এবং প্রস্থে ১ হাত বা ০.৫ হাত। রিসা নানান রঙের জমিনের উপর পাখি, প্রজাপতি ও ফুল, লতাপাতার বর্ডার নকশায় সমৃদ্ধ। আঁচলের দুই প্রান্তে অনেক সময় পুঁতির ঝালর যুক্ত থাকে। বয়স্ক ত্রিপুরা মহিলারা মাথায় সাদা কাপড় বেঁধে রাখে। পুরুষরা ধুতি ছাড়াও নিজস্ব তাঁতে তৈরি গামছা পরিধান করে এবং মাথায় পাগড়ির মতো সাদা কাপড় বেঁধে রাখে। আদিতে ত্রিপুরা পুরুষরা পাগড়ি পরত এবং হাঁটুর উপর পর্যন্ত এক টুকরা কাপড় পরত, শীতের সময় জ্যাকেট ধরনের পোশাক পরত।[৭২]

---

৭০. বাংলাপিডিয়া, ৫ম খ. পৃ. ৪৬৪
৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪
৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬০

Dhaka University Institutional Repository

তঞ্চঙ্গ্যাদের পোশাক:

তঞ্চঙ্গ্যা মহিলারা অদ্যাবধি পিনন, খাদি, জুন্নাছিলুম, ফা-ধরি এবং খবং এই পাঁচ ধরনের পোশাক পরিধান করে আসছে। লুঙ্গির মতো এবং আঁচলবিহীন (চাবুকিবিহীন) পিননে কোন সেলাই থাকে না। এর জমিন লাল ডোরাকাটা নকশায় সমৃদ্ধ। পিননের উপরে ও নিচে থাকে কালো চওড়া পাড়। চাকমাদের পিননের চেয়ে তঞ্চঙ্গ্যাদের পিননের প্রস্থ কিছুটা ছোট। মহিলাদের বক্ষবন্ধনী খাদি, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে চাকমাদের খাদির অনুরূপ। এদের খাদি দুই ধরনের ফুলখাদি এবং রাঙাখাদি। তঞ্চঙ্গ্যা মহিলারা পিনন ও খাদি ছাড়া ঊর্ধ্বাঙ্গে জুন্নাছিলুম ও কোমরবন্ধনী হিসেবে ফা-ধরি ব্যবহার করে। জুন্নাছিলুম গলায় ও কাঁধে সূক্ষ্ম কারুকাজ সমৃদ্ধ। চওড়া ধরনের বেল্ট আকৃতির ফা-ধরির দুই প্রান্ত হালকা রঙের সুতার কারুকাজে সমৃদ্ধ। সাধারণত পিননকে শক্ত করে ধরে রাখার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

তঞ্চঙ্গ্যা মহিলারা মাথায় পাগড়ির মতো খবং ব্যবহার করে। সাদা খবং-এর দুই প্রান্ত বিভিন্ন রঙের সূক্ষ্ম কারুকাজসমৃদ্ধ, দৈর্ঘ্যে সাধারণত ৩.৫ হাত এবং প্রস্থে ০.৫ হাত। তঞ্চঙ্গ্যা পুরুষদের পোশাক-পরিচ্ছদে তেমন বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় না। এরা কারুকাজবিহীন জুন্নাছিলুম, গামছা এবং খবং পরিধান করে।[৭৩]

ম্রোদের পোশাক:

ম্রো মেয়েদের একমাত্র পোশাক ওয়ানক্লাই। প্রস্থে সাধারণত ৯ ইঞ্চি হয়ে থাকে। এই বস্ত্র ম্রো মেয়েরা কোমরে জড়িয়ে রাখে। কালো জমিনের একপাশে বিভিন্ন রঙের সুতা দিয়ে তাঁতে নকশা তোলা হয়। মেয়েদের কোমরের মাপ অনুযায়ী এর দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করা হয়। ম্রো মেয়েরা বক্ষবন্ধনী ব্যবহার করে না। তারা অনেক সময় বাজার থেকে কিনে ওয়ানচা নামের চাদর গায়ে জড়িয়ে রাখে। ম্রো পুরুষ নেঙটির মতো দং নামের বস্ত্র পরে। এতে কোন নকশা থাকে না। দং শুধু লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পুরুষরা মাথায় সাদা কাপড় জড়িয়ে রাখে। ম্রোরা কোমরতাঁতে তৈরি মোটা বস্ত্র তাপুং ব্যবহার করে। শিশুকে মায়ের কাঁধে ঝুলিয়ে রাখার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।[৭৪]

লুসেইদের পোশাক:

লুসেই মহিলাদের পোশাক রিনাই, যা তারা লুঙ্গির মতো করে পরিধান করে। এর জমিনে সাধারণ সাদা কালো রঙের সুতার ডোরাকাটা নকশা তোলা হয়। ত্রিপুরা রমণীদের মতো লুসেই মহিলাদের বক্ষবন্ধনীও রিসা। এটি সাধারণত দশ ইঞ্চি চওড়া হয় এবং এতে রঙিন সুতা দিয়ে নানা ধরনের নকশা তোলা হয়। লুসেই নারীপুরুষ উভয়ই জামার মতো পোশাক জুন্নাছিলুম ব্যবহার করে।[৭৫]

মুরংদের পোশাক:

মুরং মহিলাদের নিম্নাংশের পোশাক নয় থেকে এগার ইঞ্চি চওড়া ওয়াঙলাই। সংস্কারবশত মুরং মহিলাদের ওয়াঙলাই পরিধান করার সময় বামদিকের কোমরের কাছে চার থেকে ছয় আঙুল পরিমাণ জায়গা খালি রাখে। এটি কালো মোটা সুতার তৈরি। বুকে রিসার মতো বক্ষবন্ধনী জড়িয়ে রাখে। পুরুষরা নেঙটি ব্যবহার করে। অনেককে লুঙ্গি পরতেও দেখা যায়।[৭৬]

---

৭৩. বাংলাপিডিয়া, ৫ম খ. পৃ. ৪৬১-৪৬৬
৭৪. প্রাগুক্ত, ৫ম খ. পৃ. ৪৬৫
৭৫. প্রাগুক্ত, ৫ম খ. পৃ. ৪৬৫
৭৬. প্রাগুক্ত, ৫ম খ. পৃ. ৪৬৫

Dhaka University Institutional Repository

রাখাইনদের পোশাক:

রাখাইন পুরুষরা লুঙ্গি ও মহিলারা আঙ্গি পরিধান করে। এসব পোশাকে নকশা থাকে। অনেক রাখাইন মহিলা আমি ব্লাউজের মতো জামা হিসেবে ব্যবহার করে।[৭৭]

গারোদের পোশাক:

বাংলাদেশের গারোদের পোশাক-পরিচ্ছেদ বাঙালীদের অনুরূপ। পুরুষেরা লুঙ্গি, গেঞ্জী, পাজামা, পাঞ্জাবী, ফুলপ্যান্ট, শার্ট, ধুতি প্রভৃতি এবং মেয়েরা শাড়ী, ব্লাউজ, পেটিকোট প্রভৃতি ব্যবহার করে। যদিও গারোদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোশাক-পরিচ্ছেদ রয়েছে তথাপি দেশাচার হেতু সেসব পোশাক-পরিচ্ছেদ কেউ ব্যবহার করে না। কেবলমাত্র বিশেষ কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সময় মেয়েরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক ব্যবহার করে থাকে। অথচ গারোদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক বিশেষ করে মহিলাদের পোশাক কিন্তু বেশ মনোরম। গারোদের ভাষায় এ পোশাককে দকমান্দা বলা হয়। দকমান্দা দেখতে ছোটখাটো শাড়ীর মতোই। তবে একটু মোটা আকৃতির এবং বুনন বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা।[৭৮]

গারো মহিলাদের প্রাচীন পোশাক গেনা অনেকটা লুঙ্গি জাতীয়। সেলাইবিহীন গেনা কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত হয়ে থাকে। এটি বিভিন্ন রঙের সুতায় ডোরাকাটা নকশায় সমৃদ্ধ। গারোদের পোশাক দাকমুন্দা বা গাননা দককা গেনা জাতীয়, তবে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত বর্ধিত। দাকমুন্দা তাঁতে নকশা তোলা একখণ্ড কাপড় যা কোমর থেকে নিচ পর্যন্ত লুঙ্গির মতো প্যাঁচ দিয়ে পরতে হয়। বর্তমানে বিভিন্ন রঙে বিভিন্ন নকশায় দাকমুন্দা তৈরি হয়। দাকমুন্দাতে যে চোখ ফুটিয়ে তোলা হয় তার মধ্যে আছে ধর্মীয় বিশ্বাস। গারো মেয়েরা প্রয়োজনে হাতাওয়ালা গেঞ্জির মতো পোশাকও ব্যবহার করে। দাকমুন্দা ও ব্লাউজের সঙ্গে গারো মেয়েরা গামছা বা ওড়না ব্যবহার করে থাকে। বর্তমানে সমতল ভূমিতে বসবাসকারী শিক্ষিত মেয়েরা শাড়ি পরতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।[৭৯]

সাঁওতালদের পোশাক:

সাঁওতাল মহিলাদের ঐতিহ্যগত পোশাক পানচি ও পাড়হান। পানচি অনেকটা লুঙ্গির মতো। যা কোমর থেকে হাঁটুর অল্প নিচে ঝুলে থাকে। ওড়না জাতীয় কাপড় পাড়হান দ্বারা শরীর আবৃত করে রাখা হয়। কেউ কেউ মোটা শাড়িকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করে এক অংশে শরীর আবৃত করে, আরেক অংশ নিম্নাংশে ব্যবহার করে। বর্তমানে অনেক সাঁওতাল রমণী এক প্যাঁচে শাড়ি পরতে অভ্যস্ত। পুরুষ ও ছোট ছেলেরা ধুতি ও নেঙটি ব্যবহার করে এবং গায়ে গেঞ্জি পরিধান করে।[৮০]

মণিপুরীদের পোশাক:

সিলেটে বসবাসরত পাহাড়ী অঞ্চলে উপজাতিদের মধ্যে মণিপুরী একটি উপজাতি। এদের জীবনযাত্রা, সমাজ ও সংস্কৃতি সাধারণ অঞ্চল থেকে আলাদা। এ কারণে এদের পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। মণিপুরী বস্ত্র মণিপুরীদের দিয়ে প্রস্তুত পোশাক। এ পোশাকের জন্য তার নিজেরাই সুতা প্রস্তুত করে থাকে। তারা নিজস্ব তাঁতে বস্ত্র বুনে। এ তাঁতটি সম্পূর্ণ হস্তচালিত। তাঁতটিও তারা নিজেরাই প্রস্তুত করে। মণিপুরী মহিলাদের নিচের অংশের পোশাক ফানেক, যা লুঙ্গির

---

৭৭. বাংলাপিডিয়া, ৫ম খ. পৃ. ৪৬৫

৭৮. সুভাষ জেংচাম, বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায়, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ৪৮

৭৯. বাংলাপিডিয়া, ৫ম খ. পৃ. ৪৬৫

৮০. বাংলাপিডিয়া, ৫ম খ. পৃ. ৪৬৬

Dhaka University Institutional Repository

মতো প্যাঁচ দিয়ে পরতে হয়। এ পোশাকে খুব একটা নকশা থাকে না। মণিপুরী মেয়েরা সাধারণত ঘরে বা হাটে-বাজারে যাওয়ার সময় ফানেক ব্যবহার করে। মণিপুরী মহিলাদের শরীরের নিচের অংশের আরেকটি পোশাক কারুকাজময় লাইফানেক। এ পোশাকের জমিন সাধারণত সরু দুই রঙে ডোরাকাটা হয় এবং পাড়ে বিভিন্ন নকশা তোলা হয়। আগে পাড়ে সুতা দিয়ে হাতে নকশা তোলা হতো, বর্তমানে এ নকশা মেশিনে তোলা হয়। এ ধরনের পোশাক সিলেট অঞ্চলে খুব একটা তৈরি হয় না। আসাম থেকে এনে এদেশের মণিপুরীরা তা ব্যবহার করে। মণিপুরী মহিলাদের ব্যবহৃত ব্লাউজ ফুরিত। এটি সাধারণ ব্লাউজের মতোই, তবে একটু লম্বা হয় যাতে ফানেকের নিচে গুঁজে রাখা যায়। মণিপুরীরা ব্লাউজের কাপড় নিজেরাই তাঁতে বুনে থাকে। অনেক সময় মহিলারা ফুরিতে নিজের হাতে নকশা তোলে। মণিপুরী মহিলারা ফুরিতের (ব্লাউজের) উপরে ফিফুপ নামের ওড়না পরে থাকে। ওড়না পরার পদ্ধতি একটু ভিন্ন ধরনের। প্রথম দৃষ্টিতে শাড়ি পরার মতোই মনে হয়। মণিপুরী মহিলাদের ঘরে ব্যবহৃত ওড়নায় খুব বেশি কারুকাজ থাকে না। এর সরু পাড় ও আঁচল রয়েছে। বিয়ে বা উৎসব-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ফিদুপ সূক্ষ্ম সুতায় বোনা হয় এবং এতে তাঁতে রেখেই সূক্ষ্ম কারুকাজ করা হয়ে থাকে। এর জমিন অনেকটা মসলিনের মতো সূক্ষ্ম হয়। বিয়ে ও নৃত্যের সময় মণিপুরী মহিলারা উজ্জ্বল রঙের কারুকাজময় পোশাক পলই ব্যবহার করে। পলই-এর নিচের দিকের চওড়া পাড়ের অংশে জরি ও চুমকি দিয়ে অত্যন্ত চাকচিক্যপূর্ণ নকশা তোলা হয়। পলই-এর সঙ্গে কারুকাজখচিত ফুরিত ও ফিদুপ ব্যবহার করা হয়। মণিপুরীদের ব্যবহারের তাঁতে বোনা চওড়া গামছার নাম খুদাই যা সাধারণত চেক কাপড়ের হয়। বিভিন্ন রঙের গামছা মণিপুরী পুরুষরা লুঙ্গির মতো ঘরে ব্যবহার করে। মণিপুরী পুরুষদের ব্যবহৃত ধুতিকে ফেইজং বলা হয়। ধুতি সাধারণত হাটবাজার ও উৎসব-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। পুরুষদের ফুরিত অনেকটা ফতুয়া ধরনের এবং সাধারণত তাঁতে বোনা কাপড় দিয়ে তৈরি। ফুরিত ছাড়া মণিপুরী পুরুষরা লম্বা সাদা শার্টও ব্যবহার করে। বর্তমানে শিক্ষিত যুবকরা আধুনিক শার্ট ও প্যান্ট ব্যবহার করছে। মণিপুরীদের বিয়ের অনুষ্ঠানে পুরুষরা কৈয়ত নামের পাগড়ি ব্যবহার করে। পুরুষদের ব্যবহৃত পাঞ্জাবি ধরনের পোশাককে পুজাত বলা হয়।

কা-জিমপিন, জামাতা বা নিমাক্তি খাসিয়া মেয়েদের ব্লাউজের মতো পোশাক। বাজার থেকে কাপড় কিনে এ ধরনের পোশাক তৈরি করা হয়। মহিলাদের নিচের অংশের পোশাক কা-জৈনসেম বা চুসেম। লুঙ্গির মতো প্যাঁচ দিয়ে এ পোশাক পরিধান করা হয়। এ ধরনের পোশাক ছাপা বা চেক কাপড়ের হয়ে থাকে। পূর্বে উৎসবে ব্যবহৃত কা-জৈনসেম সিল্ক বা মুগাসুতা দিয়ে তৈরি হতো। মহিলারা হাত কাটা এবং পা পর্যন্ত লম্বা সেমিজের মতো যে পোশাক ব্যবহার করে তাকে জামাপো বলা হয়। এ ধরনের পোশাক সাধারণত এক রঙের সুতি কাপড়ে তৈরি হয়।[৮১]

বর্তমানে কিছু মণিপুরী তাদের পোশাক আধুনিকায়ন করে বিক্রি করছে। ইদানিং মণিপুরী শাড়ি বাজারে দেখা যায়। এ শাড়ির নকশায় জ্যামিতিক নকশা ব্যবহার করা হচ্ছে। বিভিন্ন শিল্প মেলায় তারা তাদের প্রস্তুতকৃত বস্ত্র এবং তাঁত প্রদর্শন করে এবং বিক্রি করে। এদের পোশাকে লাল এবং কালো বর্ণের সুতার বুনন ও নকশার প্রচলন খুবই বেশি দেখা যায়। বর্তমানে শাড়িতে সাদা, ঘিয়ে, লাল ও সবুজ রঙ জমিনে ব্যবহার করছে। শাড়ির পাড়ে জমিনের বিপরীত রঙ ব্যবহার করছে।

---

৮১. বাংলাপিডিয়া, ৫ম খ. পৃ. ৪৬৬

Dhaka University Institutional Repository

খাসিয়াদের পোশাক:

খাসিয়া মহিলাদের ওড়না জাতীয় কাপড় চুসুত। চুসুত এক খণ্ড কাপড় যা ডান হাতের নিচ দিয়ে এবং বাম কাঁধের পিছন দিক থেকে এনে বাম কাঁধের উপর গিরো দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। ফুঙ্গ মারুং খাসিয়া পুরুষদের পকেটবিহীন জামা, অনেকটা ফতুয়ার মতো। ফুঙ্গ মারুং-এর সাথে পুরুষরা লুঙ্গি ব্যবহার করে। নারী ও পুরুষ উভয়কেই বেল্ট ব্যবহার করতে দেখা যায়। পূর্বে পুরুষরা এক ধরনের টুপি ও পাগড়ি ব্যবহার করত। বিত্তবান পুরুষরা নিকার বুকার, মোজা, বুট, ওয়েস্টকোট ও ক্যাপ পরিধান করত।[৮২]

পোশাককেন্দ্রিক আঞ্চলিক শিল্প :

প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কারুশিল্পের জন্য খ্যাত। পঞ্চম শতাব্দীতে বাংলার সর্ববৃহৎ বন্দরনগরী তাম্রলিপ্তির সাথে দক্ষিণ ভারত, সিংহল (শ্রীলঙ্কা), বার্মা (মায়ানমার), মালয় (মালয়েশিয়া), পারস্য উপসাগর এবং দূরপ্রাচ্যের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়। এই সময়ে প্রধান প্রধান উন্নত শিল্পসমূহের মধ্যে ছিল বস্ত্রশিল্প, চিনি শিল্প, লবণ শিল্প, গজদন্ত শিল্প এবং ধাতু শিল্প। অষ্টম শতাব্দীতে আরব দেশীয় বণিকগণ চট্টগ্রামের সাথে বহির্বিশ্বের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খ্রিষ্টবর্ষ শুরুর অনেক আগে থেকেই বাংলায় নৌকানির্মাণ শিল্প উন্নতি লাভ করে। ঢাকার মসলিন খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৫ থেকেই বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করে। এমনকি ৫০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেও বস্ত্র, চিনি, লবণ রপ্তানিতে বাংলার রেকর্ড ছিল। ৬০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে হস্তশিল্পও সমৃদ্ধি লাভ করে। অবশ্য উৎপাদনকারীদের কার্যক্রম কয়েক প্রকারের দ্রব্য উৎপাদনের মধ্যেই দীর্ঘদিন সীমাবদ্ধ ছিল।

মুগল আমলে বাংলায় উৎপাদন ক্ষেত্রে তেজি ভাব আসে। এর কারণ এদেশে ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের আগমন। রপ্তানি বাজারে বিদেশীদের অংশগ্রহণ শিল্প উন্নয়নে নতুন প্রেরণা যোগায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুদ্রার প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং মূলধন গঠন প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়। ফলে নতুন নতুন বাজার ও উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। উৎপাদন ও বাজারের প্রসার ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও বীমা খাতে বাণিজ্যিক কাগজপত্রের ব্যবহার জনপ্রিয় করে তোলে। মুগল শাসিত বাংলায় দেশীয় শিল্প উন্নয়নে চরকাকার, তাঁতি , সূত্রধর এবং কুম্ভকার নামের প্রধান প্রধান কারিগর শ্রেণীর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে উৎপাদিত সূক্ষ্ম বস্ত্র ছিল লাভজনক রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদির অন্যতম। বাজার সম্প্রসারণের সাথে সাথে চিনি উৎপাদন জোরদার করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে নোনা পানি থেকে লবণ উৎপাদনে ব্যাপক উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ের মধ্যে বাংলায় অন্যান্য যে সকল দ্রব্য উৎপাদনের প্রসার ঘটেছিল তার মধ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি, ধাতুনির্মিত দ্রব্যাদি ও অস্ত্রপাতি, তামার ছাঁচ, গজদন্ত ভাস্কর্য, কাঠের কারুকাজ, সূচিশিল্প, অলঙ্কার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিশ আমল ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বাংলায় বস্ত্রশিল্প ছিল সম্পূর্ণ কুটির শিল্প নির্ভর। বস্ত্র উৎপাদন ও বস্ত্র ব্যবসার অর্থায়নে মহাজনগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক 'দাদনি প্রথার মাধ্যমে ও এজেন্সি পদ্ধতিতে তাঁতিদের ঋণ দেওয়া হতো। দাদনি প্রথা কালক্রমে কারিগর শ্রেণীর জন্য প্রতিকূল, এমনকি অত্যাচারমূলক হয়ে ওঠে। এর ফলে বহু তাঁতি প্রবলভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পেশা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ফলে বাংলার এক সময়ের সমৃদ্ধ বস্ত্রশিল্প বিপর্যস্ত হতে থাকে এবং আঠারো শতকের শেষ দশক থেকে বাংলা

---

৮২. বাংলাপিডিয়া, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪৬৬

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বস্ত্র রপ্তানি হ্রাস পেতে শুরু করে। ১৮২০ সাল নাগাদ বস্ত্র রপ্তানির দেশ হিসেবে বাংলার নাম অবলুপ্ত হয়। ১৮৩০-এর দিকে ব্রিটেন থেকে বাংলায় বস্ত্র আমদানি শুরু হয়।

ভারতের রেশম শিল্প প্রধানত বাংলায় কেন্দ্রীভূত ছিল এবং ব্রিটিশদের শাসন আরম্ভের প্রথম থেকেই এই শিল্প তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রেশম কারখানা স্থাপন এবং রেশমগুটি চাষের উন্নয়ন করে। কোম্পানি বিদেশে রেশম রপ্তানি ব্যবস্থাকে সংগঠিত করে। রেশমগুটি চাষ ও রেশম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদের অংশবিশেষ এখন রাজশাহীর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য মধ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে চীন ও জাপানে উৎপাদিত সস্তা রেশমের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে এবং ব্রিটেনে উৎপাদিত বিকল্প বস্ত্রের দ্রুত মূল্য হ্রাসের জন্য বাংলার রেশম শিল্পের প্রসার ব্যাহত হয়।

ব্রিটিশ আমলে বাংলার শিল্পের, বিশেষ করে কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে, একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সীমিত শিল্পখাতে সঙ্কীর্ণ বিশেষায়ন। বহু শতাব্দী ধরে ভারতে প্রচলিত বর্ণভিত্তিক কারুকর্মীদের বিশেষায়ন ব্রিটিশ আমলেও সমৃদ্ধি অর্জন করে। অনেক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এইসব কুটির শিল্পের উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখেন। কিন্তু অন্য অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় কারিগরদের দৈহিক নিপীড়নসহ নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় এবং জোর করে তাদের ব্যবসায় থেকে বিতাড়ন করে আমদানিকৃত দ্রব্যাদির জন্য স্থান করে দেওয়া হয়।

পাকিস্তান আমলে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান অবিভক্ত বাংলার শিল্পের সামান্যই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। বাংলার ১০৮টি পাটকল, ১৮টি লৌহ ও ইস্পাত কল এবং ১৬টি কাগজ কলের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশে একটিও পড়ে নি। বাংলার ৩৮৯টি সুতাকলের মধ্যে মাত্র ৯০টি, ১৬৬টি চিনিকলের মধ্যে মাত্র ১০টি এবং ১৯টি সিমেন্ট কারখানার মধ্যে মাত্র ৩টি পূর্ব পাকিস্তান ভূখণ্ডে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের সুতাকলগুলিকেও আমদানিকৃত কাঁচামালের ওপর নির্ভর করতে হতো।[৮৩]

পাকিস্তান সরকারের শিল্প উন্নয়ন নীতিমালায় পাট, বস্ত্র, রেশম ও রেয়নসহ চব্বিশটি শিল্প ছিল কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাধীন। শিল্পায়নের উন্নয়নের জন্য সরকার পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন এবং পাকিস্তান শিল্প অর্থসংস্থান করপোরেশন নামে দুটি সংস্থা সৃষ্টি করে। পাট, পেপার বোর্ড, সিমেন্ট, সার, চিনি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, বস্ত্র, ঔষধ, হাল্কা প্রকৌশল ও জাহাজনির্মাণ প্রভৃতি খাতে শিল্প ইউনিট স্থাপনে পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অবশ্য, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প উন্নয়নে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে। এসব সত্ত্বেও ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পায়নে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

বাংলাদেশ আমল ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে শিল্পখাত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পসমূহের পুনর্স্থাপন ও পুনর্বাসনের ব্যয় হিসাব করা হয়েছিল ২৯১ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের শিল্পসমূহের জন্য খরচ ধরা হয়েছিল ২২৩ মিলিয়ন টাকা। ৭২টি পাটকল (৭৯,২০০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন), ৪৪টি বস্ত্রকল (১৩.৪ মিলিয়ন পাউন্ড), ১৫টি চিনি কল (১,৬৯,০০০ টন), ২টি সার কারখানা (৪,৪৬,০০০ টন), একটি ইস্পাত কল (৩,৫০,০০০ টন), একটি ডিজেল ইঞ্জিন ইউনিট (৩,০০০) এবং একটি জাহাজনির্মাণ কারখানা নিয়ে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতের কার্যক্রম আরম্ভ হয়।

---

৮৩. বাংলাপিডিয়া, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪৬৬

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৮৪ সালে এই শ্রেণীর শিল্পের সংখ্যা ছিল ৯,৩২,২০০টি। এর মধ্যে ২০.৭% ছিল তাঁত, ১৫.৪% বাঁশ ও বেতের কাজের কারখানা, ৮.১% কাঠমিস্ত্রির কাজের কারখানা, ৬.১% পাট ও তুলার সুতায় তৈরি দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা, ৩.৪% মৃৎশিল্প, ০.৩% তৈলভাঙ্গা কল, ৩.২% কামারের কারখানা, ০.৮% তামা ঢালাই কারখানা এবং অবশিষ্ট অন্যান্য ধরনের শিল্প। বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকায়ই তাঁতিদের বসতি আছে, কিন্তু নরসিংদী, বাবুরহাট, হোমনা, বাঞ্ছারামপুর, বাজিতপুর, টাঙ্গাইল, শাহাজাদপুর এবং যশোর এলাকায় তাদের অধিক সংখ্যায় কেন্দ্রীভূত রূপে দেখা যায়। রেশম শিল্প রাজশাহী ও ভোলাহাটে প্রসার লাভ করেছে। বাংলাদেশে ১৯৮০-র দশকে অন্যান্য যে সকল স্থান কুটির শিল্পের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল সেগুলির মধ্যে রয়েছে চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও ইসলামপুর (তামা ঢালাই), সিলেট (মাদুর ও বেতের আসবাবপত্র), কুমিল্লা (মৃৎশিল্প ও বাঁশের কাজ), কক্সবাজার (সিগার), বরিশাল (নারিকেলের ছোবড়া থেকে উৎপাদিত দ্রব্য) এবং রংপুর (নকশাযুক্ত কার্পেট)।[৮৪]

১৯৮৪ সালে বাংলাদেশে ৬,০০০ তাঁত এবং ১,০২৫,০০০ টাকুবিশিষ্ট ৫৮টি বস্ত্রকল ছিল। এই বস্ত্রকলগুলির বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১০৬.২ মিলিয়ন পাউন্ড সুতা, ৬৩ মিলিয়ন মিটার কাপড়। বস্ত্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত খাতের অন্যতম শিল্প এবং অন্যান্য অধিকাংশ শিল্পখাতের মতোই বস্ত্রখাতকে লোকসানের বোঝা বহন করতে হয়েছে। ১৯৮৪ সালে এই লোকসানের পরিমাণ ছিল ৩৫৩.৪ মিলিয়ন টাকা। এই খাতের অসুবিধাসমূহের মধ্যে রয়েছে দুর্বল ব্যবস্থাপনা, দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টির অসুবিধা, কাঁচামাল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের অপর্যাপ্ততা। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশে ২৩,৭০০টি টাকুবিশিষ্ট ৭০টি পাটকল ছিল। ঐ বছর এই পাটকলসমূহে ১,৬৮,০০০ জন শ্রমিক এবং ২৭,০০০ জন অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল। এই মিলসমূহে ঐ বছর ৫৪৫ টন কাঁচাপাট ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আলোচ্য বছরে এই সকল পাটকলের উৎপাদন ১৯৬৯ সালের ২১,৫০৮টি টাকুবিশিষ্ট ৫৫টি পাটকলের উৎপাদন অপেক্ষা কম ছিল। বাংলাদেশের পাট শিল্পের প্রধান তিনটি কেন্দ্র ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় অবস্থিত। পাটজাত দ্রব্যের পরিবর্তে এখন সস্তা ও অধিক টেকসই প্লাস্টিক দ্রব্য ব্যবহৃত হচ্ছে। ভারতের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের পাট শিল্প ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। বস্ত্রখাতে দীর্ঘ উন্নয়নের পিছনে বাংলাদেশে ঐতিহাসিকভবে গড়ে উঠা বিভিন্ন কুটির শিল্প প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে। নিম্নে কয়েকটি শিল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সন্নিবেশিত হলো।

পাট শিল্প : সতেরো শতক থেকেই পাট শিল্প বাংলাদেশে পাট শিল্প কুটির পর্যায়ে প্রচলিত ছিল। আঠারো শতকে বিদেশে রপ্তানি পণ্যের মধ্যে একটি ছিল চটের ব্যাগ বা গানি ব্যাগ। কুটির পর্যায়ে পাট সূতা দিয়ে শাড়ি ও লুঙ্গি তৈরি হতো। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বড় আকারের আধুনিক পাট শিল্পের সূত্রপাত ঘটে। বিশ শতকের সূচনায় পাট শিল্প ছিল বাংলার অহঙ্কার। দেশের মোট শিল্পশ্রমিকের প্রায় অর্ধেকই এই শিল্পে নিয়োজিত ছিল। ১৯০০-১ সালে বাংলার মোট রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আয় আসে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি থেকে। এই শিল্পে গোড়া থেকেই প্রথমে ইউরোপীয়রা ও পরে মাড়োয়ারিরা আধিপত্য বিস্তার করে। পাট শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের তিন-চতুর্থাংশই ছিল অবাঙালি। এই শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে কাঁচা পাটের বেশিরভাগই আসত পূর্ববাংলা থেকে।[৮৫]

---

৮৪. বাংলাপিডিয়া, ৫ম খন্ড, পৃ.

৮৫. বাংলাপিডিয়া, ৫ম খন্ড, পৃ. ৩৩২

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫৫ সালে প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠার আগে বাংলার তাঁতিরা স্থানীয়ভাবে সুতলি, দড়ি ও গরিবদের জন্য বস্ত্র তৈরিতে পাট ব্যবহার করত। এছাড়া মাছ ধরার কাজে ও নৌযান ঘাটে বেঁধে রাখার কাজেও পাটের সুতা, দড়ি ও রশির ব্যাপক ব্যবহার ছিল।

আঠারো শতকের শেষনাগাদ পাটের প্রতি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এই কোম্পানি ১৭৯১ সালে পাটের নমুনার একটি চালান ইংল্যান্ডে পাঠায়। সেখানে শণের সুতা পাকানোর যন্ত্রে পাটের সুতা পাকানোর কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়। ব্রিটিশগণ পাটের যে শক্ত ও ভঙ্গুর প্রকৃতির ভাব রয়েছে তাকে তেল-পানি মিশিয়ে নরম ও মোলায়েম করার একটি পদ্ধতিও বের করে ফেলে। ফলে পাটের আঁশ অপেক্ষাকৃত সহজে সুগোছালো ও নমনীয় করা সম্ভব হয় আর সেই সাথে পাটের আঁশকে সহজে আলাদা করাও সম্ভব হয়ে ওঠে। আর এসবের ফলে ব্যবহারযোগ্য পাটের সুতা উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

পাট শিল্প প্রসারের জন্য কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৮৩৮ সালে নেদারল্যান্ড সরকার পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে কফি পরিবহণের জন্য শণের বস্তার পরিবর্তে পাটের থলি ব্যবহারের নির্দেশ দেয়। ঐ সময় রাশিয়া থেকে শণ আমদানি করা হতো, তবে ১৮৫৪-৫৬ সালে ক্রিমিয়া যুদ্ধের কারণে রাশিয়া থেকে শণ আমদানি বন্ধ হয়ে যায় ও যুক্তরাজ্যের সুবিখ্যাত ডান্ডি কারখানাগুলি শণের বিকল্প সন্ধানে বাধ্য হয়। ডান্ডিস্থ শণের মিলগুলিকে পাটকলে রূপান্তর করা হয়। অন্যদিকে, আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-৬৫) পাটের ব্যবসায়ে আরও উৎসাহের কারণ হয়ে ওঠে। কেননা, যুদ্ধের ফলে মার্কিন তুলার যোগান অনেকটাই সীমিত হয়ে পড়ে। তারপর থেকে ডান্ডির শিল্প আর কখনও শণ বা তুলা ব্যবহারে ফিরে যায় নি। এই স্থায়ী পরিবর্তনের প্রধান কারণ ছিল তুলনামূলকভাবে পাটের সস্তা দামের সুবিধা। এরপর দ্রুত পাট শিল্প বিকাশ লাভ করে এবং যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, ইতালি, হল্যান্ড, স্পেন, রাশিয়া, ব্রাজিল ও বাংলার মতো বহু দেশে পাটকল স্থাপিত হয়। ফলে পাটের চাহিদা দ্রুত বেড়ে যায়। বাংলার কৃষকসমাজ পাটের আবাদের এলাকা বাড়িয়ে বিশ্বে পাটের চাহিদা মেটানোর জন্য সক্রিয় হয়। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কাঁচাপাটের চাহিদা বেড়ে যায়। রণক্ষেত্রে পরিখায় থেকে যুদ্ধে নিয়োজিত সৈন্যদের রক্ষার্থে বালিভর্তি বস্তা তৈরি করতে ও সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্যশস্য বয়ে নিয়ে যেতে পাটের বস্তা তৈরির জন্য কাঁচাপাটের প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলে পাটজাত পণ্য ও কাঁচাপাটের চাহিদা প্রবলভাবে বেড়ে যায় এবং পাট ও পাটজাত পণ্যের দাম আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে।[৮৬]

বাংলা, বিশেষ করে, পূর্ববাংলা উৎকৃষ্ট মানের কাঁচাপাটের প্রধান উৎপাদনকারী হলেও বাংলার প্রথম পাটকল স্থাপিত হয় ১৮৫৫ সালে হুগলী নদীর তীরে কলকাতার কাছে রিষড়ায় অর্থাৎ, ডান্ডিতে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাটের সুতা পাকানোর কাজ শুরুর বিশ বছর পরে। প্রয়োজনীয় কারিগরি কর্মী ও যন্ত্র পরিচালনার জন্য বিদ্যুৎ বা অন্য ধরনের শক্তির অভাবে বাংলায় পাট শিল্প স্থাপনে এই বিলম্ব ঘটে। ১৮৫৪ সালে রানীগঞ্জের কয়লা খনিগুলির কাজ শুরু হয়। এ কারণে শক্তি সহজলভ্য হওয়ায় জর্জ অকল্যান্ড নামে একজন ইংরেজ বাংলার প্রথম পাটকলটি স্থাপন করেন। তবে তাঁর আর্থিক অবস্থা কখনই ভাল যায় নি। তিনি এই শিল্প থেকে যুক্তিসঙ্গত মুনাফা করতে না পেরে শেষাবধি এ ব্যবসায় ছেড়ে দেন। ১৮৫৯ সালে বোর্নি কোম্পানি টাকু ও মাকু সুবিধাসহ দ্বিতীয় পাটকল স্থাপন করে। বোর্নি কোম্পানির এই পাটকলটি গোড়া থেকেই যথেষ্ট ভাল করে। পাঁচ বছরের মধ্যে পাট কলটির আয়তন দ্বিগুণ হয়। ১৮৬৬ সাল নাগাদ আরও তিনটি পাটকল স্থাপন করা হয়। ১৮৬৮ থেকে ১৮৭৩ মেয়াদের মধ্যে এই পাটকলগুলি বিরাট অঙ্কের মুনাফা করে। ১৮৭৪ সালে পাঁচটি ও ১৮৭৫ সালে আরও আটটি নতুন কোম্পানি স্থাপিত হয়। ঠিক এই স্তর থেকে পাট শিল্পে সম্প্রসারণের প্রবলতা দেখা দেয় এবং তা দ্রুত চলতে থাকে।

---

৮৬. A. Karim, History of Bengal, Mughal Period, Rajshahi, 1995, P. 221

Dhaka University Institutional Repository

পাটকল প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলা হয়ে ওঠে পাটের বস্তার নিয়মিত রপ্তানিকারক। কলকাতা ডান্ডির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। কলকাতার পাট শিল্প সাফল্যের সঙ্গে আমেরিকাসহ বিশ্বের নানা জায়গায় ডান্ডির মূল্যবান হেসিয়ান রপ্তানি-বাজারে প্রবেশ করে। এর একটি কারণ ছিল কলকাতায় পাটজাত পণ্যের সস্তা উৎপাদন ব্যয়। দ্বিতীয়ত, এই পাট শিল্প কেন্দ্রটি পূর্ববাংলা ও আসামের পাট উৎপাদনকারী জেলাগুলির খুব কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। তৃতীয়ত, সস্তায় শ্রমিক পাওয়া যেত। কলকাতার পাট শিল্পের শ্রমিকখাতে ব্যয় ছিল ব্রিটিশ পাট শ্রমিকদের তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। চতুর্থত, কলকাতার পাটকলগুলি দিনে পনের থেকে ষোল ঘণ্টা, এমনকি, কোন কোন ক্ষেত্রে বাইশ ঘণ্টা কাজ করত। এ সকল কারণে কলকাতার পাট শিল্প উৎপাদকদের আয়ত্তে ছিল আর্থিক দিক থেকে সুস্পষ্ট ও সুবিধাজনক অবস্থান। এদের নাগালে উৎকৃষ্টতর পাটতো ছিলই, টনপ্রতি কমপক্ষে তিন পাউন্ড স্টার্লিং কমেও তারা আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত পণ্য বিক্রয় করতে পারত।

সারণি-১ : বাংলায় পাট শিল্পের বিকাশ (১৮৭৯-১৯৩৯)[৮৭]

বৎসর	মিলের সংখ্যা	তাঁত '০০০	টাকু '০০০	নিয়োজিত কর্মী '০০০
১৮৭৯-৮০	২২	৫	৭১	২৭
১৯০০-০১	৩৬	১৬.১	৩৩১.৪	১১৪.৮
১৯২০-২১	৭৭	৪১.৬	৮৬৯.৯	২৮৮.৪
১৯৩৮-৩৯	১১০	৬৯	১৩৭০	২৯৯

১৮৭৯-৮০ সালের পরবর্তী ৬০ বছরে বাংলার পাট শিল্পে পাটকলের সংখ্যা পাঁচগুণ, তাঁতের সংখ্যা প্রায় চৌদ্দগুণ, টাকুর সংখ্যা উনিশগুণ ও নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা এগারো গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। ১৯২৯-৩৩ এর অর্থনৈতিক মহামন্দার সময় পাটজাত পণ্যের চাহিদা গোটা বিশ্বজুড়ে দারুণভাবে পড়ে যাওয়ায় পাট শিল্প গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই শিল্পের কিছু সম্প্রসারণ ঘটে বটে, তবে তা তেমন তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না।

১৮৭২ সালে যখন আধুনিক উৎপাদন শিল্পে পাটের ব্যবহার শুরু হয় তখন পাট প্রধানত পাবনা, বগুড়া, দার্জিলিং, দিনাজপুর, রংপুর ও বাকেরগঞ্জে উৎপাদিত হতো। পাবনা জেলার মোট আবাদি জমির ১৪ শতাংশে, বগুড়ায় ১১ শতাংশে এবং দার্জিলিং-এর ৯ শতাংশ জমিতে পাট উৎপাদিত হতো। এরপর পাটের আবাদ অন্যান্য জেলাতেও সম্প্রসারিত হয়। ত্রিপুরা, ঢাকা, ফরিদপুর, রাজশাহী, যশোর ও হুগলীর মতো কোন কোন নতুন জেলায় ব্যাপকভাবে পাট আবাদ হতো। ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জেলায় মোট আবাদি জমির সিকি ভাগে পাট উৎপাদিত হতো। ঢাকায় ১৮ শতাংশ, ফরিদপুরে ১৬ শতাংশ, রাজশাহীতে ১১ শতাংশ ও যশোরে ১০ শতাংশ জমিতে পাট উৎপাদিত হতো। পরবর্তীতে কোন কোন জেলায় (যেমন, দার্জিলিং ও বাকেরগঞ্জে) পাটের চাষ নানা কারণে সঙ্কুচিত হয়।[৮৮]

---

৮৭. বাংলা পিডিয়া, ৫ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩

৮৮. Jadhu Nath Sarker (ed.) History of Bengal, 11, Dhaka University-1948

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-২:

১৮৭২-১৯১৪ মেয়াদে পাট চাষের আওতায় আবাদি জমির শতকরা অনুপাত[৮৯]

জেলা	১৮৭২	১৮৯১/৯৫	১৯১০/১৯১৪
পাবনা	১৪	২০.৮	২১.২
বগুড়া	১১.৩	১৪.৫	২৫
দিনাজপুর	৭.১	৬.১	৭.১
রংপুর	৬.৩	১৭.৮	২৭.৮
ত্রিপুরা (কুমিল্লা)	৩.৯	১৯.৫	২৪
ঢাকা	২.৪	১৮	১৮.২
ফরিদপুর	১.৯	৭.৪	১৬
রাজশাহী	১.১	৯.৮	১০.৯
যশোর	০.৩	৩.৬	১০.২

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর বিশ্ববাজারে কাঁচাপাটের চাহিদা কমে যায়। পাট উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তবে ১৯২৯-৩৩-এর অর্থনৈতিক মহামন্দাকলে পাটের চাষাবাদে পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করে। পাটের দর এত নিচে নেমে যায় যে পাটের উৎপাদন অলাভজনক হয়ে পড়ে। ফলে চাষিরা তাদের পাট আবাদের জমি অনেক কমিয়ে দেয়। ১৯৩৯ সন পর্যন্ত অর্থনীতিতে চাঙ্গাভাব শুরু হয় এবং ঐ বছরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ফলে ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যবর্তী মেয়াদে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিক কারণেই পাটের দাম আবার চড়া হয়ে উঠলে চাষিরা আরও বেশি জমিতে পাটের আবাদ করতে থাকে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় সকল পাটকল পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়ে আর সকল প্রধান পাট উৎপাদনকারী জেলাগুলি পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। কোন পাটকল না থাকায় পূর্ববাংলা কাঁচাপাট বাজারজাত করার ব্যাপারে সমস্যার সম্মুখীন হয়। অবশ্য পূর্ববাংলায় দ্রুত কয়েকটি পাটকল স্থাপনের মাধ্যমে এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়।

১৯৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পাকিস্তানি পাটকল মালিকরা (পাট শিল্পে মোট তাঁতের আনুমানিক ৬৮ শতাংশের মালিক) পাট শিল্পকে বিশৃঙ্খল অবস্থায় রেখে দেশ ছেড়ে যায়। অবহেলায় অযত্নে পড়ে থাকা এই পাটকলগুলি বড় রকমের লুটপাটের শিকার হয়। বাংলাদেশের নতুন সরকারকে পাট শিল্পের পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিতে হয়। জাতীয়করণ আদেশের আওতায় সকল পাটকলসহ এই শিল্পের আনুমানিক ৮৫ শতাংশকে বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশনের (BJMC) অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ৩৪,৮৩৬টি তাঁতসহ ৭৩টি পাটকলের সবগুলির ব্যবস্থাপনা ও দেখাশোনার উদ্দেশ্যে এই সংস্থা গঠন করা হয়।[৯০] এক পর্যায়ে বিজেএমসির এখতিয়ারভুক্ত পাটকলের সংখ্যা

---

৮৯. বাংলা পিডিয়া, ৫ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩

৯০. তাহমিনা সেলিম, জাতীয় উন্নয়নে পোশাক শিল্প, ফর্ম ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

৭৮-এ উন্নীত হয়। বিজেএমসি এই শিল্পকে তার ধ্বংসাবস্থা থেকে তুলে দাঁড় করানোর কাজে নিয়োজিত হয়। পাটকল শ্রমিকদের অনেকেই মিল ছেড়ে চলে যাওয়ায় এবং ব্যবস্থাপনার অনেক কর্মকর্তাকে কাজে না পাওয়ায় পাট শিল্প বেশ সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়ে। দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিও কোনরকম সহায়তা করছিল না। ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণেও পাট শিল্প গুরুতর ক্ষতির সম্মুখীন হয়, উৎপাদন কমে যায়, বৈদেশিক মুদ্রার আয়ও একই কারণে পড়ে যায়। বিজেএমসির ব্যবস্থাপনায় আসার সময় খুচরা যন্ত্রাংশের অভাব, শ্রমিক অসন্তোষ, উৎপাদনের অপচয় এবং অন্যান্য সমস্যা গোটা পাট শিল্পকে দারুণভাবে বিপর্যস্ত করছিল।

স্বাধীনতার প্রথম দুই বছর ছিল বাংলাদেশের পাট শিল্পের সংকট ও পুনর্গঠনের প্রাথমিক মেয়াদ। বাংলাদেশ সরকার এই শিল্পকে ভর্তুকি দেবার নীতি অনুসরণ করে আসছে, যদিও প্রতিবছর ভর্তুকির পরিমাণ ১৯৭৬-৭৭ পর্যন্ত দুইশ মিলিয়ন টাকা থেকে পরবর্তীতে একশ মিলিয়ন টাকায় হ্রাস পেয়েছে। ভর্তুকি নীতি ও অতীতে কয়েক দফা মুদ্রা অবমূল্যায়নের কারণে বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে ডলার-অধীন রপ্তানি এলাকায় পাট রপ্তানিতে বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। এক পর্যায়ে ভর্তুকি তুলে নেওয়া হয় ও ১৯৭৯-৮০ সালে পাটপণ্য রপ্তানিখাতে মুনাফার প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর নাগাদ ৭৭টি পাটকল বিজেএমসি প্রশাসনের অধীন ছিল। এই সংস্থার দুটি কার্পেট ব্যাকিং মিল ও সেইসাথে বাড়তি খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরির দুটি ইউনিটও ছিল। ১৯৮০ সালে ছয়টি পাটের সুতা বা সুতলি তৈরির (twine) মিল থেকে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে সেগুলিকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৯৮০-৮১ সন নাগাদ ৭৪টি পাটকল বিজেএমসি প্রশাসনের আওতায় থেকে যায়। এসব মিলে প্রায় ১,৬৫,০০০ শ্রমিক ও ২৭,০০০ নির্বাহী কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োজিত ছিল।[৯১]

বিরাষ্ট্রীয়করণ ও বেসরকারি খাতের বিকাশ :

১৯৭৮ সালের আগেই কিছু কিছু রদবদল শুরু হলেও প্রকৃত বিরাষ্ট্রীয়করণের প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৮২-৮৩ সালে। সরকার ১৯৮২ সালের ১৬ ডিসেম্বর নাগাদ বিরাষ্ট্রীয়করণের প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার আদেশ দেন। তবে ১৯৮২ সালের ৩০ ডিসেম্বর নাগাদ ১০টির বেশি পাটকল বাংলাদেশী মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা সম্ভব হয় নি। মূল্যনির্ধারণ ও মিলগুলি হস্তান্তরে অন্যান্য সাংগঠনিক বিষয়-নিষ্পত্তিও সুদীর্ঘ সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৮২-৮৩ সালে বিজেএমসি-র ৪৬টি মিলের আর্থিক অর্জন সন্তোষজনক ছিল। ঐ বছর জাতীয় রাজকোষে প্রদেয় অর্থ পরিশোধপূর্বক মুনাফা হয় ২৪০ মিলিয়ন টাকা। আর সে তুলনায় আগের বছরে এ মিলগুলির মোট লোকসানের পরিমাণ ছিল ৪৩০ মিলিয়ন টাকা। অবশ্য, মুনাফার এই প্রবণতা ছিল স্বল্পস্থায়ী। এই প্রেক্ষাপটে বিদেশী সাহায্যদাতা প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের ওপর বিরাষ্ট্রীয়করণের জন্য চাপ বাড়িয়ে দেয়। ফলে আরও বেশি মিল বিরাষ্ট্রীয়করণের তালিকায় ওঠে। ১৯৯৯ সালে বিজেএমসি-র অধীনে ৩৩টি মিল ছিল। পাট শিল্প খাতকে একটি সুষ্ঠু ভিত্তিতে দাঁড় করানোর লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক দীর্ঘদিন সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। বিরাষ্ট্রীয়করণ, একীভূতকরণ, বিলুপ্তি, বন্ধ করে দেওয়া ও নতুন নতুন ইউনিট স্থাপনের কারণে পাট শিল্প খাতে সংগঠন ও মালিকানার ক্ষেত্রে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটছে।[৯২]

---

৯১. তাহমিনা সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

পাট শিল্প খাতে অর্জন:

পাট শিল্প খাতে অর্থনৈতিক অর্জন অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক হলেও অনেকে এমন যুক্তি উত্থাপিত করে যে, এই শিল্প জাতীয় রাজকোষে অবদান যুগিয়ে পাটচাষি, ব্যবসায়ী, শ্রমিক-কর্মচারী, নির্বাহী এমনকি সরকারকেও সহায়তা করে। অবশ্য, পাট শিল্পের আর্থিক অর্জনের প্রশ্নে সমালোচকরা পাল্টা যুক্তি দেন যে, এই শিল্পখাতে যে লোকসান জমে উঠেছে তার পরিমাণ এ যাবৎ শিল্পখাতটি রাজকোষে যা যোগান দিয়েছে তার চেয়ে বেশি।

১৯৯৮ সাল নাগাদ বিজেএমসি-র জমে ওঠা মোট লোকসান ও দেনার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৮ বিলিয়ন ও ১১ বিলিয়ন টাকারও বেশি। ১৯৯৭-৯৮ সালে বিজেএমসি-র ২.২৮ বিলিয়ন টাকা লোকসান হয়। সংস্থাটির মিল পরিচালনাগত অন্যান্য দিক হলো উৎপাদন ক্ষমতা ৪,৫১,৭০৭ মেট্রিক টন; সচল তাঁত সংখ্যা ১২,৩৫০; তাঁত (কর্ম) ঘণ্টা ৫৯.৩ মিলিয়ন; তাঁত ঘণ্টাপ্রতি উৎপাদন ৫.৩৩ কিলোগ্রাম; বেল আকারে উৎপাদন ৩,১২,০০০ মেট্রিক টন; কাঁচাপাট ব্যবহারের পরিমাণ ৩,১৯,৩০৬ মেট্রিক টন; স্থানীয় বিক্রয় ২৯,০০০ মেট্রিক টন; বিদেশে বিক্রয় ২,৫৬,০০০ মেট্রিক টন; মোট বিক্রয়ের মূল্য (রপ্তানি বোনাসসহ) ৮.৫ বিলিয়ন টাকা; টনপ্রতি উৎপাদন ব্যয় ৩০,৩৪৯ টাকা; শ্রমিকদেরকে প্রদত্ত মজুরি ৩.৮৯ বিলিয়ন টাকা; কর্মচারী ও নির্বাহীদের বেতন ৮৮১ মিলিয়ন টাকা।[৯৩]

প্রধান সমস্যাবলি :

ক. উৎপাদন ব্যয় বাড়লেও পাটজাত পণ্যের বিক্রয় মূল্য বাড়ে নি; খ. বিপুল পরিমাণ লোকসান পুঞ্জীভূত হয়, যার ফলস্বরূপ বিরাট দেনা জমে ওঠে; গ. পাটজাত পণ্যের রপ্তানি হ্রাস পায়; ঘ. বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও তজ্জনিত বিপর্যয়; ঙ. অত্যন্ত উঁচুহারে অপচয়; চ. নেতিবাচক শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকলাপ; ছ. অত্যন্ত নিম্নমানের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতার কারণে উৎপাদন হ্রাস; এবং জ. নীতির দুর্বলতা।

বেসরকারি খাতের পাট শিল্পের অর্জনও উৎসাহব্যঞ্জক নয়। পাট শিল্পের বেসরকারীকরণের কাজটি ছিল অত্যন্ত সমস্যাসংকুল এক প্রক্রিয়া। সংশ্লিষ্ট মিলের শ্রমিক/কর্মচারীদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ ও আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রীতা এ প্রক্রিয়াকে মন্থর করে তোলে। ১৯৯৮ সালে বেসরকারি খাতে ৪০টি মিলের মধ্যে তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয় ও দুটিতে লে-অফ ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৭-৯৮ মেয়াদে বিজেএমএ-র স্থাপিত তাঁত সংখ্যা ছিল ১০,১৯৮, যার মধ্যে সচল তাঁত ৪,৪৭১টি। বেসরকারি খাতের পাটকলগুলি অত্যন্ত দুর্বলভাবে পরিচালিত হয়। এসব পাটকলের অর্জনও ছিল নেতিবাচক। এ পর্যন্ত বেসরকারি খাতের পাটকলগুলিতে ১২ বিলিয়ন কোটিরও বেশি টাকার লোকসান হয়েছে।[৯৪]

বাংলাদেশের সুতা প্রস্তুতকারক (স্পিনিং) পাটকলগুলি উৎপাদনের প্রায় ১০০% ভাগই রপ্তানি করে থাকে। ১৯৯৮ সালে স্পিনিং মিলেব সংখ্যা ছিল ৪১টি। এগুলির বার্ষিক উৎপাদনক্ষমতা ছিল প্রায় ১,৯৫,০০০ মেট্রিক টন। স্পিনিং মিলের উৎপাদিত পণ্য হলো পাকানো সুতা ও সুতলি। এগুলি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কার্পেট বয়ন, দেওয়াল আচ্ছাদন, জুট উইয়েভিং, শপিং ব্যাগ, টুপি, হস্তশিল্প পণ্য, ক্যানভাস, সাজসজ্জার কাপড়, লেমিনেটেড কাপড় ও বিস্ফোরকের জন্য সেফটি ফিউজ ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এই মিলগুলিতে আনুমানিক ২৫,০০০ লোক কর্মরত। এসব মিলের কর্মীদের নিজস্ব সমিতি রয়েছে যার নাম বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

---

৯৩. বাংলা পিডিয়া, ৫ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫

Dhaka University Institutional Repository

কার্যত: প্রায় এক শতকেরও অধিক সময় একচেটিয়া সুবিধাভোগের পর পাটজাত পণ্যসামগ্রী ১৯৭০-এর দশকে এসে পলিপ্রোপাইলিন নামে কৃত্রিম তন্তুর প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়। পলিপ্রোপাইলিন হচ্ছে পাটের এক ধরনের অত্যন্ত কমদামের বিকল্প প্যাকিং সামগ্রী যা সহজে উৎপাদনযোগ্য আর অত্যন্ত টেকসই ও হাল্কা ওজনের। এটি খুবই দ্রুতগতিতে বাজারের অন্যান্য প্যাকিং দ্রব্যের জায়গা দখল করে। এ বিকল্পটির কারণে পাশ্চাত্যের দেশগুলির কয়েকটি পাটকল বন্ধ হয়ে যায়। আর সেইসাথে এই উপমহাদেশের পাট শিল্পকে গভীর এক সংকটে নিক্ষেপ করে। তবে পাটজাত পণ্যের সুবিধাগুলি হলো: ক. পাট টেকসই ও মজবুত প্যাকিং দ্রব্য বলে এ ধরনের জিনিস নিয়ে কাজ করা সহজতর; খ. এতে হুক ব্যবহার করা যায়, তাতে প্যাকিং-এর কোন ক্ষতি হয় না, গ. কয়েকবার ব্যবহার করা যায়; ঘ. হাতে বা যন্ত্র দিয়ে সেলাই করা যায়; ঙ. স্তূপ দীর্ঘমেয়াদে সঞ্চিত রাখা যায়, এভাবে রাখা পণ্যে বায়ু চলাচলে অসুবিধে হয় না, ফলে পণ্য অনেকদিন ভাল থাকে। তবু পাটজাত পণ্যের চড়াদামের কারণে গ্রাহকরা এর বদলে কৃত্রিম তন্তুজাত পণ্য ব্যবহারের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কৃত্রিম তন্তুর বেশ কয়েকটি অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও, বিশেষ করে, পরিবেশের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব ও স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক বিবেচিত হলেও, এই পণ্যের উৎপাদকরা কৌশল ও দক্ষতার সাথে সারাবিশ্বে এর বিক্রয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। তবে ইদানীং পাটের মতো প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহারের দিকে একটা ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসচেতন মানুষ এখন পাটজাত পণ্যের কদর উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। বিজ্ঞানীরাও পাট প্রক্রিয়াকরণের কাজে জৈববস্তু বা পদার্থের ব্যবহার সম্পর্কে কাজ শুরু করেছেন। আর তাতে যদি কোন ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়, তাহলে পাটজাত পণ্য পুরোপুরিই পরিবেশ-বান্ধব হয়ে উঠবে, এতে পরিবেশ-বৈরিতার কোন উপাদান আর থাকবে না। আন্তর্জাতিক পাট সংস্থা (IJO) পাটের পরিবেশ-অনুকূল বৈশিষ্ট্যগুলির প্রচার-প্রসারে যথাসাধ্য কাজ করছে।

রেশম শিল্প : একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ শিল্প এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ হিসেবে এই রেশম তৈরি প্রক্রিয়ার ইতিহাস শুরু হয়েছিল বহু শতাব্দী আগেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুদূর ইতালিতে এই রেশম গাঙ্গেয় সিল্ক নামে পরিচিত ছিল। বাংলায় রেশম উৎপাদনের দীর্ঘ ইতিহাস থেকে দেখা যায়, গ্রামের গৃহস্থরা রেশম উৎপাদনের প্রথম তিনটি পর্যায় সম্পন্ন করে: মালবেরি বা তুঁত চাষ, রেশমগুটি লালনপালন এবং সুতা কাটা। তারপর সেই সুতা নিকটবর্তী গ্রাম বা শহরের দক্ষ তাঁতিদের কাছে বিক্রয় করা হয় বিভিন্ন প্রকার রেশম বস্ত্র তৈরির জন্য। বাংলায় এত বেশি রেশম উৎপাদিত হতো যে তা স্থানীয় চাহিদা পূরণ করার পর প্রচুর পরিমাণে বাইরে রপ্তানি হতো। এই সিল্কের বাজারই প্রথম ইউরোপীয় বণিকদের বাংলায় আসতে আকৃষ্ট করে। ছোট আকারে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে পরিণতিতে ইউরোপীয় বণিক কোম্পানিগুলি বাংলার বস্ত্রশিল্পের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। ক্রমশ তারা বাংলার তৈরি পোশাক শিল্পকে প্রভাবান্বিত করে এবং বস্ত্র রপ্তানির পরিবর্তে প্রসারণশীল বিশ্ববাজারের চাহিদা অনুযায়ী বস্ত্র তৈরির কাঁচামাল রপ্তানি শুরু করে। ১৮৩৫ সালের মধ্যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৎপরতা এ অঞ্চলের একশটি রেশম নিষ্কাশন কেন্দ্রকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে এবং প্রায় ৪০০ টন রেশম তৈরির কাঁচামাল রপ্তানি করে। এরপর থেকে প্রাইভেট কোম্পানিগুলি রেশমের কাঁচামাল বাণিজ্যকে ব্যাপক আকারে সম্প্রসারণ করে এবং রেশমের রপ্তানি বাণিজ্য বেশ কিছুকাল জমজমাট থাকে। কিন্তু ১৮৭০-এর দশকে মহামারী আকারে রেশমকীটের রোগবিস্তার এবং কারিগরি দিক থেকে অচলাবস্থা সৃষ্টির দরুন বাংলার রেশম শিল্প বিদেশের বাজার হারায়।[৯৫]

---

৯৫. বাংলা পিডিয়া, ৯ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দক্ষিণ এশিয়ার বাজারে বাংলার রেশম বস্ত্রের কদর কমে গিয়ে সেখানে কাশ্মীর ও মহীশূর সিল্কের চাহিদা তৈরি হয়। ১৯৩০ সালের মধ্যে চীন এবং জাপানের সিল্ক বাংলার রেশমের স্থান দখল করে, এমনকি বাংলায়ও এসব সিল্ক আসতে শুরু করে। এর ফলে বাংলায় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় দেখা দেয়। রাজশাহী জেলার একটি উদাহরণ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৮৭০-এর দশকের এক হিসাবে জানা যায়, রাজশাহীতে সিল্ক উৎপাদন থেকে প্রায় ২,৫০,০০০ লোকের কর্মসংস্থান হতো; ১৯০১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪১,০০০ এবং ১৯২১ সালে তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ৬০০ জনে। সিল্ক উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই বিপর্যয় বাংলার তৎকালীন সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে।

এই রেশম উৎপাদনকারীরা ভারতের রেশমবস্ত্র তৈরির কারখানা ও সেখানকার বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রেশম উৎপাদনে পাকিস্তান সরকারের তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। রেশম শিল্পকে ব্যক্তিমালিকানায় গড়ে তোলার সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু এ ব্যাপারে কোন উদ্যোক্তা এগিয়ে আসে নি; আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রেও কোন সংরক্ষণমূলক শুল্কনীতি ছিল না। সরকার রেশম উৎপাদনের কাঁচামাল আমদানির ব্যাপারে অবাধ সুযোগ দেয়। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর ফলে ১৯৬২ সালের মধ্যে সরকারি অর্থায়নে রাজশাহী সিল্ক ফ্যাক্টরি চালু হয়। কিন্তু এসব পদক্ষেপ রেশম উৎপাদনকারীদের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি ঘটাতে পারে নি। বিভাগকালীন সামান্য ৩০০ হেক্টর তুঁতচাষ এলাকা ১৯৭১ সালে ৫০০ হেক্টর পর্যন্ত প্রসারিত হয় এবং তা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের আনুমানিক ৫,০০০ লোকের কর্মসংস্থান হয়।[৯৬]

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য অধিকতর সুসংবদ্ধ নীতি গ্রহণ করা হয়। এছাড়া এই শিল্প বৈদেশিক সাহায্য এবং কারিগরি সহায়তা লাভ করে। ১৯৭৭ সালে সিল্ক খাতের কার্যক্রম সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সেরিকালচার বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাবে উন্নয়ন ধীরগতিতে চলে। ১৯৮০-র দশকে একটি মূল্যায়ন দলের অভিমত অনুসারে সেরিকালচার বা রেশমগুটির চাষ সরকারের একটি গৌণ খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়, যদিও গ্রামীণ কর্মসংস্থান এবং আয়ের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে এ শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। ইতোমধ্যে কতিপয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রেশম উৎপাদনে এগিয়ে আসে। স্থানীয়ভাবে কিছু সাফল্য অর্জিত হলেও অধিকাংশ উদ্যোগই নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। ১৯৮০-র দশকের শেষদিকে এসে দেশে তুঁতচাষ এলাকার পরিমাণ ছিল ৩,০০০ হেক্টর এবং রেশম খাত ৫০,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিল বলে ধারণা করা হয়। সে সময় বাংলাদেশের রেশম উৎপাদনের পরিমাণ ভারতের সিল্ক উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক ছিল।[৯৭]

রেশম উৎপাদন একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। রেশমগুটি থেকে রেশম তৈরি করা হয়। রেশমগুটি আসলে রেশম মথের শুঁয়াপোকা; এদের একমাত্র খাদ্য তুঁতপাতা। রেশমকীট ডিম থেকে জন্মায় এবং গুটিতে রূপান্তরিত হওয়ার পর্যায় শেষ করে তারা রেশম মথ হিসেবে আবির্ভূত হয়। স্ত্রী মথ তখন কালচক্র পুনরায় শুরু করার জন্য ডিম পাড়ে। গুটিবদ্ধ অবস্থায় রেশম পিউপা বা কীটগুলিকে মেরে ফেলে সেগুলিকে সেদ্ধ করে সুতা ছাড়ানো হয় এবং পরে তা গোটানো হয়। এর এই সুতা বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র তৈরির জন্য নানাভাবে প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশে প্রায় সবধরনের রেশমগুটিই গ্রামের হাটগুলিতে বাঁশের ট্রেতে করে প্রতিপালন করা হয়। রেশমগুটি পালন খুবই

---

৯৬. বাংলা পিডিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

Dhaka University Institutional Repository

পরিশ্রমসাপেক্ষ, বিশেষ করে মৌসুমের শেষে যখন হাজার হাজার রেশমপোকা গোগ্রাসে পাতা খায় তখন তাদের পালনের জন্য পর্যাপ্ত শ্রমের প্রয়োজন হয়। আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে একটি রেশম মৌসুম ৩০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বাংলাদেশে বছরে চার থেকে পাঁচটি রেশম মৌসুম হয়ে থাকে। প্রধান প্রধান মৌসুমগুলি হচ্ছে চৈত্র, জ্যৈষ্ঠ এবং অগ্রহায়ণ। রেশম রং করা, বোনা ও ছাপা প্রভৃতি কাজ গ্রামের ছোট কারখানা এবং শহরের উন্নত ফ্যাক্টরিতে সম্পন্ন হয়। বাংলায় যারা সিল্ক তৈরি করে (তবে সচরাচর নিজেরা পরতে পারে না), তাদের মধ্যে রেশমের ভিন্ন ধরনের নাম প্রচলিত আছে। উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ের ওপর নির্ভর করে এই নামকরণ করা হয়। যেমন রেশমগুটি পালনকারীকে বলা হয় বোসনি, রেশমগুটিকে পোলু, গুটির সুপ্তাবস্থাকে চোঞ্চ বা বিজন গুটি, গুটি মেলার বাঁশের চালনকে বলে চন্দ্রোকি, ১,২৮০টি রেশমগুটিকে কাহন, রেশমকীটের মহামারী রোগকে কোটা রোগ এবং জীবাণু সংক্রামক মাছিকে বলা হয় উজি।

বাংলাদেশের রেশম বাজার পুরোপুরি স্থানীয়। কখনও কখনও স্থানীয় সরবরাহের বাইরেও রেশমের চাহিদা দেখা যায় এবং বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রধানত ভারত থেকে রেশমবস্ত্র আমদানি হয়ে থাকে। বাংলাদেশের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর জীবনে রেশমের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। একখানি রেশম শাড়ির আভিজাত্য একটি দামি সুন্দর পোশাকের চেয়ে অনেক বেশি। রেশম শাড়ি বিত্ত, সভ্যতা, বাঙালি রমণীর ঐতিহ্যগত সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক। সিল্কের বিভিন্ন নমুনা এবং ডিজাইনের জন্য বাংলা ভাষায় বিশেষ বিশেষ নাম প্রচলিত, যেমন গরদ, মটকা, বেনারসি প্রভৃতি।

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট:

১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। ইনস্টিটিউটের প্রধান লক্ষ্য দেশে রেশম উৎপাদনের ব্যাপক বিস্তার ও সম্প্রসারণের জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রসার, সহায়ক সেবাপ্রদান এবং দক্ষ কারিগরি জনশক্তি গড়ে তোলা। রাজশাহীতে অবস্থিত এ ইনস্টিটিউটের রয়েছে প্রায় ২০ হেক্টর বিস্তৃত চত্বর, একজন পরিচালক এবং ২২ জন বিজ্ঞানিসহ প্রায় ১০০ জনের একটি কর্মিদল।

প্রতিষ্ঠানের একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ১৮৯৮ সালে রাজশাহীতে একটি রেশম কারিগরি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের বিভক্তির পর সাবেক পূর্ব পাকিস্তান দুটি রেশম নার্সারি লাভ করে, যার একটি বগুড়ায়, অন্যটি রাজশাহীর মীরগঞ্জে। রেশম উৎপাদন প্রকল্প ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এই নতুন উদ্যোগের অধীনে ১০টি নতুন নার্সারি স্থাপিত হয় (ভোলারহাট, নবাবগঞ্জ, ঈশ্বরদী, রংপুর, দিনাজপুর, কোনাবাড়ী, ময়নামতি, সিলেটের খাদিমনগর, ভাটিয়ারি ও চন্দ্রঘোনা)। অতঃপর ২২টি সম্প্রসারণ কেন্দ্র, একটি রেশম কারখানা ও একটি রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রথম দিকে ইনস্টিটিউটটি রেশম ও লাক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং রেশম কারিগরি ইনস্টিটিউট এই দুটি ইউনিট নিয়ে গঠিত হয়েছিল। পরে এ দুটিকে একত্র করে ১৯৭৪ সালে রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নাম দেওয়া হয়। ১৯৭৮ সালে নাংলাদেশ রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠার আগে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমে ভাটা পড়ে। ইনস্টিটিউটে বর্তমানে ৫টি গবেষণা শাখা রয়েছে: ১. তুঁতশাখা উচ্চফলনশীল তুঁতজাত উদ্ভাবন, তুঁতচাষ ও রোগবালাই নিয়ন্ত্রণ; ২. রেশমকীট শাখা রেশমকীটের জীনগত সম্ভার সংরক্ষণ, উচ্চফলনশীল রেশমকীটের জাত/সংকর উদ্ভাবন ও ডিম উৎপাদন, সংরক্ষণ ও রেশমপোকার পরিচর্যা উন্নয়ন; ৩. রেশমরোগতত্ত্ব শাখা রেশমকীটের বিভিন্ন রোগ ও বালাই নিয়ন্ত্রণ; ৪. রেশম রসায়ন শাখা মাটি ও

Dhaka University Institutional Repository

তুঁতপাতা বিশ্লেষণ এবং রেশম উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপবস্তুর ব্যবহার; এবং ৫. রেশমপ্রযুক্তি শাখা পর্যাপ্ত পরিমাণ মানসম্পন্ন কাঁচা রেশম উৎপাদনের জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন। ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে একটি পৃথক জীবপ্রযুক্তি ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ শাখাটি রেশম উৎপাদনের বিভিন্ন দিকের ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ইনস্টিটিউট নিজস্ব মুখপত্র Bulletin of Sericultural Research নিয়মিত প্রকাশ করে।[৯৮]

বাংলাদেশ রেশম বোর্ড :

বাংলাদেশ রেশম বোর্ড রাজশাহীতে অবস্থিত, রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশে ১৯৭৮ সালে (অধ্যাদেশ ১৯৭৭ সাল) প্রতিষ্ঠিত। রেশম উৎপাদনে উৎসাহ দান ও রেশম শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। চার জন সার্বক্ষণিক ও ৭ জন খণ্ডকালীন সদস্য নিয়ে এই বোর্ড গঠিত। বোর্ডের প্রধান নির্বাহী হলেন চেয়ারম্যান। বোর্ডের কার্যাবলি নিম্নোক্ত প্রধান বিভাগসমূহে বিভক্ত: ১. অর্থসংস্থান ও পরিকল্পনা; ২. সম্প্রসারণ ও উদ্বুদ্ধকরণ; ৩. উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ এবং ৪. প্রশাসন।

বোর্ডের প্রধান লক্ষ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে: ১. রেশম উৎপাদন ও রেশম শিল্পের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন; ২. রেশম উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণে উদ্যোগ, সহায়তা বা উৎসাহ প্রদান; এবং ৩. তুঁত, ভেরেণ্ডা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদের উন্নত চাষপদ্ধতি উদ্ভাবন।

দেশের বিভিন্ন অংশে বোর্ডের ১৪টি নার্সারি, ৩৯টি কেন্দ্র ও ১৫৯টি উপকেন্দ্র রয়েছে। বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজ পর্যন্ত বোর্ডের উদ্যোগে দেশের ৪৮টি জেলা ও ২০২টি উপজেলায় রেশম উৎপাদন কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে; প্রায় ১ কোটি তুঁত গাছ রোপণ করা হয়েছে; ৫০ লক্ষাধিক ব্যক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে; রেশমগুটি উৎপাদনের পরিমাণ ১০ লক্ষাধিক কেজি বৃদ্ধি পেয়েছে; উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেসরকারি সংস্থা রেশম উৎপাদন কার্যক্রমে জড়িত হয়েছে এবং এর ফলে গ্রামীণ দরিদ্রদের কর্মসংস্থান বেড়েছে। বোর্ডের সহায়তায় দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক রেশম কারখানা গড়ে উঠেছে এবং রেশম উৎপাদনে ১১ হাজারেরও অধিক ব্যক্তি প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

সূচিশিল্প :

সূচিশিল্প এক ধরনের লোকশিল্প, যা সুই-সুতা দিয়ে হাতের সাহায্যে রচিত হয়। সূচিশিল্পের দুটি ধারা লৌকিক ও পরিশীলিত। লৌকিক পর্যায়ে পড়ে নকশি কাঁথা । অতীতে পুরনো কাপড় ও সুতা দিয়ে একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে যে নকশাযুক্ত কাঁথা তৈরি হতো তা-ই নকশি কাঁথা। পরিবারের ব্যবহারিক প্রয়োজনে এ কাঁথা তৈরি করা হতো; এর সঙ্গে কোন বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল না। নকশি কাঁথার কোনটি হতো বর্গাকার, কোনটি আয়তাকার। গ্রামের মেয়েরা বিভিন্ন রঙের সুতা দিয়ে নানা নকশা, কথা, ফুল, পাখি ইত্যাদি তৈরি করত। এগুলি আকার অনুযায়ী রুমাল, বালিশের কভার ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হতো। মেয়েদের বিয়ের সময় সূচিশিল্পে দক্ষতা অনত্যম যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হতো। এসব সূচিকর্ম একান্ত প্রিয়জনকে উপহারও দেওয়া হতো।

দেড় শতাধিক বছর আগের একটি পালকি-কাঁথার চারদিকে রয়েছে কাঠঠোকরা পাড়। তার পাশে রয়েছে লাল, হলুদ, সবুজ ও কালো রঙে তৈরি বাঘের সারির অনেকটা বিমূর্ত ছবি। কেন্দ্রে আছে একটি পদ্মফুল, চারকোণায় জীবনবৃক্ষ এবং মাঝখানে হড়ানো-ছিটানো কল্কা , বেকিফুল ইত্যাদি; সব মিলিয়ে কাঁথাটিতে এক অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে। এটি যশোর এলাকার কাঁথা।

---

৯৮. বাংলা পিডিয়া, ৯ম খন্ড, পৃ. ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

যশোর, ফরিদপুর ও রাজশাহীর নকশি কাঁথাই বেশি বিখ্যাত। বর্তমানে এ সূচিকর্মটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি করা হয়ে থাকে। ফলে এর যে মৌলিক শিল্পগুণ তা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

সূচিশিল্পের পরিশীলিত ধারাটি স্থানিক নয়, বলা যায়, বিদেশাগত এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এ শিল্প গড়ে উঠেছে। মসলিন-জামদানি প্রভৃতি কাপড়ে এ সূচিকর্মের দ্বারা বুটি তোলা হতো। রাজা-বাদশাহদের হেরেমে, বিত্তবানদের ঘরে এবং দেশের বাইরে অভিজাতদের নিকট এ শিল্পের প্রচুর চাহিদা ছিল। ১০ গজ ১ গজ মাপের সূক্ষ্ম কাশিদা কাজে একজন সূচিশিল্পীর সময় লাগত আড়াই বছর। কাশিদাই ছিল ব্যাপকতম সূচিশিল্প। নবম শতাব্দীতে বসরা থেকে কাশিদার কাজ ঢাকায় আসে বলে অনুমিত হয়।

কার্পাস ও রেশম সুতায় বোনা কাপড়ের কার্পাস-বোনা অংশে মুগা এবং তসর সিল্কে রিপু ও সাটিন ফোঁড়ে কাশিদার বুটি তোলা হতো। টান করে কাপড় সেঁটে তার ওপর সুচ দিয়ে সোনা-রূপার কাজের নাম ছিল কারচব। এ কাজে ঢাকা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। বর্তমানে একে কারচুপি, আড়ি ও ইরি বলা হয়। আড়ি ও ইরি হচ্ছে কারচবের কাজে ব্যবহৃত সুচের নাম।[৯৯]

কারচব শিল্পের কয়েকটি বিভাগ হচ্ছে: জরদাজি, কাশিদা, চিকনকারি, ফুলকুরি ও রিফুগরি। আবার সূচিকর্মে কার্পাস, রেশম ও সোনা-রূপার ব্যবহার ভেদে কাজের নাম ছিল কারচব, ঝাপান, চারখানা, কলাবতন, কারচিকা ও কামদানি। মসলিন, পশমি, সাল, রুমাল ইত্যাদির ওপর সোনারূপা ও রেশমি সুতার কাজের নাম ছিল জরদাজি। সূক্ষ্ম কাপড়ের জরি বা বাদলার কাজের নাম কলাবতন বা গোলাবতন। সাদা মসলিন ও নয়নসুকের ওপর সাদা সুতার কাজের নাম চিকন, চিকনকারি বা চিকনদাজি। সুতি মসলিনের কাপড়ের ওপর সোনা-রূপার কাজের নাম কামদানি। অপেক্ষাকৃত কম সোনা-রূপার কাজের নাম কারচিকা। কার্পাস জমিনের ওপর রঙিন রেশমি সুতার কাজের নাম ফুলকুরি বা ফুলবুটি। রেশমের সঙ্গে সোনা-রূপার তার পাকানো সুতার নাম কলাবতন। এ সুতা কেবল সূচিকর্মেই ব্যবহৃত হতো।

চুনাই কাজে রিফুগরেরা সিদ্ধহস্ত ছিল। তারা অতি সূক্ষ্ম মসলিন থেকে একটি আস্ত সুতা বের করে অন্য একটি সুতা সেই ফাঁক দিয়ে চালিয়ে দিতে পারত। এতে রিফুর চিহ্নমাত্র বোঝার উপায় ছিল না। ঢাকার মিরপুর ও মোহাম্মদপুরের অবাঙালি শিল্পীরা কারচবের কাজ করে থাকে। পাঞ্জাবিতে চিকন ও অন্যান্য কাজ হয় মিরপুর, কচুক্ষেত, মোহাম্মদপুর, দয়াগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে। এছাড়া বেডশিট, টেবিলের চাদর, সালোয়ার-কামিজ, স্কুলের পোশাক ইত্যাদিতে এখন সূচিকর্মের কাজ হয়ে থাকে।

মুসলমান পুরুষ ও নারীদের মধ্যে প্রচলিত সেলাই-করা কাপড় পরার রীতি ছিল। কাপড় কাটা, সেলাই করা, রিপু করা প্রভৃতিতে নিয়োজিত একটি পেশাজীবী গোষ্ঠীকে দর্জি বলা হতো। প্রাচীন বাংলায় মুসলমানরাই সর্বপ্রথম দর্জি পেশায় নিয়োজিত হয়। হিন্দুদের জন্য দর্জির কাজের কোন সুযোগ ছিল না। হিন্দু পুরুষরা ধুতি ও চাদর পরিধান করত, আর হিন্দু মহিলারা সনাতনী পন্থায় শাড়ি পরত। সময়ের আবর্তনে হিন্দুদের পোশাক-পরিচ্ছদে পরিবর্তন আসে। ফলে পরিবর্তনমুখী ও ফ্যাশননির্ভর পোশাকের চাহিদা মেটাতে জীবিকার প্রয়োজনে তাদের মধ্যেও দর্জির আবির্ভাব ঘটে। আগের দিনের দর্জিদের কোন সেলাই মেশিন ছিল না। কাঁচি, সুই ও সুতা নিয়ে তারা হাত দিয়েই কাজ করতো। তাদের মধ্যে অনেকে আবার এমব্রয়ডারির কাজ জানতো। আধুনিক কালের দর্জিরা প্রায় সবাই সেলাই মেশিন ব্যবহার করে। অধিকাংশ সেলাই মেশিনই যান্ত্রিক এবং তা পাদানি ঘুরানোর মাধ্যমে চালানো হয়। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলির সেলাই মেশিন বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত। বর্তমানে

৯৯. বাংলা পিডিয়া, ১০ম খন্ড, পৃ. ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপকহারে উৎপন্ন তৈরি পোশাকশিল্প দর্জির কাজ কিছুটা সীমিত করেছে বটে কিন্তু সারা দেশে, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় দর্জিদের কাজের পরিধি একটুও কমে নি। কারণ সাধারণ জনগণ লুঙ্গি, শার্ট, পায়জামা, পাঞ্জাবিসহ আরও অনেক ধরনের পোশাক পরে, যা দর্জিরাই তৈরি করে থাকে। শহরে আধুনিক টেইলারিং শিল্প দর্জিদের নির্দিষ্ট মাসোহারার শ্রমিকে পরিণত করেছে। তৈরি পোশাক শিল্পের অনেক উদ্যোক্তা তাদের সরবরাহ নিশ্চিত রাখতে দর্জিদের সাব কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজে লাগায়।

তাঁত শিল্প:

তাঁত বাংলাদেশের একটি অতি প্রাচীন শিল্প। খ্রিষ্টীয় প্রথম দিকের শতাব্দীগুলোতে ঢাকায় তাঁতশিল্প গড়ে উঠে। কিন্তু মোগল যুগে, বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় কোম্পানীসমূহের রপ্তানী বৃদ্ধির কারণে ঢাকায় এ শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করে। বয়নশিল্প এ জেলায় এবং আশেপাশের সকল এলাকায় প্রত্যেক গ্রামে বিস্তার লাভ করে।[১০০] ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনকালে এ অঞ্চলের অনেক জেলায় তাঁত শিল্প গড়ে উঠেছে। আবহমান কাল থেকে তাঁতী সমাজ তাদের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের কাপড়েরর চাহিদা মেটায়। দেশের চাহিদা মেটানোর পরেও বিদেশে তাঁতজাত কাপড় রফতানি হতে থাকে। বর্তমানে তাঁত বস্ত্রের মাঝে জামদানী কাপড় সারা বিশ্বে সুপরিচিত।

তাঁতিরা হাত ও পায়ের সাহায্যে তাঁতযন্ত্র পরিচালনা করে সুতি বস্ত্র তৈরি করে। দৈনন্দিন ব্যবহার্য কাপড়ের চাহিদা পূরণের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। চর্যাপদে তাঁতিদের জীবনপ্রণালী, কাজের গতিপ্রকৃতি, তাদের পেশার শৈল্পিক উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে স্নিগ্ধা, দুকুল, পাত্রনন্দা ইত্যাদি নামের কিছু মিহি সুতার উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের আবিষ্কার থেকে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে বাংলা সুতিবস্ত্র উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। বাংলায় বস্ত্রশিল্পের সস্তা উপকরণ তুলা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ঢাকার মসলিন রোমে সুখ্যাতি ও বিপুল কদর লাভ করে। বাংলায় বিভিন্ন ধরনের মসলিন তৈরি হতো, যথা তানজেব, সারবন্দ, বাদান, খোশ, এলেবেলে, শর্বাতি, তারান্দম, কুমিশ, তূর্য, নয়নসুখ, চারখানা, মলমল, জামদানি এবং আদ্দি। মসলিন ছাড়াও বাংলা ভূখণ্ডে অন্যান্য মিহি সুতার কাপড় প্রস্তুত করা হতো। এগুলির মধ্যে শবনম এবং আবে রাওয়াঁ উল্লেখযোগ্য।

এসব বস্ত্রসহ বাংলার অন্যান্য অনেক কাপড় বুনন, সৌন্দর্য, কারুকার্য, নমনীয়তা এবং স্থায়িত্ব বিবেচনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। তবে তাঁতিরা দৈনন্দিন ব্যবহারোপযোগী যেসব কাপড় প্রস্তুত করতেন সেগুলির অধিকাংশই হয় মোটা এবং অপেক্ষাকৃত কমদামি। তাঁতিদের কারখানায় এখন মানের দিক থেকে উৎকৃষ্ট বিবেচিত কাপড় প্রায় দুষ্প্রাপ্যই বলা চলে। তাঁতিরা এখন সাধারণ মানুষের আটপৌরে ব্যবহারের কাপড় তৈরি করেই তাদের পেশা জিইয়ে রেখেছেন।[১০১]

একসময় হিন্দু সম্প্রদায়ের কারিগররাই তাঁতি পেশায় আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত এই পেশার লোকজন আশ্বিনী তাঁতি নামে পরিচিত ছিল। তারা অন্যদের চেয়ে জাতে কিছুটা উঁচুতে ছিল। ব্রাহ্মণরা তাদের ছোঁয়া পানি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতেন। পশ্চিমবঙ্গে আশ্বিনী

---

১০০. James Tailor, A Descriptive and Historical Account of cotton manufacturing of Dacca, P. 5, 1987.

১০১. Ibid, P. 5

Dhaka University Institutional Repository

বা আসান তাঁতিরা দাবি করেন যে তারাই আসল তাঁতি, অন্যসব তাঁতি হচ্ছে তাদের উপগোত্র। এ দলের তাঁতি মহিলারা নাকে নোলক পরতেন। এটা ছিল তাদের সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের নিদর্শন। সাধারণ তাঁতিদের নিচু জাতের বলে গণ্য করা হতো। শূদ্র পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতা থেকে তাঁতির জন্ম হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়।[১০২]

তাঁতিরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পেশার অনুসারী। বাংলাদেশে তারা বিভিন্ন উপাধি যথা বারাশ, বসাক, নন্দী, পাল, প্রামাণিক, সাধু, সরকার, শীল ইত্যাদি নামে সুপারিচিত। এসব উপাধিধারী প্রত্যেকেই বর্তমানে আলাদা আলাদা পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করেন। বসাক উপাধি এসেছে ধনাঢ্যদের কাছ থেকে, এরা বুনন কাজ করার মাধ্যমে কাপড় ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়েছে। ১৯২০-এব প্রথমার্ধে শহুরে তাঁতিদের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির একদল তাঁতি পূর্ববঙ্গে এসে আবাস গড়েন, তাদেরকে বাংলার আসল তাঁতি বংশোদ্ভূত বলে গণ্য করা হয়। কথিত আছে যে, তারাই সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলের আগে সুতির কাপড় সরবরাহ করত।

সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে তাঁতিদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় ও তাদের পেশাগত চরিত্রও বিবর্তিত হতে থাকে। মুগল আমলে হিন্দু ও মুসলিম উভয়েই এ পেশার সাথে জড়িত ছিলেন। ১৫১৮ সালের দিকে দুয়ার্তে বারবোসা নামের একজন পর্তুগিজ পরিব্রাজক বাংলা ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর লেখায় সে সময়ের বিশিষ্ট কিছু কাপড়, যেমন মেমোনা, চওলারি, চিনিবাপা, বালিহা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঢাকা, চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, কিশোরগঞ্জ এবং বাজিতপুরের তাঁতশিল্পের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেন। সিগমা, কাসা, মলমল, রেশমি, নীলা এবং টফেটা ছিল স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত কাপড়ের প্রধান উদাহরণ।

ইংরেজের ঔপনিবেশিক শাসন এবং কর্তৃত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেশীয়ভাবে উৎপাদিত কাপড়ের উন্নয়ন ও রপ্তানীকরণের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক হস্তক্ষেপ ঘটায়। ১৭৭৩ সালে ঢাকার কর্তৃপক্ষের কাছে মি. রোজ কর্তৃক লিখিত চিঠিতে তাঁতিদের দুরবস্থার কারণসমূহ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। তিনি জানান যে, তাঁতিরা সাধারণত ভীরু প্রকৃতির এবং অসহায়, তাদের অধিকাংশই দুরবস্থায় পতিত, তারা হিসাব-নিকাশ রাখতে অক্ষম, জন্মগতভাবে পরিশ্রমী হলেও নিজেদের ওপর নির্ভর করতে পারেন না বলে অসহায়ত্বের শিকার। তবু তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী কাজে সন্তুষ্ট। তারা তাদের পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষার্থে কোনরকমে উপার্জন করে সততার সাথে কার্য সম্পাদন করেন। প্রায় এক শতাব্দী আগে বাংলার প্রায় প্রতিটি ঘরে বুনন মেশিন বা চরকা ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যখন বিদেশী পণ্য বর্জন করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে জাতীয় কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছিল তখন বিলেতি ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় অচল হয়ে পড়ে। সেই সময় তাঁতবস্ত্রের উন্নয়ন ঘটার একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালে বিলেতি শাসনের শেষদিকে ভারতে তাঁতশিল্পে ঝলমলে ফ্যাশনের পুনর্বিকাশ ঘটতে শুরু করে।

হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁতিদের দেখা পাওয়া যায়। মুসলিম তাঁতিদের জোলা নামে ডাকা হয়। এই নাম মুসলিম তাঁতিরা পছন্দ করেন না, নিজেরা সেই নামে পরিচিতও হতে চান না। জোলা নামের পরিবর্তে তারা নিজেদেরকে কারিগর বলতেই অধিক পছন্দ করেন। যদিও স্মরণাতীতকাল থেকেই তাঁতিদের পেশা বুনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাপড় তৈরি করা, তথাপি তারা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এটাকে তাদের একচেটিয়া পেশার

---

১০২. Ibid, P. 6

Dhaka University Institutional Repository

আওতায় ধরে রাখতে পারেন নি। সস্তায় কাপড় প্রস্তুতকরণ প্রযুক্তির বিকাশ তাঁতিদের অনেককে জীবনধারণের দ্বিতীয় উপায় হিসেবে অন্য পেশা গ্রহণে এবং এ পেশা পরিত্যাগে বাধ্য করছে।[১০৩]

আগেকার দিনে হস্তচালিত তাঁতের সাহায্যে তাঁতবস্ত্র তৈরি করার জন্য চরকা বা সুতাকাটার টাকু ব্যবহার করা হতো। আজকাল পর্যাপ্ত পরিমাণে সুতা মেশিনে তৈরি হচ্ছে। পরিণতিতে চরকা প্রায় অবলুপ্ত হতে চলেছে। এখন বয়নকারীরা শুধু নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারোপযোগী চলতি মানের সস্তা গামছা, গেঞ্জি, লুঙ্গি এবং শাড়ি প্রস্তুত করছেন।

তাঁতিরা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এখন একান্তই পরিবারকেন্দ্রিক। তারা গ্রামের যে অঞ্চলে স্থায়িভাবে বসবাস করেন এর নাম তাঁতিপাড়া। দেশের কিছু অঞ্চল যেমন নরসিংদী, রায়পুরা, ডেমরা, টাঙ্গাইল, শাহজাদপুর, বেড়া, কুমারখালী, রুহিতপুর, বাবুরহাট, গৌরনদী এবং নাসিরনগর বয়নকার্যের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। কাপড়ের গুণগত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দেখা যায় অঞ্চলভিত্তিক কাপড় উৎপাদনে। রাজশাহীর সিল্ক, টাঙ্গাইল এবং পাবনার সুতি শাড়ি, মিরপুরের কাতান এবং জামদানি, ডেমরার বেনারসি এবং নরসিংদীর লুঙ্গি, গামছার খ্যাতি আছে সারাদেশব্যাপী। এসব স্থান এখনও ব্যাপক পরিমাণে কাপড় রপ্তানি করছে।[১০৪]

কুটির শিল্প হিসেবে হস্তচালিত তাঁত শিল্প বৃটিশ পূর্বকালে কেবল দেশেই নয় বর্হিবাণিজ্যেও বিশেষ স্থান দখল করেছিল। বংশ পরম্পরায় দক্ষতা অর্জনের মধ্যদিয়ে বয়ন উৎকর্ষতায় এ দেশে তাঁতীরা এক অনন্য স্থান সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বৃটিশ আমলে অসম করারোপ, তাঁত ব্যবহারের উপর আরোপিত নানা বিধি নিষেধ, বৃটিশ বস্ত্রের জন্য বাজার সৃষ্টির নানা অপকৌশলের কাছে তাঁতী সমাজ তাদের ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেনি। ক্রমান্বয়ে তাঁত শিল্পে সংকট ঘনীভূত হতে থাকে। স্বাধীনতার পরও সে সংকটের তেমন কোন সুরাহ হয়নি। বাজার অর্থনীতি সম্প্রসারণে তাঁতীদের সমস্যা আরো জটিল করে তুলেছে। বর্তমানে মুক্ত বাজার অর্থনীতির আড়ালে হ"ছ পরোক্ষ আগ্রাসনের শিকার নানা ধরণ, নানা রং, নানা ডিজাইনের কাপড়ের অবাধ প্রবেশের ফলে বাজার সনাতনী তাঁতীদের প্রতিকূলে চলে গেছে। মুদ্রা অর্থনীতির প্রসারের ফলে পুঁজি সংকট দেখা দিয়েছে। সে সুযোগে অধিকাংশ প্রান্তিক তাঁতী ও তাঁত মালিক মহাজনের সেবাদাসে পরিণত হয়েছে। তাঁতীরা সুতা, রং রসায়নের জন্য মহাজনের কাছে বাধা হয়ে বাধা পড়তে হচ্ছে। তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহাজন ও পাইকারের পাতা জালে ধরা দিতে হচ্ছে।

নানা প্রতিকুলতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এ সমাজ টিকে থাকতে পারছে না। তাই এ পেশা ছাড়তে অনেক তাঁতী অন্য পেশায় যোগ দিচ্ছে। কেউ কেউ তাদের ঐতিহ্য পেশাকে কোন মতে আকড়ে রয়েছে। হস্তচালিত তাঁতশিল্পের সমস্যাগুলো নিম্নরূপ:

(১) আধুনিক প্রযুক্তি সাথে টেক্কা দিতে হস্তচালিত তাঁতেও কিছুটা প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ নিয়ে আসা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ এগিয়ে আসতে হবে।

(২) পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক উৎস বিশেষ করে ব্যাংক ও বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ ধরনের পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

---

১০৩. বাংলাপিডিয়া, ৪র্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯০

১০৪. ঐ, পৃ. ২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

(৩) শিথিল প্রশাসন ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে চোরাচালানীর মাধ্যমে অবাধে বস্ত্র সামগ্রী দেশে প্রবেশ করছে। ফলে চোরাই পথে আসা কাপড়ের সাথে দেশীতাঁত বস্ত্র এখন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। চোরাইপথে আসা বস্ত্র সামগ্রীর ট্যাক্স দিত না হওয়ায় সেগুলো কম দামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। দেশী তাঁতবস্ত্র তাই মানে ভালহওয়া সত্ত্বেও বাজার পাচ্ছে না। তাঁ বস্ত্রের বাজার তাই সীমিত হয়ে পড়ছে। পণ্য বিক্রি করতে গিয়ে তাঁতীদেরকে দারুণ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

(৪) তৈরি পোশাক শিল্প ও তাঁতীদের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একশ্রেণীর তৈরি পোশাক আমদানীকারক বিশেষ কর ও শুল্ক সুবিধায় পোশাক রপ্তানির নামে বস্ত্র আমদানি করে দেশের বাজারে তা বিক্রি করে দিচ্ছে। কর ফাঁকি দেয়ায় এ সকল বস্ত্র কম দামে বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছে। বস্ত্রকলে তৈরি এ সকল কাপড় তাঁতবস্ত্রের বাজার সহজেই দখল করে নিচ্ছে। ফলে তাঁতীরা বিপাকে পড়ছে।

(৫) বৈধ ও অবৈধভারে আমদানকৃিত কাপড় পরিকল্পিত ও সুব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে তৈরি হওয়ার ফলে সেগুলোর ডিজাইন, মান ও গুণ তুলনামূলকভাবে উন্নতমানের। উন্নতমানের এ পণ্যের সাথে হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত কাপড় প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখার জন্য ডিজাইন ও ব্যবসায়ী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যে সহযোগিতা দরকার, তার কোন ব্যবস্থা নেই। তাঁত বস্ত্রের ডিজাইন উন্নত আকর্ষণীয় ও বহুমাত্রিক করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অভাব তাঁতীদের অবস্থান আরো দুর্বল করে দিচ্ছে। তাঁতশিল্প এখনো সিংহভাগ মানুষের জন্য বস্ত্র সরবরাহ করে চলেছে। সে প্রেক্ষিতে এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত কারিগরদের জন্য পেশাগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। মানুষের রুচি ও পছন্দের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। যাতায়াত, যোগাযোগ ও প্রচারণা ব্যবস্থার অকল্পনীয় উন্নতির কারণেই মানুষের রুচি বদল দ্রুততর হচ্ছে। পরিবর্তিত রুচি ও পছন্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁত বস্ত্রের পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগা প্রয়োজন। কিন্তু সেজন্য যে সামর্থ থাকা দরকার সাধারণ তাঁতী সমাজের তা নেই। তাই তাদেরকে সনাতনী পদ্ধতিতেই ও সনাতনী মানের বস্ত্র উৎপাদনে নিয়োজিত থাকতে হচ্ছে। এ অবস্থায় তাঁত শিল্পের উৎকর্ষ সাধারণের পথে বড় অন্তরায় হয়ে অবস্থান করছে।

(৬) তাঁত শিল্পের জন্য প্রয়োজন সুতা, রং, রাসায়নিক দ্রব্য ও অন্যান্য উপকরণ। এক ধরনের মধ্যসত্বভোগীর কারণে এ সকলউপকরণের মূল্য বৃদ্ধি ঘটার ফলে, তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন খরচ স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে তাঁতীদের প্রতিযোগিতা ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে। রোকসানের ঝুঁকি বাড়ছে। অতিরিক্ত রোকসানের কারণে অনেকেই তাদের তাঁত বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে।

(৭) বিশেষ ধরণের তাঁতবস্ত্র যেমন জামদানী, বেনারসী ইত্যাদির জন্য বিশ কারিগরী দক্ষতার প্রয়োজন। ঐতিহ্যের ধারা রক্ষা করে এ সকল শিল্পের জন্য মূল-কারিগর গড়ে ওঠে। এ ধরনের কারিগরের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। এ সকল বিশেষ বস্ত্রের মানও তাই কমে যাচ্ছে। বিশেষ কারগরদের খুঁজে বের করে তাদের দক্ষতার স্বীকৃতি দান ও দক্ষতার ব্যবহার করার কোন ব্যবস্থা নেই। বিশেষ বস্ত্র বয়নে বিশেষ কারিগরী দক্ষতা তাই হ্রাস পাচ্ছে। তাঁত শিল্পের জনপ্রিয়তা অনেকাংশে বিশেষ কারিগরী দক্ষতার বিস্তার ঘটিয়ে পণ্যে অনন্যতা সৃষ্টি করার উপরে নির্ভর করছে। বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তাঁত বস্ত্র তেরি করতে না পারার কারণে সাধারণ বস্ত্রের সাথে আলাদা অবস্থানে তাঁত বস্ত্রকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

Dhaka University Institutional Repository

(৮) সময়মত রং, সুতা ও অন্যান্য উপকরণ পাওয়ার উপরে তাঁত শিল্পের উৎপাদন অনেকটা নির্ভর করে। তাঁতজাত পণ্য বিক্রির জন্য তাঁতীদেরকে সাধারণতঃ সাপ্তাহিক হাট বা বাজারের উপর নির্ভর করতে হয়। সময়মত উপকরণ না পেলে পণ্য উৎপাদন করে যথাসময়ে হাট বা বাজার ধরা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে, তাদের পুঁজি বেশীদিন আটকে থাকে এবং আয়ও কমে যায়।

(৯) সরকারীভাবে তাঁতশিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য গৃহীত উদ্যোগ ও ব্যবস্থা যথেষ্ট না। আবার সেগুলো কার্যকরও নয়। এছাড়া, সরকারী নীতি ও কর্মকাণ্ড তাঁত শিল্পের অনুকূলে বাস্তবে কম প্রতিফলিত হয়। তাঁত শিল্পের বিকাশের জন্য অপেক্ষাকৃত সংরক্ষিত আভ্যন্তরীণ বাজার, অবৈধ বস্ত্রের প্রবেশ রোধ, তাঁত বস্ত্রের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির অনুকূলে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, ডিজাইন বহুমুখীকরণ, ঋণ সহযোগিতা তাঁত পণ্য বাজারজাতকরণ ও বাজার প্রসারের বিশেষ পদক্ষেপ দরকার। কিন্তু তেমন পদক্ষেপের অনুপস্থিতি তাঁত শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও বিকাশ প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে।

(১০) তাঁত শিল্পের সাথে যারা জড়িত তাদের জোরালো সাংগঠনিক অনুপস্থিতিও তাঁতশিল্প বিকাশের পথে অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁতীদের সমস্যা, দুরাবস্থা তুলে ধরার জন্য শক্তিশালী পেশাগত সংগঠনের অভাব বিদ্যমান। তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য তাই তারা নীতি নির্ধারকদের উপরে চাপ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। পুঁজি সরবরাহ প্রাপ্তির জন্য একটি তাঁত ব্যাংক স্থাপন করা তাঁতী সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের দাবি। এছাড়া তাঁত বস্ত্র বাজারজাত করণের জন্য জাতীয়ভিত্তিক কার্যকর ব্যবস্থাও গড়ে তোলা দরকার। এক সময় ছিল বহিঃবিশ্বে তাঁতবস্ত্রের বড় বাজার ছিল। রপ্তানী বাজার ধরার জন্যও প্রয়োজন শক্তিশালী বাজার প্রসার-পদক্ষেপ। এ সকল বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে তাঁতী সম্প্রদায়কে সংগঠিত শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটাতে হবে।[১০৫]

তবে আগের তুলনায় এ শিল্পের সাথে জড়িত লোকদের সংখ্যা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তথাপি এ শিল্পের সাথে এখনো একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ওপপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। তাঁত শিল্প দেশের মোট কাপড়ের চাহিদার শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ যোগন দিচ্ছে। ৫০ লাখ লোক সরাসরি তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছে। বিশ্ব বাজারে দেশীয় ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্পের চাহিদা বাড়াতে সরকার উদ্যোগ নিচ্ছে। রপ্তানি বাড়াতে বিদেশি ক্রেতাদের পছন্দসই পোশাক তৈরিতে নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা চলছে। এরই অংশ হিসেবে হস্তচালিত তাঁত শিল্পে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি করতে চারটি ফ্যাশন ডিজাইন ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তৈরি পোশাকের (গার্মেন্ট) পাশাপাশি হস্তচালিত তাঁতে তৈরি দেশীয় বস্ত্রের বিপুল চাহিদা রয়েছে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় গার্মেন্ট খাত এখন নিত্য নতুন পোশাক তৈরি করছে। বিশ্ব বাজারে এর চাহিদাও ব্যাপক। সেই তুলনায় তাঁতে তৈরি জামদানী, বেনারসী ও বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রেরক্ষেত্রে নতুনত্ব আসেনি। বিভিন্ন দেশে চাহিদা থাকলেও ডিজাইন, ফ্যাশন ও রংয়ের কারণে তা এখনও পিছিয়ে রয়েছে। এজন্য তাঁতীদের সমতা বাড়াতে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। রাজধানীর মিরপুর, টাঙ্গাইলের কালিহাতি, সিরাজগঞ্জের বেলকুচি এবং কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে ফ্যাশন ডিজাইন ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং উপ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হচ্ছে। তাঁতীদের বিশ্ব বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ফ্যাশনেবল পোশাক তৈরির জন্য প্রশিতি করতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এসব কেন্দ্র স্থাপন করবে। প্রকল্পের আওতায় তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় তাঁতীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার

---

১০৫. বস্ত্র ও পরিচ্ছদঃ ব্যবহারিক শিল্পকলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩

Dhaka University Institutional Repository

জন্য অবকাঠামো নির্মাণ, তিনটি প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র স্থাপন, তাঁতীদের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বিপুল চাহিদা রয়েছে। গার্মেন্টে তৈরি পোশাক ছাড়াও হস্তচালিত তাঁতে তৈরি পোশাকের চাহিদাও অনেক। অথচ বিশ্বের ভোক্তার নিত্য নতুন ডিজাইন ও চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না দেশের তাঁতীরা। ফ্যাশন ছাড়াও রংয়েরঙে ত্রও তাতীরা নতুন চিন্তাধারা প্রয়োগ করতে পারছে না। এ কারণে তাঁতীদের ফ্যাশন ডিজাইনের নিত্য নতুন ধারা ও পাশ্চাত্য চাহিদার সঙ্গে পরিচিত করানো ও হাতে কলমে শেখানোর জন্য এসব ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা হবে।

দেশের তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্র ঐতিহ্যবাহী। এককালে তাঁতে তৈরি মসলিন সারা বিশ্বে সমাদৃত ছিল। কালের বিবর্তনে মসলিনের বিলুপ্তি ঘটলেও বর্তমানে হস্তচালিত তাঁতে তৈরি জামদানি, বেনারসি ও টাঙ্গাইল শাড়ী মসলিনই ধারক ও বাহক। গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁতীরা তাদের হস্তচালিত তাঁতে পুরনো আমলের ডিজাইনে পোশাক তৈরি করে। এ ধরণের পোশাকের প্রতি দেশি-বিদেশি ক্রেতাদের আগ্রহ থাকলেও বাজারের চাহিদা এবং ভোক্তাদের পছন্দসই বস্ত্র উৎপাদন না করায় হস্তচালিত এসব তাঁত বস্ত্র বেশি পরিমানে বিক্রি হচ্ছে না। অথচ কিছু এনজিও নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন করে উন্নতমানের বস্ত্র অধিক মুনাফায় ক্রেতাদের নিকট বিক্রি করছে। এ অবস্থায় দেশের হস্তচালিত তাঁতীদের আধুনিক ডিজাইনের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিকল্প নেই। এতে করে বাজারের চাহিদা এবং ভোক্তাদের পছন্দসই বস্ত্র উৎপাদনে তাঁতীদের সমতা বাড়বে। ন্যায্যমূল্যের পাশাপাশি বিদেশের বাজারেও এর রপ্তানির পরিমান বাড়বে।

নকশি কাঁথা:

কয়েকপ্রস্থ জীর্ণ পুরাতন শাড়ি কাপড় আর সে কাপড়ের পাড় থেকে ছড়ানো কিছু রঙিন সুতার সামান্য এ উপকরণের সাহায্য বাঙালী নারীরা যে এক অসামান্য শিল্প সৃষ্টি করত তার নাম নকশি কাঁথা। নকশি কাঁথা নকশা করা কাঁথা, বাংলার অন্যতম লোকশিল্প। বাংলাদেশে এই পারিভাষিক শব্দটির বহুল ব্যবহার জসীমউদ্‌দীনের *নক্সী কাঁথার মাঠ* (১৯২৯) কাব্য থেকে শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গে এতদিন নকশা করা হোক বা না-হোক সকল কাঁথাই 'কাঁথা' নামে পরিচিত ছিল। ইদানীং অবশ্য 'নকশি কাঁথা' শব্দের প্রচলন হয়েছে। কাঁথাকে খেতা, কেন্থা ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়।

পাক-ভারতের কুটির শিল্পগুলো প্রায় সব ক্ষেত্রে শিল্পী পরিবার। পরিবারের মহিলা পুরুষ সবাই কাজ করে। কিনউত নকশি কাঁথার বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। এ চারুশিল্পটি আদ্যন্ত গ্রামীণ মহিলাদের পরিচর্যায় পুষ্ট। এ শিল্প বিকাশে পুরুষের সাহায্যের প্রয়োজন হয়নি। পুরাতন শাড়ি কাপড়গুলোর ধুয়ে পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে রঙিন সুতা বাছাই এবং সুষম প্রয়োগ, কি জাতীয় নকশা ব্যবহার হবে তা স্থিও করা এবং প্রয়োজন্ হলে জমিনে অঙ্কন করা সবই মহিলা দিয়ে সম্পন্ন হত। এরপর অীধক ধৈর্য ও শ্রম ব্যবহার করে সেলাই এর কাজ সবই মহিলারা করেন। সাধারণত পুরনো কাপড়, শাড়ি, লুঙ্গি ও ধুতি দিয়ে কাঁথা তৈরি হয়। সাধারণ কাঁথা বছরের সব সময়ই ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু নকশি কাঁথা বিশেষ উপলক্ষে ব্যবহৃত হয় এবং তা পুরুষানুক্রমে স্মারক চিহ্ন হিসেবে সংরক্ষিত থাকে। ভারতের বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে এ ধরনের কাঁথাকে বলে শুজনি। প্রয়োজনীয় পুরুত্ব অনুযায়ী তিন থেকে সাতটি শাড়ি স্তরীভূত করে সাধারণ ফোঁড়ে কাঁথা সেলাই করা হয় এবং সেলাইগুলি দেখতে ছোট ছোট তরঙ্গের মতো। সাধারণত শাড়ির রঙিন পাড় থেকে তোলা সুতা দিয়ে শাড়ির পাড়েরই অনুকরণে নকশা তৈরি করা হয়। তবে কাপড় বোনায় ব্যবহৃত সুতাও কাঁথার নকশা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, বিশেষত রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে।[১০৬]

---

১০৬. বাংলাপিডিয়া, ৪র্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪

Dhaka University Institutional Repository

কাঁথা সাধারণত বিছানা হিসেবে এবং অল্প শীতে হালকা চাদর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ছোট কাঁথা শিশুকে পেঁচিয়ে রাখার কাজেও ব্যবহৃত হয়। আকার ও ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে কাঁথার বিভিন্ন নাম হয়। লেপ-কাঁথা ও শুজনি-কাঁথা আকারে বড় এবং লেপ-কাঁথা হয় মোটা, আর শুজনি-কাঁথা হয় পাতলা। এক বর্গফুট আকারের কাঁথার নাম রুমাল-কাঁথা। এ ছাড়া আরও আছে আসন-কাঁথা–বসার কাজে ব্যবহৃত হয়; বস্তানি বা গাত্রি–কাপড়-চোপড় বা অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র ঢেকে রাখা হয়; আর্শিলতা– আয়না, চিরুনি, কাজলদান ইত্যাদি ঢেকে রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়; দস্তরখান–খাবারের সময় মেঝেতে পেতে তার উপর খাদ্যদ্রব্য ও বাসন-কোসন রাখা হয়; গিলাফ–খাম আকৃতির এ কাঁথার মধ্যে কুরআন শরিফ রাখা হয় এবং জায়নামায– যার উপর বসে নামায পড়া হয়।

সাধারণ কাঁথা কয়েক পাল্লা কাপড় দিয়ে কাঁথাফোঁড়ে সেলাই করা হয়। উনিশ শতকের কিছু পুরনো কাঁথায় উজ্জ্বল চিত্রযুক্ত নকশা দেখা যায়, যা কাঁথাফোঁড়ে চমৎকার উদ্ভাবনী কুশলতায় তৈরি করা হয়েছে। কাঁথাফোঁড়ের নৈপুণ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে তৈরি হয়েছে হালকা তরঙ্গ, রঙের ভুবন, বিচিত্র বর্ণের বিন্দুনকশা ও বয়নভঙ্গি, যা দেখতে মনে হয় হাতে সেলাই করা নয়, তাঁতে বোনা।

কাঁথাফোঁড়ের আবার বৈচিত্র্য আছে এবং সে অনুযায়ী এর দুটি নাম হয়েছে: চাটাই বা পাটি ফোঁড় এবং কাইত্যা ফোঁড়। নকশার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্য ফোঁড়ের দৈর্ঘ্য কখনও কখনও বড়-ছোট হয় এবং তখন তাকে তাঁতে বোনা শাড়ির পাড়ের অবিকল নকল বলে মনে হয়। কাঁথা হচ্ছে মিতব্যয়িতার একটি দৃষ্টান্ত, কারণ এ ক্ষেত্রে পুরনো কাপড় একত্র করে নতুন কিছু একটা তৈরি করা হয়। তাছাড়া পুরনো কাপড়ের একটা অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলে মনে করা হয় এবং তা হলো কারও কুদৃষ্টি প্রতিহত করা। কাঁথা মোটিফগুলির মধ্য দিয়ে শিল্পিমনের বিভিন্ন আবেগ ও অনুভূতি প্রতিফলিত হয়। কাঁথায় যে পৌনঃপুনিক মোটিফগুলি দেখা যায় তার অনেকগুলি বিভিন্ন উৎসব ও ব্রত উপলক্ষে অঙ্কিত আলপনা শিল্পেও ব্যবহৃত হয়। এই মোটিফগুলি সূচিশিল্পীর সুখ, সমৃদ্ধি, বিবাহ এবং মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করে।

বৈচিত্র্য থাকলেও অধিকাংশ কাঁথায়ই মোটিফের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি অনুসৃত হতে দেখা যায় এবং সেটি হলো কাঁথার কেন্দ্রবিন্দুতে একটি পদ্ম মোটিফ। এর চারদিকে থাকে এককেন্দ্রিক কতগুলি বৃত্ত, যা দেখতে তরঙ্গায়িত লতা বা শাড়ির পাড়ের মতো। কাঁথার চার কোণায় কিংবা পদ্মের চতুর্দিকে বর্গাকৃতির যে নকশা থাকে তার চার কোণায় গাছের মোটিফ বা কল্কার নকশা করা হয় এবং সেগুলি কেন্দ্রীয় মোটিফের দিকে মুখ করা থাকে। কেন্দ্রীয় এবং কৌণিক মোটিফের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাগুলি প্রকৃতি ও খামার বাড়ি কিংবা বাস্তব জীবন অথবা লোককাহিনীর দৃশ্যমূলক মোটিফ দ্বারা পূর্ণ করা হয়। কাঁথায় ব্যবহৃত পুষ্প মোটিফ ছাড়াও আবর্তক মোটিফগুলি হচ্ছে: স্বস্তিকা, কুলো, অলঙ্কার , হাতি, বাঘ, ঘোড়া, ময়ূর, নৌকা, জগন্নাথদেবের রথ, নৃত্য, শিকার, নৌকা বাইচ , রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতি হিন্দু দেবতা এবং হিন্দু পুরাণের বিভিন্ন দৃশ্য। মোটিফ এবং দৃশ্যবিহীন জায়গাগুলি তরঙ্গায়িত কাঁথাফোঁড়ে সেলাই করা হয়।

অন্য দুই প্রকার কাঁথা হলো: পাড়তোলা কাঁথা– এর সমস্তটাই শাড়ির পাড়ের ঢঙে নকশা করা হয় এবং লহরি বা লোহিরা কাঁথা– এতে মোটা সুতায় ঘন কারুকাজ করা হয়। পাড়তোলা কাঁথার ঘন কারুকাজের ক্ষেত্রে পাড় ও নকশার মধ্যে কোন ফাঁক থাকে না, তাই পুরো কাঁথাটাকেই তাঁতে বোনা কাপড়ের মতো মনে হয়। অধিকাংশ কাঁথাই অশিক্ষিত মহিলাদের হাতে তৈরি, তবে কোন কোনটিতে বাংলা অক্ষরে অনেক প্রবাদ, আশীর্বাদ, এমনকি কোন কোন মোটিফ ও দৃশ্যের শিরোনামও লেখা হয় সেলাইয়ের মাধ্যমে। একটি কাঁথায় দেখা গেছে শিল্পী তাঁর জামাতাকে

Dhaka University Institutional Repository

আশীর্বাদ করছেন: 'সুখে থাকো'। কোন কোন কাঁথায় শিল্পীর স্বাক্ষর থাকে, যা তার এবং যার জন্য এটি তৈরি হয়েছে তার মধ্যেকার সম্পর্ককে নির্দেশ করে। কোন কোন কাঁথায় গ্রহীতার নামও দেখা যায়। নকশি কাঁথার বৃহত্তম সংগ্রহ সংখ্যায় প্রায় দু'শত কিংবা তারও বেশি হবে। কলকাতার ঠাকুর পুকুরের গুরুসদর যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। নকশি কাঁথা সম্পর্কে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল, সেকালে এ শিল্প সম্ভার প্রীতি উপহার হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। কখন বাজারের পণ্যে পরিণত হয়নি। স্টেলা ক্র্যামরিশ উল্লেখ করেছেন, 'তিন পুরুষের পরিশ্রমের ফল এমন কাঁথাও তিনি দেখেছেন।' গুরসদয় যাদুঘরে দশ-বিশ বছরে প্রস্তুত নিদর্শনের অভাব নেই। এ গুলো অতীতের বঙ্গ নারীদের গভীর স্নেহ ভালবাসার প্রতীক। নকশিকাঁথার রক্ষিত নিদর্শনগুলো থেকে দেখা যায় যে, পূর্ববঙ্গের মহিলারাই এ চারু শিল্পটির প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন।[১০৭] পশ্চিমবঙ্গের ঠাকুরপুকুরের গুরুসদয় জাদুঘরে এরূপ একটি কাঁথায় লেখা আছে, জনৈকা মানদাসুন্দরী তাঁর পিতার জন্য নিজ হাতে কাঁথাটি তৈরি করেছেন। ফরিদপুরের একটি কাঁথায় কৃষ্ণকাহিনীর একটি দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাতে গাছের উপরে বসা কয়েকজন নগ্ন মহিলার একটি দৃশ্যের নীচে শিরোনাম লিখিত হয়েছে: বস্ত্রহরণ। ব্যবহারিক কাঁথা তৈরি কখনও বন্ধ না হলেও বিশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান, মেশিনে তৈরি জিনিসপত্রের প্রাচুর্য এবং রুচির পরিবর্তন এক সময়ের শিল্পসমৃদ্ধ এই নকশি কাঁথাকে বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যায়। তবে বর্তমান বছরগুলিতে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে নৃতাত্ত্বিক শিল্পকলার প্রতি মানুষের আগ্রহ কাঁথাশিল্পের পুনরুজ্জীবনে উৎসাহের সৃষ্টি করেছে।

প্রকারভেদ ও উপাদান:

এ অপরূপ সুচিকর্মগুলো সর্বদাই কোন নির্দিষ্ট মাপে তৈরি হত মনে করা ভুল হবে। এ শিল্প বস্তুর বিভিন্ন আকারের বস্তুর নামও বিভিন্ন ছিল। সবচেয়ে বড় বস্তুর নাম ছিল লেপ। তুলার লেপের মত এগুলো ব্যবহার হত। অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের নাম ছিল 'সজনী'। সজনীর আয়তন ৬ ফুট / ৪ ফুট হয়। এগুলো বিছানার আবরণ হিসেবে ব্যবহার হয় এবং সম্মানিত অতিথিদের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত থাকত। আরো ছোট মাপের নকশি কাঁথার নাম ছিল 'বেতন'। বেতন আকারে চৌকো। চৌকো বালিশ, বাক্শ, তোরঙ্গ, আসবাবপত্র ঢাকার জন্য ব্যবহার হত। আয়না চিরুণি প্রভৃতি প্রসাধন সামগ্রী জড়িয়ে রাখার জন্য লম্বা আকারের আর এক শ্রেণীর নকশি কাঁথাও প্রস্তুত হত। তার নাম ছিল 'আরশিলতা'। পান সুপারি, জাঁতি প্রভৃতি ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বহনের জন্য নকশি থলির নাম ছিল দুর্জনী। পাতলা জমিনের সব থেকে ছোট শিল্প বস্তুকে বলা হত 'রুমাল'। যা ব্যবহার সাধারণ রুমাল থেকে পৃথক ছিল না।

এসবেরই উপাদান ছিল জীর্ণ পুরাতন শাড়ি, পাতলা এক রঙা বস্ত্র এবং পাড়ের সুতা। বঙ্গ নারীর কুশলী আঙুলের জাদুস্পর্শে, স্নেহ-পরায়ণ হৃদয়ের উত্তাপ সে সামান্য উপকরণও রূপান্তরিত হত অসামান্য কারুকৃতিতে। এ শিল্পকর্ম এত নিখুঁত এবং বিভিন্ন নকশার সমন্বয় যে, এ শিল্পকর্মটি সম্পন্ন করতে গৃহবধুদের অনেক সময় লেগে যেত। অবশ্য বেশি সময় ধরে কাজটি তারা সম্পন্ন করত। এর পিছনে দুটি যুক্তি দাঁড় করানো যায়। প্রথমত মহিলারা সংসারের কাজ সম্পন্ন করে অবসর সময়ে এ কাঁথা সেলাই করত। দ্বিতীয়ত যেহেতু এ শিল্পটির বাণিজ্যিক ভিত্তি ছিল না সেহেতু আস্তে ধীরে তার অবসর যাপনের সময়টিতে কাজ করত। এছাড়া বড় যুক্তি হল একটি বস্ত্রে নকশায় একাধিক সুচি নকশা এবং কৌশল প্রয়োগ করত। যা দ্রুত সম্পন্ন করা কঠিন ছিল। অতীতের এরকম দু'চারটি শিল্পকর্ম হাতে নিয়ে পরীক্ষা করলেই বুঝা যায়।[১০৮]

---

১০৭. বাংলাপিডিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪

১০৮. বাংলাপিডিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৫

Dhaka University Institutional Repository

বুনন পদ্ধতি :

পুরাতন ধোয়া কাপড় পাঁচ-সাত প্রস্থ পরপর সাজিয়ে যে কোণা থেকে সাদা সুতার হেম বা মুড়ি সেলাই আরম্ভ হত। এভাবে চারধারে মুড়ি দেয়া শেষ হলে কাঁথার ভেতর ফাঁক ফাঁক করে বড় বড় দাঁড়া সেলাই দিয়ে সাতপরত কাপড়টি আটকিয়ে ফেলা হত। তারপর নকশার কাজ শুরু হত। এ নকশা চিত্রনে নানা রঙের সুতার সাহায্যে বিবিধ প্রকারের অজস্র ফোঁড় ব্যবহার হত। লাল জমিনের সর্বাংশে আবৃত হত সাদা এবং বিভিন্ন রঙের সুতার অতি সূক্ষ্ম সেলাই।

প্রথমে নকশার সুক্ষ্মতা ও তারতম্য দেখে মনে হয় সুঁচালো কাঠ কয়লা বা অনুরূপ কিছু দিয়ে জমিনের উপর অঙ্কন কর নকশা। বহু সংখ্যক নকশি কাঁথা পরীক্ষা করে জানা যায় এ ধারণা ভুল। প্রাথমিক কোনো ড্রইং ব্যতীতই শিল্পীরা শুধু ফোঁড়ের সাহায্যে নকশাগুলোতে ফুটিয়ে তুলত। কাজের সুবিধার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে কল্পিত চিত্রটির মোটামুটি একটা আউট লাইন কোনো কিছুর সাহায্যে অথবা সুঁচের সাহায্যে নেয়া হত। ব্যবহৃত ফোঁড়ের নানাবিধ রকমারি ছিল। ফুল, লতা-পাতা, পশুপাখি বা নরনারীর মূর্তির ভেতরের অংশগুলো ভরাট করা হত দুবার দাঁড় সেলাই দিয়ে একটানা ফোঁড়ের সাহায্যে। তারপর ভেতরের অংশগুলো ভরাট করা হত আড়াআড়ি ফোঁড়ের সুতা ফেলে। নকশি কাজ শেষ হলে জমিনের ফাঁকা অংশগুলো সাদা সুতা অসংখ্য সূক্ষ্ম সেলাই চালিয়ে কাঁথাটির সর্বাংশে দৃঢ় করা হত। ফোঁড় তোলার সুচিন্তিত কৌশলে দু'পিঠে একই রকম নকশা ফুঁটিয়ে কিছু কিছু দোরাখা কাঁথা প্রস্তুত হত। অসামান্য দক্ষতা এবং অতি দীর্ঘকালের পরিশ্রম যুক্ত না হলে এহেন শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হত না।

সাধারণত এ শিল্পে কালো, লাল, কমলা, সবুজ ও হলুদ রঙের প্রাধান্য বেশি। এর মধ্যে প্রাকৃতিক বস্তুর রঙের ধারণা রেখেও রঙ ব্যবহার করা হত। এর ফলে কম বেশি সব রঙ এসে যেতো। এখন নকশি কাঁথা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার হচ্ছে সেই জন্য এর নকশা, সেলাই এবং বিভিন্ন ফোঁড়ের কৌশল পরিবর্তন এবং সংক্ষিপ্ত হয়। এর ফলে অতীতের মত এখন আর দীর্ঘ সময় না লাগলেও ৩ থেকে ৬ মাস লেগে যায়।

নকশা নির্বাচন :

নকশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রাথমিক কতকগুলো নিয়ম মেনে চলা হত। কেন্দ্রীয় চিত্রটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রস্ফুটিত এক পদ্মের। পদ্মশ্রী সমৃদ্ধির প্রতীক। তার রেশ নকশি কাঁথাতেও এসে লেগেছিল। এছাড়া ফল, ফুল, পাখি, কাল্পনিক কল্পবৃক্ষের প্রতীক, নয়তো ধর্মীয় কোনো আদর্শ ব্যবহার হত। নর-নারী, জমিদার মহাজন, পুরোহিত, গোয়ালিনি, মেছুনি, বর-বধূ, ফিরিঙ্গি, ঘোড়া সওয়ার, পালকি, গরুও গাড়ি, গ্রাম্য দৃশ্য ইত্যাদি ব্যবহার হত। পশুপাখির ক্ষেত্রেও বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া, গরু, ষাঁড়, কুকুর, বেড়াল, হরিণ, ময়ূর এমনকি নানা প্রকার মাছও ঐ নকশায় স্থান পেত। হুকো, ঢেঁকি, বাসন, জাঁতি, কাঁচি, আয়না-চিরুণি, কাজল লতা, পিল সুজ প্রভৃতি গৃহ সামগ্রী ঐ কাঁথায় স্থান পেত। বস্তুত নকশি কাঁথাগুলোকে সেকালের পল্লীবালাদের সরল চিত্তকাশের এক নির্মল দর্পণ বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও জামালপুরের নকশি কাঁথার মধ্যে পূর্বের নকশা, সেলাই এবং বিভিন্ন ফোঁড়ের পরিবর্তন দেখা যায়। সাধারণত পূর্বের নকশি কাঁথায় যে নকশা এবং ফোঁড় ব্যবহার হত তার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বের নকশি কাঁথায় পল্লীবালাদের মনের অভিব্যক্তি ফুটে তোলা হত। এর ফলে একই বস্ত্রে বিভিন্ন নকশার সমাবেশ দেখা যায়। যেমন, নদী, পুকুর, ফুল ঘর, আকাশ,

Dhaka University Institutional Repository

শস্যক্ষেত্র, হালচাষ কোনো কিছুই বাদ যেত না। বর্তমানে আধুনিক যুগে এর কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। যেমন নকশার পরিবর্তন। একই নকশা সম্পূর্ণ বস্ত্রে অংকন করে কাঁথা সেলাই বা ফোঁড় ব্যবহার করা হয়েছে। তাবে পূর্বের ন্যায় ফোঁড়ের কৌশল ও পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। নকশা হিসেবে পূর্বে যেমন শুধু প্রকৃতির নকশা ব্যবহার হত কিন্তু বর্তমানে তার পরিবর্তন হয়েছে। এখন নকশি কাঁথায় জ্যামিতিক নকশা, প্রাকৃতিক নকশা দুটিই ব্যবহার হচ্ছে। ফোঁড় হিসেবে সাদাসিদা ফোঁড়, মার্টিন ফোঁড়, কখনো কখনো ভরাট ফোঁড় ব্যবহৃত হচ্ছে। সুচি নকশার এবং ফোঁড়ের কৌশলের পরিবর্তনের ফলে পূর্বের ন্যায় এতো সময়ের প্রয়োজন হয় না। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। চাঁপাই নবাবগঞ্জ এবং জামালপুরের নকশি কাঁথার নকশা এখন বিভিন্ন বস্ত্রে এবং গৃহ সজ্জায় ব্যবহার হচ্ছে। শাড়ি, ওড়না, কামিজ, টেবিল ক্লথ, ঘর সাজাবার সামগ্রী, দেয়াল সজ্জা, বিছানার চাদর, গায়ের চাদর ইত্যাদি।[১০৯]

ছাপা শিল্প :

বাংলাদেশে ছাপা বস্ত্রশিল্পের বর্তমান সম্ভাবনাময় এবং উজ্জ্বলতর অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। ছাপা পদ্ধতি যদিও অতিপ্রাচীন কিন্তু বাংলাদেশে স্বাধীন হওয়ার পর এ দেশে এ শিল্পের সূচনা কখন, কিভাবে এবং কার প্রচেষ্ঠায় সুচিত হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট সময় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নেই। স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশে ছাপা শাড়ির তেমন উৎপাদন ছিল না। ছাপা বস্ত্রের ব্যবহার ছিল। কিন্তু অধিকাংশ বস্ত্র পশ্চিম পাকিস্থান থেকে আসতো। স্বাধীনতার পর নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রান্ত হয়ে ছাপা বস্ত্রের আধুনিকায়ন ঘটে। এ ব্যাপাওে উদ্যোক্তা হিসেবে বাংলাদেশ টেক্সটাইল কর্পোরেশন এর অবদান প্রচুর। বিটিএমসি থেকে ছাপা শাড়ি, বস্ত্র, বিছানার চাদর ইত্যাদি উৎপাদন হয়।

এসব বস্ত্রের রঙ, গুণাবলী এবং মানের দিক থেকে বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ। এছাড়া এসব বস্ত্রকলগুলোতে পপলিন, বয়েল, থান কাপড়, শার্ট সুটিং এবং শাড়ি তৈরি গ্রে বিপুলভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। দেশের এক কোটি বস্ত্রশিল্পের উপযুক্ত পরিবেশ দেশের বস্ত্রশিল্প বিকাশকে গতিশীল করেছে। এর ফলে বর্তমান ছাপা বস্ত্রশিল্প দ্রুত বিকাশমান এবং অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি শিল্প।

স্বাধীনতার পর নানা বাধাবিঘ্ন প্রতিকূলতার মধ্যে ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় ছাপা শাড়ির আধুনিকায়ন ঘটে। এর মধ্যে স্ক্রিন ছাপা শাড়ির প্রচার বেশি হয়। কারণ এ ছাপা দুই পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। কুটির শিল্প হিসেবে হাতে ছাপা এবং মেশিনে ছাপা। মেশিনে ছাপার প্রচার বেশি এবং উৎপাদনও বেশি। বাংলাদেশে ছাপা শাড়ির প্রসার প্রথম ১৯৬২ সালে স্ক্রিন ছাপা শাড়ি তৈরি শুরু হয়। এরপর শিল্প প্রযুক্তির অপ্রতুলতার মধ্যে সম্ভবমানময় এ শিল্পকে এগিয়ে নিতে উদ্যোগি হলেন তৎকালীন ঢাকার রেইনবো ডাইং।

স্বাধীনতা উত্তরকালে আমাদের ছাপা শাড়ি জগতে নতুন মাত্রা যুক্ত করেন যুব টেক্সটাইল। দেশে প্রথম উচ্চমানের ছাপা শাড়ি তৈরি করেন। অনেক আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে তারা ঐ নতুন প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত সফলতা লাভ করেন। তারপর এ সৃজনশীল কর্মের প্রচেষ্ঠাকে সফলতার রূপদান করেন রহমান ট্রেডিং নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এরপর নকশার বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করে উচ্চমানের দেশীয় ছাপা শাড়ি তৈরি করেন সোনার ডাইং।

---

১০৯. বস্ত্র ও পরিচ্ছদ : ব্যবহারিক শিল্পকলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

দেশীয় ছাপা শাড়ি শিল্পের বিকাশে জনী টেক্সটাইল, পাকিজা, প্রাইড টেক্সটাইল এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব প্রতিষ্ঠান শাড়ি শিল্পকে নানাভাবে সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতাসহ দেশীয় উৎপাদকের উৎপাদিত শাড়ি বাজারজাত করে আসছে।[১১০]

বাংলাদেশে কয়েক প্রকার ছাপা বস্ত্র প্রস্তুত হয়ে থাকে। যেমন- ব্লক ছাপা, বাটিক ছাপা, টাই-ডাই ছাপা এবং স্ক্রিন ছাপা। এর মধ্যে স্ক্রিন ছাপা বৃহৎ আকারে বাজারজাতকরণ হয়েছে। স্ক্রিন ছাপা পদ্ধতি দুভাবে করা হয়। প্রথমত মেশিনচালিত তাঁতে ছাপা, দ্বিতীয়ত হস্তচালিত তাঁতে ছাপা। মেশিনচালিত তাঁতে ছাপা শাড়ি বা বস্ত্রের চাহিদা যেমন বেশি, উৎপাদনের পরিমাণও বেশি। কিছু সৌখিন ব্যবসায়ী একটি ব্যতিক্রমধর্মী নকশার বস্ত্রে বা শাড়িতে হস্তচালিত স্ক্রিন ছাপা বস্ত্র প্রস্তুত করে থাকেন।

এমব্রয়ডারী শিল্প :

বর্তমানে পোশাকে বিভিন্ন নকশাকে এমব্রয়ডারীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। এ এমব্রয়ডারীকে একটি শিল্প হিসেবে আখ্যা দেয়া যায় । কাপড়ে নিখুতভাবে সেলাই করে বিভিন্ন ডিজাইন করাকে বস্ত্রশিল্পের পরিভাষায় এমব্রয়ডারী বলা হয়। বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলের মহিলারা কাজের ফাকে যে অবসর পান সেই অবসরে নকশি কাথা সেলাই করতেন। নকশি কাথায় ফুল ও পাতাসহ বিভিন্ন বিভিন্ন রকমের ডিজাইন আকা থাকে। অবশ্য শহর এলাকায়ও এই শিল্প প্রসার লাভ করেছে। শহরের মহিলা কিংবা মেয়েরা নকশি কাথা ও নকশা করা শাড়ি সেলাই করেন । হস্তচালিত সুইয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা নকশি কাথার বাজাওে খুব বেশ চাহিদা সৃষ্টি হয়। ফলে আধুনিক যুগে বিভিন্ন রকমের সেলাই মেশিন দিয়েও এমব্রয়ডারীর কাজ করা হয়। তাতে অবশ্য হাতের কাজ এর গুরুত্ব কোন অংশে কমে যায় নি। তবে হস্তচালিত সুইয়ের চেয়ে মেশিনে এমব্রয়ডারীর নকশা সুন্দর ও দ্রুততা আসে। ফলে এমব্রয়ডারী শিল্প বিকশিত হয়।

হোসিয়ারি শিল্প:

বাংলাদেশের পাবনা জেলায় হোসিয়ারী শিল্প বস্ত্র উৎপাদনের একটি প্রাচীন কুঠির শিল্প বলা চলে। পাবনার হোসিয়ারি শিল্পের উত্থান হয়েছিল ১৯১৮ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে। ওই সময় পাবনার গেঞ্জি রপ্তানি হতো ভারত, পাকিস্তানসহ কয়েকটি দেশে। ১৯২২ সালে এই গেঞ্জি কারখানা দেখতে নেতাজি সুভাস বসু পাবনায় এসেছিলেন। ১৯৭০ সালের পর দেশে অস্থিতিশীল অবস্থা দেখা দিলে পাবনার এই শিল্পে ভাটা পড়ে। তবে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে আবার কারখানাগুলো চালু হয়।

হোসিয়ারি শিল্পের অতীত ও বর্তমান:

পূর্বে পাবনায় শতাধিক নিটিং মেশিন চালু ছিল। যেসব মেশিনে গেঞ্জির থান কাপড় তৈরি হতো। কিন্তু রং ও সুতার দাম বেড়ে যাওয়ায় এসব নিটিং মেশিন বন্ধ হয়ে গেছে। এখন ঢাকা থেকে গার্মেন্টস জুট কিনে পাবনায় গেঞ্জি বানানো হচ্ছে। অন্যদিকে শ্রমিকের মজুরি অনেক গুণ বেড়ে গেলেও প্রতিযোগিতার কারণে গেঞ্জির দাম বাড়ানো সম্ভব হয়নি। সব মিলিয়ে পাবনার হোসিয়ারি শিল্প কারখানাগুলো বন্ধ হওয়ার পর্যায়ে চলে এসেছে।

---

১১০. বস্ত্র ও পরিচ্ছদ : ব্যবহারিক শিল্পকলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্যবাহী হোসিয়ারি শিল্প রং ও সুতার চড়া দাম, শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি, ঋণের চড়া সুদ ও বাজারজাতকরণের অসুবিধার কারণে শিল্প ধ্বংসের পথে। সুনামধারী নিট থান গেঞ্জির পরিবর্তে পাবনার এই শিল্প এখন গার্মেন্টসের কাটপিসনির্ভর হয়ে পড়েছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় পুঁজির অভাবে অনেকেই ব্যবসা পরিবর্তন করেছে ।

বর্তমানে নিট থান কাপড়ের স্থলে গার্মেন্টসের জুট কাপড় দিয়ে পাবনার হোসিয়ারি শিল্প পরিচালিত হয়। কিন্তু জুট কাপড় সংগ্রহের অভাবে কাঁচামাল সংকট দেখা দিয়েছে। আবার আমাদের তৈরি পণ্য বাজারজাতকরণে নানা সমস্যা রয়েছে। অনেক সময়ই হোসিয়ারি পণ্য সরবরাহে ব্যবসায়ীদের আইনি জটিলতায় পড়তে হয়। পাবনা থেকে অন্য জেলায় গেঞ্জি পাঠাতে গেলে পাচার বলে তা বিভিন্ন চেকপোস্টে আটকা পড়ছে। এভাবে কাঁচামালসংকট এবং বাজারজাতকরণের অসুবিধার ফলে পাবনার হোসিয়ারি শিল্পের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

বর্তমানে পাবনায় প্রায় এক হাজার হোসিয়ারি কারখানার ১০ হাজারের বেশি শ্রমিক কাজ করছে। যেসব শ্রমিকের পরিবার নিয়ে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রায় ৪০ হাজার মানুষের জীবন জীবিকা। তাই পাবনার হোসিয়ারি শিল্পে সরকারের শুভ দৃষ্টি প্রয়োজন। সরকার সল্প সুদে ঋণ দিয়ে রং-সুতার দাম কমানোসহ বাজারজাতকরণের সমস্যা দূর করলে তা আবার ফিরে আসবে আগের অবস্থায়। দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে অংশগ্রহণসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নেও রাখতে পারবে বড় ভূমিকা।

আদি কুঠির শিল্প থেকে তৈরি পোশাক শিল্প :

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনে কুটির শিল্পের গুরুত্ব বিষয়ে নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এই খাত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে, কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ হ্রাস করতে, জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষায়, ভারী শিল্পের সহায়ক শিল্প হিসেরে ভূমিকা পালনসহ গ্রামীণ পর্যায়ে স্বল্পমূল্যে প্রাপ্ত কাঁচামালের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। কুটির শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশীয় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন মাত্রা সম্প্রসারিত হয়ে মুদ্রাস্ফীতির চাপ হ্রাস করে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল করে জাতীয় অর্থনীতিতে বিরাজমান অসমতা হ্রাস করে। জাতীয় অর্থনীতিকে একটি সুস্থ-সবল কাঠামোর উপরে দাঁড় করাতে কুটির শিল্প ক্রমবর্ধমান বৈষম্যমূলক অর্থনীতির লাগামহীনতা টেনে ধরে। সার্বিক বিবেচনায় কুটির শিল্প নারীর ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নে মাইলফলকের ভূমিকা রেখেছে।

খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, নরসিংদী, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, ভৈরব, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ জেলাসমূহের বিভিন্ন গ্রামে কুটির শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কুটির শিল্পে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর কথা বলতে গেলেই বাঙালি মানেই স্মরণে আসবে মসলিনের কথা, যা একদিন বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁত শিল্পে এখন আর সেই মসলিন নেই। তবে তাঁত শিল্প শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা ইত্যাদি উৎপাদনে ভূমিকা রাখছে। এই জাতীয় শিল্পকর্ম ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, কুমিল্লা, পাবনা, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া, ভৈরব, টাঙ্গাইল, বরিশাল, পিরোজপুর ও রাজশাহী জেলায় অধিকতর দেখা যায়। তাঁত শিল্পে কাঁচামালের জোগান দেয় চরকা শিল্প। এ শিল্পের জন্য কুমিল্লা, নরসিংদী, টাঙ্গাইল ও রাজশাহী জেলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চরকা শিল্পে বিশেষ করে মহিলাদের অংশগ্রহণ অধিক।[১১১]

---

১১১. বস্ত্র ও পরিচ্ছদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতির বাস্তবতায় দেশে শ্রমনিবিড় উৎপাদন কৌশল ব্যবহারের অধিক যৌক্তিকতা থাকলেও ক্ষুদ্র শিল্পও যন্ত্রপাতিনির্ভর হতে যাচ্ছে। যার ফলে কুটির শিল্পও হয়ে যাচ্ছে বহুলাংশে মূলধননির্ভর। সে কারণে শ্রমনির্ভর ক্ষুদ্র শিল্প পড়ছে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে।

পাশাপাশি কাঁচামালের স্বল্পতা, অদক্ষ শ্রমিক, প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবসহ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে সম্ভাবনাময় এ খাতটি জাতীয় অর্থনীতিতে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে পারছে না। সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

দেশের যে গ্রামগুলো এক সময়ে কুটির শিল্পকে আঁকড়ে ধরে তাদের জীবন-জীবিকার গতিধারা ভরে রাখতো আনন্দ-উচ্ছ্বাসে সময়ের ব্যবধানে সে গ্রামগুলো হারিয়েছে দীর্ঘকালের লালিত ঐতিহ্য। পরিবর্তন এসেছে তাদের পেশায়। বাঁচার জন্য তারা পূর্বপুরুষের পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় করেছে মনোনিবেশ। অবশ্য পেশা পরিবর্তনকারী গ্রামীণ জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু দক্ষতা অর্জন করেছে পুরানো পেশায়ই।

হস্তচালিত তাঁত থেকে মেশনারী বুনন:

বাংলাদেশে তাঁত শিল্প খুবই প্রাচীন। পূর্বে বাংলাদেশে শুধু হস্তচালিত তাঁতশিল্প ছিল। বর্তমানে হস্তচালিত তাঁতের সাথে সাথে লোহার তাঁত, বিদ্যুত চালিত তাঁত ও কম্পিউটারচালিত তাঁতে বস্ত্র বুনন হয়। যন্ত্রচালিত তাঁতশিল্পের আগমণের পূর্ব হতেই বুনন, রঙ করা এবং নকশার ব্যাপারে এদেশের বিশেষত ঢাকার তাঁতিরা খুবই উচ্চমানের দক্ষতা অর্জন করে। অত্র অঞ্চলের তাঁতিদের দিয়ে তৈরি সুতি ও সিল্ক বস্ত্রের গুণাগুণ ও পরিমাণ দেখে সমগ্র পৃথিবীর লোকেরা আশর্য্যান্বিত হত।

হস্তচালিত তাঁতশিল্প অথবা যন্ত্রচালিত তাঁতশিল্পের যে কোনো অঙ্গনে সর্বভারতীয় বিবেচনায় বাংলাদেশ সবকিছু অগ্রপথিক। চাই তা রেশম হোক বা পাট শিল্প যাই হোক না কেন। এর মধ্যেও কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ আছে যারা সবকিছু উপেক্ষা করে তাঁতশিল্পকে অগ্রগতির পথে নিয়ে আসে। এর ফলে বাংলাদেশের বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের গতিধারার পরিবর্তন হয়। পূর্বে হস্তচালিত তাঁতে বস্ত্র প্রস্তুত হত। পরবর্তীতে যন্ত্রচালিত তাঁতে পোশাক প্রস্তুত হওয়া শুরু হয়। বর্তমানে বস্ত্র ও পোশাক শিল্প প্রস্তুতকরণ এমন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে যা বর্ণনাহীন। এখন পোশাক প্রস্তুত শুধু গৃহাভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ নেই। গৃহের বাইরে প্রথমে বিভিন্ন ছোট ছোট ফ্যাক্টরিতে পোশাক প্রস্তুত হত। তারপর বড় বড় প্রতিষ্ঠান যেমন গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে পোশাক প্রস্তুত হচ্ছে। এরচেয়ে চকমপ্রদ বিষয় হচ্ছে বর্তমানে বস্ত্র ও পোশাক কম্পিউটার এর মাধ্যমে বস্ত্রের নকশা, পোশাকের গঠন, মাপ ও নকশা প্রস্তুত করা হচ্ছে। মানুষের চাহিদা যত দ্রুত বাড়ছে প্রযুক্তির মাধ্যমে তার চাহিদাও মেটাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

এটি সর্বজনবিদিত সত্য যে, ঢাকার তাঁতিরা হস্তচালিত তাঁতের মাধ্যমে উচ্চমানের বস্ত্র প্রস্তুত করত। বাস্তবিক পক্ষে তখন এ তাঁতশিল্প কম বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণশীল গ্রামে গড়ে উঠে। ১৯ শতকের প্রথম ভাগ পযর্ন্ত যে ঢাকাই মসলিন পৃথিবীতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তা তাঁতের মাধ্যমে তৈরি হত। পরবর্তীকালে ম্যানচেস্টারের কারখানায় তৈরি বস্ত্র বাজারে আসার ফলে এদেশের হস্ত চালিত তাঁতশিল্পের উপর মরণাঘাত পড়ে।

১৯০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে অন্যান্য জিনিসের সাথে বিদেশী বস্ত্র বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। স্বদেশী বস্ত্র অর্থাৎ তাঁত বস্ত্রের উপর খুবই জোর দেয়া হয়। এর ফলে তাঁতিরা নতুন কণ্ডে বস্ত্র প্রস্তুত করার প্রেরণা পায়। এ ব্যাপারে খেলাফত আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলন তাঁতশিল্পের প্রচার কিছুটা সাহায্য করে। ভারত-পাকিস্থান বিভাগের পূর্বে এসব অঞ্চলে তাঁতশিল্প খুবই

Dhaka University Institutional Repository

উন্নত অবস্থায় ছিল। কেননা তখন পৃথিবীর সর্বত্র কারখানায় উৎপন্ন বস্ত্রের মন্দাভাব এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল। পাকিস্থান স্বাধীনের পরই শুধু পূর্ব পাকিস্থানেই নয় বরং সমগ্র পাকিস্থানে তাঁতশিল্পের প্রচুর উন্নতি লাভ করে। বস্ত্রেও চাহিদা পূরণের জন্য এবং সাধারণ লোকের চাহিদা পূরণের জন্য তাঁতশিল্পের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এর ফলে তাঁতিরা তাঁতশিল্প উন্নত করার জন্য যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে তাঁতশিল্প এদেশের বৃহত্তর কুটির শিল্প। এ শিল্প হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে পরিচালনা করে তাদের জীবিকা অর্জন করত। স্থানীয়ভাবে হিন্দু তাঁতিরা জুগি এবং নাথ বলে পরিচিত ছিল। আর মুসলিম তাঁতিরা মোনেনসর কারিগর নামে পরিচিত ছিল।[১১২]

বাংলাদেশের তাঁতিরা কলকারখানার যুগের পূর্ব হতে বুনন, রঙ করা এবং নকশা করার কাজে পারদর্শী ছিল। তারা বিপুল পরিমাণ শাড়ি, লুঙি, বিছানার চাদর, টাওয়াল, গামছা, শাল, পর্দা, মশারি ইত্যাদি তৈরি করত।

বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের কেন্দ্রগুলো সমগ্র দেশে ছড়িয়ে আছে। তম্মধ্যে ঢাকা জেলার ডেমরা, নরসিংদী, গোপালদি, রায়পুরা, টাঙ্গাইল, পাবনা, শাহাজাদপুর, কুমিল্লার রামচন্দ্রপুর, কুষ্টিয়ার কুমারখালী, যশোরের মেমোননগর, চট্রগ্রামের কক্সবাজার এবং রাজশাহী ইত্যাদি তাঁতশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকা জেলার বাবুর হাট তাঁতশিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র। রাজশাহী রেশমশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। রাজশাহীতে হস্তচালিত তাঁতের সিল্ক শাড়ি বহুপূর্ব হতে প্রস্তুত হত। হস্তচালিত তাঁতশিল্পের মধ্যে ঢাকা 'ঢাকাই মসলিন ও ঢাকাই জামদানি' এর জন্য এবং কুমিল্লা খদ্দর বা খাদির জন্য বিখ্যাত ছিল। টাঙ্গাইল জেলার পাথরাইল, ঘাটাইল ইত্যাদি স্থান সুতি ও সিল্ক শাড়ির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

একসময় বাংলাদেশে খুব সীমিত সংখ্যক কাপড়ের কল ছিল। যার ফলে তাঁতকলে বস্ত্র বোনা ও উৎপাদনও কম ছিল। সে ঘাটতি পূরণ করত হস্তচালিত তাঁত। এছাড়া মিলে তৈরি বস্ত্র ব্যবহারে টেকসই কম এবং পাতলা হওয়ায় গ্রামবাংলার মহিলারা তাঁতের প্রস্তুত বস্ত্র বেশি ব্যবহার করতে পছন্দ করে। এ কারণে পাবনার তৈরি বস্ত্র অধিক সমাদৃত। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর এখানে তাঁতকল প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁতকলে মোটা কাপড় বোনা হত। উন্নতমানের সুতি বস্ত্র, নাইলেন, টেট্রন, লিলেন ইত্যাদি বিদেশ থেরক আমদানি করা হত। এর ফলে উচ্চমূল্যে বস্ত্র ক্রয় করতে হত। উন্নতমানের পোশাক যেমন- সালোয়ার, কামিজ, প্যান্ট, শার্ট-এর জন্য বস্ত্র বিদেশ থেকে আমদানি করা হত। এ প্রকার বস্ত্র হস্তচালিত তাঁতে ভালোও বোনা হত না। মিলে এজাতীয় তাঁতশিল্পের সুতা প্রস্তুত হয় না। বর্তমানে এসব বস্ত্র বোনার জন্য তাঁতকল স্থাপন হয়েছে। এ জাতীয় বস্ত্রের জন্য সুতা এসব মিলে বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত হয়। এর মূল্য তাঁতের সুতা হতে কম। কারখানায় প্রাকৃতিক সুতা এবং কৃত্রিম সুতার বহু বস্ত্র প্রস্তুত হচ্ছে। বিভিন্ন নকশা, রঙ এবং বিভিন্ন প্রকার সুতা ব্যবহার করে তারা বস্ত্র প্রস্তুত করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের প্রসার দেখার জন্য বহু লোক আগমন করেন। এখানকার তাঁতিরা কারিগরের চেয়ে শিল্পী হিসেবে অধিকতর পরিচিত। এ তাঁতশিল্প খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ এটি একক, বৃহত্তর ক্ষুদ্র শিল্প। এটি গ্রাম্য এলাকায় বিপুল পরিমাণে লোকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে কাজ করে।

---

১১২. বস্ত্র ও পরিচ্ছদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে চার প্রকার লুম ব্যবহার হয় এবং বিভিন্ন প্রকার শাড়ি, লুঙ্গি, টাওয়াল, টেবিলক্লথ, মশারি, গামছা এবং বিভিন্ন ব্যবহারিক বস্ত্র প্রস্তত হয়। অনুমান করা হয় যে, বাংলাদেশের সর্বমোট বস্ত্রের চাহিদার ৮০% তাঁত শিল্প দিয়ে পূরণ হয়। বাকি ২০% মিল বস্ত্র দিয়ে পূরণ হয়। বিভিন্ন অসুবিধা এবং সমস্যার মধ্যেও তাঁতশিল্প ধীরে ধীরে সন্তোষজনক প্রগতি লাভ করছে।

পাক-ভারত আমলে উন্নতমানের হস্তচালিত তাঁত-চিত্তরঞ্জন তাঁত পশ্চিম বঙ্গের শ্রীরামপুরে সর্বপ্রথম প্রচলিত হলেও বাংলাদেশের কুষ্টিয়া শহরে প্রথম বিদ্যুতচালিত তাঁত কারখানা স্থাপন হয়। এ মিল বা কারখানা 'মোহিনী কটন মিলস্' নামে পরিচিত। ১৯০৮ সালে মোহিনী কটন মিল মাত্র ৮ খানা যন্ত্রচালিত তাঁত দিয়ে শুরু হয়। ১৯২৯ সালে সুতা কল এবং অন্যান্য বস্ত্র বুননের সহযোগী যন্ত্রাদির সংযোজন সমাপ্ত হয়। এ মিলে প্রস্তুত বস্ত্র যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এ মিল হতে ধুতি, শাড়ি প্রস্তুত হত। উৎপাদিত বস্ত্র সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৮ সালে মোহিনী মিল প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে আর কোনো টেক্সটাইল মিল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ দীর্ঘকাল স্থবিরতার জন্য যেসব কারণ বিদ্যমান ছিল তারমধ্যে সবচেয়ে প্রকট ছিল শিল্প উদ্যোক্তার অভাব।

কথিত আছে বাগেরহাটে একটি বস্ত্রশিল্প কারখানা ছিল। কিন্তু সে বস্ত্র শিল্পের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। বর্তমান শতাব্দির চল্লিশ দশকের শুরুতে যখন এদেশে প্রথম সমবায় আন্দোলন শুরু হয় সেসময় বাগেরহাটের সমবায় সমিতির উদ্যোগে একটি বস্ত্র শিল্প কারখানা প্রস্তুত হয়। প্রথমে হস্তচালিত তাঁতের সাহায্যে কাপড় উৎপাদন শুরু করে এ কাজে যথেষ্ট বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়। ১৯৪০ সালের ২৯ শে নভেম্বর অবিভক্ত বাংলার গভর্নর স্যার জোন আর্থার হার্বার্ট কো-অপারেটিভ উইভিং মিল উদ্বোধন করেন। কিন্তু নানা ধরনের কোন্দলের কারণে সে বস্ত্র শিল্পটি বিলীন হয়ে যায়। চল্লিশের দশক থেকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্থান সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্প স্থাপনের গতি ছিল নিতান্ত ধীর। এ সময়ের মধ্যে এদেশের মাটিতে বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য বস্ত্র শিল্প স্থাপন হয়নি।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পযর্ন্ত তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্থানে মাত্র ৬ টি টেক্সটাইল মিল স্থাপিত হয়। ১৯৫৪ সালে যে ৬ টি মিল স্থাপিত হয়েছিল তার অন্তরালে তিন প্রকার কারণ ও মনোভাব কার্যকর ছিল। যথা:

১. পশ্চিম পাকিস্থানের কিছু পুঁজিপতি পূর্ব পাকিস্থানকে ব্যবসায়িক বাজার হিসেবে ব্যবহার করতেন।তারা পশ্চিম পাকিস্থান বা অন্য কোনো দেশ হতে সুতা এখানে বিক্রি করার চেয়ে যদি পূর্ব পাকিস্থানে শিল্প কারখানা প্রস্তুত করা হয় তাহলে অল্প ব্যয়ে উৎপাদনের মাধ্যমে বেশি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে এখানে মিল স্থাপন করেন।

২. কিছু কিছু প্রগতিশীল বাঙালি ব্যবসায়ী বিদেশ ও পশ্চিম পাকিস্থানের উপর নির্ভরশীলতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় টেক্সটাইল মিল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। এ সূত্রে বগুড়ার জনাব মজিবুর রহমান ভাণ্ডারীর পৃষ্ঠপোষকতায় বগুড়া কটন এন্ড স্পিনিং মিল এবং জনাব একে খানের পৃষ্ঠপোষকতায় চিটাগাং মিল স্থাপিত হয়।

৩. ১৯৪৯ সাল থেকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কারণে পূর্ব পাকিস্থানে পশ্চিম পাকিস্থানের সাথে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়। এছাড়া সমগ্র পাকিস্থানের ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্থানীদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় সমগ্র উন্নয়ন বাজেটের বেশিরভাগ অর্থ পশ্চিম পাকিস্থানে খরচ হত। এসব কারণে বস্ত্র মিলগুলোও সেভাবে স্থাপন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পযর্ন্ত বাংলাদেশে ৫টি টেক্সটাইল মিল স্থাপিত হয়। এগুলো হলো- ১৯৫৪ সালে আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিল, ১৯৫৭ সালে চাঁদ টেক্সটাইল মিল, ১৯৫৮ সালে এশিয়াটিক কটন মিল, ১৯৫৯ সালে ইস্ট পাকিস্থান টেক্সটাইল মিল এগুলো সংস্থাপনের ব্যাপারে একদিকে যেমন ছিল পশ্চিমা গ্রুপের আগ্রাসন নীতি তেমনি বাঙালি গ্রুপের প্রগতিশীল প্রতিযোগিতা।

ষাটের দশকে বাংলাদেশে স্থাপিত হয়েছে ২৬ টি টেক্সটাইল মিল। ১৯৫২ সালে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের পরে বাঙালি জাতির সচেতনার ফলে ২৬ টি মিলের মধ্যে ১৬ টি মিল স্থাপিত হয় বাঙালি মালিকানায়। এর ফলে অনেক বাঙালি উদ্যোক্তার শিল্প স্থাপনের পথ সুগম হয়।

১৯৭১ সালের যুদ্ধে অধিকাংশ তাঁতশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯৭২ সালে ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয়করণ অধ্যাদেশ জারি করে বাংলাদেশে টেক্সটাইল মিল কর্পোরেশন গঠন করে বস্ত্রশিল্পকে চালু করার নির্দেশ দেন। এতে প্রায় দুই হাজার মিল স্থাপিত হয়।

১৯৭৯ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বস্ত্র শিল্পকে স্পেসালাইজড তাঁত শিল্পের উপর ছেড়ে দেন। এর ফলে ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে কয়েকটি মিল স্থাপিত হয়। এসব মিল হতে গ্রে বস্ত্র, ছাপা, অভেন, ডেনিম, পলিস্টার, অলিমার, নাইলন ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তন্তুর বস্ত্র প্রস্তুত হয়। রাজশাহী সেরিকালচারের মাধ্যমে শিল্প বস্ত্র বুননের মিল স্থাপন করা হয়। সেখান থেকে বর্তমানে বিভিন্ন রঙ, নকশা এবং ছাপার সিল্ক শাড়ি এবং বস্ত্র প্রস্তুত করা হয়। এছাড়া হস্তচালিত তাঁতেও সিল্ক বস্ত্র প্রস্তুত হচ্ছে।

বস্তুত ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত যন্ত্রচালিত তাঁতশিল্পের পাশাপাশি হস্তচালিত তাঁতশিল্পের যথেষ্ট প্রসার ছিল। যন্ত্রচালিত তাঁতের মূল্য বেশি হওয়ায় বাংলাদেশে হস্তচালিত তাঁত বস্ত্রের চাহিদা বেশি হয়। স্বাধীনতার পূর্বে মিলের বস্ত্রের প্রসার লাভ করায় বাংলার তাঁতশিল্পের অবস্থার অবনতি ঘটে। বর্তমানে সে ঝুঁকি কেটে উঠেছে। বস্ত্রের ভাল নকশা, রঙ এবং জমিন ব্যবহারের ফলে মেশিন তাঁতের পাশাপাশি হস্তচালিত তাঁতের চাহিদা ও গুরুত্ব বেড়ে গেছে। বর্তমানে হস্তচালিত তাঁতের সাথে সাথে লোহার তাঁত, বিদ্যুত চালিত তাঁত ও কম্পিউটারচালিত তাঁতে বস্ত্র বুনন হয়। এর ফলে নাইলন, পলিস্টার, পলিমার, ব্লেন্ডেড সুতা ও মাস এন্ডওয়ার সুতার বস্ত্র প্রস্তুত হচ্ছে। এর ফলে বর্তমানে আভিজাত্যের পোশাক হিসেবে বাংলাদেশের বস্ত্র স্বীকৃতি পেয়েছে।

উপসংহার :

পোশাক মানব সমাজের একটি মৌলিক চাহিদা। সমাজবদ্ধ ও গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাসের ফলে বিভিন্ন প্রকার চাহিদা সৃষ্টি হতে থাকে। এ বিভিন্ন প্রকার চাহিদার মধ্যে পোশাক অন্যতম। পৃথিবীর প্রথম মানব আদম (আ.) ও মানবী হাওয়া (আ.) এর সৃষ্টির পরপরই এক সাথে বসবাসের জন্য লজ্জা ঢাকার প্রয়োজনে পোশাকের সৃষ্টি হয়। এ দিক থেকে পোশাকের ইতিহাস মানব জাতির ইতিহাসের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। মানবজাতি বৃক্ষের পাতা, গাছের ছাল, বাকল, পশুর চামড়া ও লোম ইত্যাদি দিয়ে পোশাকের ব্যবহার শুরু করলেও ক্রমান্বয়ে বস্ত্রের প্রয়োজন নানাভাবে উপলব্ধি করতে শুরু করে। এভাবেই বর্তমান সময় পর্যন্ত পোশাকের প্রয়োজনীয়তা হেতু মানুষ বিভিন্ন রকমারী পোশাক উৎপাদন করেছে।

ভারতীয় উপমহাদেশ বিশেষত বাংলাদেশে পোশাক শিল্প বিকাশের গতিধারা প্রাক্-মুগল যুগে ঢাকা ও তার সন্নিহিত কয়েকটি এলাকার হস্তশিল্প ও তাঁতের কাজ ইত্যাদির

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসকে বুঝায়। প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কারুশিল্পের জন্য খ্যাত। পঞ্চম শতাব্দীতে বাংলার সর্ববৃহৎ বন্দরনগরী তাম্রলিপ্তির সাথে দক্ষিণ ভারত, সিংহল, বার্মা, মালয়, পারস্য উপসাগর এবং দূরপ্রাচ্যের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। এই সময়ে প্রধান প্রধান উন্নত শিল্পসমূহের মধ্যে বস্ত্রশিল্প ছিল সর্বপ্রধান। ঢাকার মসলিন খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৫ থেকেই বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করে। মসলিন তৈরি করার জন্য দরকার হতো বিশেষ ধরনের কার্পাস বা তুলা। এ বিশেষ ধরনের কার্পাসটি মেঘনা নদীর তীরে ঢাকা জেলার কয়েকটি স্থানে জন্মাতো। শ্রীরামপুর, কেদারপুর, বিক্রমপুর, রাজনগর ইত্যাদি স্থানগুলো ফুটি কার্পাসের জন্য বিখ্যাত ছিল। এর সুতা থেকে সবচেয়ে সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র তৈরি হতো। বস্ত্র তৈরির উপাদান হিসাবে তুলাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। বস্ত্র তৈরির অন্যতম একটি উপাদান ছিল পাট। প্রাচীনকাল থেকে প্যাকেজিংয়ের কাঁচামাল হিসেবে পাট ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার আগে এটি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে রশি, হাতে তৈরি কাপড়, শিকা ও গৃহসজ্জার সামগ্রীসহ গৃহস্থালি ও খামারে উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মধ্যযুগে বাংলায় পাটজাত দ্রব্যের মধ্যে গানিবস্তা ও পাটশাড়ির বহুল ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায়। পাট ও পাটজাত সামগ্রী বহুল ব্যবহৃত। পাটজাত দ্রব্যের প্রথাগত ব্যবহার প্রধানত পাকানো সুতা, শক্ত কাপড়, চটের ব্যাগ, টুইল কাপড়, কার্পেট ব্যাকিং, উল-প্যাক, মাদুর, মোটা কাপড়, দেয়াল-আচ্ছাদন, গালিচা ও বিভিন্ন ধরনের গৃহসজ্জার বস্ত্র প্রভৃতি। পাট সূতা দিয়ে কুটির পর্যায়ে শাড়ি ও লুঙ্গি তৈরি হতো। পাটকল প্রতিষ্ঠার আগে বাংলার তাঁতিরা স্থানীয়ভাবে সুতলি, দড়ি ও গরিবদের জন্য বস্ত্র তৈরিতে পাট ব্যবহার করত। পাটকল প্রতিষ্ঠার পর বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল হিসেবে পাট ব্যবহৃত হতে থাকে। এছাড়া বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল হিসেবে বাংলায় রেশম উৎপাদিত হত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুদূর ইতালিতে বাংলার এই রেশম গাঙ্গেয় সিল্ক নামে পরিচিত ছিল। গ্রামের গৃহস্থরা রেশম উৎপাদন পর্যায়ে তুঁত চাষ, রেশমগুটি লালনপালন এবং সুতা কাটার কাজ সম্পন্ন করে। তারপর সেই সুতা নিকটবর্তী গ্রাম বা শহরে রেশম বস্ত্র তৈরির জন্য তাঁতিদের কাছে বিক্রয় করে।

বস্তুত দূরাতীত কালে বাংলার নানা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধ হয়ে বর্তমান পোশাক শিল্পের রূপ লাভ করেছে। বাংলায় ব্যাপকহারে তুলা, পাট ও রেশমের উৎপাদন হত। এখানকার তাঁতিরা তা দিয়ে মসলিন ও জামদানির মতো বিখ্যাত কাপড় প্রস্তুত করত। ফলে সুচিশিল্প, তাঁতশিল্প, নকশা, ছাপাশিল্প ইত্যাদির বিকাশ ঘটতে থাকে। বস্ত্রশিল্পের স্থানীয় কাঁচামাল, স্থানীয় তাঁতীদের দক্ষতা ও নিপুণতা, হস্তনির্ভর সুচিশিল্প হতে তাঁতশিল্প, তাঁতশিল্প থেকে যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন, সুইয়ের মাধ্যমে নকশা তোলা থেকে কম্পিউটার মাধ্যমে কারুময় নকশা, তুলির ব্যবহারে নানা রঙের নকশা থেরক আধুনিক ছাপা ইত্যাদি এ অঞ্চলের বস্ত্রশিল্পের ক্রমবিকাশের ধারা ও ইতিহাস। ফলে বাংলাদেশের বর্তমান তৈরি পোশাক রপ্তানির ইতিহাস প্রাচীনকালে সুক্ষ্ম মসলিন ও জামদানির রপ্তানির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নারী শ্রমঃ প্রকৃতি ও অবস্থান

* পোশাকশিল্প ও জাতীয় অর্থনীতি
* দেশের শ্রমজীবী নারী ও পুরুষ
* রাষ্ট্রীয় খাতে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান
* বাংলাদেশের বর্তমান দারিদ্র পরিস্থিতি ও নারী শ্রম
* বাংলাদেশের নারী শ্রমিক ও অর্থনীতির মুক্তি
* বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ
* শ্রম বাজারে নারী-পুরুষ বৈষম্য
* পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকদের অবস্থা ও অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

পোশাক শিল্প ও জাতীয় অর্থনীতি:

বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্পখাতে আন্তর্জাতিক বাজারে পদার্পণ করেছিল ১৯৭৬ সালে। সে বছর ২টি প্রতিষ্ঠানের প্রথম চালান হিসেবে পশ্চিম জার্মানিতে পাঠানো হয়। ৭৬–৭৭ অর্থবর্ষে রফতানিমূখী তৈরি পোশাক শিল্প সত্যিকার অর্থে যাত্রা করে বিশ্ববিপনীর পথে। এরপর ক্রমশঃ উদ্যোক্তা ও ইউনিটের সংখ্যা এবং উৎপাদন ও আয়ের পরিমাণ বাড়তে থাকে। একই সাথে উন্মুক্ত হতে থাকে আর্থ-সামাজিক মুক্তি ও সমৃদ্ধির এক অভাবিতপূর্ব স্বর্ণদ্বার। বাণিজ্যের দিগন্তে উদিত হতে থাকে সম্ভাবনার উজ্জ্বল সূর্য।

১৯৮৩ সালের মধ্যে দেশে রফতানিমুখী গার্মেন্টস শিল্প কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০-এ। একই বছর আরো দু'শতাধিক উদ্যোক্তা এই শিল্প স্থাপনের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন পেশ করেন। ১৯৮৩ – ৮৪ সালে ২৫০টি এবং পরের বছর দ্বিগুণ সংখ্যক গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান ছিল যারা হয় স্থাপিত, না হয় অনুমোদনপ্রাপ্ত, নতুনা ব্যাংক ঋণ অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন। ১৯৮০–৮১ সালে এই খাতে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অনুর্ধ ৬ কোটি টাকা । মাত্র তিন বছরে ৮৩–৮৪ সালে তা ৭০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। একটি সূত্র জানায়, ৬৭ সালে যখন বাংলাদেশী গার্মেন্টস ধীরে ধীরে রফতানি বাজারে প্রবেশ করে, সে সময়ে দেশে কারখানা ছিল মাত্র ৪টি। এগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল বার্ষিক মোট সোয়া ১০ লাখ পিস জামা ও শিশু পোশাক। মাত্র ৮ বছরে উৎপাদনশীল গার্মেন্টস কারখানার সংখ্যা পৌঁছে ২০৩-এ। আর সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১,০৬০.৩ লাখ পিস। অর্থাৎ কারখানার সংখ্যা ৫১ গুণ এবং উৎপাদন ক্ষমতা ১০৩ গুণ বেড়ে গিয়েছিল।[১]

পোশাক রফতানির বাজারে বাংলাদেশের কয়েক দশক আগেই প্রবেশ করেছিল জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং, সিংগাপুর। পরে থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া এই খাতে বেশ এগিয়ে যায়। গার্মেন্টস শিল্পের প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি তৈরির ক্ষেত্রে ভূমিকা রয়েছে জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের। সাম্প্রতিককালে চীন ও তাইওয়ান গার্মেন্টস শিল্পের যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে।

প্রথম কয়েক বছরের রফতানি আয়:

১৯৬৭ – ৭৭	৯৮,০০০ টাকা
১৯৭৭–৭৮	১০,২৯,০০০.০০
১৯৭৮–৭৯	১৫,৬৩,০০০.০০
১৯৭৯–৮০	১০,০৮০.০০০.০০
১৯৮০–৮১	৫,২৯,৮৫,০০০.০০
১৯৮১–৮২	১৪,০১,৪২,০০০.০০
১৯৮২–৮৩	২৫,৫২,১৮,০০০.০০

১. আবুল কাসেম হায়দার ও মিজানুল করীম, তৈরী পোশাক শিল্প : একটি মূল্যায়ন, শিল্পায়ন ও উন্নয়ন, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, প্যানোরমা পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯৭, পৃ. ২৩১

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮২ সালে বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের কারখানা বা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী ছিল মাত্র ২১টি, পরের বছর তা দাঁড়ায় ৬৫টিতে। ৮৪ সালে ১৮০টি, ৮৫ সালে ৫৮৭টি, ৮৬ সালে ৬০১টি, ৮৭ সালে ৬৫৮টি, ৮৮ সালে ৭১২টি, ৮৯ সালে ৭৩৭টি, ৯০ সালে ৭৮০টি এবং ৯১ সালে ৯৩৪ টি গার্মেন্টস শিল্প ছিল।[২]

বিজিএমই কর্তৃক প্রদত্ত এই পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মাত্র এক দশকে গার্মেন্টস এর কারখানা ৬৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী দিনেও এ ধারা অব্যাহত থাকারই কথা।

বিজিএমই-এ সূত্রে জানিয়েছেন ১৯৯২ সালে কেবল গার্মেন্টস শিল্পখাত থেকেই বাংলাদেশ ৫,৬০০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে। মাত্র এক বছরের মধ্যে এ ক্ষেত্রে আয় বেড়েছে শতকরা ৪০ ভাগ। এটা বাংলাদেশের মতো আমদানি নির্ভর উন্নয়নশীল দেশের জন্য এক যুগান্তকর ঘটনা।

বিজিএমই-এ ইতিপূর্বে ৯৫ সালে গার্মেন্টস রফতানি করে ১২ হাজার কোটি টাকা আয়ের টার্গেট স্থির করেছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে, এই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উক্ত সময়সীমার মধ্যে অর্জিত করা সম্ভব বলে সমিতির প্রধান জনাব মোশাররফ হোসেন জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ বেকারত্বের ক্রমবর্ধমান বোঝার দুঃসহ ভারে দিন দিন ন্যুব্জপৃষ্ঠ কুব্জদেহ হয়ে পড়েছে। কর্মসংস্থানের অভাব এখন অন্যতম প্রধান জাতীয় সমস্যা। দেড় কোটি বেকার যুবকের ইস্যুটি বর্তমানে সরকারের প্রধান সংকটগুলোর একটি। আর বিরোধী দলীয় রাজনীতির মূল্যবান 'হটকেক'।

এমনি এক গুরুতর পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে গার্মেন্টস খাত পালন করে চলেছে ঐতিহাসিক ভূমিকা। ১৯৯২ সালে এই শিল্পে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে লাখ নতুন লোক। ফলে গার্মেন্টস কর্মীর সংখ্যা মাত্র ১২ মাসের ব্যবধানে ৫ থেকে ৭ লাখে উন্নীত হয়েছে। এদের ৮৫ শতাংশই মহিলা। জনসংখ্যার অর্ধেক নারী তাদের কর্মসংস্থানের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে বলে আশা করা যায়। এদিক দিয়ে গার্মেন্টস যে অবদান রাখছে তার সাথে অন্য কোন শিল্পের তুলনাই চলে না। বিগত এক বছরে কারখানার সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজিএমই এ-র মতে এই অগ্রগতি শুধু আশাব্যঞ্জক নয়, আশাতীত। ১৯৯১ সালের শেষে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী ছিল ৯৩৪টি। এক বছরের সীমিত সময়ে তার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৫০-এ। গত ৩১শে মার্চের মধ্যে আরো ৪টি কারখানা স্থাপিত হয়েছে।[৩] এসব প্রতিষ্ঠানই বিজিএমই-এর সদস্য। এর বাইরেও কিছু গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী রয়েছে। প্রধানত রাজধানী ঢাকা ও বন্দর নগরী চট্টগ্রামেই ফ্যাক্টরীগুলো অবস্থিত।

৯২ সালের হিসাব মোতাবেক আমাদের রফতানি আয়ের ৬০ শতাংশই আসে গার্মেন্টস থেকে। সে তুলনায় পাট, চামড়া, চা'র মতো ঐতিহ্যবাহী ও প্রচলিত পণ্যগুলোর অবদান নগন্য। এবারে পাট ও পাটজাত দ্রব্য থেকে রফতানি আয়ের ১৮ শতাংশ, চামড়া থেকে ৭ শতাংশ, হিমায়িত খাদ্য থেকে ৬ শতাংশ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি থেকে ২ শতাংশ এবং চা থেকে ১ শতাংশ অর্জিত হয়েছে।

গার্মেন্টস যে কী দ্রুত গতিতে রফতানিমুখী শিল্প হিসেবে বিকশিত হয়েছে, তা বুঝা যাবে এর দ্বারা অর্জিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ থেকে। ১৯৮৩ সালে ২,০৬৪ মিলিয়ন ডলার (মার্কিন) আয় করেছিল। তা এক দশক পেরুবার পূর্বেই ৯২ সালে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩,৮৫৫ মি. ডলারে অর্থাৎ প্রায় ৬০ গুণ।[৪]

---

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

Dhaka University Institutional Repository

এর মধ্যবর্তী বছরগুলোতে আয় হয়েছিল নিম্নরূপ:

সাল	মিলিয়ন ডলার (মার্কিন)
১৯৮৪	৭২.৭৮ মিলিয়ন ডলার
১৯৮৫	১১৫.৫২ মিলিয়ন ডলার
১৯৮৬	২১৩.৪৪ মিলিয়ন ডলার
১৯৮৭	৩৫৮.৯৬ মিলিয়ন ডলার
১৯৮৮	৪৪৪.৯৯ মিলিয়ন ডলার
১৯৮৯	৫৪১.৩৪ মিলিয়ন ডলার
১৯৯০	৭১০.৪৮ মিলিয়ন ডলার
১৯৯১	৯৭৬.৯৫ মিলিয়ন ডলার

বাংলাদেশী পোশাকের সর্বপ্রধান ক্রেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এরপরই আসে জার্মানীর নাম। ৯২ সালে দেখা গেছে আমাদের রফতানিকৃত গার্মেন্টস সামগ্রীর ৪২% যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ১৭%, ফ্রান্স ১০%, ইটালী ৯%, বৃটেন ৮%, নেদারল্যান্ড ৫% এবং ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, স্পেন ও কানাডা ২% করে ক্রয় করেছে।[৫]

আবার এক্ষেত্রে শুধু ইউরোপীয় অর্থনীতিক গোষ্ঠীর (ইইসি) দেশগুলোর দিকে লক্ষ্য করে দেখা যায়, জার্মানী ৩০%, ফ্রান্স ও ইটালী ১৭%, বৃটেন ১৫%, নেদারল্যান্ড ৯%, বেলজিয়াম ও স্পেন ৪% করে আমদানী করেছে। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ ইইসি দেশসমূহে ১১ কোটি ৮০ লাখ পিস তৈরি পোশাক রফতানি করেছিল। মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে এর পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে পৌঁছেছে ২২ কোটি পিসে।

আমেরিকার বাজারে বাংলাদেশী গার্মেন্টসের কদর এতে বেশী বেড়ে গিয়েছিল যে, মার্কিন ক্রেতারা বিপুলভাবে এগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়েন। এরপর বাংলাদেশের গার্মেন্টস রফতানির উপর সেখাকে কোটা আরোপ করা হয়। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী আইটেমের সংখ্যা ৩১। গত বছর শুধু সেদেশেই পোশাক সরবরাহ করে বাংলাদেশ আয় করেছে ২,৮২৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা।[৬]

পাশের দেশ কানাডাতেও আমাদের গার্মেন্টস পণ্যের বাজার এত বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হয় যে তারাও কোটা আরোপ করেছে। এখন ওখানে কোটাভুক্ত ক্যাটাগরী বা আইটেমের সংখ্যা ৬। এটা সত্যিই আমাদের জন্য বিরাট গর্বের বিষয় যে, বাংলাদেশ আজ গার্মেন্টস-এর সরবরাহকারী হিসেবে বহু রফতানিকারক দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ৭ম, কানাডায় ৯ম এবং (শার্ট ও টি-শার্টের ক্ষেত্রে) ইইসি রাষ্ট্রগুলোতে ১ম স্থানে অধিষ্ঠিত। বর্তমানে সারা দুনিয়ার অন্ততঃ ৪৫টি দেশে বাংলাদেশী পোশাক রফতানি হচ্ছে। গার্মেন্টস শিল্পের উদ্যোক্তাদের প্রয়াস এখানেই থেমে নেই। তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে জাপান, অষ্ট্রেলিয়ান, মধ্যপ্রাচ্য, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ প্রভৃতি অঞ্চলে রফতানির নতুন নতুন বাজার পাওয়া যায়। তা ছাড়া ইসি-র সদস্য দেশগুলো বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অতিসম্প্রতি বিজিএইমএ'র উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্রতিনিধি দল ঐসব দেশে সফর করেছেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের আলোচনা সন্তোষজনক ও ফলপ্রসূ বলে জানা গেছে।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩
৬. The Financial Times, 26th March.

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোপরি পোশাক শিল্পের ব্যাপক প্রসারের সাথে সাথে ব্যাংক, বীমা, শিপিং, গৃহায়ন, পর্যটন, পরিবহন, হোটেল, স্থল ও নৌ কনটেইনার সার্ভিস, ডাক ও কুরিয়ার, টিএন্ডটি, প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, শুল্ক প্রভৃতি বহু ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মতৎপরতার মধ্যে দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে। এই শিল্পকে ঘিরে প্রতিষ্ঠিত অন্ততঃ দু'শ বায়িং হাউসে কর্মসংস্থান হয়েছে বহু লোকের।

গার্মেন্টস শিল্পের ব্যাপক অগ্রগতির ফলে অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে বিপুল কর্মচাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। কার্টন, সেলাই সূতা, লেবেল, পলিব্যাগ, গামটেপ, নেকবোর্ড, ইলাষ্টিক, জিপার, প্লাষ্টিক, ব্লাকবোর্ড, পেপার কোন প্রভৃতি। উল্লেখ্য হ্যাংগার, কলার ইনসার্ট, ক্লিপ, পি.পি ব্যান্ড, বাটার ফ্লাই প্রভৃতির জন্য প্লাষ্টিকের প্রয়োজন হয়। এমনকি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপেরও প্রসার ঘটছে পোশাক শিল্পের যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, আগে ষ্টীম আয়রণ ও বয়লার পুরোপুরিই আমদানি করতে হতো বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে। আর এখন এগুলো তৈরি হচ্ছে দেশেই।

গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে নিয়োজিত আছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী। এরা প্রায় সবাই নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। এদের চাহিদা মিটাতে স্বল্পমূল্যের বিভিন্ন পণ্যের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে ৬ লক্ষাধিক মহিলা কর্মীর জন্য সস্তা প্রসাধনী শাড়ি, স্যান্ডেল প্রভৃতি উৎপন্ন হচ্ছে এসব কারখানায়।

পশ্চাদ সংযোগ শিল্প (Backward link Industry)- ক্ষেত্রে, বিশেষ করে দেশী বস্ত্রের উৎপাদন বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থেই হয়ে পড়েছে একান্ত অপরিহার্য। উরুগুয়ে রাউন্ডের আলোচনা শেষ হলে Multi Fibre Arrangement (MFA) উঠে যেতে পারে। এই পটভূমিতে বিদেশী কাপড়ের আমদানি হ্রাস এবং স্বদেশী কাপড়ের মান ও পরিমাণ, উভয়ই বৃদ্ধি করতে হবে আন্তর্জাতিক চাহিদা মোতাবেক। উন্নতমানের বস্ত্র যত বেশী উৎপন্ন হচ্ছে, গার্মেন্টস শিল্পে স্থানীয় কাপড়ের ব্যবহারও তত বেড়ে চলেছে। গত ৭ বছরে এখানে দেশী কাপড়ের চাহিদা বেড়েছে ১০ গুণ। ৮৫ সালে এর পরিমাণ ছিল ২০ লাখ গজ। আর ৯২ সালে তা পৌঁছেছে ২ কোটি গজে। কিন্তু তা মোট চাহিদার তুলনায় একেবারেই নগণ্য। এ বছর গার্মেন্টস শিল্পের জন্য ৭০ কোটি মিটারের বেশী বিদেশী বস্ত্র আমদানি করা হচ্ছে। এজন্য ব্যয় হবে ৬৫ কোটি ডলার মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা।

লন্ডনের বিখ্যাত 'দি ফিননাশিয়াল টাইম'স পত্রিকা গত ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এদেশে সাম্প্রতিককালে অর্জিত বিভিন্ন অগ্রগতির উপর একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। এতে প্রশংসার সুরে বলা হয় "এখানে পোষাক শিল্পে নিয়োজিত আছে ৭ লাখ ৩৮ হাজার লোক। গত বছর এখানে রফতানি আয় হয়েছে ১৫০ কোটি ডলার যা ৮৯ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ (আসলে আড়াই গুণের বেশী)।[৭] বিশিষ্ট সমাজ গবেষক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. নজরুল ইসলাম বলেন, "গার্মেন্টস এর মতো একটা বেসিক সেক্টরে কর্মসংস্থান মানে কয়েকটা নন বেসিক সেক্টরেও কর্মসংস্থান সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়া। এভাবে অর্থনীতিতে পড়ে বিরাট প্রভাব।"[৮] গার্মেন্টস কর্মীদের আয় সৃষ্টি করছে চাহিদা। ফলে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের স্বার্থে শিল্পের বিকাশ ঘটছে।

---

৭. Ibid, P.

৮. Ibid, P

Dhaka University Institutional Repository

রপ্তানীমূখী তৈরী পোশাক শিল্প এদেশের একটি নতুন শিল্প সংস্থাপনা। তবে একথা সত্য আমাদের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র শিল্পের এ এক আধুনিক সংযোজন। সেই সাথে আজকের অর্থনৈতিক বাস্তবতা হলো এদেশের রপ্তানীমূখী তৈরী পোশাক শিল্প ঐতিহ্যবাহী পাট এবং পাটজাত পণ্য সামগ্রিক রপ্তানী আয়কে ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে। তা আজ দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানের (১৯৯১–৯২) অর্থ বছরে মার্চ ৯৩ পর্যন্ত এই খাত থেকে আয় হয় ৫ হাজার ৬ শ কোটি টাকা, যা আমাদের গোটা রপ্তানী আয়ের সিংহ ভাগ।[৯]

এই শিল্প সংস্থাটি যে নতুন এবং ব্যতিক্রমধর্মী, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পোশাক শিল্প এককভাবে দেশের অর্থনীতিকে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছে। পোশাক শিল্পের এক বিরাট সংখ্যক মানুষের কর্মের সংস্থান করেছে। এতে করে দেশের বিপুল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মের সংস্থান হয়েছে।[১০]

পোশাক শিল্প আরো যেসব সহায়ক শিল্পকে বিকশিত করেছে। সেসব শিল্পের মধ্যে রয়েছে কার্টন, পলি ব্যাগ, বোতাম, সেলাইয়ের সূতা, ওভেন লেবেল, ধোলাই ইউনিট। এছাড়া ব্যাংকিং ও বীমার ব্যবসায়ের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছে। শিপিং লাইনকে সমৃদ্ধ করেছে, সড়ক পথের ট্রান্স এজেন্সিগুলোর আয় বাড়িয়েছে। পর্যটন ও হোটেল ব্যবসায়কে প্রসারিত করেছে, শহরগুলোতে বাড়ী নির্মাণ ও ভাড়ার সুবন্দোবস্ত করেছে। শুধু তাই নয় পোশাক শিল্পে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় এখানে কর্মরত মানুষগুলোর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ৭ লাখ মানুষ নিজেদের এবং তাদের স্বজনদের জন্য ভোগ্য পণ্য ক্রয় করতে পারছে। এর ফলে ভোগ্য পণ্যের একটি বিরাট বাজার সৃষ্টি হয়েছে। নয়া বাজার সৃষ্টি হওয়ায় এসব শিল্পেরও বিকাশ হয়েছে সেখানেও নয়া কর্মের সংস্থান ঘটেছে।[১১] এসব ভোগ্য পণ্যের ভিতর রয়েছে সস্তা প্রসাধনী, শাড়ী, অন্যান্য কাপড়, বিভিন্ন প্রকারের সেন্ডেল সহ অন্যান্য পণ্য।

সামগ্রিকভাবে পোশাক শিল্পের সহায়ক শিল্প সেক্টর প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা মূল্যের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছে। দেশের পোশাক শিল্প গড়ে উঠার পূর্বে উল্লেখিত সহায়ক শিল্পগুলোর বিকাশের কোন যৌক্তিক কারণ ছিল না। যেমন কার্টন, পলিব্যাগ, ওভেন লেবেল, ধোলাই ইউনিটের কোন উপযোগিতাই ছিল না। যে শিল্পের কোন প্রয়োজন নেই তার জন্ম বিকাশের কথা চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। ইতিপূর্বে দেশে সাধারণভাবে যে বোতাম ও সূতার চাহিদা ছিল তা বস্তুতঃ আমদানির মাধ্যমেই পূরণ হত। এসব শিল্প বিকাশের সম্ভাবনাও তেমনি ছিল না। কারণ হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে যে চাহিদা ছিল তা পূরণের কোন শিল্প গড়া 'ভায়াবেল' হত না। কিন্তু দেশে পোশাক শিল্পের বিকাশের সাথে সূতা ও বোতামের চাহিদা রাতারাতি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকলে এসব শিল্পের জন্ম ও বিকাশের পথটি উন্মোচন করেছে।[১২]

---

৯. আবুল কাসেম প্রমুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

দেশের প্রধান রপ্তানি আয় হচ্ছে পোশাক শিল্প থেকে। এই খাত থেকে আয় হচ্ছে প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু এই শিল্পের বিনিয়োগ হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকার। প্রতিদিন এই শিল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থ ট্রানজেকশান হচ্ছে। আর এসব অর্থ পুরোটাই ব্যাংক ও বীমা শিল্পের মাধ্যমে হচ্ছে। তাই স্বাভাবিকভাবে এটা অনুধাবন করা যায় দেশের ব্যাংক ও বীমা শিল্পের গতি সঞ্চার পোশাক শিল্পের অবদান এখন কতটা। তাছাড়া ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগের একটি বিরাট সুযোগ ঘটিয়েছে পোশাক শিল্প।

দেশের পোশাক শিল্প শতকরা প্রায় একশ ভাগই রপ্তানীমূখী। সুদূর আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারে এসব পণ্য যাচ্ছে। আর পোশাক শিল্পের কাঁচামাল তথা কাপড় বাইরে থেকে আসে। পণ্য রপ্তানি ও আমদানি হচ্ছে বিভিন্ন শিপিং লাইনের মাধ্যমে। পোশাক শিল্পের বিকাশের ফলে পণ্য পরিবহনের পরিমাণ বিপুলভাবে বেড়ে যাওয়ায় শিপিং লাইনগুলোর ব্যবসা বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত পোশাক শিল্পের উৎপাদিত পণ্য সমুদ্র বন্দরে পৌঁছে দেয়ার জন্য সড়ক পরিবহন এজেন্সিগুলো নিয়োজিত রয়েছে। শুধু মাত্র ঢাকা থেকেই প্রতিদিন শতাধিক ট্রাক চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

দেশের পোশাক শিল্প শতকরা প্রায় একশ ভাগ রপ্তানিমুখী বিধায় এই ব্যবসায়ের সাথে বাইরের 'বায়ার'দের সম্পর্ক গভীর। ব্যবসায়িক কারণেই এইসব 'বায়ার'দের এক বিরাট সংখ্যক প্রতিনিধি প্রতিদিন বাংলাদেশে আসছে এবং যাচ্ছে। এসব ব্যক্তিদের গমনাগমন দেশের হোটেল ও পর্যটন শিল্পকে পরিপুষ্ট করে তুলতে সাহায্য করছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রে যেসকল দেশ পোশাক রপ্তানী করে থাকে তার মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ৪র্থ কানাডায় ৯ম, ইইসি দেশসমূহেও ১০ম স্থান রয়েছে বাংলাদেশের।[১৩] এ থেকে বোঝা যেতে পারে যে, সব দেশের কত প্রতিনিধি ব্যবসায়িক কারণে বাংলাদেশে আসছেন।

465191

ব্যবসায়িক কারণে যেমন বাইরে থেকে বায়ার'রা আসছেন, তেমনি স্থানীয় উৎপাদকদেরও প্রতিনিধি তাদের 'বায়ার'দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। সাধারণতঃ টেলিফোন ফ্যাক্সের মাধ্যমেই এসব যোগাযোগ হয়ে থাকে। দেশে এখন এমন বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যারা ইন্টারন্যাশনাল টেলিফোন ও ফ্যাক্স নিয়ে তাদের দফতর গড়ে তুলেছে। এর মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠান যেমন আয় করছে একই সাথে সরকারী সংস্থা টিএন্ডটি ও বিপুল পরিমাণের রাজস্ব পাচ্ছে। পোশাক শিল্প দেশের পরিবেশকে কোনভাবে দূষিত করছে না বলে এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের প্রায় সর্বত্র গড়ে উঠতে পারছে। আর প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য বিরাট ভবনের প্রয়োজন হচ্ছে। এই চাহিদা পূরণের জন্য নির্মিত হচ্ছে ভবনসমূহ। ভবনের মালিকগণ ভবন ভাড়া দিয়ে নিশ্চিত আয়ের পথ করে নিয়েছেন। পোশাক শিল্পের ব্যবহৃত মেশিনগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্যও স্থানীয়ভাবে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান তাছাড়া এসব প্রতিষ্ঠান ছোট খাটো যন্ত্রাংশও তৈরি করছে।

দেশের শ্রমজীবী নারী ও পুরুষ:

২০০২ সালের জরিপ অনুসারে দেশের মোট ৭ কোটি ৪২ লাখ কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে ৩ কোটি ৯ লাখ উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত; বাদবাকি প্রায় ৩ কোটি লোকের হাতে কোনো উৎপাদনমূলক কাজ নেই। সর্বশেষ সরকারি (শ্রমশক্তি জরিপ) হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তি ৬.৫ কোটি। বিলস (BILS) এর তথ্য মতে, দেশের শ্রমজীবী

---

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের সংখ্যা এখন ৪ কোটি ৬৩ লাখ। এর মধ্যে শ্রমজীবী পুরুষ ৩.৬ কোটি এবং নারী শ্রমিক ১.০৩ কোটি। শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বিসিএস মতে, ৭৪ লাখ ২৩ হাজার; ছেলে শিশু শ্রমিক ৫৪ লাখ ৭১ হাজার এবং মেয়ে শিশু শ্রমিক ১৯ লাখ ৫২ হাজার।[১৪]

১৩ লাখ শিশুশ্রমিক আবার ৬৭ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিযুক্ত। বিদেশে কর্মরত আছে ৩৮ লাখ শ্রমিক। বেসরকারি সংগঠন 'দৃষ্টি' প্রদত্ত তথ্যমতে বিদেশে কর্মরত নারীশ্রমিকের সংখ্যা এখন ৪ লাখ ৩৭ হাজার, যা অভিবাসী পুরুষ শ্রমিকদের ১৫ শতাংশ। অন্যদিকে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর তথ্যমতে শ্রমশক্তির মাত্র ৫ শতাংশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা রয়েছে।

বর্তমানে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত মানুষের মধ্যে ৫১.৭ শতাংশ কৃষিতে এবং বাদবাকি অন্যান্য খাতে। অ-কৃষি খাদের মধ্যে ৩৪.৬ শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন, ব্যাংক-বীমা, পরিবহন ইত্যাদি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত এবং ১৩.৭ শতাংশ শ্রমশক্তি বিভিন্ন শিল্পখাতে নিয়োজিত। মোট শ্রমশক্তির মাত্র ১৩.৭৭ শতাংশ নিয়োগকৃত কর্মী। শ্রমশক্তির ২০.৯ শতাংশ দিনমজুর (শ্রমশক্তি জরিপ)। বিশ্বব্যাংক তথ্যমতে দেশে যান্ত্রিক যানবাহন শ্রমিকদের সংখ্যা ৩ লাখ। সারাদেশে রিকসা শ্রমিক আছে ৬০ লাখ। দেশের রাইস মিলে কর্মরত আছে ৫ লাখ শ্রমিক। দেশের ট্যানারি বা চামড়া শিল্পে আছে ৩০ হাজার শ্রমিক। এ ছাড়াও ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প কলকারখানা বা ইপিজেড গুলিতে (EPZs) প্রায় ১.৫ লাখ শ্রমিক এখন কাজ করছে, যাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হলো আবার নারী শ্রমিক।[১৫]

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর অর্থনীতির দেশ হলেও বিস্ময়কর সত্য যে, কৃষিখাতে শ্রমশক্তি বা কৃষিনির্ভর শ্রমিকের সংখ্যা কমছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্যমতে, ১৯৯৯ সালে ১৯.৪ শতাংশ শ্রমিক কৃষি কাজে নিযুক্ত ছিল। ২০০৪ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৪.৫ শতাংশ। ১৯৯৯ সালেও জনগোষ্ঠীর ২৯.৩ শতাংশ মানুষ কৃষি শ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল। আর ২০০৪ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৩.২ শতাংশ। অন্যদিকে আবার অ-কৃষিখাতের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন-১৯৯৯ সালে ১২.৭ শতাংশ মানুষ যুক্ত ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য খাতে। আর এখন ব্যবসা-বাণিজ্য ও হোটেল-রেস্টুরেন্টে ১৫.৩৪ শতাংশ শ্রমশক্তি নিয়োজিত। এছাড়াও বর্তমানে শ্রমশক্তির ৯.৭১ শতাংশ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে, ৬.৭৭ শতাংশ পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে, ৬.৩২ শতাংশ জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষায়, ৫.৬৪ শতাংশ পণ্য ও বেসরকারি পরিসেবা খাতে এবং ৩.৩৯ শতাংশ নির্মাণ খাতে নিযুক্ত।[১৬]

শ্রমশক্তি বাড়ছে:

বাংলাদেশে এখন প্রতি বছর ২ শতাংশ হারে শ্রমশক্তি বাড়ছে (বিবিএস)। এভাবে প্রতি বছর প্রায় ২০ লাখ নতুন মুখ বাজারে প্রবেশ করছে। তবে গ্রামের তুলনায় শহরে শ্রমশক্তি দ্রুত হারে বেশি বেড়ে চলেছে। নগরে শ্রমশক্তি বৃদ্ধির হার ২০০০ সালে ছিল ১.১৩ শতাংশ, ২০০৩ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬.৯ শতাংশ। শহরের তুলনায় বরং গ্রামে শ্রমশক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে বেশ কম হারে। যেমন ২০০০ সালে গ্রামীণ শ্রমশক্তির হার ৩.৫ শতাংশ থেকে সামান্য বেড়ে ২০০৩ সালে দাঁড়ায় ৩.৬ শতাংশ।[১৭]

---

১৪. দৈনিক যুগান্তর, ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০০০

১৫. ঐ.

১৬. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৪, পৃ. ২২৯

১৭. শ্রমশক্তি জরিপ, ২০০৪, বিবিএস.

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় খাতে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান কমছে:

এক সময় রাষ্ট্রায়াত্ত খাত কিংবা রাষ্ট্রীয় বা সরকারি মালিকানাধীন শিল্প-কলকারখানাগুলি ছিল ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের মূল উৎস। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ১১টি সেক্টর কর্পোরেশনের শিল্প-মিল-কলকারখানাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। এর মধ্যে ছিল সরকারি মালিকানাধিন ২২টি পাটকল, ১৬টি চিনিকল, ১৪টি বস্ত্র কল, ২২টি কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ এবং বন ও পরিবেশ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইস্পাত প্রকৌশল খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের কর্মসূচির (SAP) অধীনে ঢালাও বেসরকারিকরণ করা হয় বহু সরকারি কল-কারখানা। এছাড়া বিশ্বব্যাংকের নির্দেশে লোকসানের অজুহাতে সরকার বন্ধ করে দেয় অনেক মিল-কারখানা।[১৮] সরকারি শিল্প-কারখানাগুলিকে লাভজনক করার কোনো উদ্যোগ না নিয়ে এধরনের আত্মঘাতী পদক্ষেপ গ্রহণের ফল হয়েছে মারাত্মক। একটি দেশের জাতীয় অর্থনীতির মূলভিত্তি স্বরূপ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতের সংকোচন ঘটেছে। বেকার হয়ে পড়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানার লাখ লাখ শ্রমিক কর্মচারী। কেবল এশিয়ার সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজী বন্ধ করায় বেকার হয়েছে ৪০ হাজার শ্রমিক কর্মচারী।[১৯] বর্তমানে সরকারের ৭টি সেক্টর কর্পোরেশনের অধীনে স্বল্পসংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান কোনোমতে খুঁড়িয়ে চলছে। বর্তমানে সরকারি শিল্পখাত বা মিল-কল-কারখানা শ্রমিক-কর্মচারী সংখ্যা মাত্র ৬৭ হাজার হাজার এবং এর সমপরিমাণ রয়েছে অস্থায়ী শ্রমিক। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সরকারি খাতের অবদান এখন মাত্র ৫ শতাংশ। কেননা দেশের মোট বড়-মাঝারি-ছোট সব ধরণের শিল্প-কলকারখানার ৯৮ ভাগই বর্তমানে বেসরকারি মালিকানায়। বেসরকারি শিল্পখাতের ৮০ ভাগই আবার অপ্রাতিষ্ঠানিক বা ইনফরমাল সেক্টর। বিবিএস সর্বশেষ শিল্প শুমারি অনুসারে দেশে ২৪ হাজার ৭৫২টি বড় ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ২৪ হাজার ৫২০টি বেসরকারি মালিকানাধীন। এখানে কর্মরত আছে প্রায় ৬০ লাখ শ্রমিক (BILS)। নির্মাণ শিল্প খাতেই সবচেয়ে বেশি শ্রমিক কর্মরত।[২০]

মন্দা অর্থনীতি কবলিত হওয়ায় শিল্প ও কৃষি কিংবা সরকারি-বেসরকারি কোনো খাতেই শ্রমশক্তি বৃদ্ধির তুলনায় কর্মসংস্থান বাড়েনি। ২০০২ সালের বিবিএস জরিপ অনুযায়ী প্রায় ৩ কোটি মানুষের হাতে কোনো উৎপাদনমূলক কাজ নেই। প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ মুখ আমাদের শ্রম বাজারে প্রবেশ করলেও কর্মসংস্থান বাড়ছে না, বরং বেকারত্বই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ২ কোটিরও বেশি শ্রমজীবী মানুষ। বিশ্বের ২০ শীর্ষ বেকারত্ব কবলিত দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১২তম। বর্তমানে শ্রমশক্তি বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৬৩ কোটি হলেও এর সঙ্গে বেকারত্বও বেড়েছে ১৭ শতাংশ। অর্থনীতি সমিতির মতে, মোট শ্রমশক্তির ৩০ ভাগের হাতে কোনো কাজ নেই। বিভিন্ন খাতে কর্মরত শ্রমশক্তির ৪০ ভাগ মানুষ সারা বছর কাজ পায় না।

অন্যদিকে শ্রমশক্তি জরিপ (২০০৩) অনুযায়ী দেশের ২০ লাখের বেশি মানুষ বা মোট শ্রমশক্তির ৪.৩ শতাংশ পুরোপুরি বেকার, কর্মসংস্থানহীন। এছাড়াও ১.৫ কোটি মানুষ বা মোট শ্রমশক্তির ৩৪.২ ভাগ অর্ধবেকার বা সীমিত কাজের সুযোগ পাচ্ছে। আবার দেশের ২.৩১ কোটি শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ১২.১ লাখ বা ৫.২ শতাংশ বেকার। নগরাঞ্চলে বেকারত্ব কিছুটা হ্রাস পেলেও গ্রামে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০০ সালের তুলনায় ২০০৩ সালে নগরে বেকারত্ব ৫ শতাংশ কমেছে। কিন্তু একই সময়ে আবার

---

১৮. উন্নয়ন পদক্ষেপ, মে-২০০৬, পৃ. ২১
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামাঞ্চলে বেকারত্ব বেড়েছে ৪.১ শতাংশ। তবে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থানহীনতা বা বেকারত্বের শিকার হচ্ছে ২০ থেকে ২৯ বছরের মানুষরা।[২১]

উল্লেখ্য যে, শ্রমিক বা শ্রমজীবীদের কর্মসংস্থানহীনতার একটি মূল কারণ হল ভুল অর্থনৈতিক নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে সরকারি শিল্প-মিল-কল-কারখানা বেসরকারিকরণ এবং লোকসানের অজুহাতে বন্ধ করে দেওয়া। এছাড়াও প্রায় ২ হাজার রুগ্ন কল-কারখানাগুলিকে বাঁচাবার উদ্যোগও সরকারিভাবে না নেওয়ায় সেগুলি এখন বন্ধ হওয়ায় ব্যাপক কর্মচ্যুতির শিকার হচ্ছে মালিক-কর্মচারীরা। বিবিএস সূত্রমতে, ১৯৯৭–২০০০ এই তিন বছরে ছোট-বড়-মাঝারি মিলিয়ে প্রায় ৫ হাজার শিল্প কারখানা বন্ধ হয়েছে। দেশে ১৩৪টি সরকারি-বেসরকারি পাটকলের মধ্যে ২৯টি এখন বন্ধ। এর মধ্যে সরকারি ৭টি। এছাড়াও ১৬টি চিনিকল, ১৪টি বস্ত্রকল, ২২টি কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিসহ বন ও পরিবেশ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইস্পাত-প্রকৌশল খাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হওয়ায় শ্রমজীবীদের বেকারত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে ২৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয় এবং আরো ৪৫টি বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়াধীনে।[২২]

এ সময়কালে দেশের প্রায় ৩০০ ফাউন্ড্রি বা ঢালাই লোহা কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এক লাখের কাছাকাছি শ্রমিক কাজ হরায়। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের আমলে আরো কয়েক হাজার কলকারখানা বন্ধের কারণে ১৫ লাখ নতুন বেকার সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ফার্নেস অয়েল সরবরাহ বন্ধে সরকারি ঘোষণার ফলে ৬ হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠানে এখন উৎপাদন বন্ধ এবং এজন্য বন্ধ ২৫০০ প্রতিষ্ঠান। উপরন্তু দেশীয় বাজারে সংকট এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে গত ১৪ বছরে ২.৫ লাখ তাঁতী বাধ্য হয়ে তাদের পেশা ছেড়ে দিয়েছে।

অন্যদিকে আবার ২০০১ সালে আমেরিকায় টুইন টাওয়ার হামলার ঘটনা এবং তারপর ২০০৫ সাল থেকে গার্মেন্টস খাতে কোটা সুবিধা (MFA) উঠে যাবার দরুণ গার্মেন্টস শিল্পে বিপর্যয় নেমে আসে। বিলস-এর তথ্য মতে, দেশের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি গার্মেন্টস কারখানা এখন বন্ধ। মোট ৪ হাজার গার্মেন্টস-এর মধ্যে পুরোপুরি বন্ধ ১ হাজার এবং বন্ধের পথে আরো ৮০০ কারখানা। এ কারণে বেকার হয়েছে ৬ লাখ শ্রমিক, যাদের ৮৫ ভাগ নারী (বিলস)।

তবে পুরুষেরা তুলনায় নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় নারী বেকারত্বের হার খানিকটা হ্রাস পেয়েছে। ২০০০ সালে নারী বেকারত্বের হার যেখানে ছিল ৭.৮ শতাংশ, তা ২০০৩ সালে কমে দাঁড়ায় ৪.৯ শতাংশ। পুরুষ বেকারত্বের হার এসময় ৩.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪.২ শতাংশ।[২৩]

বাংলাদেশে বর্তমান দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও নারী শ্রম:

বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৬ কোটি ৩০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে এবং ৪ কোটি মানুষের আয় দৈনিক ১ ডলারের নিচে। অনেকে মনে করেন, ২ কোটি ৫০ লাখ মানুষের কোনো আয়ই নেই। নারী, ভূমিহীন ও আদিবাসী মানুষ এই চরম দারিদ্র্যের শিকার। দেশে খাদ্যদ্রব্য (বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের খাদ্যদ্রব্য যেমন মোটা চাল, মাছ, মসলা, সবজি, পেঁয়াজ, লবণ, তেল, ডাল ইত্যাদি), বিভিন্ন মৌলিক ভোগদ্রব্য, স্বাস্থ্যসেবাসহ অন্যান্য সেবার

---

২১. শ্রমশক্তি জরীপ, ২০০৩, পৃ. ১৯
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
২৩. উন্নয়ন পদক্ষেপ, ২২

Dhaka University Institutional Repository

অতি উচ্চমূল্য এবং অন্যদিকে খুবই অল্প আয়ের উভয়বিধ চাপে দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ জীবন যাপন করছেন এবং আরো ২০ শতাংশ খুবই কষ্টসাধ্য জীবনযাপন করছেন।[২৪] পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনের অগ্রগতি হচ্ছে সামান্যই। খাদ্যশক্তি গ্রহণ ভিত্তিতে দারিদ্র্যের অনুপাত ১৯৯৯ সালে ৪৪.৭ শতাংশ থেকে কমে ২০০৪ সালে ৪২.১ শতাংশ দাঁড়ায়।[২৫] অর্থাৎ বছরে গড় দারিদ্র্য কমেছে মাত্র ১.২ শতাংশ হারে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৭ শতাংশ পল্লী এলাকায় বসবাস করে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪০ শতাংশেরও অধিক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। তাদের মাথাপিছু আয় যেমন অত্যন্ত সীমিত, তেমনিভাবে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, যাতায়াত ব্যবস্থা, ঋণ গ্রহণের সুবিধা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।

পল্লীর জনগণের মাঝে এখনো প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি, ঝাড়-ফুঁক প্রভাব বিস্তার করে আছে ব্যাপকভাবে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য দেশে এখনও অবহেলিত। প্রায় ৮৫ শতাংশ শিশুর জন্ম হচ্ছে গ্রামের বাড়িতে, অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের তত্ত্বাবধানে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতা, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে স্থবিরতা, আর্সেনিক প্রাদুর্ভাব, ডায়রিয়া ও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ, শিক্ষিত চিকিৎসকদের গ্রামে যাতায়াতে প্রবল অনীহা পল্লীর স্বাস্থ্যসেবাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

গ্রামাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। গ্রামীণ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ৭৫ শতাংশ মানুষের ঘরে আলো দিতে পারেনি। গ্রামীণ কুটিরশিল্প বহুজাতিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রভাবে বিলুপ্তির পথে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব এতে অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেছে। ভূমির মালিকানা হচ্ছে সংকুচিত। গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় এসেছে ভাঙন। দলীয় রাজনীতি দুর্বিষহ করেছে মানুষের জীবনযাত্রাকে।

একটি দেমের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক ন্যায়বিচারসহ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের জীবনের মান উন্নত ও কল্যাণ বৃদ্ধি করা। নারী-পুরুষ উভয়ের বেলায়ই এটা প্রযোজ্য। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারী সমাজ দেশের অর্ধেক মানবসম্পদ এবং তাই তারা অর্ধেক জনশক্তির প্রতিনিধি। কিন্তু স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা, সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাট বৈষম্য রয়ে গেছে। অব্যাহত এ বৈষম্য এটাই প্রমাণ করে যে, উন্নয়ন, বিনিয়োগ ও উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো নারীর জন্য সমভাবে কোনো উপকার বয়ে আনতে পারছে না। অসম বণ্টন নারীর উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং তা দেশের পরিপূর্ণ ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জাতীয় সামর্থ্যকেও সীমিত করে ফেলেছে।[২৬]

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকে ১৭৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১০৫তম দেশ। নারীর অগ্রগতি, অবস্থান, সামাজিক স্বীকৃতি সব মিলিয়ে জেন্ডারভিত্তিক এই হিসেবে বাংলাদেশ এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পিছিয়ে আছে। রাজনীতি, প্রশাসন, রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণসহ সার্বিকভাবে এগিয়ে চলার সূচকে বাংলাদেশ রয়েছে ৭৯ তম অবস্থানে। কৃষি, শিল্প, সেবাখাতসহ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমশ বাড়লেও পিছিয়ে পড়েছে জাতীয়ভাবে। নির্যাতন আর সহিংসতার রূপ ও পরিমাণ বেড়েই চলেছে।

---

২৪. দৈনিক সমকাল, ২৫ এপ্রিল, ২০০৬

২৫. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৫

২৬. চিররঞ্জন সরকার, নারী ও দারিদ্র্য, স্টেপ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ২০০৭, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

ইউএনডিপি'র হিসাবে, বাংলাদেশের মেয়েদের সাক্ষরতার হার ৩১.৪ ভাগ (পুরুষদের ৫০.৩ ভাগ), অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ৬৬.৫ ভাগ নারী (৭৬ শতাংশ পুরুষ) সরাসরি অবদান রাখছে। কৃষিতে ৭৭ শতাংশ (পুরুষ ৫৩ শতাংশ), শিল্প-কারখানায় ৯ শতাংশ (১১শতাংশ পুরুষ), সেবাখাতে ১২ শতাংশ (৩০ শতাংশ পুরুষ) আর পারিবারিক কাজে ৮১ শতাংশ নারী অবদান রাখছে। উচ্চশিক্ষা আর কারিগরি ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ নারী নিয়োজিত আছে। আইন প্রণয়ন তথা রাজনীতি, প্রশাসন আর উচ্চতর ব্যবস্থাপনার পদে ৮ শতাংশ নারী অংশ নিচ্ছে।[২৭]

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে ১৫ বছরের বয়সের উপরের কর্মক্ষম জনসংখ্যা হচ্ছে ৮ কোটি ৮ লাখ ৪৩ হাজার। এর মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আছে ৪ কোটি ৪০ লাখ ২২ হাজার জন। কর্মক্ষম লোকের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৪ কোটি ৫৮ লাখ ৬৭ হাজার। মহিলার সংখ্যা ৩ কোটি ৪৯ লাখ ৬৭ হাজার। হিসাবে দেখা যায়, যে পরিমাণ জনসংখ্যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩ কোটি ৪২ লাখ ২৫ হাজার এবং নারীর সংখ্যা ৯৭ লাখ ৯৭ হাজার। সরকারের হিসাব মতে, কর্মক্ষম লোকের মধ্যে ৫৪ শতাংশের বেশি বেকার। প্রতি বছর শ্রম বাজারে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে সাড়ে ৪ শতাংশ।[২৮]

কর্মক্ষেত্র বা সরকারি অফিসের কোথাও নারীর প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্য থাকতে পারবে না- এই সাংবিধানিক ম্যান্ডেট (আর্টিক্যাল ২৯) সত্ত্বেও সরকারি চাকরিতে নারীদের উপস্থিতি এখনো সামান্যই রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণও খুবই সামান্য। মজুরি-শ্রমের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে মজুরি-বৈষম্য অনেক বেশি। বিয়ে বিচ্ছেদ, স্বামী কর্তৃক পরিত্যাগ এবং বৈষম্যের ঘটনাও বেড়ে চলেছে। দেশের গ্রামীণ পরিবারের ১৫ শতাংশ এবং ভূমিহীন পরিবারের ২৫ শতাংশ হলো মহিলাপ্রধান। এটিও জেন্ডার-প্রতিকূলতা ও দারিদ্র্যের বহিঃপ্রকাশ। নারী প্রধান পরিবারসমূহের আয় পুরুষ-প্রধান পরিবারসমূহের তুলনায় ৪০ ভাগ কম।

শ্রমশক্তি জরিপ (২০০২–০৩)-এর তথ্য অনুযায়ী, মোট ৫৬ মিলিয়ন (৫ কোটি ৬০ লাখ) শ্রমশক্তির মধ্যে ৩৪.৭ মিলিয়ন (৩ কোটি ৪৭ লাখ) পুরুষ এবং ২১.৩ মিলিয়ন (২ কোটি ১৩ লাখ) নারী। যদিও নারীকে সাধারণত অদক্ষ শ্রমশক্তি বলে বিবেচনা করা হয়। প্রাথমিকভাবেই বাজার উপযোগী দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে নারীকে প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। পেশাগত ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতাসহ প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমশক্তিতে নারীর প্রবেশ ত্বরান্বিত করার পরিবেশ এখনো প্রতিকূলই রয়ে গেছে।[২৯]

বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি মানুষ অতি দরিদ্র অবস্থায় জীবনযাপন করছে যাদের বেশিরভাগই নারী। নারী ও পুরুষ উভয়েই এই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করলেও পুরুষের তুলনায় নারী দারিদ্র্যের বোঝা বহন করে বেশি এবং নারীই মূলত পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম। শহর কিংবা গ্রামের নারীর শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক নানাবিধ সুযোগ সৃষ্টি করা হলেও নারীর কর্মসংস্থানের চিত্র এখনও হতাশাজনক। নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালায় বলা হয়েছে, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নারীর সব চাহিদা পূরণের জন্য জাতীয় বাজেটের বরাদ্দ বাড়াতে হবে। কিন্তু জাতীয় বাজেটে এখনো তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের জাতীয় মান অনুযায়ী একজন মানুষের প্রতিদিন ২,১২২ কিলোক্যালরি গ্রহণের জন্য যে পরিমাণ ও মানের খাদ্য দরকার, দেশের ৬ কোটি মানুষই তা পায়না।

২৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ মার্চ, ২০০৬
২৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা মে-২০০৬
২৯. চিররঞ্জন দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

একারণে দেশে ৫ বছরের কম বয়সী শতকরা ৪৫ ভাগ শিশু অপুষ্ট ও ক্ষুদ্রাকৃতির হয়ে থাকে, ১০ শতাংশের বেশি মারা যায়। সংখ্যার দিক দিয়ে এদেশের ক্ষুধার্ত মানুষ পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় সর্বোচ্চ, কিন্তু জনসংখ্যার শতকরা হিসাবে ক্ষুধার্ত মানুষ বাংলাদেশেই বেশি। এদের জন্য ২৭টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে জাতীয় আয়ের মাত্র ১ শতাংশেরও কম ব্যয় করা হচ্ছে এবং তা রাজস্ব আয়ের মাত্র ৪ শতাংশ।[৩০]

নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণে তাকে উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য সরকারের জাতীয় পরিকল্পনা থাকলেও ২০০৫–২০০৬ অর্থ বছরে নারীকে লক্ষ্যভুক্ত করে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পে মোট রাজস্ব বাজেটের মাত্র ৪ শতাংশ রাখা হয়েছে এবং জাতীয় বাজেটে নারীকে এখনও বিত্তহীন, দুস্থ ও হতদরিদ্র হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে। ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন মৌলিক অধিকার বঞ্চিত নারী এখনো দারিদ্র্যের তলানিতে পড়ে রয়েছে।

এদেশে মেয়েশিশুরাও চরম দারিদ্র্য ও বঞ্চনার শিকার। একটি জরিপে দেখা যায় ১–৪ বছর বয়সী মেয়ে শিশুর মৃত্যুর হার ছেলেশিশুর চেয়ে শতকরা ২৭ ভাগ বেশি। দারিদ্র্য এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে গ্রামাঞ্চলে সাধারণত ১২–১৪ এবং শহরে বস্তিতে ১৪–১৫ বছর বয়সী মেয়েদের বিয়ে হয়। সরকারি বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, দেশে ১০–১৪ বছর বয়সী ৫% এবং ১৫–১৮ বছর বয়সী ৪% মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। বাংলাদেশে ১৯ বছর বয়সের নিচে ৫৮% মেয়ে শিশু ইতোমধ্যে মা বা গর্ভবতী হয়েছে। ফার্টাইলিটি জরিপের তথ্যমতে, দেশে ১০ বছরের কম বয়সী ১৬%, ১১ বছরের কম বয়সী ৩৪% এবং ১৪ বছরের কম বয়সী ৮০% মেয়ে বিবাহিত।[৩১]

গণসাক্ষরতা অভিযানের তথ্য অনুসারে, দেশে প্রাথমিক স্কুলে গড়ে মেয়েদের ভর্তির হার ৪৯ শতাংশ। কিন্তু স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রোফাইল অন অ্যাডুকেশন ইন বাংলাদেশ-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীদের ঝড়ে পড়ার হার শতকরা ১৭.৭২ ভাগ এবং মাধ্যমিক শতকরা ৪৫.৮০ ভাগ। এডুকেশন ওয়াচের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বাংলাদেশের নারীরা পুরুষদের তুলনায় সাক্ষরতার দিক থেকে ১২ শতাংশ পিছিয়ে আছে। বর্তমানে দেশে পুরুষ সাক্ষরতার হার ৪৭.৬০ শতাংশ আর নারীর ৩৫.৬০ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী দেশে গত ৩০ বছরে নারী শিক্ষার অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ২৭.৬০ শতাংশ।[৩২]

ব্যানবেইসের তথ্য অনুযায়ী দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২ লাখ ৬ হাজার ৫৬৪ জন। এর মধ্যে ৯ লাখ ৩ হাজার ৮৭৯ জন ছেলে এবং মাত্র ৩ লাখ ২ হাজার ৬৮৫ জন মেয়ে অর্থাৎ মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ২৫.৮ ভাগ মেয়ে।[৩৩] দেশের দেড় কোটি স্কুলগামী মেয়েশিশুর ৩৩% প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে পরে। নারী উদ্যোগ কেন্দ্রের মতে দেশের প্রায় ৭০ ভাগ ছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হয়না।[৩৪] এডুকেশন ওয়াচের তথ্য মতে, বাংলাদেশে পুরুষ ও নারীর সাক্ষরতার হার ৪৭.৬% এবং ৩৫.৬%।[৩৫]

---

৩০. দৈনিক প্রথম আলো, ১১ ডিসেম্বর, ২০০৫

৩১. The Daily New Age, 8th October, 2005

৩২. দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৯ অক্টোবর, ২০০৫

৩৩. দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৪ অক্টোবর, ২০০৫

৩৪. দৈনিক আজকের কাগজ, ১লা অক্টোবর, ২০০৫

৩৫. The Daily Star, 16th October, 2005

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে বাল্য বিয়ের হার বিশ্বে এখনো শীর্ষে। ২০ বছর বয়স হওয়ার আগেই বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। দেশে ৭৫ ভাগ কিশোরীর বিয়ে হচ্ছে ১৫ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমার পথে বাল্যবিয়ে একটি প্রধান বাধা হয়ে আছে। বর্তমানে দেশে দেড় কোটি কিশোরী প্রতিবছর সন্তান জন্ম দিচ্ছে। এদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন বিয়ের বছর পার না হতেই সন্তানের মা হয়। সন্তান প্রসবকালে মারা যায় ২০ ভাগ কিশোরী। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে কিশোরীদের বিয়ের গড় বয়স হচ্ছে ১৬.৯। আর এদেশে যত নারী গর্ভবতী হয় তার মধ্যে শতকরা ৩৫ ভাগই কিশোরী। ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে শতকরা ৩৯ ভাগ কখনোই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করেনা। শতকরা ৭৬.৫ ভাগের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি ১ লাখে ৩শ' থেকে ৪শ' জন। কিশোরীদের জন্য এই সংখ্যা প্রতি ১ লাখে ৫৮০ জন। অর্থাৎ কিশোরী মাতৃমৃত্যু হার আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি। এসব মৃত্যুর শতকরা ৭০ ভাগই প্রসবকালে চিকিৎসাজনিত জটিলতার কারণে এবং সহিংসতা ও অন্যান্য কারণে হয়ে থাকে।[৩৬]

বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১০টি দেশের ২৪ হাজার মহিলার উপর পরিচালিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বে প্রতি ৬ জন নারীর মধ্যে ১ জন পারিবারিক নির্যাতনের শিকার। কিশোরীদের ওপর বাংলাদেশে পারিবারিক নির্যাতন সবচেয়ে বেশি, শতকরা ৪৮ ভাগেরই বয়স ১৫ থেকে ১৯ বছর। নির্যাতিত নারীদের মাত্র ১০ শতাংশ বয়স্ক। পারিবারিক নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের ২৮তম অবস্থানে রয়েছে। শতকরা ৪৫ ভাগ নারীই এ নির্যাতনের শিকার হয়। এর মধ্যে ৩৮ ভাগ নারী শারীরিকভাবে এবং ৩৫ ভাগ মানসিকভাবে এবং ২৭ ভাগ নারী মৌখিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।[৩৭]

আমাদের দেশে নারীর প্রতি সহিংসতার চিত্র অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, পারিবারিক সহিংসতা ক্রমেই বাড়ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতার বিচার ও অপরাধীদের শাস্তি কার্যকর না হওয়া এসব অপরাধ বৃদ্ধির মূল কারণ। নারী এখন এমনই সহজ লক্ষ্যবস্তু যে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব-কলহের জের ধরেও তারা ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন।[৩৮]

সারনি:

নারী নির্যাতনের চিত্র (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৫)

ক্রমিক নং	নির্যাতনের ধরণ	মোট সংখ্যা
১.	ধর্ষণ	৪৯১
২.	গণধর্ষণ	২৭১
৩.	ধর্ষণের পর হত্যা	১৪২
৪.	এসিড দগ্ধ	১৪৪
৫.	যৌতুকের কারণে নির্যাতন	১৩১
৬.	শারীরিক নির্যাতন	১৩৫০
৭.	আত্মহত্যা	৫৬৩
৮.	ফতোয়া	৬৯

৩৬. দৈনিক সমকাল, ২৬ আগষ্ট-২০০৫
৩৭. দৈনিক প্রথম আলো, ৫ নভেম্বর-২০০৫
৩৮. দৈনিক যুগান্তর, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে একজন নারী প্রতিনিয়ত সংসারে ঘর-গৃহস্থালির দায়-দায়িত্ব ছাড়াও আরো অনেক কাজ করে যার কোনো বাজার মূল্য নেই। তাই এগুলো কোনো উৎপাদনশীল বা উন্নয়মূলক কাজ হিসেবে গণ্য হয়না এবং এসব কাজের কোনো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিও নেই। আমাদের দেশের বর্তমান সামাজিক বাস্তবতায় নারীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পায়না বললেই চলে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীর অংশগ্রহণ সীমিত। যদিও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গত দুই দশকে মেয়েদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। তবে সরকারি চাকরিতে পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ এখনো যথেষ্ট কম অর্থাৎ মাত্র ৮ ভাগ। এছাড়া সরকারি কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগে নারীর জন্য মাত্র ১৫% কোটা বরাদ্দ যা এখনো পুরোপুরি পূরণ হয়নি। সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে এ হার অত্যন্ত সীমিত। প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মধ্যে ৬ ভাগ নারী, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী মিলে শতকরা এ হার মাত্র ৮ ভাগ। এছাড়াও বিভিন্ন অবস্থানে নারীরা তাদের সমকক্ষ পুরুষদের সমান ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত দেয়ার সুযোগই পায় না।

বাংলাদেশে নারী শ্রমিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি:

শ্রমশক্তি জরীপ (Labour Survey Or, LFS) ১৯৯০–৯১ অনুযায়ী ঐ সালে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার ছিল ৫৮.২% বা ১৯৮৪–৮৫ সালে ছিল মাত্র ৮.২%। আকস্মিক এই বিপুল বৃদ্ধির কারণ হলো মহিলাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বৃহত্তর সংজ্ঞা গ্রহণ। যুক্তিসঙ্গত কারণেই এই হার শহুরে এলাকার (৩০.১%) চাইতে গ্রামীণ এলাকাতেই বেশি (৬৫%)। ঐ একই বছরে পুরুষদের অংশগ্রহণের হার ছিল ৭৯.৬%।[৩৯]

পেশাগত কাঠামোর প্রেক্ষিতে বিচার করলে ১৯৯০–৯১ সালের শ্রমশক্তির জরিপ হতে দেখা যায়, শহুরে কর্মরত মহিলাদের প্রায় ৬৫% কৃষি, বনায়ন ও মৎস্য খাতে নিয়োজিত। সেবামূলক খাতে কর্মরত মহিলাদের হার ১৭%। অন্যান্য খাতে, বিশেষত প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা খাতে এই সংখ্যা একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য। গ্রামেও কৃষি, বনায়ন ও মৎস্য চাষই প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে। এক্ষেত্রে শতকরা হার ৯০। এর পরের স্থান উৎপাদন ও পরিবহনের (৪.৪%)।[৪০]

শ্রমশক্তি জরিপ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণকে প্রধান প্রধান শিল্পখাত অনুসারেও দেখিয়েছে। এক্ষেত্রে শহর এলাকায় কৃষিখাতে নিয়োজিত মহিলার সংখ্যা ৬৪% এবং গ্রামীণ এলাকায় ৮৭% হলেও উৎপাদন খাতে কর্মসংস্থান খুবই নগণ্য শহর এলাকায় ৮.৮% এবং গ্রামীণ এলাকায় ৮.৫%। কৃষিখাতে কর্মরত মহিলাদের প্রায় অধিকাংশই বিনা বেতনের পারিবারিক কর্মী- শহরে এই হার ৯৮.২% এবং গ্রামীণ এলাকায় ৯৪.৬%। অকৃষিখাতে স্বনিয়োজিত কর্মী (শহর এলাকায় ১৪% এবং গ্রামীণ এলাকায় ৪৮.৮%) এবং বেতনভুক্ত কর্মীর সংখ্যাধিক্য (শহরে ৭৭% এবং গ্রামে ২৫.৫%) চোখে পড়ার মতো।[৪১]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অকৃষি খাতে স্বনিয়োজিত মহিলার সংখ্যা ১৯৮৩–৮৪ সালের ১৫.৯% হতে লাফ দিয়ে বেড়ে ১৯৯০–৯১ সালে ৬৩% এ পৌঁছেছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল ঋণের বর্ধিত সরবরাহ এবং গ্রামীণ ব্যাংক ও গ্রামীণ ব্যাংকের আদর্শে পরিচালিত অন্যান্য এনজিও কর্মসূচির প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার ফলে। উদাহরণস্বরূপ গ্রামীণ ব্যাংক একাই ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ১,২৪,৬২০ জন সদস্যের মধ্যে ৯.৬৫ কোটি টাকা বিতরণ করেছিল। এদের ৯৫% ই মহিলা।

---

৩৯. Nasreen Khundakar, A Review of Bangladesh Development, Centre for Policy Dialogue, Univesity Press Limited, Dhaka-1996, P. 420

৪০. Ibid, P. 420

৪১. Ibid, P. 420

Dhaka University Institutional Repository

মহিলারা এই ঋণের প্রায় সবটাই ক্ষুদ্রায়তন কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল গবাদি পশুপালন ও মৎস্য চাষ। এর পরেই ছিল কৃষি কাজ, বনায়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ব্যবসা।[৪২]

উৎপাদনকারী শিল্পসমূহের শুমারী (Census Manufacturing Industries বা CMI) হতে বাংলাদেশে মহিলাদের কর্মসংস্থানের প্রকৃতি ও পরিধি সম্বন্ধে আরও বিশদ তথ্য পাওয়া যায়। ঐ শুমারী হতে দেখা যায় বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত মহিলাদের মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি মহিলা কর্মরত রয়েছে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশেষ করে ধান ভানা, চিড়া তৈরি, দৈশী তাঁত ও তৈরি পোশাক শিল্পে। বাংলাদেশ তৈরি পোশাক শিল্প ও রপ্তানিকারকদের এসোসিয়েশনের সূত্র অনুসারে তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত মহিলার সংখ্যা ১৯৯৫–৯৬ সালে দশ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। CMI অনুসারে ১৯৮৫–৮৬ এবং ১৯৯১–৯২ এর মধ্যে উৎপাদনমুখী শিল্পে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। খোন্দকার নাসরিন বলেন, উৎপাদন সম্পর্কিত এবং ভাড়া করা শ্রমের ক্ষেত্রে মহিলাদের শতকরা হার বৃদ্ধি পেলেও প্রশাসনিক/করণিক/বিক্রয়কর্মী অথবা ডিরেক্টর/অংশীদার/মালিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে মহিলাদের অনুপাত প্রকৃতপক্ষে হ্রাস পেয়েছে।[৪৩]

মহিলা কর্মসংস্থানের আরেকটি চিত্র হলো মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে মহিলাদের অনুপাত ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ১৯৮৫–৮৬ সালে যার পরিমাণ ছিল ৩.০৪% সেই অনুপাতই ১৯৯০–৯১ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫.৯%। অবশ্য শিল্পসমূহের মধ্যে এই অনুপাতের বেশ বিভিন্নতা রয়েছে। নানা ধরণের কাপড়-চোপড় এমব্রয়ডারীর ক্ষেত্রে এই অনুপাত সর্বোচ্চ (৯৭%)। এর পরেই রয়েছে তৈরি পোশাক শিল্প (৬৯%) এবং বাঁশ ও বেতের সামগ্রী (৬৬%)। এই অনুপাত স্বভাবতই ইট ও মাটির তৈরি সামগ্রী (১.৪৫%) এবং বস্ত্রবয়ন শিল্পে (০.৯২%) খুবই কম। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য, দেশের দুটি রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) মহিলাদের কর্মসংস্থানের অনুপাত পুরুষদের তুলনায় আড়াই গুণ।

বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের নিয়োগের প্রকৃতি ও পরিধি ছাড়াও তাদের মজুরী সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। বাংলাদেশে বিদ্যমান অবস্থার প্রেক্ষিতে এটাই রূঢ় বাস্তবতা যে মোট কর্মসংস্থানে মহিলাদের যে অংশ তার চাইতে তাদের মজুরীর পরিমাণ অনেক কম। উদাহরণস্বরূপ ১৯৯১–৯২ সালে তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত মহিলাদের অংশ ৬৯% হলেও তাদের মজুরীর অংশ ছিল ৬১.৪%। ঐ একই সালে CMI জরীপকৃত শিল্পসমূহ মহিলাদের কর্মসংস্থানের পরিমাণ ছিল ১৫%, কিন্তু মোট মজুরীতে তাদের অংশ ছিল মাত্র ৮.৫%। একই উৎস হতে জানা যায়, ১৯৯০–৯১ সালে অধিকাংশ মহিলাই, বিশেষত গ্রামীণ এলাকার মহিলারা সপ্তাহে টাকা ১৫০% এর কম মজুরী পেয়েছে। গ্রামীণ কর্মরত মহিলাদের ৮৪% এবং শহুরে কর্মরত মহিলাদের ৫৭% এই নিচু আয়ের শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে এই একই নিচু আয়ের শ্রেণীতে পুরুষের সংখ্যা পল্লী এলাকাতে ৬৯% এবং শহুরে এলাকাতে ৩১%। নাসরীন খোন্দকার তার সমীক্ষায় দেখিয়েছেন তৈরি পোশাক শিল্পে পুরুষ-মহিলার মজুরীর পার্থক্য ২২%–৩০%। ভীতিপ্রদ তথ্য হলো এই মজুরী পার্থক্য সময়ের সাথে বেড়েই চলেছে।

---

৪২. Ibid, P. 417
৪৩. Ibid, P. 418

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে মহিলা কর্মসংস্থানের অপর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তরুণীদের কর্মসংস্থানের উচ্চতর হার। LFS ১৯৯০–৯১ সালের জন্যে গোটা দেশের যে সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপন করেছে তাতে দেখা যায় ১৫–৩৪ বছরের বয়সের মহিলাদের কর্মসংস্থানের হারই সর্বোচ্চ। এই একই তথ্য পাওয়া যায় মজুদদার ও চৌধুরীর তৈরি পোশাক শিল্প সম্পর্কিত সমীক্ষায়।[৪৪]

বাংলাদেশের জনসংখ্যা (২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী) ১২ কোটি ৯২ লাখ ৪৭ হাজার ২৩৩ জন। এর মধ্যে পুরুষের ৬ কোটি ৫৮ লাখ ৪১ হাজার ৪১৯ এবং নারীর সংখ্যা ৬ কোটি ৩৪ লাখ ৫ হাজার ৮১৪। অর্থাৎ দেশে প্রতি ১০৩.৮ জন পুরুষের অনুপাতে নারী হচ্ছেন ১০০ জন (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৫)। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই অনুপাত ছিলো প্রায় ১০৬ জন পুরুষ। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান পুরুষের বহু নিচে।[৪৫] প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে ব্যাপক লিঙ্গগত পার্থক্য (Gender gap)। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিক্রমায় নারীর অবদান অসীম। কিন্তু জাতীয়ভাবে নারীর অবদানের কোনো মূল্যায়ন নেই।

প্রচলিত জাতীয় আয় (GDP) পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরুষের উৎপাদনশীলতার যেখানে প্রায় ৯৮ শতাংশ হিসেবে ধরা হয়, সেখানে নারীর উৎপাদনশীলতার মাত্র ৪৭ শতাংশ গণনা করা হয়। গৃহস্থালির কাজ প্রায় এককভাবে নারী সম্পন্ন করছেন। কিন্তু কোথাও নারীর গৃহস্থালির কাজকে (Unpaid labour) অর্থনৈতিক কাজ (Market work) হিসেবে ধরা হয় না। তাই বিশ্ব অর্থনীতি থেকে নারীর এই অদৃশ্য অবদান (Invisible Contribution) স্বরূপ ১১ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়ে যায় যা পরিমাপ করা হয় না। নারী পৃথিবীর মোট কাজের তিন ভাগের দুই ভাগ সম্পাদন করেন। কিন্তু মোট আয়ের ১০ ভাগের ১ ভাগ তারা পান। নারী বিশ্বের মোট আয়ের ১০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র ভোগ করেন এবং মোট সম্পদের ১ শতাংশেরও কম মালিক।[৪৬] উৎপাদনশীল পরিমণ্ডলে নারীকে সবসময়ই অনুৎপাদনশীল এবং কেবল ভোগকারী হিসেবে মনে করা হয় বলেই তাদের এই অবস্থা। অথচ নারী সমানভাবে ভোগকারী এবং উৎপাদনকারী। গৃহকর্মের স্বীকৃতিহীনতা জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ হিসেবে নারীকে বেকার এবং নিষ্ক্রিয়রূপে চিত্রিত করেছে। এ কারণে দেশের ১০ থেকে ৬৪ বছর বয়স্ক কর্মক্ষম নারী জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশকে 'গৃহবধূ' বা 'ঘরণী' নামে আখ্যায়িত করে তাদের রাষ্ট্রের মোট শ্রমশক্তি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে।[৪৭] এখনো পরিসংখ্যানে নারীর অর্থনৈতিক অবদানের তেমন কোনো স্বীকৃতি নেই। পরিসংখ্যানে নারীর কাজের ঘণ্টা পুরুষের চেয়ে কম দেখানো হয়। যদিও নারীরা সারাক্ষণই কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত থাকেন। যেহেতু বহু ক্ষেত্রেই তাদের কাজের অর্থায়ন হয়না, তাই তাজের কাজের ঘণ্টাও কম ধরা হয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রম সময় এবং উৎপাদন সময়ের মধ্যে যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ হওয়ার কারণেই নারীর কাজের সময়কে পরিসংখ্যানগতভাবে পরিমাপ করা হয়না। অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সত্ত্বেও নারীর অবস্থান সম্পর্কে যে চিত্রটি উঠে আসে তা আশাব্যঞ্জক নয়। যেমন-প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নারীর নিয়োগ নগণ্য। করণিক পদেও অল্পসংখ্যক নারী নিয়োজিত। পদমর্যাদা হিসেবে দেখলে দেখা যায়, বিপুল সংখ্যক নারী পরিবারে পারিশ্রমিক ছাড়া কাজে নিয়োজিত (বাড়ির কাজ ব্যতীত)। পুরুষের তুলনায় বাসা-বাড়ির কাজে নারীর অংশগ্রহণ বেশি এবং অন্যদিকে মালিকদের সংখ্যা অনেক কম।[৪৮]

---

৪৪. Ibid, P. 418
৪৫. চিররঞ্জন সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৪৬. দৈনিক সংবাদ, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৫
৪৭. হোসেন জিল্লুর রহমান, গ্রামীণ দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা, কিছু পুর্ণভবনা, দারিদ্র ও উন্নয়ন : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, বিআইডিএস, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ৫৯
৪৮. চিররঞ্জন সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

সারণি:

বিভিন্ন পেশায় কর্মরত পুরুষ ও নারী (%)[৪৯]

(২০০২ – ২০০৩)			নারী : পুরুষ	১৯৭৪
পেশাজীবী, প্রযুক্তিগত	পুরুষ	নারী		
প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপক	৩.৮	৪.১	০.৩০	২.৬
করণিক, শ্রমিক	০.৩	০.০	০.০৪	০.১
বিক্রি শ্রমিক	৩.৯	১.৭	০.১৪	০.৩
সেবা শ্রমিক	১৮.২	২.৯	০.০৪	১.৩
কৃষি, বনজ ও মৎস্য	৩.০	৯.৭	০.৯৩	১০.৫
উৎপাদন, যানবাহন	৪৯.৩	৫৮.৬	০.৩৩	৭২.৬
শ্রমিক ও অন্যান্য	২১.৬	২২.৪	০.৩০	১২.৬

সারণি:

কর্মরত পুরুষ ও নারীর পদমর্যাদা (%) ২০০২–২০০৩[৫০]

	পুরুষ	নারী
কর্মচারী	১৩.৮	১৩.৪
মালিক	০.৪	০.২
আত্মকর্মসংস্থান	৫০.৬	২৪.৫
দিনমজুর	২২.৯	৯.৬
পারিশ্রমিক ছাড়া	৯.৯	৪৮.০
পারিবারিক শ্রমিক	০০	০০
বাবা-বাড়ির শ্রমিক	০.১	২.৫
কাজ শিখছে	১.০	০.৬
অন্যান্য	১.২	১.২

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, শ্রমশক্তি জরিপ, বিভিন্ন বছর।

১৯৯৫–৯৬ সালে নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের হার ছিলো প্রায় ১৬ শতাংশ। সেটা ২০০১–০৩ সালে বেড়ে হয়েছে ২৬ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, এই অংশগ্রহণ শহর এবং গ্রামীণ এলাকায় একইভাবে বেড়েছে। অন্যদিকে ১৯৭৪ সালে সেটা ছিলো মাত্র ৪ শতাংশ এবং ১৯৮৩ – ৮৪ সালে ৮ শতাংশ।

অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক বাধা অতিক্রম করে নারী এখন শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ করছে এবং নানা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে শামিল হচ্ছে। এটা একটা বড় ধরণের অর্জন।

৪৯. শ্রমশক্তি জরিপ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি থেকে আরো লক্ষ্য করা যায়, বর্তমানে (২০০২–২০০৩ সালে) নারী শ্রমশক্তির পরিমাণ ১০ মিলিয়নের বেশি এবং ইদানীংকালে নারী শ্রমশক্তি বৃদ্ধির হারও পুরুষের তুলনায় বেশি। এর ভবিষ্যৎ গুরুত্ব ও তাৎপর্য আমরা অনুভব করতে পারি। আরও গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বল্প বয়স্ক নারী (১৫–১৯ বছর বয়স যাদের), তাদের অংশগ্রহণ সর্বাধিক। সারণি-৬ এর বিভিন্ন খাতে নিয়োজিত পুরুষ ও নারীর চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। যেটা চমকপ্রদ সেটা হলো, যেখানে সর্বমোট কর্মরত পুরুষের ১২ শতাংশ শিল্পে নিয়োজিত, নারীর বেলায় সেটা ১৮ শতাংশ। শিল্পখাতে নিয়োগ নারীর জন্য এক বিরাট ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। ১৯৭৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত নারীর পেশায় যে পরিবর্তন এসেছে, তাও দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ কৃষি ও সেবার গুরুত্ব কমে শিল্প, করণিক ও বিক্রয় খাতের গুরুত্ব বেড়েছে।

সারণি:

বিভিন্ন খাতে নিয়োজিত পুরুষ ও নারী (%) ২০০২–২০০৩

	নারী	পুরুষ
কৃষি	৫৮.৬	৫১.৭
সেবা	২৩.০	৩৪.৬
শিল্প	১৮.৪	১৩.৭

১৯৯০ দশকের গোড়া থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মসম্পাদন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচকগুলো বেড়ে চলেছে। ইতোমধ্যে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ পার হয়ে এসেছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকের দিক থেকে বাংলাদেশে আশাতীত ভালো করেছে। এই সূচকে তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশে তৃতীয় স্থান করে নিয়েছে। প্রথম স্থানে আছে চীন। দ্বিতীয় স্থানে আছে কেইপ ভার্দি নামে ছোট একটি দ্বীপ রাষ্ট্র।

আগে বাংলাদেশের নারীর গড় আয়ু পুরুষের গড় আয়ুর চেয়ে কম ছিল। বর্তমানে নারীর গড় আয়ু পুরুষের চেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে সার্ক দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ সবচাইতে ভালো অবস্থানে রয়েছে।

১৯৮৩ থেকে ২০০০ পর্যন্ত মেয়াদে বাংলাদেশে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে, গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলে, নারীর অংশগ্রহণ নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শহরের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে এই অংশগ্রহণ বেড়েছে বেশি। ১৯৮৩–৮৪ সালে গ্রামাঞ্চলে নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ ছিল ৭ শতাংশ, ১৯৯৯–২০০০ সালে তা বেড়ে হয়েছে ২২ শতাংশ। একই সময়ে শহরাঞ্চলে নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ ১২ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৬ শতাংশ।[৫১]

গত দশকে বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার অর্ধেক হ্রাস পেয়েছে। আর কোনো উন্নয়নশীল দেশে এতটা দ্রুত হারে শিশু মৃত্যুর হার কমেনি। বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার বছরে ৫ শতাংশ হারে হ্রাস পাচ্ছে। প্রসূতি মায়ের অপুষ্টির হার ১৯৯৬ সালে ছিল ৫২ শতাংশ, ২০০২ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৪২ শতাংশ। ১৯৯০ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হার ছিল ৭২ শতাংশ, বর্তমানে তা বেড়ে ৯০ শতাংশ হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরেও ভর্তির হার বেড়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে অসমতা বাংলাদেশ ইতিমধ্যে দূর করে ফেলেছে এবং সর্বজনীন মৌলিক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে।

---

৫১. হোসেন জিল্লুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে বয়স্ক শিক্ষার হার বেড়েছে পুরুষের ক্ষেত্রে ৬ শতাংশ এবং নারীর ক্ষেত্রে ৮ শতাংশ। শিশুমৃত্যুর হার কমানো এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।[৫২] সার্বিকভাবে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রকোপ দক্ষিণ এশিয়া মধ্যে গভীরতম হলেও এই দারিদ্র্য হ্রাসে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রাখতে পেরেছে। শুধু ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহারের মাধ্যমেই ৫ মিলিয়নের বেশি নারী তাদের পরিবারকে দারিদ্র্যসীমার ঊর্ধ্বে আনতে সক্ষম হয়েছে। সাম্প্রতিককালে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে দ্রুত জন্মহার হ্রাসকে। প্রজনন বয়সের নারীদের মধ্যে বিপুলভাবে গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়ে সম্প্রতি ৬০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মাত্র ২০ বছরে ৬.৩ শতাংশ থেকে ২০০৩ সালে ১.৪৮ শতাংশে নেমে এসেছে। এ হারে জনসংখ্যা হ্রাস করতে ইউরোপে প্রায় ২০০ বছর লেগেছিল। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও নারীর অবদান বিপুল। তৈরি পোশাক শিল্প, হিমায়িত মাছ ও চা-যা বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মূল খাত, তার সিংহভাগই নারীশ্রমে অর্জিত। আমাদের অর্থনীতি এখনো কৃষিভিত্তিক, জিডিপির ৩০ শতাংশই আসে কৃষি থেকে। বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করেছে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। উল্লেখের তালিকায় আরো রয়েছে শিশুরোগ প্রতিবেধক টিকার মাধ্যমে ৯৭ শতাংশ শিশুকে রোগ প্রতিরোধক কর্মসূচীর আওতায় আনা। মায়েদের সচেতনতার কারণে দেশে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুমৃত্যুর হার লক্ষণীয়ভাবে কমেছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেশিশুর সমহারে মেয়েশিশুর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। মাধ্যমিক স্তরেও মেয়েদের অন্তর্ভুক্তির হার অধিক। উল্লেখিত সূচকগুলো থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিগত দুই দশকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে বাংলাদেশের অর্জনের তালিকায় সিংহভাগই গ্রামীণ স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর নারীর মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।

আমরা যদি শহরাঞ্চলে শিক্ষিত নারীর দিকে তাকাই, সেখানেও নারীর অর্জন লক্ষণীয়। দেশের বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে ভালো ফল করছে। উচ্চশিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতেও মেয়েদের অংশগ্রহণ বেড়ে চলেছে। প্রথাগত পেশা ছেড়ে ব্যাংক, বীমা, বিনোদন থেকে শুরু করে বিমান চালনা বা সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতেও আগ্রহ ভরে মেয়েরা এগিয়ে আসছে। সাম্প্রতিককালে সেনাবাহিনীতে মেয়েদের জন্য ১৫০টি চাকরির বিজ্ঞাপন দিলে গ্রামাঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ১৪ হাজার প্রার্থী আবেদন করে।[৫৩] অর্থাৎ জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়াটাকে নতুন প্রজন্মের নারী সমাজ গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। সুযোগ পেলে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিটি ক্ষেত্রে সমানতালে এগিয়ে আসার প্রবণতাকে নাগরিক জীবন খুব স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছে। হাটবাজার, জনসভা, মিটিং, মিছিল, খেলার মাঠ, শিক্ষায়তনের ক্যাম্পাস-সর্বত্র নারীর স্বচ্ছন্দ চলাচল যেমন বেড়েছে, তেমনি বিশ্বায়নের জোয়ারে তার অর্জনের আকাঙ্ক্ষার সীমানা হয়েছে দিগন্তপ্রসারী। বেশভূষা, আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে মধ্যবিত্ত শহুরে প্রজন্মের নারী বহু ক্ষেত্রে তার পুরুষ প্রতিপক্ষের চেয়ে উজ্জ্বল এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আপসহীন।

বাংলাদেশের নারী বিশেষ উল্লেখযোগ্য আরেকটি অর্জন হল গতিশীল শক্তিশালী নারী আন্দোলন। এ অঞ্চলে নারী আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতার পরপরই তৃনমূল পর্যায়ে নারী সমাজকে উন্নয়ন সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এনজিও ও সুশীল সমাজের উদ্যোগকে কেন্দ্র করে নারী আন্দোলনের সূচনা হলেও অল্প সময়ের মধ্যে তা তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করে।

---

৫২. The Daily Star, 9, February, 2006

৫৩. দৈনিক প্রথম আলো, ৩০, এপ্রিল, ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

নারীর প্রতি সহিংসতা, সম্পদের অসম বণ্টন, বৈবাহিক ও পারিবারিক সম্পর্কে নারীর অসমতা, রাজনীতি ও গভর্নেন্সে নারীর অসম অংশীদারিত্বের ইস্যু থেকে শুরু করে মৌলবাদ ও নারীর প্রতি অযাচিত সামাজিক অনুশাসনকে প্রতিনিয়ত নারী আন্দোলন চ্যালেঞ্জ করছে। সার্বিক বিচারে পেশাভিত্তিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক ও শ্রেী সম্পর্কিত যত প্রকার চলমান আন্দোলন রয়েছে, নারী আন্দোলনকে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল বলে আখ্যা দেয়া যায়। কারণ নারী আন্দোলন কোনো একটি ইস্যুভিত্তিক বা শ্রেণীসম্পর্কিত নয়, এ আন্দোলনে সব রকম সামাজিক নির্যাতন, অসমতা ও বৈষম্য, বিদ্যমান সুবিধাবাদী পিতৃতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ধর্মকে ব্যবহারের প্রবণতাসহ অন্যান্য স্পর্শকাতর অথচ নেতিবাচক বিষয়সমূহের বিরুদ্ধে সোচ্চার।

বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ

গৃহস্থালি কাজে নারী :

গৃহস্থালি কাজ নারীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই গৃহস্থালি কাজে নারীর এক বড় অংশ নিয়োজিত এবং নারীরা তাদের কর্মসময়ের বড় অংশ এই কাজে ব্যয় করলেও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একে কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়না। অধিকাংশ গ্রামীণ নারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদন বা বাজারের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেন। তারা জাল ও মাদুর বোনেন, পাটজাত দ্রব্য ও ব্যাগ তৈরি করেন, মুড়ি, পিঠা ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করেন এবং আয় উপার্জনের সঙ্গে সংযুক্ত নানা কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকেন।

বাংলাদেশের বসত বাড়িতে পশু সম্পদ (হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল) উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় বিশেষত গোয়াল ঘর নির্মাণ, পরিষ্কার করা, এদের খাওয়ানো, পরিচর্যা, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের হার ৪৪–৮৫ শতাংশ। অপরদিকে এক্ষেত্রে পুরুষের অংশগ্রহণের হার শূন্য থেকে ৫০ শতাংশ। বসত বাড়িতে 'সবজি বাগান' করার মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টি সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষী পরিবারের নারীরাই তাদের নিজ নিজ উদ্যোগে বসতবাড়ির সবজি বাগান থেকে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা ৯০–১০০ শতাংশ মিটিয়েও পরিবারের অতিরিক্ত আয়ের ক্ষেত্রে ১৫–৩০ শতাংশ অবদান রাখছেন।[৫৪] আইএলও'র এক সমীক্ষায় প্রকাশ 'নারীর মোট গৃহস্থালি শ্রম যোগ করলে তা অনেক দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের অর্ধেক হবে'।[৫৫] ভিন্ন এক গবেষণায় দেখা গেছে, আত্মপোষণশীল খাতে গৃহবধূ বাদে পরিবারের সবাই গড়ে বছরের ১০০ দিন ব্যয় করে থাকে, পক্ষান্তরে গৃহবধূরা এক্ষেত্রে ব্যয় করে ২০০ দিন। আত্মপোষণশীল খাতে ব্যয়িত মোট বার্ষিক সময় ৬৯০০০ মিলিয়ন ঘণ্টা। পুরুষ কর্তৃক ব্যয়িত সময় ২৫০০০ মিলিয়ন ঘন্টা, নারী কর্তৃক ব্যয়িত সময় ৪৪০০০ মিলিয়ন ঘণ্টা।[৫৬] প্রাকৃতিক নিয়মে আবহমানকাল থেকে নারী সন্তান উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত। পাশাপাশি সন্তানকে লালন-পালনের কাজটিও নারীকেই করতে হচ্ছে। এই দুটি কাজ করতে গিয়ে নারী তার জীবনকালের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সময় (১৫–৪০ বছর) ব্যয় করছেন। অথচ তাদের এই অবদানের কোনো স্বীকৃতি নেই।

---

৫৪. উজ্জীবক, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, সেপ্টেম্বর-২০০৫

৫৫. দৈনিক সংবাদ, ১ মে, ২০০৫

৫৬. জাতিসংঘ বার্তা, মার্চ-২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

কৃষিক্ষেত্রে নারী:

বিশ্বের অর্ধেক নারী উন্নয়নশীল বিশ্বে বাস করেন। তারা কৃষিক্ষেত্রে কাজ করেন এবং সব ধরণের কৃষি উৎপাদনের ৪০–৮০ শতাংশ (দেশ অনুসারে ভিন্ন) দায়িত্বপালন করেন। এশিয়া মহাদেশে চাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশ শ্রম নারীরা দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশে ধান গোলায় তোলা, ধান বীজ সংরক্ষণ করা, খাবারের জন্য শস্য ভাঙানো ও পরিষ্কার করা, পাটকাঠি থেকে আঁশ ছাড়ানো, পশু ও হাঁস-মুরগির যত্ন নেয়া, শাক-সবজি উৎপাদন ইত্যাদি উৎপাদনমূলক কাজের সঙ্গে নারী সরাসরি সম্পৃক্ত। কৃষিকর্মে মহিলা জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকলেও অর্থনৈতিকভাবে তাদের কাজের মূল্যায়ন হয়না। বাংলাদেশের নারী তাদের শ্রম সময়ের একটা বড় সময় কৃষি কাজে দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে মোট গ্রামীণ নারীর ৭৬.৬ শতাংশ কৃষিতে কাজ করেন।[৫৭] সময়ের পরিমাপে ও গুরুত্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, কৃষিক্ষেত্রে নারীর অংশীদারিত্ব কোনভাবেই পুরুষের চেয়ে কম নয়। কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলেই এ সত্য ধরা পড়ে:

১. প্রাক্-বপন প্রক্রিয়া: এটি মূলত নারীর কাজ। এ পর্বের কাজ বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বীজের প্রস্তুতি।

২. বপন ও ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়া: এটি মূলত পুরুষের কাজ। এ পর্বের কাজ জমিতে চারা রোপণ ও তা তোলা (অঞ্চলভেদে মেয়েরাও তা করে থাকে)

৩. ফসল উত্তোলন প্রক্রিয়া: এটি প্রায় এককভাবে নারীর কাজ। এই পর্বের কাজ হলো-ধানমাড়াই, ধান বাছাই, ধান ভানা ও ঝাড়া।

গ্রামীণ নারী কৃষি উৎপাদন ও নানা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্বীকৃতিহীনভাবে অবদান রেখে গেছেন। সারা বছরের প্রায় প্রতিদিনই তারা কোনো না কোনো অর্থনৈতিক কর্মে নিয়োজিত। কিন্তু সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত হয়েও এখনো তারা কৃষিশ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেননি। নিচের সারণিতে বাংলাদেশে নারীর সারা বছরের কর্মকাণ্ডের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো:

সারণি:

বাংলাদেশে একজন গ্রামীণ নারীর জীবনে একটি বছর[৫৮]

মাস	কাজ
বৈশাখ	পুকুর থেকে মাটি আনা, শাক-সবজি লাগানো, পানি দেয়া, আগাছা পরিস্কার ও মাচার ব্যবস্থা করা, নানা ধরণের আমের আচার বানানো।
জ্যৈষ্ঠ	আমসত্ত তৈরি, তরিতরকারি চাষাবাদ।
আষাঢ়	মাছ ধরার জাল ও ফাঁদ বানানো, মাছের পোনা তৈরি, কাঁথা, মাদুর ও কাপড় সেলাই, পাটের শিকা প্রস্তুত করা।
শ্রাবণ	ধান মাড়াই, পরিষ্কার, সেদ্ধ ও শুকানো এবং ধানভানা, গরুর খাদ্যের জন্য নাড়া শুকানো ও গাদা করা, শীতল পাটি বানানো।

৫৭. দৈনিক সমকাল, ৮ মার্চ-২০০৬

৫৮. ইউনিসেফ, ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

ভাদ্র	বর্ষা পরবর্তী স্যাঁতস্যাঁতে ও ছাতা পড়া ঘরদোর পরিস্কার, পরবর্তী ফসলের জন্য ধানের গোলা মেরামত, পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত।
কার্তিক	নাইওর যাওয়া, শাক-সবজি ও কালাই বোনা।
অগ্রহায়ণ	ধান ভানা ও চালের পিঠা তৈরি, মুড়ি ও চিড়া তৈরি।
পৌষ	নতুন ধানের চালের পিঠা তৈরি, মুড়ি ও চিড়া তৈরি।
মাঘ	খেজুর গুড় তৈরি ও পিঠা বানানো।
ফাল্গুন	ঘরদোর ঠিকঠাক করা, মাটি তুলে ঘরের মেঝে উঁচু করা ও লেপা, সবজি আবাদ, সরিষা তোলা।
চৈত্র	ঘরদোর পরিষ্কার ও মেরামত, সবজি বোনা, তালপাতার পাখা তৈরি।

কুটিরশিল্পে নারী:

অকৃষি কর্মকাণ্ডে নারীর অবদানেরও যথাযথ কোনো পরিসংখ্যান সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে পাওয়া যায় না। বিআইডিএস-এর এক গবেষণা জরিপে দেখা গেছে, জরিপকৃত মোট ২১২৭৬ হাজার জনসংখ্যার মধ্যে ১০ বছরের উর্ধ্বে বয়সী ২১১৩ হাজার জন কুটির শিল্পে নিয়োজিত। এই কর্মে নিয়োজিত মোট জনসংখ্যা ৩৩ শতাংশ নারী। এই গবেষণায় বিভিন্ন শিল্পে মহিলাদের অংশগ্রহণের যে চিত্র পাওয়া যায়. তাতে দেখা যায় মোট নিয়োজিত শ্রমিকের মধ্যে ঘানি শিল্পে ৪২.৫ শতাংশ, ধানভানা ৫৬.০ শতাংশ, মাদুর শিল্পে ৬২.৮ শতাংশ, বাঁশ ও বেত শিল্পে ৮৯.০ শতাংশ, ছোবড়া শিল্পে ৬৪.৩ শতাংশ, তাঁত বোনায়ে ৩৭.৬ শতাংশ এবং মৃৎশিল্পে ৪৭.৯ শতাংশ নারী শ্রমিক নিয়োজিত। ধান ভানা ও মাদুর শিল্পে সবচেয়ে বেশি নারী কর্মরত। সারণি-১১ এর মাধ্যমে কুটির শিল্পে নারীর অংশগ্রহণের হার উল্লেখ করা হল:

দেশের বিভিন্ন বৃহৎ শিল্পেও আজ নারীরা অধিক সংখ্যায় নিয়োজিত হচ্ছেন। জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ (বিবিএস, ২০০৩) থেকে দেখা যায়, শিল্পখাতে পুরুষ শ্রমিকের অংশগ্রহণের হার ২০০১ সালের পরে তেমন বৃদ্ধি পায়নি। কিন্তু নারীর অংশগ্রহণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় প্রতিটি বৃহৎ শিল্পেই নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে। তার মধ্যে পোশাক শিল্প, চা শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, বিশেষ করে চিংড়ি শিল্পে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য।[৫৯]

সারণি:

বিভিন্ন কুটির শিল্পে নারীর অংশগ্রহণের হার:[৬০]

কাজের ধরণ	শতকরা
পাট হস্তশিল্পে	৬৮
চুন তৈরিতে	৬৮
ঠোংগা বা ছোট কাগজের বাক্স	৬৭

৫৯. চিররঞ্জন সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৬০. UNICEF, 1998, Situation Analysis of Children and Women in Bangladesh.

Dhaka University Institutional Repository

নারকেল ছোবড়ার দড়ি	৬৪
ছোবড়ার ম্যাট	৫৫
মাছ ধরার জাল	৬৩
পাটি বোনা	৬৩
ঢেঁকির কাজ	৫৬
মুড়ি তৈরি	৪৯
তাঁতের সুতা কাটা	৪৮
তেল নিষ্কাশন (তৈরি)	৪৩
রেশম বোনা/পালন	৩৯
উৎস্য: UNICEF, 1998, Situation Analysis of Children and Women in Bangladesh.	

পোশাক শিল্পে নারী:

পোশাক প্রস্তুতকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ দাবি করে থাকে, সদ্য বিকশিত পোশাক শিল্পে ইতোমধ্যে প্রায় সাড়ে ১৩ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে, যার প্রায় ৮০ শতাংশ হচ্ছে নারী। দেশের পোশাক শিল্প আজ নারী শ্রমিকের ওপর নির্ভরশীল। এই শিল্প দেশের ৭৫ শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। তাই প্রকারান্তরে দেশের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনও নারীর শ্রমের ওপর নির্ভরশীল। পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজের সময় সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা। ১২ ঘণ্টার কর্মদিবস নারীদের জন্য নিশ্চিতভাবেই নির্যাতনের সমতুল্য। দেশের শীর্ষস্থানীয় ৩২টি গার্মেন্টসে পরিচালিত এক নমুনা জরিপে দেখা গেছে, নারী শ্রমিকদের মাসিক গড় মজুর ৮৮৬ টাকা। এদের মধ্যে ৪০ শতাংশের মজুরি ৫০০ টাকারও নিচে। পোশাক শিল্পে নিয়োজিত নারীদের ১৩ শতাংশের বয়স ১৩ বছরের নিচে। মজুরি ক্ষেত্রে নারী-পুরষের বৈষম্য রয়েছে ব্যাপক। গড়ে নারী শ্রমিকদের মজুরি ৮৮৬ টাকা হলেও একই কাজে পুরুষ শ্রমিকদের গড় মজুর ১৩৪৪ টাকা।[৬১]

চা ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে নারী:

বাংলাদেশে চা শিল্পও অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী শিল্প। দেশের ১৫৮টি চা বাগানে শ্রমিক জনগোষ্ঠী রয়েছে পাঁচ লাখ। সরাসরি শ্রমিক এক লাখ। এদের মধ্যে চা বাগান থেকে চা পাতা তোলার কাজটি করেন মূলত নারীরা, যাদের সংখ্যা মোট শ্রমিকের প্রায় ৫২ শতাংশ। এদের দৈনিক মজুরি ২৪ টাকা। এই ২৪ টাকার জন্য ন্যূনতম ২৪ কেজি চা পাতা বাগান থেকে তুলতে হয়।[৬২] খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পেও নারীরা ব্যাপকভাবে নিয়োজিত। চিংড়ি শিল্প বাংলাদেশের একটি বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী শিল্প। এই শিল্পে ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোতেই নারীরা বেশি সংখ্যায় নিয়োজিত।

---

৬১. The Daily Star, 17 August, 2005

৬২. চিররঞ্জন সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

সাংবাদিকতায় নারী:

২০০৩ সালে প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে নিয়োজিত পুরুষ ও নারী সাংবাদিকের ওপর একটি জরিপ কার্য পরিচালনা করে। ৫১টি দৈনিকের মধ্যে ৩৬টি দৈনিকের তথ্য নেয়া হয়। জরিপের তথ্যানুযায়ী প্রায় ৫ হাজার পুরুষ সাংবাদিকের বিপরীতে ৮০ জন (১.৪ শতাংশ) নারী সাংবাদিক রয়েছে। এই ৮০ জনের মধ্যে ৮ জন (১০ শতাংশ) রিপোর্টার হিসেবে নিযুক্ত যারা মাঠ পর্যায়ে সংবাদ সংগ্রহ করে থাকেন। এই ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাংবাদিকতা পেশায় নারীর অংশগ্রহণ তাদের কর্মক্ষেত্রকে প্রসারিত করছে। বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

প্রশাসন এবং সরকারি অন্যান্য পদে নারী:

বর্তমানে নারীদের জন্য গেজেটেড পর্যায়ে ১০ শতাংশ এবং নন-গেজেটেড পর্যায়ে ১৫ শতাংশ কোটা নির্দিষ্ট রয়েছে। খুব কম সংখ্যক ক্ষেত্রে এই কোটা পূরণ হয়েছে। কোটা পূরণে অনেক পিছিয়ে থাকা মন্ত্রণালয়গুলো হচ্ছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় (১.৭৭%), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (২.০৭%), কৃষি মন্ত্রণালয় (২.৫৯%) এবং মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় (৩.৩৮%)। অন্যদিকে মহিলা মন্ত্রণালয় ছাড়া কোটা পূরণে এগিয়ে থাকা মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় (১৬.৭৩%), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ (২৪.০৪%), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (২৭.৪১%) এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (২২.০৩%)।[৬৩] প্রশাসনে নারীর অন্তর্ভুক্তি সামান্য হলেও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তারা নিজ নিজ দায়িত্বপালন করছেন। বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে ৮% নারী কর্মরত রয়েছে। প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ কতটুকু তা নিচে তুলে ধরা হল:

সারণি:

বাংলাদেশে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ ও শতকরা হার:[৬৪]

পদবি	মোট	পুরুষ	নারী
সচিব	৫১	৫১	০
অতিরিক্ত সচিব	৭৪	৭৩	১
যুগ্ম সচিব	১৩২	২১৮	১৪
উপ-সচিব	১২৮৮	১১৫৪	১৩৪
সিনিয়র সহকারী সচিব	১৫২৯	১৩২৪	২০৫
সহকারী সচিব	১১৫৫	৯২২	২৩৩
মোট	৪৩২৯	৩৭৪১	৫৮৮

উল্লেখ্য যে, আওয়ামীলীগ সরকার (১৯৯৬–২০০১) উচ্চতর সরকারি পদগুলোতে (ব্যাংক-বীমাসহ) ১০ শতাংশ পদ রাষ্ট্রপতির কোটায় সংরক্ষিত করেছে এবং উল্লেখিত নারী কর্মকর্তাদের অধিকাংশই রাষ্ট্রপতির কোটায় নিয়োগপ্রাপ্ত। বর্তমানে এমন কোনো সরকারি পেশা নেই যেখানে নারীর দৃপ্ত পদচারণা নেই। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা এগিয়ে আসছে।

---

৬৩. দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ এপ্রিল, ২০০০

৬৪. দৈনিক আমার দেশ, ২৪ এপ্রিল, ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

নিচের সারণি থেকে বাংলাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীর অংশগ্রহণের একটি ধারনা পাওয়া যাবে।

সারণি:

গ্রামীণ ঋণ প্রক্রিয়ায় নারী:

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে গ্রামীণ ব্যাংক আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি অর্জন করেছে। ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটিয়ে টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার জন্য ২০০৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক ও এর প্রতিষ্ঠাতা ড. ইউনুস যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেছেন। বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংক ২০০৫ এর এপ্রিল পর্যন্ত ১৮৫৬টি শাখার মাধ্যমে ৬৩টি জেলার ৪৩৩টি উপজেলায় ৪৩.৫৩ লাখ সদস্যের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২২,৫১৭.৫৯ কোটি টাকা।[৬৫]

বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণ:[৬৬]

কাজের ধরণ	শতকরা
মন্ত্রিসভায় নারী	৬.৬৬
সিভিল সার্ভিসে নারী	৮.০০
কূটনীতিতে নারী	২.৮
জেলা প্রশাসনে নারী	১১.৭
ব্যাংক ও রাজস্ব খাতে নারী	৬.৪
স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নারী	৫.০
পরিচালক অধিদপ্তর ও সচিবালয়ে নারী	১৪.০
পুলিশ সার্ভিসে নারী	০.৭
ব্যবসা-বাণিজ্যে নারী	১২.৬
মহিলা বিচারপতি	৫.১১
মহিলা আইনজীবী	১৪.৩
বিগত নির্বাচনে নারী ভোটার সংখ্যা (২০০১ সা)	৪৯.২৬
উৎস: এনজিও কোয়ালিশন অন বেইজিং প্রসেস, ২০০৫	

এ সময়কালে গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৩৭৯.৩১ কোটি টাকা। ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে মোট ৪১,৭২০২৩ জন নারী। সরকারি পরিসংখ্যান মতে, বাংলাদেশে মোট ৭২০টি এনজিও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এদের মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ১.৪৬ কোটির মধ্যে ০.২৫ কোটি পুরুষ এবং ১.২০ কোটি নারী। মোট সঞ্চয়ের পরিমান ১৫৫৬.১০ কোটি টাকা।

---

৬৫. চিররঞ্জন সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৬৬. এনজিও কোয়ালিশন অন বেইজিং প্রসেস, ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

এই ক্ষুদ্র ঋণের ৪১.৭৯ শতাংশ বিনিয়োগ হয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়, ১২.৩১ শতাংশ কৃষি, ১৭.৬৪ শতাংশ পশুসম্পদ এবং ৭.৩৯ শতাংশ মৎস্যখাতে। মূলত ৯টি সংস্থা ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, টিএমএসস, কারিতাস, আর ডি আর এস, ব্যুরো টাঙ্গাইল এবং শক্তি ফাউন্ডেশন মোট ক্ষুদ্রঋণের সর্বোচ্চ অংশ বিতরণ করে থাকে। এসব ঋণের শতকরা ২৪.৮৪ ভাগ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) থেকে সংগৃহীত হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও মন্ত্রণালয় ব্যাপকভাবে নারীদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য, এই ঋণের ৯০ শতাংশের বেশিই পরিশোধ করা হয়েছে। এ অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, 'নারী বিশ্বস্ত Client'; সুতরাং Credit Input পেলে নারী পরিবারের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজ তথা দেশের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।[৬৭]

বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারীর অংশগ্রহণ:

বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশায়ও নারীরা পুরুষের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করছে। যেমন: ফিলিং স্টেশনের মিটারম্যান, বিচারপতি, সেনাবাহিনীর উইমেন কোর, ট্রেন চালক, ট্রাফিক পুলিশ, পুলিশ, ট্রাক হেলপার, রিপোর্টার, নিরাপত্তা প্রহরী, ড্রাইভিং, শিপিং ম্যানেজমেন্ট, রিকশা পেইন্টিং, তবলা বাদক ইত্যাদি পেশা গ্রহণ করছে মেয়েরা। এ ধরনের কাজ ঝুঁকিপূর্ণ। তারপরও তারা করছে নিজের শ্রমের বিনিময়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে কর্মক্ষেত্রে নারীর বিস্তৃত অংশগ্রহণের একটি পরিষ্কার চিত্র ফুটে উঠেছে। অথচ এই বিস্তৃত অংশগ্রহণ আজও জাতীয়ভাবে স্বীকৃত হয়নি। কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রকৃত অংশগ্রহণকেই কেবল অস্বীকার করা হয়নি; তাকে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কৃষিখাতে একজন পুরুষের মজুরি নারীর চেয়ে অনেক বেশি। অথচ কৃষিশ্রমে নারীর অবদান পুরুষের চাইতে কম নয়। কী কৃষি কী অকৃষি কোনো খাতেই একজন নারী সপ্তাহে গড়ে ১০০ টাকার বেশি উপার্জন করতে পারে না। অথচ দেখা যাচ্ছে, অকৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত পুরুষদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি সপ্তাহে গড়ে ১০০ টাকার বেশি উপার্জন করছেন। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, চাকরি জীবনের অন্যান্য সুবিধা, যেমন প্রসূতি ছুটি, অর্জিত ছুটি, চিকিৎসা ছুটি, বাড়ি ভাড়া, পরিবহন সুবিধা ইত্যাদি থেকেও পুরুষের তুলনায় নারীকে অনেক বেশি বঞ্চিত করা হয়েছে এবং প্রায় সব কর্মক্ষেত্রেই নারীরা নিচু স্তরের সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোতে নিয়োজিত হয়েছেন। অনেক কর্মক্ষেত্রে পুরুষের চাইতে বেশি কর্মঘন্টা প্রদান করছেন।

শ্রমবাজারে নারী-পুরুষ বৈষম্য:

শ্রম বাজারে নারী-পুরুষের বৈষম্যের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু পরিবর্তিত বৃহত্তর আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে নারীর অবস্থান এবং অবদান পরিবর্তিত হচ্ছে এবং দেশের দারিদ্র্যের চেহারাতেও পরিবর্তন আনছে। গার্মেন্টস, নির্মাণ, সিরামিক এবং অন্যান্য শিল্পের বিস্তারের ফলে নারীর কাজে সুযোগ বাড়লেও ১৯৯৯–২০০০ সালের লেবার সার্ভে থেকে জানা যায়, অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় মাত্র ২.৪৩% নারী গার্মেন্টস শিল্পে, উৎপাদন শিল্পে ৩.৭৫% এবং টেক্সটাইল শিল্পের সঙ্গে জড়িত ৭.৩৬% নারী। কিন্তু ২০০৪ সালে গার্মেন্টস শিল্পে কোটা সুবিধা উঠে যাওয়ার পর অনেক

---

৬৭. চিররঞ্জন সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

গার্মেন্টস কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এটা নারী শ্রমিকদের জন্য বড় ধরণের হুমকি। ঢাকা শহরের প্রায় ২০০ গার্মেন্টস কারখানা ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে[৬৮] এবং বিপুল সংখ্যক নারী শ্রমিক চাকরি হারিয়েছে। সাধারণ সংজ্ঞা অনুযায়ী মোট চাকরির ২১% হচ্ছে নারী। এ সংজ্ঞার বাইরে যেসব চাকরি রয়েছে সেগুলোসহ নারী চাকুরের সংখ্যা ৩৮%। ২০০০ সালের সেক্টর অনুযায়ী চাকরি বণ্টনে অকৃষি খাতে ২২% এবং কৃষি খাতে ১৯% নারী শ্রমিক নিয়োজিত ছিল।

সারণি:

শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী (মিলিয়ন) ১৯৮৯–২০০০[৬৯]

সাধারণ সংজ্ঞা ১০ বছর এবং তার উর্ধ্বে			বর্ধিত সংজ্ঞা ১৫ বছর এবং তার উর্ধ্বে					
মোট	১৯৮৯	১৯৯০–৯১	১৯৯৫–৯৬	১৯৯০–০০	১৯৮৯	১৯৯০-৯১	১৯৯৫-৯৬	১৯৯০-০০
পুরুষ	৩২.৭	৩৪.৯	৪০.৩	৪২.৮	৪৬.১	৪৪.৭	৪৯.১	৫১.৮
নারী	২৯.৪	৩০.৪	৩৩.২	৩৩.৭	২৭	২৭	৩০.৪	৩২.৪
	(৮৯.১১%)	(৮৭.১১%)	(৮২.৩৮%)	(৭৮.৭৪%)	(৫৮.৫৭%)	(৬০.৪০%)	(৬১.৯১%)	(৬২.৫৫%)
	৩.৩	৪.৫	৭.১	৯.১	১৯.১	১৭.৭	১৮.৭	১৯.৪
	(১০.০৯%)	(১২.৮৯%)	(১৭.৬২%)	(২১.২৬%)	(৪১.৪৩%)	(৩৯.৯৯%)	(৩৮.০৯%)	(৩৭.৪৫%)

সূত্র: লেবার ফোর্স সার্ভে, ১৯৯৯–২০০০

লেবার ফোর্স সার্ভে ১৯৯৯–২০০০ এর মাধ্যমে জানা যায়, আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষ বৈষম্য বিরাজমান। মাত্র ৭% নারী শ্রমিক এবং ২৬% পুরুষ শ্রমিক আনুষ্ঠানিক (ফরমাল) সেক্টরে কাজ করে (পাবলিক এবং প্রাইভেট উভয় ক্ষেত্রে)।

ফরমাল সেক্টরে সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পুরুষের তুলনায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা কম। এনজিওগুলোর ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পে নারীদের জন্য স্বনির্ভর স্কিম থাকলেও ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিক উত্তরণে তারা খুব কমই সুযোগ পায়। যাহোক নারী শ্রমিকদের জন্য কাজের পরিবেশও অনুকূল থাকে না।

সারণি:[৭০]

সেক্টর অনুযায়ী নারীর চাকরির পরিমাণ:	শতকরা
কৃষি ক্ষেত্রে	১৯%
শিল্প খাতে	৩১%
সেবা খাতে	১৮%
বেসরকারি খাতে	২২%

৬৮. The Daily Star, 2 January, 2005
৬৯. Labour force survey, 1999-2000
৭০. মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল প্রতিবেদন, ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

সারণি:[৭১]

কাজের ধরন অনুযায়ী ১৫ বছর এবং তার উর্ধ্বে নারী-পুরুষের কাজের হার:

কাজের ধরণ	পুরুষ		নারী		(নারী/পুরুষের সংখ্যা, %)	
	১৯৯৫–৯৬	১৯৯৯–০০	১৯৯৫–৯৬	১৯৯৯–০০	১৯৯৫–৯৬	১৯৯৯–০০
সরকারি/স্বায়ত্তশাসতি	৫.৭০	৬.৩০	১.৭১	১.৪৮	১৮.৩৯	১৪.০৭
প্রাইভেট সেক্টর (ফরমাল)	১১.৪৭	১৯.৮০	৪.৫২	৫.৪২	২৪.২০	১৬.৪১
প্রাইভেট সেক্টর (ইনফরমাল)	৮২.৮৩	৭৪.৯০	৯৩.৭৬	৯৩.১০	৬৯.৪১	৭৫.১২

পারিশ্রমিক নির্ধারণে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য:

সরকারি দপ্তরগুলোতে নারী-পুরুষকে সমান বেতন দেয়া হলেও বেসরকারি সেক্টরে নারীদের পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় অনেক কম বেতন দেয়া হয়। দিনমজুরদের ক্ষেত্রে নারীর তুলনায় পুরুষরা ৬০% বেশি পারিশ্রমিক পায়। ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে এ গ্যাপ ২০.৩%। আত্মকর্মসংস্থান ক্ষেত্রে এ গ্যাপ ২৭.৩% এবং নিয়মিত কর্মীদের ক্ষেত্রে এ গ্যাপ ২২.৮%।[৭২] সমতার ভিত্তিতে প্রবৃদ্ধি, মানবাধিকার রক্ষায় জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে নারীর দক্ষতা এবং কল্যাণের লক্ষ্যে নারীদের উচ্চ বেতনের চাকরিতে নিয়োগ নিশ্চিত করা জরুরি। নারীর নেতৃত্বাধীন পরিবারগুলোতে নারীরা দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয় বেশি। এরকম দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা ৪৫%, অন্যদিকে পুরুষ নেতৃত্বাধীন দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা ৩৯%।

পুনরুৎপাদনশীল কার্যক্রম:

নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, তারা ঘরে থাকবে, ছেলেমেয়ের দেখাশোনা করবে এবং ঘরের বিভিন্ন কাজ তদারক করবে। ২০০৪ সালে ইসলাম, খান এবং হকের গবেষণায় দেখা গেছে ঘরের রান্নায় ১০০% কাজ করে নারীরা, কাপড় ধোয়ায় ৯৮% কাজে, ঘরের পরিচ্ছন্নতা ৯৫%, শিশুদের লালন-পালনের ৯৫% কাজে মেয়েরা নিয়োজিত থাকে। এভাবে পুনরুৎপাদনশীল কাজে নারীর অংশগ্রহণ অনেক বেশি। এছাড়া তারা ঘরের কাজে দিনে ৪.৫০–৫.২০ ঘন্টা সময় ব্যয় করে থাকে। বাংলাদেশের নারীর কাজের পরিবেশ এবং কাজের সুবিধা সন্তোষজনক নয়। সে কারণে জেন্ডার বৈষম্য দূর করতে এবং নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে নারীর কাজের সুবিধা এবং ভালো পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

---

৭১. চিররঞ্জন সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

সারণি:

পুনরুৎপাদনশীল কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের শ্রম:

পুনরুৎপাদনশীল কার্যক্রম	বর্তমানে		নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ %	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
ঘরের কাজের জন্য পানি সংগ্রহ	৭	৯৩	৭	৯৩
ধোয়া-মোছা	২	৯৮	২	৯৮
জ্বালানি ও কাঠ সংগ্রহ	২১	৭৯	১৯	৮১
রান্না	০	১০০	০	১০০
সন্তান লালন-পালন	২৩	৭৭	৩০	৭০
পরিবারের স্বাস্থ্য সেবা	২৫	৭৫	৩১	৬৯
সন্তানের লেখাপড়া	১০	৯০	৫	৯৫
আঙ্গিনা এবং ঘরের আশপাশ পরিষ্কার	৫	৯৫	২	৯৮

সূত্র: ইসলাম, খান এবং হক ২০০৪

'Mechanization and its effect in changing pattern of genderwise employment to improve the rural labours livelihood in Bangladesh', বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০০৪

নারীরা যে সঠিক নির্দেশনা পেলে তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে, তার উদাহরণ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীর দৃপ্ত পদচারণা। বর্তমানে নারীর ভূমিকা সমাজে স্থবির নয়, গতিশীল। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ আগের তুলনায় বেড়েছে। তবে উৎপাদনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে, সেটা অদৃশ্য। অথচ উৎপাদনমূলক কাজে নারীর অবদান ব্যাপক। তবে, জাতীয় আয়ে নারীর এই অবদানকে বিবেচনায় আনা হয়না, এর কারণ প্রক্রিয়াগত ত্রুটি। এ ত্রুটির অপসারণ অতি জরুরি, কেননা নারীর উন্নয়নে তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারীর শ্রমশক্তির প্রকৃত মূল্যায়ন ও শ্রমশক্তিতে তার আরো দৃঢ় অংশগ্রহণ শুধু বাঞ্চনীয়ই নয়, বরং অপরিহার্য।

পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিক:

বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোর মধ্যে পোশাক শিল্পের অগ্রগতি দ্রুততম। ১৯৭৬–৭৭ সালে এক জার্মান রপ্তানিকারকের সহযোগে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে মাত্র গুটি কয়েক কারখানা দিয়ে রপ্তানি ক্ষেত্রে এই শিল্পের গোড়া পত্তন হয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত মাত্র ১২/১৩ বছর সময়ের মধ্যে এই শিল্পের কারখানা সংখ্যা দাড়িয়েছে ৭৫০টিতে। এই দ্রুত অগ্রগতির পেছনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণ থাকলেও অন্যতম প্রধান কারণটি হচ্ছে বাংলাদেশে শ্রমের সস্তা ও সহজপ্রাপ্যতা।

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু পোশাক শিল্প হচ্ছে একটি অতি শ্রমঘন শিল্প। এই শিল্পের উৎপাদন খরচের সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে শ্রম খরচ। তাই সেখানে তুলনামুলকভাবে সস্তা শ্রম পাওয়া যাবে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই এই শিল্প গড়ে উঠার সম্ভাবনা থাকবে।

পোশাক শিল্পের ইতিহাস থেকে দেখা যায় একমাত্র শ্রম মূল্যের হেরফেরের কারণেই এই শিল্প এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর হয়েচে। বস্তুতপক্ষে পোশাক শিল্পের গোড়াপত্তন ঘটেছিল উন্নত দেশসমূহেই। কিন্তু অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে সে দেশগুলিতে শ্রমের মূল্য বেড়ে যায় কয়েকগুণ। ফলে পোশাক শিল্প থেকে মুনাফার অংক যায় অনেক কমে। কিন্তু এই শিল্প থেকে মুনাফার অংকটি সংরক্ষিত করে রাখার জন্য উন্নত দেশগুলি তাদের উৎপাদন উপকরণ নিয়ে স্বল্পমূল্যের শ্রমবাজার খুঁজে বেড়াতে থাকে। তারা অতি সহজেই খুঁজে পায় এশিয়ার সিংগাপুর, তাইওয়ান, হংকং এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সস্তা শ্রম বাজার। বিশেষ করে শ্রমকে কেন্দ্র করেই সেখানে গড়ে উঠে পোশাক শিল্প। এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণের বেশির ভাগই আসতে থাকল অন্য দেশ থেকে। পরবর্তীতে একই কারণে এই চারটি দেশের সাথে পোশাক উৎপাদনে যোগ দেয় শ্রীলংকা, পাকিস্তান, ফিলিপাইন এবং ভারত। সস্তা শ্রমের কারণে এ দেশগুলিতে উৎপাদিত পোশাক সহজেই উন্নত দেশের বাজার দখল করে নেয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত দেশসমূহের পোশাক শিল্প দারুণভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কারণ উচ্চ মূল্য শ্রমের জন্য সেখানে উৎপাদন খরচ অনেক বেশি হওয়ায় তারা স্বল্প মূল্যের শ্রমের দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারছিলনা। এরই ফলশ্রুতিতে মূলতঃ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে পোশাক আমদানির উপর কোটা আরোপিত হয়। সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলি তখন তাদের উৎপাদন, রপ্তানি ও মুনাফা ঠিক রাখার জন্য আরও সস্তা শ্রমের বাজার অন্বেষণ করে। যাতে এসব দেশ থেকে উপ চুক্তির (Sub Contract) মাধ্যমে অল্প খরচে পোশাক তৈরী করিয়ে নিয়ে অন্যত্র রপ্তানি করা যায়। বাংলাদেশের শ্রম অত্যন্ত সস্তা। তাই স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের শ্রম বাজার তাদেরকে আকর্ষণ করল। তারা উপ চুক্তির প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এল। বাংলাদেশের উদ্যোক্তারাও সস্তা শ্রমের কারণেই এ প্রস্তাব লুফে নেয় এবং পুরোপুরি শ্রমের উপর নির্ভর করে গড়ে তোলে একটির পর একটি পোশাক কারখানা। অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন কাপড়, সূতা, বোতাম ইত্যাদি প্রায় সম্পূর্ণরূপে আসলে লাগল বিদেশ থেকে। ফলে পোশাক তৈরীতে বাংলাদেশের ভূমিকা হয়ে দাড়ালো একজন দর্জির।

দেখা যাচ্ছে একমাত্র শ্রমকে পুঁজি করেই বাংলাদেশে পোশাক শিল্প গড়ে উঠেছে। এবং শ্রমের সহজ ও সুলভ প্রাপ্ততার জন্যই এই শিল্পের এত দ্রুত গতিতে বিকাশ ঘটেছে। মাত্র দশ বছর (১৯৮১/৮২) আগেও এ শিল্প থেকে আয় হত দেশের মোট রপ্তানি আয়ের মাত্র ০.৪ শতাংশ। বর্তমানে তা এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০ শতাংশে। মাত্র এক কোটি টাকায় আরম্ভ করে বর্তমানে এই শিল্প থেকে আয় হচ্ছে ২ হাজার কোটি টাকারও বেশি। চলতি অর্থ বছরে (১৯৯০/৯১) এ শিল্প থেকে সরকার ২৭০০ কোটি টাকার রপ্তানি আয় লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করেছেন। তবে বাংলাদেশ এই আয়ের মাত্র ২৫ শতাংশ ঘরে রাখতে পারছে। বাকী ৭৫ শতাংশই দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে পোশাক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি করার জন্য। এখানে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়ার বিষয় হল বাংলাদেশ তৈরী পোশাকে যে মূল্য সংযোজন করছে তার বেশির ভাগই সংযোজিত হচ্ছে শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়ে। এই শ্রমিকদের মধ্যে আবার নারী শ্রমিকই হচ্ছে শতকরা প্রায় ৭৮ জন। প্রকৃতপক্ষে এদেরই সস্তা এবং অনুগত শ্রমের জন্য বাংলাদেশের পোশাক শিল্প আজ এতটা প্রসার লাভ করতে পেরেছে।

Dhaka University Institutional Repository

অথচ এই সত্যটি অনুধাবিত হয়েছে অতি সামান্যই। যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পোশাক শিল্পে নিয়োজিত হাজার হাজার দুস্থ মহিলা শ্রমিক তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।[৭২]

তবে যুগ যুগ ধরে যে মহিলারা সমাজের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত তারা অতি স্বাভাবিকভাবেই কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন অধিকার হতেও বঞ্চিত হবে। তারা যে নিজের অধিকার আদায় করে নেবে তার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। যেহেতু স্বল্প শিক্ষার কারণে তারা জানেই না যে শ্রম আইনের আওতাধীনে তাদের কি কি প্রাপ্য। ফলে তাদেরকে ন্যূনতম মজুরি এবং কারখানার অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় নর-নারী ভিত্তিক বিরাট বৈষম্য তো থাকবেই। এই প্রেক্ষিতে অতি সহজভাবেই ধারণা জন্মে যে পোশাক কারকানার নিয়োজিত নারী শ্রমিকরা ব্যাপক অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার শিকার হচ্ছে।

পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকদের অবস্থা:

বাংলাদেশে মোট শ্রমশক্তি ৩ কোটি ৩০ লক্ষ। এর মধ্যে নারী শ্রম ১৫ শতাংশ বা ৫০ লক্ষের মত। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেব মতে এই ৫০ লক্ষ নারী শ্রমিকের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক অর্থাৎ ১২ লক্ষ বাসাবাড়িতে সেবাদাসি। পোশাক শিল্পে নিয়োজিত প্রায় ১৮ লক্ষ। বাদবাকী ২০ লক্ষ উদ্বৃত্ত নারী শ্রম। এরা সবাই বাসাবাড়িতে বা পোশাক শিল্পে কারখানায় চাকুরি খুঁজছে। অথবা অবৈধ জৈব সেবার দিকে ঝুঁকছে। কাজেই পোশাক শিল্পে একজন শ্রমিকের মজুরি কি হবে তা নির্ধারিত হচ্ছে শ্রমের চাহিদা ও সরবরাহের ঘাত প্রতিঘাতে। পোশাক শিল্প কর্মসংস্থানের যে সুযোগ সে তুলনায় শ্রমের সরবরাহ বহুগুণ। কাজেই মজুরি নিয়ে দর কষাকষির সুযোগ কম। বাসাবাড়িতে যে বেতন তার থেকে সামান্য বেশি বেতনে বা ন্যূনতম বেতনে পোশাক শিল্পে কাজ করার জন্য অসংখ্য নারী শ্রমিক সর্বদা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। মালিক এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পুরোপুরি। কর্মের অভাবে নারী শ্রমিকরা ভেঙ্গে পড়ছে পোশাক শিল্পে, কিন্তু মালিক পক্ষ যে পরিমাণ মজুরি তাদের দিচ্ছে তাকে অমানবিক বলছেন অনেকে। পোশাক শিল্পে নারীর অবদানকে অগ্রগতি হিসেবে দেখিয়ে মালিক পক্ষ এ শিল্পে নিয়োজিত নারীর শ্রমের অমানবিক দিকটাকে লুকোতে চাইছে।[৭৩]

পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের শতকরা ৯০ ভাগের মতোই নারী শ্রমিক। এদের অধিকাংশই অবিবাহিতা। ১৯৯৫ সালে এক হাজার নারী শ্রমিকের উপর ন্যায় ও শান্তি কমিশনের এক জরিপ রির্পোট অনুসারে ৬২.১ শতাংশ নারী শ্রমিকের বয়স ১৬ হতে ২০ বছরের মধ্যে এবং ৭৭.৭ শতাংশ নারী শ্রমিক অবিবাহিতা। আর ২.২ শতাংশ নারী শ্রমিক বিধবা বা স্বামী পরিত্যাক্তা। পোশাক শিল্প কারখানার মালিকগণ অবিবাহিতা মেয়েদের কাজে নিতে বেশি আগ্রহী, কারণ তারা কাজে চটপটে, তাদের স্বামী-সংসারের চাপ নেই, সন্তান লালন পালনের দায়িত্ব নেই; আর মাতৃকল্যাণ ছুটির (ম্যাটারনিটি লিভ) দরকার নেই। তাছাড়া মজুরি নিয়ে এদের দরকষাকষির ক্ষমতা কম। চাকুরি ক্ষেত্রে এদের অবস্থা অনিশ্চিত বলে এদের শ্রম ও সস্তা। তাছাড়া বিবাহিত নারীদের তুলনায় চাহিদা কম বলেও এদের শ্রম তুলনামূলকভাবে সস্তা। এসব নারী ইউনিয়নের ব্যাপারেও সচেতন নয়। এদের কিছু অংশ শ্রমিক ইউনিয়ন করলেও তা কারখানার ব্যবস্থাপনার জন্য কখনো মারাত্মক হয়ে উঠে না।

পোশাক শিল্প কারকানায় কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষার হার দেশের সার্বিক শিক্ষার হার থেকে অনেক বেশি। ন্যায় ও শান্তি কমিশনের জরিপে উত্তরদাতাদের মধ্যে নিরক্ষর ছিল মাত্র ১.৭ শতাংশ, ১৭ শতাংশ পড়াশোনা করেছে প্রাইমারী পর্যন্ত, ৫০.৫ শতাংশ পড়াশোনা করেছে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত

৭২. প্রতিমা পাল মজুমদার প্রমুখ, বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, একতা পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ১৯৯৪, পৃ. ২

৭৩. তাহমিনা সেলিম, জাতীয় উন্নয়নে পোশাক শিল্প, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

এবং ৩০.৮ শতাংশ এসএসসি বা তার উর্ধ্বে। একেবারে নিরক্ষর বা প্রাইমারী পর্যায়ের নীচে যারা, তাদেরকে পোশাক শিল্প কারখানায় উৎসাহিত করা হয় না; কারণ, যারা নিরক্ষর তারা টিপসই দিতে সময় নষ্ট করে। মালিকরা ত্রুটি পছন্দ করেন না। যারা সুপারভাইজারের কাজ করেন তাদের শিক্ষার মান মাধ্যমিক পর্যায় থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত।

কাজের সময়, পরিবেশ ও মজুরি বঞ্চনা:

পোশাক শিল্পে মজুরি বঞ্চনা সীমাহীন। কাজের সময় দীর্ঘ ও ওভারটাইম বাধ্যতামূলক। কিন্তু মজুরি দেবার বেলাতেই যত গড়িমসি। মজুরি দেবার ব্যাপারে মালিকরা কোনো নিয়মনীতির ধার ধারেন না। ন্যায় ও শান্তি কমিশনের জরিপ অনুসারে শিক্ষানবীশকালীন সময় ৪১.৫ শতাংশের তিন মাস, ৪০.২ শতাংশের ৪-৬ মাস, ১৮.৩ শতাংশের ৬ মাস বা তারও অধিক। শিক্ষানবীশকালীন গড়পড়তা বেতন মাসিক ৭০০/৯০০ টাকা। শিক্ষানবীশকালীন সময় পার হয়ে যাবার পরও চাকুরির কোনো নিশ্চয়তা নেই। সার্ভিস বুক বা হাজিরা কার্ড দেয়া হয় না অধিকাংশ কারখানায়। পরিচয়পত্র দেবার ব্যবস্থা আছে কোনো কোনো কারখানায়।

ওভারটাইমের বেতনের বেলাতে মালিকের গড়িমসি স্বেচ্ছারিতার পর্যায়ে। মোটামুটি সব কারখানাতেই ওভারটাইম বাধ্যতামূলক। ন্যায় ও শান্তি কমিশনের জরিপ অনুসারে শতকরা ৭৭.৭ জন শ্রমিককে বাধ্যতামূলকভাবে ওভারটাইম করতে হয়। বাকী ২২.৩ শতাংশের জন্য ওভারটাইম ঐচ্ছিক। ১১.৮% সপ্তাহে ১০ ঘন্টা বা তারও কম ওভারটাইম কাজ করে, ১৪.৪% সপ্তাহে ১১-১৫ ঘন্টা, ১০.৬% সপ্তাহে ১৬-২০ ঘন্টা এবং ৫২.৯% সপ্তাহে ২১ ঘন্টা বা তারও অধিক সময় ওভারটাইম কাজ করে। কাজের চাপ থাকলে একটানা ৪৮ ঘন্টা বা ৭২ ঘন্টা কাজ করানোর নজিরও আছে পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে। কিন্তু অধিকাংশ কারখানাতেই ওভারটাইমের বেতন কারখানার আইন বা সরকার নির্ধারিত মজুরি-কাঠামো অনুসারে দেয়া হয়না। শ্রম আইনের সীমাবদ্ধতার কারণে এবং মালিক ও ব্যবস্থাপনার আইন ভাঙ্গার বিরুদ্ধে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা না নেবার কারণে শ্রমিকদেরকে তাদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করা সম্ভব হয়। ওভারটাইমের হিসেব ঠিকমত না রাখার অভিযোগ সর্বত্র। ওভারটাইমের সময় কম করে দেখানোর জন্য সব রকম ফাঁকির আশ্রয় নেয়ার নজির দেখা যায়।[৭৪]

সরকার নির্ধারিত বেতন কাঠামোর যৌক্তিকতা:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮৫ সালের ১৬ই জুন পরিবর্তিত আকারে পোশাক শিল্পের ন্যূনতম বেতন-কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এ কাঠামো অনুসারে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকের বেতন নির্ধারিত হয়েছে মাসিক ১,১১২ টাকা; দক্ষ-১ এর বেতন ৯০৩ টাকা; দক্ষ-২ এর ৮০৮ টাকা; আধাদক্ষ-এর ৭১৩ টাকা এবং অদক্ষের ন্যূনতম বেতন ৬২৭ টাকা।

সরকার যে ন্যূনতম বেতন কাঠামো দাঁড় করিয়েছে বাংলাদেম গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন তা যুক্তিযুক্ত মনে করে না। তাই বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন ভিন্ন একটি মজুরি কাঠামো নির্ধারণ করেছে এবং সরকার ও মালিকদের কাছে তা পেশ করেছে। ফেডারেশনের এ কাঠামো অনুসারে উচ্চতর দক্ষ শ্রমিকদের জন্য মূল মজুরি ও ভাতাসহ মোট ১,৯৮৫ টাকা, দ্বিতীয় গ্রেডের দক্ষ শ্রমিকদের জন্য মূল মজুরি ও ভাতাসহ ১,৬৪৫ টাকা, আধাদক্ষ শ্রমিকদের জন্য মূল মজুরি ও ভাতাসহ ১,৪৭৫ টাকা এবং অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য মুল মজুরি ও ভাতাসহ ১,৩০৫ টাকা দাবী করা হয়েছে।

---

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

Dhaka University Institutional Repository

ফেডারেশন রেশন দরে পাঁচ মন চাউলের মূল্যকে ভিত্তি ধরে নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের দাবী জানিয়েছে।

সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি কাঠামো এবং বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন প্রণীত মজুরি কাঠামোর পাশাপাশি আরেকটি হিসেব দেয়া যেতে পারে। পোশাক শিল্পে কর্মরত একজন শ্রমিকের পরিবারে যদি ৫ জন সদস্য থাকে তবে তার পরিবারকে নিয়ে শহরে একবারে সাধারণ ঘরে (বেড়ার ঘর) থেকে সাধারণ খাওয়া খেয়ে মাসে কত টাকা খরচ হতে পারে? প্রতি সদস্যের প্রতিদিন মাথাপিছু চাল দরকার কম করে হলেও আধা সের।

ঘরভাড়া ও খাবারের জন্য অন্যান্য খরচ বাবদ আধাসের চালের সমমূল্য ধরা যেতে পারে। কাপড়-চোপড়, যাতায়াত ইত্যাদি বাবদ আরও আধাসের চালের সমমূল্য ধরা হলে প্রতি সদস্যের দৈনিক খরচ দেড় সের চালের সমমূল্য। তাতে পরিবারের দৈনিক খরচ সাড়ে সাত সের চালের সমমূল্য। প্রতি সের চালের মূল্য ১২ টাকা ধরলে পাঁচ সদস্যের পরিবারের মাসিক খরচ পড়বে ২৭০০ টাকা। শ্রমিক যদি একা শহরে থাকে এবং বাদবাকী সদস্যরা যদি গ্রামে থাকে তবে পরিবারের খরচ কিছু কমে দাঁড়াবে ২১০০ টাকায়। এ হিসেব শ্রমিকদের ন্যূনতম প্রয়োজনকে ভিত্তি করে করা হয়েছে।[৭৫]

সরকার যে ন্যূনতম বেতন কাঠামো দাঁড় করিয়েছে আর বাংলাদেশ গার্মেন্টস্ শ্রমিক ফেডারেশন যে বেতন কাঠামো প্রণয়ন ও প্রস্তাব করেছে তার মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধানে রয়েছে। বর্তমান বাজার দরে ন্যূনতম প্রয়োজনকে ভিত্তি করে আর যে একটি ন্যূনতম হিসেব তৈরি করা হয়েছে তার সাথে সরকারি বেতন কাঠামোর পার্থক্য আরো বেশি। পোশাক শিল্পে বেতন নিয়ে বর্তমানে যে অবস্থা তাতে মালিকপক্ষ সরকার নির্ধারিত বেতন কাঠামোই মানছেন না। ফেডারেশন কর্তৃক প্রণীত ও প্রস্তাবিত বেতন কাঠামো মেনে নেবার তো প্রশ্নই উঠে না। এক এক কারখানায় মালিক এক একভাবে বেতন নির্ধারণ করে থাকেন। বেতন নির্ধারণের ব্যাপারটি মালিকের খেয়ালখুশির ওপর নির্ভরশীল।

পোশাক রপ্তানিকারক দেশগুলোর তুলনামূলক মজুরি চিত্রঃ

বাংলাদেশে পোশাক শিল্প স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেনি। এশিয়ার অন্যান্য দেশের শ্রমিকের মজুরি বাড়ার কারণেই বাংলাদেশে পোশাক শিল্প এসেছে। বিশেষত: শ্রীলংকায় রাজনৈতিক গোলযোগ এবং সশস্ত্র সংঘর্ষের কারণে বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের প্রবেশ ত্বরান্বিত হয়। স্বাভাবিক কারণেই বাংলাদেশে পোশাক শিল্প কারখানাগুলোর মালিকদের সমস্যা অনেক। বাংলাদেশের একজন কারখানা মালিক কোনোভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন মালিকের সমান মজুরি দিতে পারেন না। কিন্তু মালিক তার উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি দিতে পারেন। তাতে কোনো বাধা থাকার কথা নয়। বাংলাদেশে একজন শ্রমিকের কর্মক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার অর্ধেকের সামান্য বেশি। তারপর উৎপাদনের জন্য যেসব কাঁচামাল ও মেশিনারী দরকার তাও আসে বাইরে থেকে। কিন্তু এসবের পরেও মার্কিন মুল্লুকের একজন শ্রমিক সেখানে যদি ঘণ্টায় গড়পড়তা ৫/৬ টাকা পান তবে আমরা ব্যাপারটি কিভাবে দেখব? একে আমরা কিভাবে ন্যায্য মজুরি বলব?

উন্নত এবং উন্নয়নশীল কতকগুলো দেশের মজুরির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা গেলে বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকদের মজুরি বঞ্চনার ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে।

---

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক বাজারে পোশাক শিল্পের মজুরি চিত্র:

দেশের নাম (প্রতি ঘণ্টায় মজুরি)	ইউএস ডলারে মজুরির হার (স্ট্যান্ডার্ড)	ইউএস ডলারে ঘন্টায়
ইউএসএ	৭.৫৩	১০০
সিংগাপুর	১.৬০	২১
দক্ষিণ কোরিয়া	১.৫৩	২০
তাইওয়ান	১.৪৩	১৯
হংকং	১.৪০	১৯
চীন	০.৭৫	১০
ভারত	০.৬৬	৯
শ্রীলংকা	০.৩৫	৫
বাংলাদেশ	০.২৫	৩

(সূত্র: ট্রেড এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি রিফর্ম-এর দলিল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন, ইউনিট এন্ড দি ডেভেলপমেন্ট অব পোটেনশিয়াল এক্সপোর্ট প্রডাক্টস লাইন্স ইউনিট, পুস্তক নং-২, বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশন, জানুয়ারি ১৯৮৮)

টেবিল-২১. একটি শার্ট তৈরির (সি/এম) মজুরি ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র:

দেশের নাম (প্রতি ঘন্টায় মজুরি)	ইউএস ডলারে (ব্যয়িত মিনিট)	প্রতি শার্টে মোট (প্রতি শার্টের মজুরি)	ইউএস ডলারে (স্ট্যান্ডার্ড)	ইউএস ডলারে
ইউএসএ	৭.৫৩	১৪	১.৭৬	১০০
হংকং	১.৪০	১৯.৭৫	০.৪৬	২৬
দক্ষিণ কোরিয়া	১.৫৩	২০.৭৫	০.৫৩	৩০
শ্রীলংকা	০.৩৫	২৪	০.১৪	৮
বাংলাদেশ	০.২৫	২৫	০.১০	৬

(সূত্র: ট্রেড এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি রিফর্ম প্রোগ্রাম-এর দলিল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন, ইউনিট এন্ড দি ডেভেলপমেন্ট অব পোটেনশিয়াল এক্সপোর্ট প্রডাক্টস লাইন্স ইউনিট, পুস্তক নং-২, বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশন, জানুয়ারি-১৯৮৪)

টেবিল-প্রথম এ আমরা দেখি যে নয়টি দেশের মধ্যে প্রতি ঘণ্টা হিসেবে বাংলাদেশের মজুরি সবচেয়ে কম। বাংলাদেশের উপরেই শ্রীলংকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ঘণ্টায় মজুরি যেখানে ৭.৪৩ ডলার, সেখানে বাংলাদেশে প্রতি ঘন্টায় মজুরি ০.২৫ ডলার। এশিয়ার মধ্যে প্রতি ঘণ্টায় মজুরি সবচেয়ে বেশি সিঙ্গাপুরে, ১.৬০ ডলার। এরপরেই দক্ষিণ কোরিয়ায় ১.৫৩ ডলার, তাইওয়ানে ১.৪৩ ডলার

Dhaka University Institutional Repository

হংকং-এ ১.৪০ ডলার, চীনে ০.৭৫ ডলার, ভারতে ০.৬৬ ডলার এবং শ্রীলংকায় ০.৩৫ ডলার। এতে বোঝা যায় আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের স্থান সর্বনিম্নে।

টেবিল-দ্বিতীয় এর দিকে তাকালে আমরা দেখি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি শার্ট বানাতে সময় লাগে ১৪ মিনিট এবং তার মজুরি পড়ে ১.৭৬ ডলার। প্রতিটি শার্ট বানানোর সময় এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। বাংলাদেশ একটি শার্ট বানাতে সময় নেয় সবচাইতে বেশি, ২৫ মিনিট। একটি শার্ট বানাতে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় দ্বিগুণ সময় নিলেও প্রতিটি শার্টের জন্য বাংলাদেশ তার শ্রমিককে যে মজুরি দেয় তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় খুবই কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি শার্টের জন্য তার শ্রমিককে যেখানে ১.০০ ডলার দেয়, বাংলাদেশ সেখানে মাত্র ০.২৫ ডলার, হংক ১.৪০ ডলার, দক্ষিণ কোরিয়া ০.৫৩ ডলার এবং শ্রীলংকা দেয় ০.৩৫ ডলার।[৭৬]

কর্মক্ষেত্রে নারীর স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন আছে। সমাজে নারীর মান-সম্ভ্রম নিয়ে পুরুষ জাতির ভাবনার অন্ত নেই। কিন্তু আইন শুধু কাগজে। পোশাক শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকরা কিভাবে আইনগত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

কাজের সময় ও ওভারটাইমের মজুরিঃ

১৯৬৫ সালের ফ্যাক্টরিজ এ্যাক্ট এর ৬৫ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো কারখানায় কোনো নারীকে সকাল ৭টা থেকে রাত ৮ টার মধ্যে ছাড়া অন্য কোনো সময় কাজ করতে দেয়া যাবে না। এ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে কিছুটা। গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে সরকার যে কোনো কারখানায় বা যে কোনো বিশেষ শ্রেণীর কারখানার বেলায় এবং সারা বছরের জন্য বা বছরের যেকোনো অংশের জন্য উল্লেখিত সময়সীমার ব্যতিক্রম করে সকাল ৫টা থেকে রাত ৮.৩০ টা পর্যন্ত দশ ঘণ্টা অবধি কাজের সময় নির্ধারণ করে দিতে পারে। পোশাক শিল্প কারখানার বেলাতে দেখা যায় নারী শ্রমিকদেরকে দিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে রাত ৯/১০টা পর্যন্ত কাজ করানো হয় এবং শিপমেন্টের আগে প্রয়োজনে ৩৬ ঘণ্টাও একটানা কাজ করানো হয়। নারী শ্রমিকদেরকে দিয়ে অন্যায়ভাবে অধিক সময় কাজ করানোর ব্যাপারটি দেখার দায়িত্ব যে চীফ ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ-এর, তিনি মালিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল। মালিকরাও কেউ কেউ নারীদের নিয়োগবিধি সম্পর্কে অজ্ঞ বলে অনুমান করা যায়। নারীদেরকে দিয়ে রাত ৮টার পর কাজ করানোর ব্যাপারটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার; কারণ আমাদের সমাজব্যবস্থা এমনই যে রাত ৮টার পর নারীদেরকে দিয়ে কাজ করানোর অবস্থা এখানে বিতর্কিত।

ওভারটাইম বা অতিরিক্ত সময় কাজের ব্যাপারে আইনে বলা হয়েছে যে, অতিরিক্ত ১ ঘন্টা কাজের মজুরি স্বাভাবিক কাজের মজুরির দ্বিগুণ। অতিরিক্ত সময় কাজের ব্যাপারে আর একটি নিয়ম হলো স্বাভাবিক ও অতিরিক্ত সময় মিলিয়ে কোনো শ্রমিককে (পুরুষ/নারী) সপ্তাহে কোনো অবস্থাতেই ৬০ ঘন্টার বেশি এবং বছরে প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৫৬ ঘন্টার বেশি কাজ করানো যাবে না। এর বেশি কাজ করা বা না করা শ্রমিকের ইচ্ছের ব্যাপার। কিন্তু বিভিন্ন উৎসের কাজে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে অধিকাংশ কারখানাতেই এ নিয়ম ভাংগা হয় এবং অতিরিক্ত কর্ম ঘন্টার প্রশ্নে নারী শ্রমিকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো দামই দেয়া হয় না।[৭৭]

---

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

Dhaka University Institutional Repository

কাজের পরিবেশ ও সন্তান লালন-পালনের সুবিধাদি:

১৯৬৫ সালে ফ্যাক্টরি আইনের আওতায় ১৯৭৯ সালের ফ্যাক্টরি রুলস-এর ৩নং অধ্যায়ে কাজের স্বাস্থ্যকর পরিবেশের দিকে নজর দিতে বলা হয়েছে। ঐ অধ্যায়ে বলা হয়েছে কাজের পরিবেশে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা শৌচাগার বা ল্যাভেটরি থাকতে হবে এবং ২৫ জন শ্রমিকের জন্য একটি করে শৌচাগার বা ল্যাভেটরি থাকতে হবে। মোটকথা, ভাল কাজের পরিবেশ থাকতে হবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো বড় বড় কারখানাগুলোতে আলো-বাতাসের ভালো ব্যবস্থা থাকলেও ছোট ছোট কারখানাগুলোতে আলো-বাতাসের ভালো ব্যবস্থা নেই। নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের জন্য আলাদা শৌচাগার বা ল্যাভেটরি ব্যবস্থা নেই অনেক কারখানাতেই।

সাধারণত: ৫০ জনের বেশি নারী শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে এমন কারখানায় সংশ্লিষ্ট মহিলা শ্রমিকদের অনধিক ছয় বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের জন্য যথোপযুক্ত শিশুকক্ষ বা কক্ষসমূহ থাকতে হবে। ১৯৬৫ সালের কারখানা আইনে বলা হয়েছে এ ব্যবস্থার কথা। এবং সে কক্ষগুলোতে থাকার সুষ্ঠু ব্যবস্থা এবং আলো-বাতাসের ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতে হবে এবং শিশু পালন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে। সরকার এ ব্যাপারে আরো কতকগুলো বিধি প্রণয়ন করতে পারেন। বাংলাদেশের অধিকাংশ কারখানাতে যে ৫০ জনের অধিক মহিলা শ্রমিক কাজ করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বাংলাদেশের সাড়ে আটশ'র মতো কারখানার কোনো একটিতে শিশুকক্ষ আছে বলে আজো শোনা যায়নি। এটি আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এ ব্যাপারে আইন প্রয়োগকারীগণ নীরব। আর এ নীরবতাই পোশাক শিল্প কারখানার মালিকদের জন্য সোনায় সোহাগা হয়ে উঠেছে। পোশাক শিল্প কারখানাসমূহে অবিবাহিতা নারী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৭৭ শতাংশের মতো হওয়ায় মালিকদের সুবিধা হয়েছে আরো বেশি। শিশুকক্ষের দাবী সেভাবে উঠে না শ্রমিকদের পক্ষ থেকে। নারী শ্রমিকদের মাতৃকল্যাণ ছুটির ব্যাপারেও সুস্পষ্ট আইন আছে। শ্রম আইনের একটি ধারায় বলা আছে, নারী শ্রমিকরা সন্তান জন্মদানের আগে ছয় সপ্তাহ এবং সন্তান জন্মদানের পরে ছয় সপ্তাহ মোট বারো সপ্তাহ মাতৃকল্যাণ ছুটি পাবেন। এসময় তারা বেতনও পাবেন। তবে এখানে আরেকটু বলার আছে যে, কোনো নারী শ্রমিক কোনো মালিকের অধীনে ৯ মাস কাজ করার পরই কেবল বেতনসহ মাতৃকল্যাণ ছুটি পাবেন। কোনো মালিকের অধীনে কোনো নারী শ্রমিক ৯ মাসের কম কাজ করে থাকলে মাতৃকল্যাণ ছুটি পাবেন, তবে তা হবে বেতন ছাড়া। বিভিন্ন উৎসের সাথে যোগাযোগ করে যতদূর জানা গেছে দেশের পোশাক শিল্প কারখানায় নারী শ্রমিকরা মাতৃকল্যাণ ছুটি ভোগ করতে পারেন না।[৭৮]

মোট কথা, পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগ নেই। সে কারণে এ শিল্পের নারী শ্রমিকরা তাদের আইনানুগ অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত। রাষ্ট্রীয় দুর্বলতা, মালিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতি কারখানা আইন প্রয়োগকারীদের সমর্থন, আইন সম্পর্কে সাধারণ নারী শ্রমিকদের অজ্ঞতা, শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নের অভাব, শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের প্রচেষ্টা বানচাল করার জন্য মালিক পক্ষের প্রচেষ্টা, ব্যাপক বেকারত্ব এসবের কারণে আইনের যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হয়ে উঠছে না। পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা তাদের আইনানুগ অধিকার আদায়ের জন্য এবং মালিকদের 'যা ইচ্ছে তাই' করার প্রতিবাদে একেবারে যে কিছু করছে না তা নয়। কিছু কিছু শ্রমিক কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু মালিক যখনই জানতে পারেন যে, তার কারখানায় ইউনিয়ন

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

Dhaka University Institutional Repository

গঠনের চেষ্টা হচ্ছে তখনই তিনি ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িতদের চাকুরিচ্যুত করেন, মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করেন এবং জেলে পাঠাবার সব রকম ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেন। ট্রেড ইউনিয়ন হয়ে যাবার পর জড়িত শ্রমিকদেরকে নানাভাবে হয়রানি, এমনকি গুন্ডাপান্ডা দিয়ে ভয়ভীতি দেখানো হয়। ট্রেড ইউনিয়ন করতে গিয়ে অনেক শ্রমিক শারীরিকভাবে পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে। কখনো কখনো মালিক তার অনুগত শ্রমিকদের দিয়ে পাল্টা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করেন। এই পেটি ট্রেড ইউনিয়ন সব সময় মালিকপক্ষের স্বার্থরক্ষা করে চলে।

ন্যায় ও শান্তি কমিশনের জরীপ অনুসারে পোশাক শিল্পে ১৫.৮ শতাংশ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য এবং ৮৪.১ শতাংশ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হয়নি। বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে না উঠার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে: (ক) নরী শ্রমিকরা সর্বদা নিপীড়িত বলে এদের সচেতনতার স্তর নীচে; (খ) দুর্নীতিপরায়ণ সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী এবং মালিকদের বেআইনি তৎপরতা; (গ) সাংগঠনিক শক্তির অভাব; (ঘ) শিল্পটি এখনও আমাদের দেশে নতুন এবং অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে ইত্যাদি।

নারী শ্রমিকদের সামাজিক অবস্থান:

সমাজে অনেকে আছেন যারা পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকদের কাজকে নীচুমানের কাজ মনে করেন। বেপর্দা হয়ে তারা সমাজের মুখে চুনকালি মাখিয়েছেন, সমাজের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে বলে সমাজের এক শ্রেণীর লোকের ধারণা। কারখানায় যাওয়া-আসার পথে অনেক সময় তাদেরকে অশালীন মন্তব্য শুনতে হয়। পাড়ার মাস্তানদের হাতে পড়ে শ্লীলতাহানি বা অপমানিত হবার ঘটনাও ঘটে। অনেক সময় নারী শ্রমিকদেরকে রাত ১০ টার পরে ঘরে ফিরতে হয়। মালিকপক্ষ ফ্যাক্টরির বাইরে শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে মোটেও চিন্তিন নয়। তাদের যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থা না করায় রাতে ঘরে ফেরা সব সময় নিরাপদ নয়।

পোশাক শিল্পে বেতন অপর্যাপ্ত। কাজেই শ্রমিকদের থাকার জায়গা ও খাওয়া-পরার ব্যবস্থা নিম্নমানের। তার ওপর অধিকাংশ শ্রমিকের পরিবারের অবস্থা খারাপ হবার কারণে তাদেরকে বাড়ির জন্যও ভাবতে হয়। মোটকথা, পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা সার্বিক অর্থে নিম্নমানের।

নারী ও পোশাকশিল্প:

বাংলাদেশের বড় শহরগুলোর সকালবেলার রাজপথ এখন নিম্নবিত্ত নারীর পদাচারণায় মুখর। হাতে টিফিন ক্যারিয়ার, কারখানায় ছুটছে পোশাকশিল্পের কর্মচারী নারী। ক্রমবর্ধমান ফতোয়া, পথের অনিরপত্তা, সামাজিক নিন্দা এ পথযাত্রাকে স্থবির করতে পারেনি। এ যাত্রা ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। শিল্পে মেয়েদের শ্রমশক্তির হার বেড়েছে, এ খবরটি নিঃসন্দেহে সুসংবাদ। কিন্তু পত্রিকায় পোশাক শিল্প সম্পর্কিত প্রতিনিয়ত দুঃসংবাদগুলোর সংখ্যা খুব কম নয়। নারী শ্রমিকদের ভিতরে রেখে তালা ঝুলানো, আগুন লেগে অসংখ্য নারী শ্রমিকের প্রাণহানি, কারখানায় যৌননিপীড়ন, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারহরণ, কোনো নিয়োগপত্র না দিয়ে শ্রমিকদের কর্মে নিয়োগ করা, কর্মচারীদের জোরপূর্বক সময়ের অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য করা, পথের অনিরাপত্তা, সর্বোপরি এত প্রাণান্ত পরিশ্রমের পরও নারী শ্রমিকদের দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াইয়ের অব্যাহত অবস্থা-এসবই এ পোশাক শিল্পকে হাজারো প্রশ্নের মুখোমুখি করছে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বিস্তারলাভের ইতিহাসের পটভূমিতে রয়েছে সস্তাশ্রমের ভিত্তি, যা বাংলাদেশকে বর্ধিত রপ্তানি উন্নয়নে ক্রমাগতই উৎসাহিত করছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি:

বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের পরিসংখ্যান ও রপ্তানি আয়

বছর	পোষাক শিল্পের সংখ্যা	এ শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা (মিলিয়ন)	রপ্তানি (মিলিয়ন ডলার)
১৯৮৩–৮৪	১৩৪	–	৩১.৫৭
১৯৮৪–৮৫	৩৮৪	–	১১৬.২
১৯৮৫–৮৬	৫৯৪	০.১৯৮	১৩১.৪৮
১৯৮৬–৮৭	৬২৯	০.২৮৩	২৯৮.৬৭
১৯৮৭–৮৮	৬৮৫	০.৩০৬	৪৩৩.৯২
১৯৮৮–৮৯	৭২৫	০.৩১৭	৪৩১.০৯
১৯৮৯–৯০	৭৫৯	০.৩৩৫	৬২৪.১৬
১৯৯০–৯১	৮৩৪	০.৪০২	৮৬৬.৮২
১৯৯১–৯২	১১৬৩	০.৫৮২	১১৮২.৫৭
১৯৯২–৯৩	১৫৩৭	০.৮০৪	১৪৪৫.০২
১৯৯৩–৯৪	১৮৩৯	০.৮২৭	১৫৫৫.৭৯
১৯৯৪–৯৫	২১৮২	১.২০	২২৮.৩৫
১৯৯৫–৯৬	২৩৫৩	১.২৯	২৫৪৭.১৩
১৯৯৬–৯৭	২৫০৩	১.৩০	৩০০১.২৫
১৯৯৭–৯৮	২৭২৬	১.৫০	৩৭৮১.৯৪

(Source: Export Promotion Bureau BGMEA)

সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে এ শিল্পের শ্রমিক সংখ্যা ১৯৮৫–৮৬ সনে ছিল ০.১৯৮ মিলিয়ন; ১৯৯৭–৯৮ সনে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এটি ১.৫০ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। একই সাথে ক্রমান্বয়ে বেড়েছে শিল্পসংখ্যা ও রপ্তানি আয়। ১৯৮৩–৮৪ সনে শিল্প সংখ্যা ছিল ১৩৪টি; পরবর্তীকালে এর সংখ্যা ১৯৯৭–৯৮ সনে ২৭২৬টিতে উন্নীত হয়। রপ্তানি আয় ১৯৮৩–৮৪ সনে ছিল ৩১.৫৭ মিলিয়ন ডলার; পরবর্তীকালে এর আয়ের পরিমাণ বর্ধিত হয়ে দাঁড়ায় ৩৭৮১.৯৮ মিলিয়ন ডলারে।[৭৯]

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের নারীশ্রমিকদের অধিকাংশই বয়সে নবীন। মালিকপক্ষ ব্যবসায়িক কারণে অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের কাজ করতে বাধ্য করে। সাধারণত শ্রমিক নিয়োগ পর্বেই তারা অবিবাহিতা অল্পবয়স্ক মেয়েদের চাকুরি দিয়ে থাকে। লক্ষ্য করা গেছে, এদের অধিকাংশই গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল কাজে যোগ দেওয়ার অল্প কিছুদিন আগে। তাদের গ্রাম ছেড়ে আসার পিছনে রয়েছে

৭৯. হান্নানা বেগম, মানব সম্পদ: বাংলাদেশের নারী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২০০২, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

নারী নির্যাতনের মতো লোমহর্ষক ইতিহাস ও দারিদ্র্য, নদীভাঙ্গন, ভূমিহীনতা, বিবাহবিচ্ছেদ, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, গ্রামে কর্মসংস্থানের প্রকট অভাব, সমাজচ্যুত ও ছিন্নমূল অসহায় মহিলাদের পুর্নবাসন ব্যবস্থার অভাব, গৃহ পরিচারিকার অসম্মানজনক পেশা, সামাজিক অবজ্ঞা, আর্থিক মজুরির নিশ্চয়তার অভাব এবং নিরাপত্তার অভাবজনিত কারণসমূহ।[৮০]

শ্রমশিল্পে যোগদানের পর বাংলাদেশের নারীদের সমস্যার স্বরূপ পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু সমস্যা আসছে বারে বারে বহুরূপে। এসব কারখানায় যখন তখন আগুন লাগে। শ্রমিক নিহত হয়। পত্রিকার পাতায় সারিবদ্ধ লাশ, স্তূপীকৃত মৃতদেহ। আগুল লাগার কারণ বিভিন্ন। তবে মৃত্যুর কারণ, বদ্ধ কোলাপসেবল গেইট। মালিকেরা কেন তালা লাগান? মালিকপক্ষের যুক্তি হলো পোশাক শিল্পের কাঁচামালের প্রকৃতি এমন যে সেখানে চুরি সহজেই সম্ভব। কাপড়, সুতা, বোতাম ইত্যাদি চুরি প্রায় নিত্যদিনের ব্যাপার। এমনকি জানাল দিয়ে কাপড়ের গাঁটও নিচে ফেলে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য মালিকপক্ষ মরিয়া হয়ে উঠেন, দরজায় তালা লাগান, গেইটে দারোয়ান বসান, নারী শ্রমিকের দেহতল্লাশির জন্য লোক নিয়োগ করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জানালা বন্ধ করেন, লোহার জাল লাগান। দরজা বন্ধ করার দ্বিতীয় কারণ পাড়ার মাস্তান ও তাদের ঢিল মারা থেকে কমবয়সী মেয়েদের রক্ষা করা। কোলাপসেবল গেইটের তালা এবং গার্মেন্টেসের অপ্রশস্ত সিঁড়ি অগ্নিকান্ডের সময় শ্রমিকের মৃত্যুর প্রধান কারণ।[৮১]

বাংলাদেশে গার্মেন্টেসে শিল্প শুরু করা হয়েছিল অপরিকল্পিত ও অদক্ষভাবে। গার্মেন্টস করার জন্য যে ধরণের বাড়ি দরকার তার কোনো ব্যবস্থাই প্রথম দিকে ছিল না। ইদানিং কয়েকটি কারখানা ধীরে ধীরে নিজস্ব ভবন তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছে। তবে যে কারণেই হোক শ্রমিকের মৃত্যুর জন্য মালিকপক্ষ অথবা সরকার কেউ দায় এড়াতে পারে না। বাংলাদেশের মালিকপক্ষ নিজেদের প্রয়োজনমাফিক নারীশ্রমিকদের পরিচালনা করছেন। এ সুযোগ তাদের যথেষ্ট অধিকারও হরণ করা হয়। বি.আই.ডি.এস-এর গবেষণায় কারখানাগুলোর শ্রমিকদের জরিপে দেখা গেছে ২৯ শতাংশেরও বেশি নারী শ্রমিক কোনো লেখাপড়া জানে না। দশম শ্রেণী উত্তীর্ণদের সংখ্যা মাত্র ৯ শতাংশ। এসব অল্পশিক্ষিত শ্রমিকের শতকরা ৫৫ জনের বয়স বিশ বছরের নিচে এবং তাদের শতকরা ৮০ জন ট্রেড ইউনিয়নের কোনো জ্ঞান রাখে না। এক্ষেত্রে মালিকপক্ষের বক্তব্য হলো-গার্মেন্টেস শ্রমিকদের সচেতনতা খুবই নিম্নমানের। এ অবস্থায় ট্রেড ইউনিয়ন করলে পরিচালনা তাদের হাতে থাকবে না। কারণ রাজনৈতিক দলই ট্রেড ইউনিয়নে সক্রিয় থাকে। প্রতিটি দলই দাবি উত্থাপন করে এবং মালিককে প্রত্যেক দলকে সন্তুষ্ট রাখতে হয়। মালিক যখনই কোনো দলের মর্জিমাফিক চলতে ব্যর্থ হন তখনই শ্রমিকদের উস্কে দেওয়া হয়। এর ফলে মাস্তান ও রাজনৈতিক দলগুলো উপকৃত হয়, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় মালিক ও শ্রমিক।[৮২]

ইনস্টিটিউট ফর ল্ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কিছুদিন আগে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিষয়ে যে কর্মশালা করেছেন তাতে বলা হয়েছে, বাংলাদেম উইমেন্স হেলথ্ কোয়ালিশনের একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে নারী শ্রমিকদের ২৫% মহিলা এম আর করছে; এর মধ্যে ২৩.৮০% গার্মেন্টস শ্রমিক। কারণসমূহ হলো-চাকুরি পাওয়ার জন্য বিবাহিতা মেয়েরাও নিজেদের অবিবাহিতা বলে এবং পরবর্তীকালে চাকুরি বজায় রাখার জন্য এম.আর করে। এছাড়া যাদের আগে একটি কি দুটো বাচ্চা আছে তারাও কাজের সুবিধার জন্য এম.আর. করে।

---

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের শ্রম আইনের নিয়মে ৫০ জনের অধিক মহিলাকর্মী থাকলে সেখানে দিবাযত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা রাখতে হবে। দেখা যায়-পোশাক শিল্পে নারী ও পুরুষ-শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক মজুরি-পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এজন্য পুরুষের দক্ষতা ও শিক্ষাকে প্রধান কারণ বলে মালিকগণ চিহ্নিত করেন। তবে লক্ষণীয় যে, পোশাক কারখানার একজন শ্রমিকের দক্ষতা নিরূপণ কঠিন ব্যাপার, যেহেতু পোশাক তৈরির কাজ হলো দলীয় কাজ। যেখানে একটি অপারেশনেই প্রয়োজন হয় ৫–১৫ জনের সহযোগিতা এবং একটি পোশাক সম্পূর্ণ করতে কমপক্ষে ৫০ জনের সাহায্যের প্রয়োজন হয় সেখানে অদক্ষতার অজুহাতে নারী শ্রমিকদের স্বল্পমজুরি দেওয়া অবান্তর। নারী শ্রমিকরা যদি এত অযোগ্য হয় তাহলে সমাজে এত বেকার শ্রমিক থাকতে কেন তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এক্ষেত্রে শিল্পে নারীর আনুগত্যই নারীর প্রধান গুণ বলে বিবেচিত হয়। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে নারী তার সংসারের হাজারো মূল্য দিয়ে কারখানায় সর্বপ্রকার আনুগত্য বজায় রেখে কারখানার উৎপাদন ঠিক রাখে, যে কারণে মালিকপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ে রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছুটা নিরুদ্বিগ্ন থাকে। তাহলে সেক্ষেত্রে নারী শ্রমিককে তাদের আনুগত্যের মূল্যও দেওয়া উচিত।

সারণি:

পোশাক শিল্পে নারী-পুরুষের তুলনামূলক শ্রমচিত্র

বছর	পুরুষ-শ্রমিক	নারী শ্রমিক	মোট
১৯৯১–৯২	৮৭৩০০	৪৯৪৭০০	৫৮২০০০
১৯৯২–৯৩	১২০৬০০	৬৮৩৪০০	৮০৪০০০
১৯৯৩–৯৪	১২৪০৫০	৭০২৯৫০	৮২৭০০০
১৯৯৩–৯৫	১২০০০০	১০৮০০০০	১২০০০০০
১৯৯৫-৯৬	১২৯০০০	১১৬৫০৪২	১২৯৪০৪২
১৯৯৬–৯৭	১৩৯৭৫৬	১২৫৭৮০৮	১৩৯৭৫৬৪
১৯৯৭–৮৮	১৫০০০০	১৩৫০০০০	১৫০০০০০

(উৎস: Export Promotion Bureau (EPB)

সারণিতে দেখা যাচ্ছে, পোশাক শিল্পের ১৯৯৭–৯৮ সনে মোট ১৫,০০,০০০ শ্রমিকের মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ১৩,৫০,০০০। সেক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সুবিধা, নিয়োগের নিয়ম, মাতৃত্ব নিরাপত্তা, সমিতি গঠনের স্বাধীনতা ও সর্বোপরি মৌলিক মানবাধিকারসহ আই.এল.ও কনভেশনে বর্ণিত নারী শ্রমিকের অধিকার মেনে চলেই এসব কারখানা পরিচালিত হওয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে প্রযোজ্য এবং আইএলও কনভেনশনে বর্ণিত নারী শ্রমিকের অধিকারসমূহ[৮৩]

অধিকার	কনভেশনের বিষয়	বছর	কনভেনশনের নম্বর	কনভেশনের বক্তব্য
মৌলিক মানবাধিকার	সমান পারিশ্রমিক	১৯৫১	১০০নং	একই ধরনের কাজের জন্য পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য সমান পারিশ্রমিক।
	বৈষম্য (চাকরি এবং পেশা)	১৯৫৮	১১১নং	গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম, রাজনৈতিক বিশ্বাস, জাতীয় অথবা সামাজিক পরিচয় নির্বিশেষে সকলের জন্য চাকরি লাভের সুযোগ থাকবে।
	পারিবারিক দায়িত্ব বহনকারী শ্রমিক	১৯৮১	১৫৬নং	পুরুষ ও নারী উভয় ক্ষেত্রে পারিবারিক দায়িত্ব বহনকারী শ্রমিক এবং অন্যান্য শ্রমিকের সমান সুযোগ থাকবে।
সমিতি গঠনের স্বাধীনতা	সমিতি গঠনের অধিকার এবং সংগঠিত হওয়ার অধিকার সংরক্ষণ	১৯৪৮	৮৭নং	নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে সকল শ্রমিক অথবা মালিক নিজ অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।
	সংগঠিত হওয়া এবং সমষ্টিগতভাবে দর কষাকষির অধিকার	১৯৪৯নং	৯৮নং	সংগঠিত হওয়ার অধিকার প্রয়োগকালে শ্রমিকের নিরাপত্তা সংগঠনগুলোর মধ্যে হস্তক্ষেপ না করা। স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সমষ্টিগত দরকষাকষিতে উৎসাহ প্রদান।
নিয়োগ	মানবসম্পদ উন্নয়ন	১৯৭৫	১৪২নং	বৃত্তিমূলক নির্দেশনর নীতি ও কার্যক্রম এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়োগের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।
	চাকরি অবসান	১৯৮২	১৫৮নং	কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া নিয়োগকর্তা কর্তৃক নিয়োজিত শ্রমিককে চাকরি থেকে বহিষ্কারের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা।
মাতৃত্ব নিরাপত্তা	মাতৃত্ব নিরাপত্তা (সংশোধিত)	১৯৫২	১০৩নং	নগদ অর্থ সুবিধা এবং চিকিৎসা সুবিধাসহ ১২ সপ্তাহের মাতৃত্বকালীন ছুটি।
নৈশ্যকালীন চাকরি	নৈশ চাকরি (সংশোধিত)	১৯৪৮ (এবং খসড়া চুক্তি ১৯৯০)	৮৯নং	শিল্প প্রতিষ্ঠানে নারীদের জন্য নৈশ্যকালীন চাকরি নিষিদ্ধ। এখানে নৈশ বলতে পর পর ১১ ঘণ্টা অর্থাৎ রাত ১০ টা থেকে সকাল ৭ টা পর্যন্ত কাজ করা বোঝায়।

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে পোশাক শিল্প কিছু পরিসংখ্যান[৮৪]

(২০০৪ সালের মাঝামাঝি সময়ের হিসাব অনুসারে)
মোট কারখানার সংখ্যা
বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স
এন্ড এ্যাসোসিয়শনের সাথে রেজিস্ট্রিকৃত: ৩৭৬০টি

রপ্তানি আয়:

অর্থ বছর ১৯৮৯–৯০	৬০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার (২০০০ কোটি টাকা)
অর্থ বছর ১৯৯০–৯১	১০০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার (৩০০০ কোটি টাকা)
অর্থ বছর ১৯৯১–৯২ (অনুমিত)	১৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার (৩৭০০ কোটি টাকা)
অর্থ বছর ১৯৯২–৯৩ (অনুমিত)	১৪২০ মিলিয়ন ইউএস ডলার (৫১০০ কোটি টাকা)
অর্থ বছর ২০০৩–২০০৪	৫.২ বিলিয়ন ইউএস ডলার (৩১,০০০ কোটি টাকা)

সূত্র: বিজিএমইএ বার্ষিক রিপোর্ট ২০০৩

পরিচ্ছেদ : ষোল

কর্মসংস্থান

প্রত্যক্ষ	২০,৫০,০০০ শ্রমিক (৯০% নারী)
পরোক্ষ	৩,০০,০০০ ব্যক্তি
পড়ে এখাতে	১৫০০,০০০ লোক নির্ভরশীল
মোট রপ্তানি আয়ে পোশাক শিল্পের অবদান:	
অর্থ বছর ১৯৮৯–৯০	৪০%
অর্থ বছর ১৯৯০–৯১	৪৮%
অর্থ বছর ২০০৩–২০০৪	৭৬%
১৯৮১–৮৭ সালে গড়পড়তা প্রবৃদ্ধির হার:	
পোশাক শিল্প	+ ১০৬%
পাটজাত দ্রব্য	–৩%
চা	– ৫%
ন্যাপথা	– ২২%
প্রক্রিয়াজাত খাদ্য	+ ২২%

বিশ্বের প্রধান দশটি দেশে সরবরাহকারী হিসাবে বাংলাদেশের সংস্থান:

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭ম বৃহত্তম রপ্তানিকারক
* ইইসি দেশসমূহে ১০ম বৃহত্তম রপ্তানিকারক
* কানাডায় ৯ম বৃহত্তম রপ্তানিকারক
* ইউসি দেশসমূহে বাংলাদেশ সর্ববৃহৎ শার্ট রপ্তানিকারক দেশ।

(সূত্র: রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো।)

---

৮৪. হান্নানা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

পোশাক শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের আর্থ-সামাজিক অবস্থান

* পোশাক কারখানার কাজে নারী শ্রমিকের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা
* নারী শ্রমিকের অর্থনীতির নিরাপত্তা ও মজুরী
* নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মুজরী বৈষ্যমের কারণ
* নারী ও পুরুষ শ্রমিকের পদোন্নতির বিভাজন
* নারী শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা
* বাসস্থান ও স্বাস্থ্যগত অবস্থান
* নারী শ্রমিকের শ্রম,পরিবেশ ও শ্রমিকের অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

পোশাক শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের আর্থ-সামাজিক অবস্থান :

পোশাক শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্টগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান যে কয়টি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তা হল এদের অল্প বয়স, অবিবাহিত এবং এদের অভিবাসী প্রকৃতি। বলা বাহুল্য, কর্মসংস্থানের বিকল্প কোন উপায় না পেয়েই দারিদ্র্যেও সঙ্গে সংগ্রামরত এই নারীরা শিল্প উৎপাদনের জগতে নিজেদের যুক্ত করেছেন।

অনুমিত হচ্ছে পোশাক কারখানায় কাজ সম্বন্ধে যে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা প্রথম দিকে ছিল তা সময়ের অতিক্রমনে দূর হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে ভাল পরিবারের মেয়েরাও পোশাক কারখানায় কাজ করতে দ্বিধা করছে না। জরিপে দেখা যায় শতকরা ৬২.৯ জন নারী শ্রমিকই পোশাক কারখানায় কাজ করতে এসে কোন রকম সামাজিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়নি। অবশ্য সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বেশির ভাগটার জন্যই দায়ী হল কারখানা সম্বন্ধে মানুষের বিরুপ মনোভাব, যার উদ্ভব হয়েছে পোশাক কারখানা সম্বন্ধে নানা রটনা বা ঘটনা থেকে। এই রটনা বা ঘটনা যে কেবল পোশাক কারখানার জন্যই প্রযোজ্য তা নয় এবং বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থায়যেখানেই মহিলারা দলে দলে কাজে প্রবেশ করবে সেখানেই যে একই ধরনের রটনা বা ঘটনার উদ্ভব হবে এই সত্যটি মানুষ আজ উপলব্ধি করতে পেরেছে। এবং হয়তোবা এই জন্যই ভাল ঘরের মেয়েরাও এখন পোশাক কারখানায় প্রবেশ করছে।

পোশাক কারখানার কাজে প্রবেশের সময় নারী শ্রমিকের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা:[১]

বিবাহ সম্পর্ক	মোট শ্রমিক সংখ্যা	প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হয়েছে	প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হয়নি
বিবাহিত	১৬৫	৩৫.৮	৬৪.২
অবিবাহিত	২৩১	৩৭.৬	৬২.৪
অন্যান্য	৩২	৪৩.৭	৫৬.৩
সববিবাহ সম্পর্ক	৪২৮	৩৭.১	৬২.৯

১. প্রথম আলো,৭ এপ্রিল ২০১১, পৃ-১৫

Dhaka University Institutional Repository

পোশাক শ্রমিকদের আরেকটি বিশেষ সামাজিক বৈশিষ্ট্য হল এদের তরুণ বয়স। জরিপে দেখা যায় নারী শ্রমিকদের গড় বয়স হচ্ছে মাত্র ১৯.৭ বছর। তার মধ্যে প্রায় ৫৬ শতাংশ শ্রমিকের বয়স হচ্ছে এই গড় বয়সের নীচে। তবে তাদের সহকর্মী পুরুষ শ্রমিকের বয়স তাদের চাইতে প্রায় ৪ বছর বেশী। এর প্রধান কারণই হচ্ছে অধিক হারে নারী শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ। দেখা গেছে কারখানাগুলিতে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকদের প্রায় ৮০ শতাংশই হচ্ছে নারী শ্রমিক। তবে পুরো নারী শ্রমিক গোষ্ঠীতে শিশু শ্রমিকের (যারা ১৫ বছরের নীচে) যে অংশ পাওয়া যায় (১৬.৪ শতাংশ) তা মালিক কতৃক উলেস্নখিত শিশু শ্রমিকের অংশের (৫ শতাংশ) চাইতে প্রায় আড়াইগুণ বেশি।

বয়স এবং বৈবাহিক অবস্থা অনুযায়ী নারী শ্রমিকের শতকরা বিন্যাস:[২]

বয়স স্তর	মোট নারী শ্রমিক	বৈবাহিক অবস্থা				
		বিবাহিত	অবিবাহিত	বিধবা	তালাকপ্রাপ্তা	পরিত্যক্তা
১৫ বছরের নীচে	৭০(১৬.৪)	৪.৩	৯৫.৭	-	-	-
১৫-১৯	১৬৯(৩৯.৫)	১৮.৩	৭৭.৫	-	৩.০	১.২
২০-২৪	১০৩(২৪.১)	৫৮.৩	২৮.২	২.৯	৭.৮	৩.৮
২৫-২৯	৪৫(১০.৫)	৭৭.৮	৮.৯	৬.৭	৪.৪	২.২
৩০-৩৪	২৬(৬.১)	৮৪.৬	৩.৪	২২.২	-	৩.৮
৩৫+	১৪(৩.৫)	৯২.৯	-	৭.১	-	-
সব বয়স স্তর	৪২৮(১০০)	৩৮.৬	৫৪.০	২.১	৩.৫	১.৯
গড় বয়স	১৯.৭	২৩.৯	১৬.৪	২৬.৯	২০.৫	২২.০

পোশাক শ্রমিকদের অন্যতম একটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য হলো এদের অভিবাসী প্রকৃতি। গভীর কৌতুহলের সাথে লক্ষ্য করা গেছে পোশাক শ্রমিকদের ৭০ শতাংশেরও বেশি গ্রাম থেকে এসেছে। তাদের মধ্যে আবার শতকরা ৯০ জনই ঢাকায় এসেছে পোশাক কারখানায় কাজ করা জন্য। পুরুষ শ্রমিকরা অবশ্য নারী শ্রমিকের চাইতে বেশি সংখ্যায় অভিগমন করেছে। পোশাক কারখানায় নারী শ্রমিকের উচ্চ চাহিদা মেটানোর জন্য পোশাক শ্রমিকরা গ্রাম থেকে তাদের আত্মীয় বন্দুদের নিয়ে এসে কারখানার কাজে লাগিয়েছে। যার জন্য দেখা গেছে প্রায় ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রেই নারী শ্রমিকগণ আত্মীয় / বন্ধু / প্রতিবেশীর মাধ্যমে কাজ পেয়েছে। পুরুষ শ্রমিকদের বেলায়ও এই মাধ্যমটি অত্যন্ত সক্রিয়। দেখা গেছে প্রায় ৬৩ শতাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিকরাও আত্মীয় / বন্ধু / প্রতিবেশীর মাধ্যমে পোশাক কারখানায় প্রবেশ করতে পেরেছে। প্রায় ৪০ শতায়শ ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকগণ আত্মীয় / বন্ধু পরিবৃত হয়ে কারখানায় কাজ করছে।[৩]

---

২. আলতাফ পারভেজ, প্রাগুক্ত, পৃ.-৪১

৩. আলতাফ পারভেজ, প্রাগুক্ত, পৃ.-৪৩

Dhaka University Institutional Repository

অনুমিত হয় নারী শ্রমিকের এই আত্মীয় পরিবেষ্টন কারখানার মধ্যে তাদের নিরাপত্তাকে দারুণ ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। কেননা গ্রামীণ ভিত নিয়ে শহরের সম্পূর্ণ এক ভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে নারী শ্রমিকের অনেক সময় লাগবে। এটা স্বাভাবিক যে নারী শ্রমিক তার গ্রামীণ ভিত্তিটির জন্য সহজেই শহরের নানা সামাজিক প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হবে। তাই নারী পোশাক শ্রমিকের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তাদাহীনতার জন্য এই বিস্তৃত গ্রামীণ ভিত অংশত দায়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নারী শ্রমিকের পারিবারিক পরিচিতি খুঁজতে গিয়ে এক চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গেছে তা হল- তারা অতি নিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারের সদস্য নয়। আগে মনে করা হত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারী শ্রমিকদের পরিবার প্রধানের পেশা হবে হয় কোন পরিবহন শ্রমিকের নয়তোবা কোন কারখানা শ্রমিকের। পরিবারের উপার্জনকারী অন্যান্য সদস্যরে ও প্রায় একই পেশা হবে। মা অথবা বোন যদি উপার্জনকারী হয় তবে মনে করা হয়েছিল তাদের পেশা হবে রাসার পরিচারিকার কাজ। কিন্তু বর্তমানে তার সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্তমান জরিপের তথ্য থেকে জানা যায় মাত্র ৮ টি ক্ষেত্রে মা অথবা বোন বাসায় কাজ করছে। ৪৫ শতায়শ ক্ষেত্রে বাবা শ্রমিকের কাজ করছে। আরো দেখা যায় যে প্রায় ১৭ শতাংশ ক্ষেত্রে বাবা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে চাকুরী করছেন। একই ক্ষেত্রে চাকুরিরত ভাইয়ের সংখ্যাও ১২ শতাংশ। আরেকটি যে চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গেছে তা হল প্রায় ৪ শতাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে পরিবারের সদস্যরা শিক্ষাক্ষেত্রে চাকুরিরত। যাদেও মধ্যে ৩ জন পাওয়া গেছে যারা কলেজে অধ্যাপনা করছেন।[৪] পরিবার সদস্যদের পেশা কাঠামো থেকে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে যে নারী শ্রমিকদের সামাজিক পরিচিতি সম্মানজনক।

অর্থনৈতিক পরিচিতি:

সকল নারীই শ্রমজীবী। যিনি শুধু ঘরে থাকেন তিনিও সন্তান ধারণ ও প্রতিপালন, স্বামী ও বয়স্কদের সেবা ও ঘর গৃহস্থালীর কাজে প্রতিনিয়ত শ্রম দেন। গোটা জীবনই হয়তো দৈনিক ১৫/১৬ ঘন্টা শারীরিক ও মানসিক শ্রম দিয়ে চলেন-যদিও গৃহিণী পরিচয়ের আড়ালে তার এই শ্রমের আর্থিক মূল্য কখনো সামাজিক স্বীকৃতি পায় না।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ১৯৯৮ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায়- এদেশে কমপক্ষে ৫৮ টি নপেশায় কাজ করছে নারী শ্রমিকরা। এর মধ্যে আছে কৃষি মজুরি এবং বহুধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প, যেমন: কৃষিভিত্তিক ফার্ম,নির্মাণ খাত, ইটের ভাটা, জুতা ও বিড়ি তৈরির কারখানা, ঝিনুক শিল্প, হস্তশিল্প ইত্যাদি।[৫] এগুলো কিছু কিছু খাত ইতিমধ্যে নারী প্রধান এবং বাকিগুলো ধীরে ধীরে নারী প্রধান হয়ে উঠছে।

২০০২-২০০৩ অর্থবছরে 'বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ' অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে ৪.৪৩ কোটি শ্রমশক্তি বিভিন্ন পেশায় যুক্ত আছে। যার মধ্যে ০.৯৮ কোটি নারী। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে একই ধরনের জরিপে নারী শ্রমশক্তি ছিল ০.৭৯ কোটি। অর্থাৎ বছরে প্রায় ১০ লাখ নারী শ্রমববাজারে যুক্ত হচ্ছে। বহির্বিশ্বে আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারেও প্রায় ৪.৩৭ বাংলাদেশী নারী কাজ করছে।[৬]

---

৪. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস বুলেটিন, ৫ম সংখ্যা,মে ২০০৬, পৃ.-০১

৫. অবলা,কর্মজীবী নারী,৩/৬ সেগুনবাগিচা ঢাকা,আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং,অক্টোবর-ডিসেম্বও ২০০৬, পৃ.-২৪

৬. প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বও ২০০৬, পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

পোশাক শিল্প দেশের প্রায় অসংখ্য নারীকে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক পরিচিতি দিয়েছে। পোশাক কারখানার বিভিন্ন বিভাগে তারা নিয়োজিত। তবে সেলাই বিভাগটি এককভাবে তাদের দ্বারাই চালিত হচ্ছে। এ বিভাগে মোট শ্রমিকের প্রায় ৭৮ শতাংশই হচ্ছে নারী শ্রমিক।

পোশাক কারখানায় পদমর্যাদা অনুযায়ী নারী শ্রমিকের অর্থনৈতিক পরিচিতি বিচার করে দেখা যায় কোয়ালিটি কন্ট্রোলার, কাটার এবং সুপারভাইজার এই উচ্চ পদগুলি নারীরা কম দখল কনতে পেরেছে। তারা সবচাইতে বেশি নিয়োজিত আছে হেল্পার পদে।

পোশাক কারখানার বিভিন্ন বিভাগে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের শতকরা অংশ:[৭]

বিভাগ	মোট সংখ্যা	নারী	পুরুষ
কোয়ালিটি কন্ট্রোলার	২০	৪০.০	৬০.০
কাটিং	৬৩	১১.১	৮৮.৯
সেলাই	৪৪৬	৭৮.৭	২১.৩
ফিনিসিং	১৪৪	৪৩.১	৫৬.৯
সব বিভাগ	৬৭৩	৬৩.৬	৩৬.৪

পোশাক শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকরা পারিবারিক আয়ের ৪৬ শতাংশ উপার্জন করছে। যেখানে শ্রমজীবী মহিলাদেও বিভিন্ন জরিপ থেকে দেখা গেছে পারিবারিক আয়ে মহিলাদের অবদান মাত্র ২০-৩০ শতাংশের বেশি নয়। আরো কৌতুহলের বিষয় হল নারী পোশাক শ্রমিকরা প্রায় ৩০ শতাংশ ক্ষেত্রে পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী।[৮] অবশ্য লক্ষ্য করা গেছে অনেক ক্ষেত্রে তারা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের চাইতে বেশি উপার্জন করেও নিজেকে প্রধান উপার্জনকারী বলে চিহ্নিত করেনি। পরিবারের উপার্জনশীল সদস্যদের সংখ্যা হিসাব করলেও দেখা যাবে যে পুরুষ শ্রমিকের পরিবারের চাইতে নারী শ্রমিকের পরিবারে উপার্জনকারী বেশি । পুরুষ শ্রমিকের পরিবারের চাইতে নারী শ্রমিকদের পরিবারের অধিকতর দারিদ্র্যতা পরিলক্ষিত হয় এবং কেবল নির্ভরশীলতা কমানোর জন্যই হয়তো নারী শ্রমিকের পরিবার সদস্যরা অল্প বয়সে উপার্জনের পথ খুঁজে নিয়েছে।

নারী শ্রমিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও মজুরী কঠামো:

পোশাক শিল্প আজ বাংলাদেশের অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই শিল্প কেবল দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহ ভাগই (প্রায় ৪০ শতাংশ) উপার্জন করছে না নিয়োগ দান করেছে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ ব্যক্তিকে। যাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই হচ্ছে নারী। যারা প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে চলে এসেছে ভাগ্যোন্নয়নের আশায়। অবশ্য সরকারী হিসেব মতে বাংলাদেশে নারী শ্রমিকের ন্যূনতম সংখ্যা এক কোটি এবং এই সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। নারী শ্রমিকের এই বৃদ্ধিও ধারা একটা সাম্প্রতিক প্রবণতা। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নারীদের শ্রমিক হিসেবে সংযুক্তির ধারা ক্রমবর্ধমান হলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতেই তাদের সংখ্যা বেশী। মূখ্যত নিম্নবিত্ত পরিবারের নারীই

---

৭. প্রতিমা পাল মজুমদার, সালমা চৌধুরী, জহির, বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের আর্থসামাজিক অবস্থা, একতা পাবলিকেশন্স ঢাকা লিমিটেড ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৫

৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

এসব খাতে যুক্ত হচ্ছেন বেশী। স্বল্প মজুরি ও স্বল্প ভোগের একটি চক্রে এরা আবদ্ধ থাকলেও শ্রমজীবি এই নারীদের আবির্ভাব দেশজ উৎপাদন,বিপনন ও ভোগে বিরাট প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

মাসে গড়ে এক হাজার টাকা করে আয় করলেও এই নারীরা বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা আয় ও ব্যয় করছেন। তাদের ব্যয়ের একটি বিরাট অংশ পরোক্ষ কর হিসেবে সরকারের কোষাগারে যাচ্ছে। কারণ এদের ক্ষেত্র হিসেবে এমন সব খাত রয়েছে যা সরাসরি জাতীয় অর্থনীতির সাথে যুক্ত। রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রামের শিল্পাঞ্চলগুলোতে কর্মরত নারী শ্রমিকদের আবাসস্থলে দেখা যায় শত শত মেস ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান পলস্নী গড়ে উঠেছে। কেবল চাল-ডাল নিয়ে নয় প্রসাধন সামগ্রী নিয়ে ও ঐ সব রাণিজ্যিক পল্লীতে পসরা সাজিয়ে বসেন শত শত দোকানী। খুব সাধারন এক হিসেবে দেখা যায়,দেশের প্রায় ১০ লাখ নারী গার্মেন্টস শ্রমিক যদি মাসে একটি ১০ টাকা দামের সাবান ও ক্রয় করে তা হলেও কেবল এই খাতে বছরে ১২ কোটি টাকার অর্থনীতির জন্ম হচ্ছে। বস্তুত মাত্রায় ও পরিমাণে কম ক্রয় করলেও সকল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসই এই নারীরা ক্রয় করছে। এই নতুন ক্রেতাদের ঘিরে দেশজ উৎপাদনের একটি জগত গড়ে উঠেছে-যা আবার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। চাকুরীগত আয়ের কারণে এক কোটি নারী শ্রমিক যদি বাৎসরিক ঈদ উৎসবে ২০০ টাকা করেও বাড়তি খরচ করে তা হলেও ২০০ কোটি টাকার শপিং করছে তারা।

বাস্তবে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় এই শ্রমজীবীদের যেহেতু সঞ্চয়ের সুযোগ নেই-সে কারণে তাদের আয়ের পুরোটাই বাজারে চলে যাচ্ছে। সে হিসাবে সাধারণভাবে অনুমান করা যায়,নারী শ্রমিকদের সূত্রে ১৫ হাজার কোটি টাকারও অধিক বাৎসরিক অর্থনীতির জন্ম হচ্ছে বাজারে। এর থেকে যদি এক শতাংশও পরোক্ষ কর হিসেবে সরকার পেয়ে থাকে তা হলেও এই শ্রমিকরা সরকারকে বছরে ১৫০ কোটি টাকা দিচ্ছে।

কিন্তু বিনিময়ে নারী শ্রমিকরা কি পাচ্ছে? এখনো কোন সরকার এই শ্রমিকদের জীবনযাপনকে সহনীয় করতে সুনির্দিষ্ট কোন কর্মসূচি নিয়েছে বলে জানা যায় না। বরং বস্তি উচ্ছেদসহ নানা তৎপরতার মাধ্যমে সরকার প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে নিরাপত্তাহীন করছে। নারী শ্রমিকদের প্রতি এরূপ বিবিধ বঞ্চনা-সমগ্র নারী সমাজের প্রতি জাতীয় বঞ্চনারই একটি বিশেষ রূপ মাত্র। যে কারণে দেখা যায়,আন্তর্জাতিক জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স ২০০৪(জিডিআই)-এ বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৫ টি দেশের মধ্যে ১১০ তম। চরমতম দরিদ্রদের মাঝেও নারীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

পোশাক শিল্পে নিয়োজিত প্রায় প্রতিটি নারী শ্রমিক অর্থনৈতিক কারণেই পোশাক তৈরির কাজ করছে। পোশাক তৈরির কাজ ভালবেসে কিম্বা নিজস্ব একটি ব্যক্তি পরিচয় পাওয়ার জন্য তারা এ কাজ গ্রহণ করেনি। অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তাদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৭০ জন প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ছুটে এসেছে এবং তাদের আবার অর্ধেকই সরাসরি পোশাক কারখানায় কাজ গ্রহণ করেছে। অর্থনৈতিক মুক্তির আশায় তারা সপ্তাহের প্রায় প্রতিটি দিনই ১০-১৫ ঘন্টা সময় কাজ করে চলেছে। তাদের এই শ্রমের উপর নির্ভর করে দেশ আজ হাজার হাজার কোটি ডলার আয় করতেছে।

রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর হালনাগাদ পরিসংখ্যান অনুসারে,২০১০-২০১১ অর্থবছরে প্রথম নয় মাসে পণ্য রপ্তানী বাবদ আয় হয়েছে ১৬২০ কোটি ৭১ লাখ ডলার। যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ছিল ১৬২০ কোটি ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

লাখ।[১] যার ফলে দেখা গেছে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা আমাদের অর্থনীতিতে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। কিন্তু যেসব নারী শ্রমিক হার-খাটুনী খেটে আমাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে রেখেছে, তারা কি পেরেছে নিজেদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে, নাকি এই কর্মে জড়িত শোষণের কারণে তারা এক দারিদ্র্য থেকে অন্য এক দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা আজ অনুসন্ধাননির্ভর।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বলতে নারীর অর্থনৈতিক সচ্ছলতাকেই বোঝানো হয়। আর অর্থনৈতিক সচ্ছলতা নির্ভর করে মূলত মজুরির পরিমাণ ও প্রাপ্তির নিয়মানুবর্তিতা,বাড়তি কাজের মজুরি এবং তা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা,নিয়োগ পদ্ধতি,চাকুরীর স্থায়িত্বকাল এবং ধরণ,চাকুরীচ্যুতির নিয়মকানুন,শ্রম আইন প্রয়োগের ব্যাপ্তি ইত্যাদি অর্থনৈতিক উপাদান সমূহের উপর। তাছাড়া পদোন্নতি এবং মজুরি বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি অথবা শ্রমিকের অপেক্ষাকৃত ভাল চাকুরিতে বা পদে উত্তরণ ইত্যাদিও দারুণভাবে শ্রমিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করে। তবে মজুরির পরিমাণ এবং মজুরি প্রাপ্তির নিশ্চয়তাই সবচাইতে বেশি অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করে।

বাংলাদেশে প্রতিটি নারী পোশাক শ্রমিকের সবচেয়ে বড় সমস্যা নিম্ন মজুরি হার এবং নির্ধারিত মজুরিও নির্ধারিত সময়ে না পাওয়া। পরিসংখ্যান ব্যুরোর মজুরি সংক্রান্ত তথ্য থেকে দেখা যায়,নারী প্রধান পোশাক শিল্পের দক্ষ শ্রমিকের ও মাসিক গড় আয় পুরুষ প্রধান বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পের একই ধরনের আয়ের ১.৪ থেকে ২ গুণ কম। আন্তর্জাতিক ভাবে তুলনা করলে বাংলাদেশের পোশাক বা অন্য নারী প্রধান শিল্পের মজুরি হার খুব নিচে। ঘন্টা হিসেবে এটা ভারত, নেপাল ও শ্রীরংকার তুলনায় যথাক্রমে ৪২, ৫০ ও ৩৩ শতাংশ। বাংলাদেশে বর্তমানে পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকদেও গড় মজুরি দেড় হাজার টাকা।

বিভিন্ন দেশে গার্মেন্টস খাতে ঘন্টা প্রতি মজুরি হার:[২]

দেশের নাম	মজুরি/ঘন্টা (ইউএস ডলার)
জার্মানী	২৫
আমেরিকা	১৬
দক্ষিণ কোরিয়া	৫
মেক্সিকো	২.৪০
পোল্যান্ড	১.৪০
শ্রীলংকা	০.৪৫
চীন	০.৩৫
ভারত	০.৩৫
নেপাল	০.৩০
বাংলাদেশ	০.১৫

উৎস: Financial Express, ঢাকা, ১৫ জুন ১৯৯৫

১. প্রথম আলো,৭ এপ্রিল ২০১১, পৃ.-১৫

২.আলতাফ পারভেজ, প্রাগুক্ত, পৃ.-৪১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের একটি পোশাক কারখানা তৈরী পোশাকে যতটা মূল্য সংযোজন করছে তার সিংহ ভাগই সংযোজিত হচ্ছে শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়ে। অথচ এই সংযোজিত মূল্যেও অতি সামান্যই তারা মজুরি এবং অন্যান্য সুবিধা বাবদ পাচ্ছে। সংযোজিত মূল্যে পুঁজির অবদান সামান্য হলেও পুজির মালিকগণ গ্রহণ করেছে এর সিংহভাগ। কার্ল মার্ক্সের তত্ত্ব অনুসারে পোশাক শিল্পে শ্রমিক শোষণের ব্যাপ্তি কতটা তা এই তথ্য হতে সহজেই অনুমান করা যায়।

বাংলাদেশে নারী শ্রমিকদের ঘিরে মজুরি শোষণের তীব্রতা কত বৃদ্ধি পাচ্ছে তার ধারণা পেতে নিম্নে দুটি পরিসংখ্যান তুলে ধরছি।[৩]

১. ১৯৯২ সালে বিশ্বব্যাংক ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সেক্টর স্টাডি-এর অধীনে ৭২ টি রেডিমেড গার্মেন্টস ইউনিটে এক জরিপ চালায়। তাতে নিম্নরূপ হিসাব পাওয়া যায়:

উৎপাদন মূল্যে	=	১০০
শিল্পগত খরচ	=	৭৩ (মজুরি ছাড়া)
শিল্প বহিভূত খরচ	=	৩ (ট্যাক্স ইত্যাদি)
মোট খরচ	=	৭৬
মূল্য সংযোজন	=	২৪
শ্রমিক পায়	=	১১
মালিক পায়	=	১৩

২. ১৯৯৫ সালে ৩৮ টি কারখানায় বিআইডিএস-এর অপর এক জরিপে নিম্নোক্ত হিসাবটি পাওয়া যায়:

উৎপাদন মূল্যে	=	১০০
শিল্পগত খরচ	=	৬৪ (মজুরি ছাড়া)
শিল্প বহিভূত খরচ	=	৫ (ট্যাক্স ইত্যাদি)
মোট খরচ	=	৬৯
মূল্য সংযোজন	=	৩১
শ্রমিক পায়	=	৭
মালিক পায়	=	২৪

উপরোক্ত দুটি জরিপের তুলনা করলে দেখা যায় শ্রমিকদের দ্বারা সংযোজিত মূল্যের পরিমাণ ক্রমে বাড়লেও তাতে শ্রমিকের হিস্যা কমে গেছে।

৩.আলতাফ পারভেজ, প্রাগুক্ত,পৃ-৪৩

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৪ সালে পোশাক শিল্পে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয় ৯৩০ টাকা-যা ১২ বছর পর সর্বশেষ ২০০৬ সালে ১৬৬৪ টাকায় পুনর্নির্ধারিত হয়। ১৯৯৪ এবং ২০০৬-এর মজুরি কাঠামো ডলার মূল্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ৯৩০ টাকার ন্যূনতম মজুরি ১৬৬৪ টাকায় নির্ধারণ আসলে টাকার অংকে প্রকৃত মজুরি কমে যায়। আবার অন্তত ২২ শতাংশ হেলপার শ্রমিক ঐ ন্যূনতম মজুরি ও পায় না। মজুরির পাশাপাশি বঞ্চনা রয়েছে ওভারটাইমেও। মালিকরা সবসময় এক মাসের ওভারটাইম পাওনা বকেয়া রেখে দেন যাতে শ্রমিকরা চাকুরি ছেড়ে যেতে না পারে। ওভারটাইমের হিসাবেও ভয়ংকর রকমের চুরি করা হয়। চাকুরি হারানোর ভয়ে শ্রমিকরা এসবের প্রতিবাদ করতে ভয় পান।

১৯৯৭, ২০০০ এবং ২০০২ সালে গার্মেন্টস শ্রমিকদেও সাংগঠনিক জোট 'গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য পরিষদ'-এর সঙ্গে মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ-এর তিন দফা মজুরি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন বিষয়ে চুক্তি হলেও তার বাস্তবায়ন হয়নি। চুক্তিভঙ্গের বিষয়ে সরকারও কোন সালিশমূলক ভূমিকা রাখেনি।

২০০৬ সালের জানুয়ারীতে বিজিএমইএ প্রধানত আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের চাপে শ্রম মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেছিল-তাদের কর্মীদের বেতন কাঠামো পুনর্নির্ধারণের জন্য নতুন করে মজুরি বোর্ড গঠন করতে। এদেশে সরকার শ্রমজীবীদেও বিষয়ে কতটা উদাসীন তা বোঝা যায়-এ ঘটনায়। যেখানে মালিকরা সরকারকে অনুরোধ করে বেতন কাঠামো পুনর্মূল্যায়নের জন্য এবং তারপরও সরকার সক্রিয় হয় না!

এদিকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স ২২ ও ২৪ এপ্রিল ২০০৬ পোশাক খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরিসহ বিভিন্ন ইস্যুতে কর্মশালার আয়োজন করে। যাতে ২৫টি গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের নেতৃবর্গ অংশ নেন। ওই কর্মশালায় ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবর্গ একমত হয়েছেন যে,এ খাতের জন্য তারা ৩০০০ টাকা ন্যূনতম মজুরি দাবী করবেন এবং প্রতি বছর মজুরি পর্যালোচনা করে বাজার দর ও মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৃদ্ধি করতে হবে। দুই বছর পর তা মূল মজুরির সাথে সন্নিবেশিত করে মজুরি স্কেল পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।[৪]

সর্বশেষ ২০০৬ সালের মে মাসে গার্মেন্টস শিল্পে ব্যাপক শ্রমিক বিক্ষোভ শুরু হয়। শ্রমিকদের এই বিক্ষোভের মুখে ২০০৬ সালের ২২ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকার গার্মেন্টস 'শ্রমিক ও কর্মচারী'দের জন্য নতুন মজুরি ঘোষণা করেছে। সরকার-মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত মজুরি বোর্ড এই ঘোষণা দেয়। হেলপারদের ন্যূনতম মজুরি ১৬৬২ টাকা এবং সিনিয়র অপারেটরদের ন্যূনতম মজুরি ২৪৪৯ টাকা ধার্য করা হয়। মজুরি বোর্ড শ্রমিকদের ৭ টি গ্রেডে এবং কর্মচারীদেও ৪ টি গ্রেডে বিভক্ত করে এই মজুরি নির্ধারণ করেছে।

কিন্তু বর্তমান বাজার দর ও জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী মজুরি নির্ধারণ করা হয়নি। ঘোষিত মজুরি শ্রমিকদের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম। শ্রমিকেরা দীর্ঘদিন ধরে ৩০০ টাকা মজুরি দাবী করে আসছিল। তারপরও শ্রমিকদের আন্দোলন সংগ্রামের ফলে এই মজুরি যতটুকু বেড়েছে তা যেন শ্রমিকদের হাতে সঠিকভাবে পৌছায় এটাই প্রত্যাশা।

---

৪. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস বুলেটিন, ৫ম সংখ্যা, মে ২০০৬, পৃ.-০১

Dhaka University Institutional Repository

২২ অক্টোবর ২০০৬ থেকে কার্যকর গার্মেন্টস শ্রমিকদের নতুন মজুরি কাঠামো:[৫]

শ্রমিকদের পদবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ	মাসিক মূল (মজুরি)	বাড়ি ভাড়া (মজুরির ৩০%)	চিকিৎসা ভাতা	সর্ব মোট মজুরি
গ্রেড-১ প্যাটার্ণ মাস্টার,চীফ কোয়ালিটি কন্ট্রোলার,চীফ কাটিং মাস্টার,চীফ মেকানিক	৩৮০০	১১৪০	২০০	৫২৪০
গ্রেড-২ মেকানিক/ইলেকট্রিশিয়ান,কাটিং মাস্টার	২৮০০	৮৪০	২০০	৩৮৪০
গ্রেড-৩ সিনিয়র মেশিন অপারেটর,সিনিয়র কাটার,সিনিয়র কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর প্রমুখ	১৭৩০	৫১৯	২০০	২৪৪৯
গ্রেড-৪ সেলাই মেশিন অপারেটর,নিটিং মেশিন অপারেটর,ড্রইংম্যান,কাটার,প্যাকার,লাইন লিডার প্রমুখ	১৫৭৭	৪৭৩.১০	২০০	২২৫০.১০
গ্রেড-৫ জুনিয়র সেলাই মেশির অপারেটর,জুনিয়র কার্টার,জুনিয়র মেন্ডিং অপারেটর প্রমুখ	১৪২০	৪২৬.১০	২০০	২০৪৬
গ্রেড-৬ সাধারণ সেলাই মেশিন অপারেটর,সাধারণ বাটন মেশিন অপারেটর প্রমুখ	১২৭০	৩৮১	২০০	১৮৫১
গ্রেড-৭ সহকারী সেলাই মেশিন অপারেটর,সহকারী কাটার,ফিনিশিং সহকারী প্রমুখ	১১২৫	৩৩৭	২০০	১৬৬২.৫০
শিক্ষানবীশ (তিন মান কাল)	-	-	-	১২০০

৫. অবলা,কর্মজীবী নারী, ৩/৬ সেগুনবাগিচা ঢাকা,আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং, অক্টোবর-ডিসেম্বও ২০০৬, পৃ.-২৪

Dhaka University Institutional Repository

২২ অক্টোবর ২০০৬ সাল থেকে কার্যকর গার্মেন্টস কর্মচারীদের নতুন মজুরি কাঠামো:

কর্মচারীদের পদবিন্যাস	মাসিক মূল (মজুরি)	বাড়ি ভাড়া (মজুরির ৩০%)	চিকিৎসা ভাতা	সর্ব মোট মজুরি
গ্রেড-১ স্টোর কিপার	২৬০০	৭৮০	২০০	৩৫৮০
গ্রেড-২ সহকারী হিসাবরক্ষক,সহকারী স্টোর কিপার,কম্পিউটার অপারেটর,ক্যাশিয়ার,আমদানি/রপ্তানী সহকারী	২০০০	৬০০	২০০	২৮০০
গ্রেড-৩ টাইপিস্ট, অফিসসহকারী,টেলিফোন অপারেটর, কেয়ারটেকার, সিকিউরিটি গার্ড, ড্রাইভার, ক্যাশ সহকারী	১৭৩০	৫১৯	২০০	২৪৪৯
গ্রেড-৪ পিয়ন, গার্ড, চেকার, বাবুর্চি, সুইপার	১২৭০	৩৮১	২০০	১৮৫১

ন্যূনতম মজুরি বোর্ডে মালিকদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদী গ্রুপের আনিসুল হক। শ্রমিক আন্দোলনকে বরাবরই তিনি 'ষড়যন্ত্র' বলতে পছন্দ করেন । মে আন্দোলন পরবর্তীকালে গঠিত মজুরি বোর্ডে তিনি সদস্য ছিলেন। গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৬ দৈনিক প্রথম আলোতে তিনি লিখেছেন...ন্যূনতম মজুরি বোর্ডে মালিকদের পক্ষ থেকে একমাত্র সদস্য হওয়ার সুবাদে স্বগোত্রীয় বেশির ভাগ ব্যবসায়ী-বন্ধু আমাকে বলেন,ভাই ১৩০০ থেকে ১৪০০ টাকার বেশী মজুরি হলে আমরা মরে যাব...[৬]

অর্থাৎ বর্তমান বাজারে শ্রমিকদের যদি মাসে ১৩০০/১৪০০ টাকার বেশী মজুরি (দৈনিক ৪০/৪৫ টাকা) দেয়া হয় তাহলে গার্মেন্টস মালিকরা ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবেন।

আনিসুল হকের এই মিথ্যাচার যে কাগজ বিশাল গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছে সেই দৈনিক প্রথম আলো ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৬ এক রিপোর্ট করেছে, বিজিএমইএ ঢাকা শেরাটন হোটেলে তাদের বাৎসরিক প্রদর্শনীতে তিন দিন ব্যাপী সান্ধ্য বিনোদনে শুধু ভারতীয় নৃত্য শিল্পিদের পেছনে ব্যয় করেছে কোটি টাকা[৭]। অতীতে প্রদর্শনী উপলক্ষে সান্ধ্য বিনোদন একবার হলেও এবার তা করা হয়েছে তিন সন্ধ্যা ব্যাপী এবং বিজিএমইএ-এর এক পরিচালক এই বিনোদন অনুষ্ঠান সফল করার জন্য নিজে ভারত সফর করে ত্রিশজন নৃত্য শিল্পি নিয়ে এসেছেন। শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির

৬. প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বও ২০০৬, পৃ.-

৭. প্রথম আলো, ২২ সেপ্টেম্বও ২০০৬, পৃ.-

Dhaka University Institutional Repository

যৌক্তিকতার পেছনে ভারতীয় ষড়যন্ত্র থাকলেও কোটি টাকা খরচ করে ভারতীয় নৃত্য শিল্পীদের অঙ্গসৌষ্ঠব দেখার মাঝে নিশ্চয়ই আপত্তিকর কিছু নেই। সান্ধ্য বিনোদন বলে কথা!

পোশাক কারখানার নারী শ্রমিকরা যে ন্যূনতম মজুরির অধিকার থেকেই বঞ্চিত হচ্ছে তাই নয় তারা আর একটি অতিরিক্ত বঞ্চনারও শিকার। প্রতিটি কারখানাতেই দেখা গেছে নারী এবং পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে বিরাট মজুরি ব্যবধান রয়েছে। বিআইডিএস পরিচালিত গ্রামীণ শিল্প গবেষণা প্রকল্পের চূড়ান্ত রিপোর্টে (১৯৮১) উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন পূর্ণ বয়স্ক নারী শ্রমিক একজন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের মজুরির মাত্র ৭ শতাংশ পেয়ে থাকে।[৮]

অবশ্য পোশাক কারখানায় কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে মজুরির হার দারুণভাবে ভিন্ন হয়। কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী পোশাক কারখানায় পুরো কাজকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: কাটিং, সোয়িং এবং ফিনিসিং বিভাগ। কাটিং বিভাগের মজুরির হার সবচাইতে বেশি। কিন্তু এই বিভাগে নারী শ্রমিকের হার শতকরা মাত্র ১.৭ শতাংশ। অন্যদিকে ২৪.৩ শতাংশ পুরুষ শ্রমিক এই বিভাগে কর্মরত। সোয়িং বিভাগের মজুরির হার কাটিং বিভাগের মজুরি থেকে কম। অথচ এই বিভাগে সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রায় ৮৩ শতাংশ নারী শ্রমিক কর্মরত। এর বিপরীতে পুরুষ শ্রমিকদের মাত্র ৪১ শতাংশ এই বিভাগে কর্মরত। তাছাড়া দেখা যায় যে, একই বিভাগে কর্মরত নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মাঝেও মজুরির পার্থক্য রয়েছে। দেখা গেছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিকরা উচ্চ পদগুলি (কাটিং মাস্টার, সুপারভাইজার, কোয়ালিটি কন্ট্রোলার, অপারেটর ইত্যাদি) দখল করে রাখে। যার জন্য পুরুষ শ্রমিকরা নারী শ্রমিকদের থেকে বেশি মজুরি পাচ্ছে।

পোশাক কারখানায় কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মজুরির গড় পরিমাণ:[৯]

কাজের প্রকৃতি	নারী		পুরুষ	
	৪২৬ জন শ্রমিকের শতাংশ	গড় মজুরি	২৪৫ জন শ্রমিকের শতাংশ	গড় মজুরি
কাটিং	১.৭	১০৩২	২৪.৩	১৬৬৫
সোয়িং	৮৩.১	৯২৩	৪০.৫	১৪০৩
ফিনিসিং	১৫.২	৬৫১	৩৫.২	৯৩৯
সব ধরনের কাজ	১০০.০	৮৮৬	১০০.০	১৩৪৪

বিশ্বের সম্পদ উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত কাজের ৬৫ ভাগই করে নারী অথচ মূল্য পায় মাত্র ১১ ভাগ। আর সম্পত্তির উপর তাদের মালিকানা মাত্র ১ ভাগ । সারাবিশ্বে পরিবারে ও কৃষিতে নারীর দেয়া শ্রমের কোনই স্বীকৃতি নেই। জাতিসংঘের (২০০২) মতে, নারীর যে শ্রমের মূল্য পরিশোধ করা হয় না তার পরিমাণ বছরে ৭ ট্রিলিয়ন ডলার।[১০]

---

৮. ড.খালেদা সালাহউদ্দিন,একুশ শতকে বাংলাদেশের নারী,পালক পাবলিশার্স ঢাকা ২০০৬,পৃ-১১৯

৯. প্রতিমা পাল মজুমদার,প্রাগুক্ত,পৃ-৪৪

১০. রোকেয়া কবীর,শতবর্ষে নারী দিবস,ইতিহাস তবুও প্রাসঙ্গিক,জনকণ্ঠ ৮ মার্চ ২০১০,পৃ-২৪

Dhaka University Institutional Repository

অন্য এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, শ্রমশক্তিতে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় ৩১ শতাংশ । তবে পুরুষের চেয়ে নারী শ্রমিক ৪১ শতাংশ মজুরি কম পান। অথচ গত ১০ বছরে শ্রম খাতে নারীর অংশগ্রহণের হার বেড়েছে অন্তত ৪০ শতাংশ। পোশাক খাতে নারী ও পুরুষের মজুরির বৈষম্য প্রায় দেড় থেকে দুই গুণ।[১১]

নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মজুরি কাঠামোতে এই পার্থক্যের কারণ খুঁজে বের করা দরকার । কেবলমাত্র লিঙ্গ বৈষম্যের কারণেই কি এই মজুরি পার্থক্য? নাকি মজুরি পার্থক্যেও প্রকৃত কারণগুলি যেমন দক্ষতা, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি মজুরি নির্ধারক উপাদানগুলি অর্জনের ব্যাপারে নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে ' তা আজ অনুসন্ধাননির্ভর।

নারী ও পুরুষ শ্রমিকের পদমর্যদা অনুযায়ী শতকরা বিভাজন এবং প্রতি পদের মজুরির গড় পরিমাণ:[১২]

পদ মর্যাদা	নারী		পুরুষ		পুরুষের তুলনায় নারীর মজুরির শতাংশ
	মোট ৪২৬ জন নারী শ্রমিকের শতাংশ	মজুরির গড় পরিমান	মোট ২৪৫ জন পুরুষ শ্রমিকের শতাংশ	মজুরির গড় পরিমান	
কোয়ালিটি কন্ট্রোলার	১.৯	১০৭৫	৪.৯	২১৯৭	৪৮.৯
কাটার	০.২	২০০০	১০.২	২৬০২	৭৬.৯
সুপারভাইজার	৬.১	২৪২৬	১২.২	২৩১৭	১০৪.৭
অপারেটর	৪৪.৪	১০৬৯	১৫.৯	১২৩৮	৮৬.৩
হেল্পার(সোয়িং)	৩১.৫	৪৩৯	১০.৬	৫৯৮	৭৩.৪
হেল্পার(কাটিং এবং ফিনিসিং)	৯.৮	৬০৩	১৯.৬	৮৪৬	৭১.৩
আয়রনিং এবং ফোল্ডিং	৬.১	৮৬৮	২৬.৫	৯৮৫	৮৮.১
সব পদ	১০০.০	৮৮৬	১০০.০	১৩৪৫	৬৫.৯

নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মজুরি বৈষম্যের কারণসমূহ:

নারী এবং পুরুষ শ্রমিকের মজুরি বৈষম্যের পেছনে কারখানার বয়স, কারখানার আকার, শ্রমিকের অভিরাসনের ব্যাপ্তিকাল, শ্রমিকের শিক্ষা, চাকুরির স্থায়িত্বকাল,বয়স এবং তাদের পদোন্নতি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

---

১১. কাওসার সোহেলী,এখনও অর্জিত হয়নি নারীর অধিকার, যুগান্তর ৮ মার্চ ২০১০,পৃ.-০৯

১২. প্রতিমা পাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ.-৪৫

Dhaka University Institutional Repository

১. শিক্ষা: শিক্ষা উৎপাদকটি ব্যাপকভাবে মজুরির পরিমাণকে প্রভাবিত করে। তবে মজার ব্যাপার হল পুরুষের সমান শিক্ষিত হলেও নারী শ্রমিক পুরুষের সমান মজুরি পায় না। ধারণা করা হয় যে, পুরুষের সমান শিক্ষিত হলেও নারী শ্রমিকরা উচ্চপদগুলি দখল করতে পারে না। যার ফলে একই শিক্ষা স্তরে নারী পুরুষের মধ্যে মজুরি বৈষম্য থেকে যায়। এখানে অবশ্য মালিকগণ উল্লেখ করেন যে, শিক্ষা এবং পদ মর্যাদা সমান হলেও উৎপাদিকা শক্তিতে নারী শ্রমিকগণ পুরুষ শ্রমিকের সমান হতে পারে না। আর এজন্যই তারা পুরুষের চাইতে কম মজুরি পায়।

শিক্ষাস্তর ও চাকুরির স্থায়িত্বকাল অনুযায়ী নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মজুরির পরিমাণ:[১৩]

শিক্ষাস্তর	নারী			পুরুষ		
	মোট ৪২৬ জন নারী শ্রমিকের শতাংশ	গড় মজুরি (টাকায়)	চাকুরির গড় স্থায়িত্বকাল	মোট ২৪৫ জন পুরুষ শ্রমিকের শতাংশ	গড় মজুরি (টাকায়)	চাকুরির গড় স্থায়িত্বকাল
স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন	২৯.২	৬২০	৪৫	৯.৮	৮১১	২৯
৫ম শ্রেণী পর্যন্ত	৩৪.৬	৭৪৬	৩৩	১৪.৩	৮৬৩	৩৭
৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত	২৭.৫	১০৪৭	৩৭	৩৯.৬	১৩৩৫	৩৬
দশম শ্রেণীর উপরে	৮.৬	১৮৮৪	৪৯	৩৬.৩	১৬৮৮	৩১
সব শিক্ষাস্তর	১০০.০	৮৮৬	৩৭	১০০.০	১৩৪৪	৩৪

২. বয়স: পোশাক কারখানায় শ্রমিকের বয়সের সঙ্গে মজুরির পরিমাণের দারুণ ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। দেখা যায় পুরুষ শ্রমিকদের গড় বয়স নারী শ্রমিকদের গড় বয়সের চাইতে বেশি। অর্থাৎ মজুরির উপর প্রভাব বিস্তারকারী এই উপাদানটি দখলের ব্যাপারে নারী শ্রমিকরা পুরষি শ্রমিকের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। তবে বস্তুতপক্ষে বয়নের সঙ্গে মজুরির এই ইতিবাচক সম্পর্কটি ঘটে দক্ষতা বৃদ্ধিও মাধ্যমেই। কেননা যতই বয়স বাড়বে ততই চাকুরির সময়সীমা বাড়বে এবং ততই পোশাক তৈরীর অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা বাড়বে। তবে প্রদত্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে,প্রতিটি বয়স স্তরেই নারী শ্রমিকের চাকুরির স্থায়িত্বকাল পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় বেশি। চাকুরির স্থায়িত্বকাল যদি দক্ষতা বৃদ্ধির কারণ হয় এবং দক্ষতা বৃদ্ধি যদি মজুরি বৃদ্দির শর্ত হয় তবে বয়সে ছোট হলেও নারী শ্রমিক পুরুষ শওমিকের অধিক মজুরি পাওয়ার যোগ্য। অথচ প্রকৃতপক্ষে ঘটছে উল্টো। তাই অনুমিত হচ্ছে নারী শ্রমিকের অল্প বয়সের সুযোগ নিয়ে হয়তো মালিকগণ তাদেরকে ন্যায্য মজুরি হতে বঞ্চিত করার সুযোগ পায়।

১৩. প্রতিমা পাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ.-৪৮

Dhaka University Institutional Repository

বয়স এবং শিক্ষা স্তরকে নিয়ন্ত্রণ করে যদি মজুরি স্তর বিচার করা হয় তবে দেখা যায় একমাত্র সর্বোচ্চ শিক্ষা স্তর ছাড়া প্রতিটি বয়স দলে একই শিক্ষা স্তর হওয়া সত্ত্বেও নারী শ্রমিক পুরুষ শ্রমিকের চাইতে কম মজুরি পাচ্ছে। সুতরাং আবারো বলা যায় যে নারী এবং পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে ব্যাপক মজুরি বৈষম্য রয়েছে।

বয়স স্তর অনুযায়ী নারী ও পুরুষ শ্রমিকের পোশাক শিল্পে চাকুরির মোট স্থায়িত্বকাল এবং মজুরির পরিমাণ:[১৪]

বয়স স্তর	নারী			পুরুষ			নারীর মজুরি পুরুষের মজুরির কত অংশ
	৪২৬ জন নারী শ্রমিকের শতাংশ	চাকুরির স্থায়িত্বকাল (মাসে)	মজুরির পরিমাণ (টাকায়)	২৪৫ জন পুরুষ শ্রমিকের শতাংশ	চাকুরির স্থায়িত্বকাল (মাসে)	মজুরির পরিমাণ (টাকায়)	
১৪ বছর পর্যন্ত	১৬.৪	১৮.০	৪৬৮	৭.৮	১৬.৬	৬৩৮	৭৩.৪
১৫-১৯	৩৯.৫	২৯.৯	৭৭৩	১৮.৪	১৬.১	৮৪০	৯২.০
২০-২৪	২৪.১	৪৬.৬	১০২২	৩৩.৫	৩৩.৫	১২২৬	৮৩.৪
২৫-২৯	১০.৫	৫৪.৬	১২৩৪	২২.০	৪৩.৩	১৬৪৫	৭৫.০
৩০-৩৪	৬.১	৫৩.৭	১২৯৬	১২.৯	৫২.৪	২০৫৪	৬৩.১
৩৫-৩৯	৩.৩	৫৪.৯	১৫১৩	৩.৭	৪৪.২	১৭১৭	৮৮.১
৪০+	০.২	৮৪.০	৮০০	২.৭	৪০.১	২১৯০	৩৬.৫
সব বয়স স্তর	১০০.০	৩৬.৯	৮৮৬	১০.০	৩৪.৪	১৩৪৪	৬৫.৯
গড় বয়স	১৯.৭	-	-	২৩.৫	-	-	-

৩.পদোন্নতি:

বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা যায় যে নারী শ্রমিকদের তুলনায় পুরুষ শ্রমিকরা একটুবেশি সংখ্যায় পদোন্নতি পেয়েছে। তাদের এই পদোন্নতির ফলে মজুরির পরিমাণ দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছে। পদোন্নতির সংখ্যা দ্বারা মজুরির পরিমাণ বিচার করলে দেখা যায় ১ বার পদোন্নতি পাওয়ার পর নারী শ্রমিক যেখানে ১০৬৬ টাকা মজুরি পায় সেখানে পুরুষ শ্রমিক পায় ১৪২৪ টাকা।

---

১৪. প্রতিমা পাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ.-৫১

Dhaka University Institutional Repository

পদোন্নতির সংখ্যা অনুযায়ী নারী ও পুরুষ শ্রমিকের বিভাজন:[১৫]

পদোন্নতির সংখ্যা	নারী		পুরুষ	
	মোট ৪২৬ জন নারী শ্রমিকের শতাংশ	মজুরির গড় পরিমাণ (টাকায়)	মোট ২৪৫ জন পুরুষ শ্রমিকের শতাংশ	মজুরির গড় পরিমাণ (টাকায়)
০	৭৪.৯	৭৭৬	৬৯.৮	১২৫১
১	১৯.২	১০৩০	২২.৪	১৪২৪
২	২.৮	১০৩০	৪.৫	১৪৬৮
৩+	৩.১	২০৩৩	৩.৩	২৬০৪

৪. অভিজ্ঞতা:

পূর্ব অভিজ্ঞতা পোশাক শ্রমিককে দ্রুন্নত দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে । কেননা পূর্ব কর্মের অর্জিত অভিজ্ঞতা সে রর্তমান কর্মে প্রয়োগ করে অতি দ্রুন্নত দক্ষতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও নারী শ্রমিকরা পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরি পায় না। এইসব তথ্য থেকে পরিস্কারভাবে বুঝা যায় পোশাক কারখানার নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে মজুরি পার্থক্যের জন্য অন্যান্য উৎপাদকসমূহ দায়ী হলেও নারী-পুরুষ ভিত্তিক বৈষম্যই প্রধানতঃ দায়ী।

অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নারী-পুরুষ সমান মজুরি পেয়ে থাকে। তবে এসব ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি কাজ করে থাকে। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৪ এ বলা হয়েছে,একজন নারী ও পুরুষ সমান সম্মানী পেলেও গড়ে নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশি কাজ করে। বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের গ্রামীণ এলাকায় নারীরা গড়ে পুরুষের চেয়ে ২০ শতাংশ বেশি কাজ করে। এই পরিসংখ্যানকে অন্যভাবে বলা যায়,নারীরা দিনে ১০২ মিনিট বেশি পরিশ্রম করে। ২০০১ সালে জাতিসংঘের প্যান প্যাসিফিক সাউথ ইস্ট এশিয়া উইমেন্স এসোসিয়েশন তাদের ২১ তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জানায়,নারীরা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৫১ শতাংশ । কিন্তু মোট কাজের প্রায় ৬৬ শতাংশ সম্পাদন করে । পারিশ্রমিক পায় মাত্র ১০ শতাংশ এবং মোট সম্পত্তির ১ শতাংশের মালিকাধীন।[১৬]

নারী শ্রমিকের মজুরিকেন্দ্রিক আরেকটি সমস্যা হলো-নিজের উপার্জিত অর্থ ব্যয়ের স্বাধীনতা না থাকা।

---

১৫. প্রতিমা পাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, প.-৫৩

১৬. কুন্তল রায়,যুগে যুগে নারী মুক্তি আন্দোলন,জনকণ্ঠ, ৮ মার্চ ২০১০, পৃ-২২

১৭. প্রতিমা পাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, প.-১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

কার সিদ্ধান্তে শ্রমিকের উপার্জিত অর্থ ব্যয় হয়:[১৭]

বৈবাহিক অবস্থা	নারী				পুরুষ			
	মোট শ্রমিক সংখ্যা	নিজের সিদ্ধান্তে	যৌথ সিদ্ধান্তে	পরিবারের অন্যান্য সিদ্ধান্ত	মোট শ্রমিক সংখ্যা	নিজের সিদ্ধান্তে	যৌথ সিদ্ধান্তে	পরিবারের অন্যান্য সিদ্ধান্ত
বিবাহিত	১৬৩	৫৩	৪৬	৬৪	৮২	৭২	৪	৬
অবিবাহিত	২৩১	৭২	১২৯	৩০	১৬১	১০০	৩৫	২৬
বিধাব	৯	৮	-	১	-	-	-	-
তালাক প্রাপ্ত	১০	৩	২	১	১	১	-	-
পৃথক	৬	৪	২	-	১	১	-	-
সব বৈবাহিক সম্পর্ক	৪২৬	১৪৭	১৮২	৯৭	২৪৫	১৭৪	৩৯	৩২

অতিরিক্ত শ্রম ও অতিরিক্ত শ্রমের মজুরি:

বাড়তি শ্রম পোশাক কারখানাগুলোর প্রায় নিয়মিত ঘটনা। জরিপে দেখা যায় মাত্র ১২ শতাংশ নারী শ্রমিক দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজ করে। যা শ্রম আইন অনুযায়ী একটি স্বাভাবিক শ্রম দিবসের ব্যাপ্তি। বাকি ৮৮ শতাংশ নারী শ্রমিকই অতিরিক্ত শ্রম প্রদান করে। হিসাব করে দৈনিক শ্রম ঘন্টার গড় পরিমাণ পাওয়া যায় ১১.৮ ঘন্টা। অর্থাৎ প্রতিটি নারী শ্রমিকই গড়ে প্রায় ৪ ঘন্টা সময় বাড়তি কাজ করে।তাছাড়া তাদেও অনেকেই সপ্তাহের প্রায় প্রতিটি দিনেই কাজ করছে। পুরুষ শ্রমিক নারী শ্রমিকদের তুলনায় দৈনিক গড়ে প্রায় ১ ঘন্টা সময় বেশি অতিরিক্ত শ্রম করে।

দৈনিক শ্রম ঘন্টা অনুযায়ী নারী ও পুরুষ শ্রমিকের শতকরা বিভাজন:[১৮]

দৈনিক শ্রম ঘন্টা	ইারী	পুরুষ
৮ ঘন্টা পর্যন্ত	১১.৭	৭.৮
৯-১০	২১.৮	১৬.৩
১১-১২	৩৬.৯	৩১.৮
১৩-১৪	২৫.৬	৩৫.৯
১৫+	৪.০	৮.২
সব শ্রম ঘন্টা	১০০.০	১০০.০
গড় দৈনিক শ্রম ঘন্টা	১১.৬৯	১২.৯০
মোট শ্রমিক সংখ্যা	**৪২৬**	**২৪৫**

১৭. প্রতিমা পাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ.-১৩৮

১৮. প্রতিমা পাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ.-১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

বাড়তি শ্রমের পরিমাণ নির্ভর করছে কারখানার মোট উৎপাদনের পরিমানের উপর। যা আবার নির্ভর করছে আদেশ প্রাপ্তির উপর। যে কারখানা যতবেশি পোশাক তৈরির আদেশ গ্রহণ করে সে কারখানা ততবেশি অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করে। কেননা আদেশটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশ্যই তালিম করতে হবে। আর একই শ্রমিক দিয়ে আদেশকৃত পুরো পোশাকগুলি তৈরী করিয়ে নিতে হবে। কারণ মালিকগণ উল্লেখ করেছেন দক্ষ শ্রমিকের খুব অভাব। প্রায় বাধ্যতামূলকভাবেই শ্রমিকদেরকে এই শ্রম প্রদান করতে হয়। কেউ কেউ এই শ্রম প্রদান করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে চাকুরি হতে বরখাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য অতিরিক্ত শ্রম বাধ্যতামূলক হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রমিকরা তাদের ইচ্ছানুসারেই এই শ্রম প্রদান করে।

অতিরিক্ত শ্রমের মজুরির হার অনুযায়ী নারী শ্রমিকের শতকরা বিভাজন:[১৯]

পদ	মোট শ্রমিক	নিয়মিত মজুরির শতাংশ				
		৫০ শতাংশ	৫১-৭৫	৭৬-১০০	১০১-১১৯	১২০+
কোয়ালিটি কন্ট্রোলার	৬	১৬.৭	১৬.৭	১৬.৭	৩৩.৩	১৬.৬
কাটিং মাস্টার	-	-	-	-	-	-
সুপারভাইজার	৬	১৬.৭	৩৩.৩	৩৩.৩	৩০.০	১৬.৭
অপারেটর	৮৩	২৮.৯	৯.৬	২৪.১	২৮.৯	৮.৫
সোয়িং হেল্পার	৪৭	১৭.০	১৪.৯	২১.৩	২৯.৮	১৭.০
আয়রন/ফোল্ডিং	১০	৩০.০	১০.০	৩০.০	১০.০	২০.০
ফিনিসিং/কাটিং	২৬	১৯.২	৭.৭	২৬.৯	২৬.৯	১৯.৩
সব পদ মর্যাদা	১৭৮	২৩.০	১১.২	২৪.২	২৮.১	১৩.৫

বোনাস:

শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য এবং উৎসাহ দেয়ার জন্য পোশাক কারখানার মালিকগণ ঈদ বোনাস ছাড়াও আরও বেশ কিছু বোনাস প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে উৎপাদন বোনাস,দক্ষতা বোনাস এবং উপস্থিতি বোনাস। উৎপাদন বোনাসের আওতায় প্রতি স্তর উৎপাদন শেষে দক্ষ শ্রমিকদের কিছু টাকা বোনাস হিসাবে প্রদান করা হয়। আর দক্ষতা বোনাস প্রদান করা হয় সাধারনভাবে শ্রমিকদের দক্ষতা বিচারের উপর ভিত্তি করে। উপস্থিতি বোনাস প্রদান করা হয় তাদেরকেই যারা একমাসের মধ্যে কারখানায় উপস্থিতিতে একদিনও বিলম্ব বা অনুপস্থিত থাকে নাই। উপস্থিতি বোনাসের পরিমান কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় যখন একজন শ্রমিক পর পর তিন মাস এই বোনাস পেতে থাকে। এক কারখানা থেকে অন্য কারখানায় শ্রমিকদের অভিগমনকে নিরুৎসাহিত করতেই মালিকপক্ষের এই ব্যবস্থা। তবে বোনাস প্রাপ্তিতে নারী এবং পুরুষ শ্রমিকের মাঝে বেশ পার্থক্য রয়েছে।

---

১৯. প্রতিমা পাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ.-৬৪

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ধরণের বোনাস প্রাপ্তি অনুযায়ী পোশাক শিল্পে নিয়োজিত নারী ও পুরুষ শ্রমিকের শতকরা বিভাজন:[২০]

বোনাসের ধরণ	নারী		পুরুষ	
	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না
ঈদ বোনাস	৪৩.০	৫৭.০	৫০.৬	৪৯.৪
দক্ষতা বোনাস	১৪.১	৮৫.৯	১৪.৫	৮৬.৫
উপস্থিতি বোনাস	৫.৪	৯৪.৬	৪.৬	৯৫.৫

মজুরি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা:

পোশাক শ্রমিকরা যে কেবল ন্যায্য মজুরি হতেই বঞ্চিত হচ্ছে তাই নয়। মজুরি প্রাপ্তির বেলাতেও বেশ কিছু বঞ্চনা রয়েছে। নিয়মিত এবং অনিয়মিত এই উভয় প্রকার শ্রমের মজুরি পেতেই শ্রমিককে বেশ কিছু দিন অপেক্ষা করতে হয়। জরিপে দেখা যায় যে ন্যূনতম ৫ দিন থেকে সর্বাধিক ২৯ দিন পর্যন্ত তাদেরকে অপেক্ষা করতে হয় নিয়মিত শ্রমের মজুরি পাওয়ার জন্য।

অতিরিক্ত শ্রমের মজুরি প্রাপ্তিও দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় প্রায় প্রতিটি কারখানাতেই শ্রমিকের ১ কিংবা ২ মাসের অতিরিক্ত মজুরি আটকে রাখা হয়। অর্থাৎ প্রতিমাসে শ্রমিক যে অতিরিক্ত শ্রমের মজুরি গ্রহণ করে তা ঠিক পূর্বের মাসের নয়। দুই অথবা তিন মাস অতিরিক্ত শ্রম করার পর শ্রমিক এক মানের মজুরি পায়। বাকি মাসের মজুরিটি গচ্ছিত থাকে মালিকের কাছে সিকিউরিটি হিসেবে। শ্রমিক যাতে হুট করে চাকুরি ছেড়ে চলে যেতে না পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা। যদি শ্রমিক চাকুরি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় তবে এ টাকা পাওয়ার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয় অনেকদিন এবং হাঁটাহাটিও করতে হয় প্রচুর। অনেক ক্ষেত্রে এই টাকা তারা পায়ই না। বস্তুতপক্ষে পোশাক শ্রমিকের স্বল্প মজুরি হতে যতটা না নিরাপত্তাহীনতা উত্থিত হয় তার চাইতে কয়েকগুণ বেশি নিরাপত্তাহীনতা উত্থিত হয় মজুরি প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা হতে।

দিন দিন সমাজ তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চললেও কর্মক্ষেত্রে এখনও রয়ে গেছে নারীদের বেতন বৈষম্য। যুগ যুগ ধরে নারীরা পেটে- ভাতে সংসার খাটুনী খেটে যাচ্ছেন। একই কাজ করে নারীরা পুরুষের তুলনায় কম বেতন পাচ্ছেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের অর্ধেক বেতনও পাচ্ছেন। তারপরও নারীরা তাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের দিকে তাকিয়ে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

বরিশালের কাশিপুর ইউনিয়নের আজিজুল হক,জামাল হোসেন,সঞ্জীব রায়,রুহুল,কালু,সুমন,আনোয়ার,বাবুল ,আকলিমা, রোজি ,তাসলিমা,রহিমা সবাই কাজ অমৃত কনজ্যুমার ফুড প্রোডাক্টসের কারখানায়। এদের মধ্যে পুরুষ শ্রমিকদের বেতন দৈনিক ১০০ থেকে ১২০ টাকা হলেও নারী শ্রমিকদের বেতন ৪০ থেকে ৫০ টাকা। এখানে নারী ও শ্রমিকদের বেতন বিস্তর ফারাক।[২১]

---

২০. প্রতিমা পাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ.-৬৭

২১. দৈনিক আমার দেশ, ২৮ এপ্রিল ২০১১, পৃ.-০৯

Dhaka University Institutional Repository

একই কোম্পানীতে একই কাজ করেও সারাদিন পর একজন নারী শ্রমিক পুরুষ শ্রমিকের অর্ধেকেরও কম মজুরি পান। তবু তারা মুখ বুঝে সহ্য করে যাচ্ছেন। নইলে যে এটুকুও হারাতে হবে! তাহলে স্বামী সন্তান নিয়ে ভীষণ বিপদে পড়তে হবে। এতকিছু সহ্য করার পরও মাঝে মাঝে সইতে হয় কোম্পানী কর্মকর্তাদের নানা স্বেচ্ছাচারিতা। কারণে অকারণে চলে যায় চাকরি, বছরের পর বছর কাজ করার পরও স্থায়ী হয়নি চাকরি। তবে মাঝে মধ্যে সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে। তখন দাবী দাওয়া আদায়ে নেমে আসেন রাস্তায়। আন্দোলনের মুখে মালিক পক্ষ নানা আশ্বাস দিলেও আদৌ তা বাস্তবে রূপ নিয়েছে কি না, সে বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও নারীর শ্রমের যে সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না, গার্মেন্টস সেক্টরে শ্রমিক অসন্তোষের ফলে সৃষ্ট আন্দোলন সেকথাই প্রমাণ করে।

নারী শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা, বাসস্থান ও স্বাস্থ্যগত অবস্থান

সামাজিক নিরাপত্তাঃ

বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্র ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমমর্যাদার নির্দেশনা (আর্টিক্যাল ২৮) দিলেও বাস্তবে নারীরা কম ক্ষেত্রেই সমমর্যাদা পায়। ঐতিহ্য ও প্রথাগতভাবেই শিক্ষা,বিয়ে,সন্তান ধারণ,পারিবারিক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদিতে নারীর মতামত কম গুরুত্ব পায়। নারীর এই অধস্তনতারই আরেকটি রূপ আমরা দেখি-সামাজিক পরিসরে তার নিরাপত্তাহীনতার মাঝে। শারীরিক নিরাপত্তাহীনতা ও মানসিক চাপের পাশাপাশি সামাজিক পরিসরে নারীর নিরাপত্তাহীনতার একটি বড় ক্ষেত্র হলো-তার জন্য আর্থ-সামাজিক সুরক্ষার অভাব।

'সামাজিক নিরাপত্তা' বলতে সচরাচর বোঝানো হয়-কর্মচ্যুতি ও বেকারত্বকালীন সুরক্ষা,পেশাগত অক্ষমতাজনিত সুরক্ষা,অসুস্থকালীন সেবা ও সুরক্ষা,পোষ্যদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা,বার্ধক্য ও অবসরকালীন সুরক্ষা,ন্যূনতম মজুরি,সর্বোপরি তাদের সামাজিক ক্ষমতায়ন ইত্যাদি। বলা বাহুল্য,সমাজের সুবিধাবঞ্চিত পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্যই এই ধরণের সুরক্ষা প্রয়োজন।

সমাজে বিস্তৃত ধারণা রয়েছে পোশাক শ্রমিকরা বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থায় এটা অবশ্য স্বাভাবিক ধারণা। পোশাক কারখানায় নারী শ্রমিকের প্রাধান্য,নারী শ্রমিকের তরুণ বয়স এবং তাদের অবিবাহিত বৈবাহিক সম্পর্ক অতি সহজেই এই ধারণার জন্ম দেয়। সাধারণত ধারণা করা হয় যে অল্প বয়সের নারী শ্রমিকরা যারা এর আগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গৃহবন্দী ছিল,এবং যাদের অধিকাংশই গ্রাম থেকে সদ্যাগত,তারা বহির্জগতের সংস্পর্শে এসে অতি দ্রুত বিপথগামী হবে। তাছাড়া অধিক রাত পর্যন্ত নারী শ্রমিকের কারখানায় কাজ করাও এই ধারণার জন্ম দেওয়ার জন্য বহুলাংশে দায়ী।

অধিক রাত অবধি অল্প বয়সের নারী শ্রমিকরা কারখানায় কাজ করে বলে স্বাভাবিকভাবেই একটি ধারণা হয় যে কারখানার পুরুষ কর্মচারীরা এমনকি মালিকরা ও এই শ্রমিকদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে। ইদানিংকালের পত্র-পত্রিকায় পোশাক কারখানা সম্পর্কে বিভিন্ন খবর ও এই ধারণাকে আরও বদ্ধমূল করেছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নিকট ১৯৯৮ সালে ১৬১ টি ধর্ষণের মামলা নিবন্ধিত হয়েছে যার মধ্যে ১৭ জন হলো গার্মেন্টসের নারী শ্রমিক।[১]

---

১. Pratima Paul-Majumder,Anwara Begum,The Gender Imbalances in the Export Orinted Garments Industry in Bangladesh,policy Research Report,Series-12,The World Bank Research Group,June 2000, P.-18

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে বিদ্যমান এই সমস্ত বিরূপ ধারণার জন্য বহু ক্ষেত্রেই নারী শ্রমিকরা পোশাক কারখানায় চাকুরী গ্রহণকালে নানা প্রবিন্ধকতার সম্মুখীন হয়। বর্তমান জরিপকৃত নারী শ্রমিকদেও শতকরা ৩৭ জনেরই এই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাদের আত্মীয়-বন্ধুরা তাদের পোশাক কারখানায় চাকুরী গ্রহণের ব্যাপারে দারুণ বিরোধিতা করেছে। তাই শতকরা ৩১ জন নারী শ্রমিকই বলেছে তাদের সম্বন্ধে তাদের আত্মীয়-বন্ধুদের ধারণা খারাপ। প্রতিবেশীরাও একই ধারণা পোষণ করে। তাই দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে গিয়ে নারী শ্রমিকরা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সামাজিক মর্যাদা হারিয়েছে।

পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের নিয়োজন সম্বন্ধে সমাজ এবং নারী শ্রমিকের নিজের ধারণাঃ

(শ্রমিকের শতকরা বিন্যাস)[২]

ধারণা সমূহ	নিজের	আত্মীয়/বন্ধুবান্ধব	প্রতিবেশী
ভাল	৫৯.৬	২৯.৩	২৪.৪
মোটামুটি ভালো	৩০.৫	৩৪.৩	৩০.১
খারাপ	৯.৪	৩১.০	৩১.৯
কোন ধারণা নাই	০.৫	৫.৪	১৩.৬
মোট সংখ্যা	**৪২৬**	**৪২৬**	**৪২৬**

বাসস্থান,কারখানায় আসা যাওয়ার পথ এবং কারখানা এই তিন উৎস থেকে নারী শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ঘটে থাকে। স্বল্প মজুরির পোশাক শ্রমিকরা নিম্ন ভাড়ার বাড়িতে থাকে। আর নিম্ন ভাড়ার বাড়িগুলো সাধারণত বস্তি অথবা বস্তি এলাকাতেই অবস্থিত যেখানে রয়েছে নানা ধরনের সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা। অবশ্য শতকরা মাত্র ১৪ জন নারী শ্রমিক বস্তিতে বাস করে।[৩] বস্তি এবং বস্তি এলাকায় বিদ্যমান অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা তাদেও ভোগ করতে হয়। মদ,গাজা এবং জুয়ার আড্ডা বস্তিতে ব্যাপক। নারী ব্যবসায়ী এবং মাস্তানদের দৌরাত্ম্য ও রয়েছে। এই ধরনের পরিবেশে তরুণ বয়সের নারী শ্রমিকরা বাস করলে তাদের সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার ব্যাপ্তি অনুমান করা কঠিন নয়।

পোশাক কারখানার ভেতরে পোশাক শ্রমিকের বিশেষ করে নারী শ্রমিকের ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতা রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এই নিরাপত্তাহীনতার জন্য জন্যই তাদেরকে নানা দুর্ঘটনায় পতিত হতে হয়। তাছাড়া বদ্ধ আবহাওয়ার কারণে প্রতিদিন একজন দুজন শ্রমিকের জ্ঞান হারিয়ে ফেলাতো স্বাভাবিক ঘটনা। প্রতিটি কারখানার কক্ষগুলি অত্যন্ত জনাকীর্ণ এবং কক্ষ সংখ্যা ও সীমিত। যার ফলে শ্রমিকদের জন্য বিশ্রাম ঘর,খাবার ঘর,টয়লেট ইত্যাদি পর্যাপ্ত সংখ্যায় করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য মালিক পক্ষের নিকট হতে যে তথ্য পাওয়া তাতে দেখা যায় প্রতিটি কারখানাতে পুরুষ এবং নারী শ্রমিকের জন্য আলাদা খাবার ঘর রয়েছে। মালিক পক্ষের এই তথ্য অবশ্য নির্ভুল। তবে স্থান সংকুলানের অভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঐ খাবার ঘরগুলো অন্য কাজে বিশেষকরে গুদামঘর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

---

২. প্রতিমা পাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ.-৮২

৩. Syeda Sarmin Absar,Living condition of woman workers in RMG sector in Bangladesh,National Centre for Development Studies(NCDS),Canberra Australia,p-03

Dhaka University Institutional Repository

নারী শ্রমিকের মধ্যে শতকরা মাত্র ৩৮ জন উল্লেখ করেছে যে তারা খাবার ঘরে বসে দুপুরের খাবার খায়। বাকিরা হয় ছাদে,নয়তো বারান্দায়,নয়তোবা সিড়িতে বা কাজের জায়গার আশে পাশে বসে খাবার খায়। শ্রম আইন অনুযায়ী জরিপভুক্ত কোনো কারখানাতেই বিশ্রাম ঘর বা ক্যান্টিন দেখা যায় না। শ্রম আইন অনুযায়ী ২৫ জন শ্রমিকের জন্য একটি টয়লেট বরাদ্দ। কিন্তু একটি কারখানাতেও এই আইনটি মানা হয় না। একটি টয়লেট ব্যহারকারীর সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০ জন ও অতিক্রম করেছে। এছাড়া স্থান সংকুলান পর্যাপ্ত নয় বলে প্রায় প্রতিটি কারখানার পরিবেশ অত্যন্ত নোংড়া এবং বদ্ধ।

কারখানা চত্বরের আশেপাশে কোনো উন্মুক্ত চত্বর নেই। তাই কারখানার সদর দরজা বন্ধ করলে শ্রমিকরা আর কোনো মতেই খোলা আকাশের নীচে আসতে পারে না। তার উপর কারখানায় প্রবেশ এবং বের হওয়ার উপর রয়েছে প্রচন্ড কড়াকড়ি। যার ফলে একবার প্রবেশ করলে বের হওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া যখন দরজায় তালা লাগিয়ে অন্যত্র চলে যায় এসময়ে কারখানায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে শ্রমিকের প্রাণ বাঁচাবার কোন পথ খোলা থাকে না,যদিও তরুণ বয়সের নারী শ্রমিকের নিরাপত্তার কারণেই এই কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়,তথাপি এই ব্যবস্থা থেকেই উত্থিত হয় শ্রমিকের অধিকাংশ জীবনের নিরাপত্তাহীনতা। বাংলাদেশ ফায়ার ব্রিগেড এর এক সমীক্ষায় দেখা যায় ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ৫৮ বার পোশাক কারখানায় আগুন লেগেছে, ১১৮ জন মারা গেছে যার মধ্যে ৯০ জনই হলেন নারী।[৪]

পোশাক কারখানায় কাজের পরিবেশ[৫]

কাজের পরিবেশ	হ্যাঁ	না
পর্যাপ্ত লাইটিং	৩৬(৪০)	৫৪(৬০)
পর্যাপ্ত স্বাস্থসম্মত অবস্থা	২৩(২৬)	৬৭(৭৪)
পর্যাপ্ত বাতাস	১৮(২০)	৭২(৮০)
পর্যাপ্ত টয়লেট	৫৪(৬০)	৩৬(৪০)

অধিকাংশ মালিকই উল্লেখ করেছেন পাড়ার মাস্তান এবং অন্যান্য দুস্কৃতকারীদের হাত থেকে নারী শ্রমিকদের মান-ইজ্জত রক্ষার জন্যই তাদেরকে তালাবদ্ধ করে রাখতে হয়। বহু ক্ষেত্রে কারখানার জানালাগুলিও বন্ধ করে রাখা হয়। মালিকগণ উল্লেখ করেন যে জানালা দিয়ে শ্রমিকগণ তৈরী পোশাক এবং পোশাকের উপকরণ নীচে ফেলে দেয় বলেই তারা জানালা বন্ধ করে রাখেন। এখানে মালিকদের এই বিষয়টি বিবেচনার বিষয়। মাস্তান হতে তরুণী নারীদের নিরাপত্তাজনিত কারণে তালাবদ্ধ করে রাখার যুক্তিটিও অকাট্য। কিন্তু তারপরে ও প্রশ্ন উঠে শত শত শ্রমিককে ঘরের মধ্যে গাদাগাদি করে রেখে এইভাবে দরজা জানালা বন্ধ করে রাখার পদ্ধতিটি কতটা অমানবিক। মালিকের এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য অন্য পথ খুঁজে বের করা উচিত।

---

৪. Pratima Paul-Majumder,Anwara Begum,The Gender Imbalances,ibid, P.-15

Dhaka University Institutional Repository

পোশাক কারখানায় নারীর কাজ করা সম্বন্ধে সমাজে যে তীব্র বিরূপ ধারণা ছিল তা কিছুটা হলেও কমেছে। এক সমীক্ষায় দেখা যায় শতকরা ৯০ জন নারী শ্রমিক তাদের নিজেদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করে থাকে এবং প্রায় শতকরা ৩৭ জন তাদের পরিবারের সম্মতিতে পোশাক শিল্পে কাজ করে থাকে।[৫] অধিকাংশ নারী শ্রমিক বলেছে সহকর্মী এবং সুপারভাইজারের ব্যবহার ভাল অথবা মোটামুটি ভাল।

কারখানায় সহকর্মীদের সম্বন্ধে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের অভিমত:[৭]

ব্যবহারের ধরণ	নারী			পুরুষ		
	নারী সহকর্মীর ব্যবহার	পুরুষ সহকর্মীর ব্যবহার	সুপার ভাইজারের ব্যবহার	নারী সহকর্মীর ব্যবহার	পুরুষ সহকর্মীর ব্যবহার	সুপার ভাইজারের ব্যবহার
ভাল	৭০.১	৬৫.২	৬৩.৬	৫৯.২	৬৪.৫	৬০.৪
মোটামুটি	২৮.৩	৩০.৬	২৯.৯	২৯.৮	৩৩.১	৩১.৪
খারাপ	১.৪	৪.২	৬.৫	১.৩	১.৬	৭.৭
ধারণা নেই	০.২	-	-	৯.৮	০.৮	০.৪
মোট সংখ্যা	**৪২৮**	**৪২৮**	**৪২৮**	**২৪৫**	**২৪৫**	**২৪৫**

তাছাড়া নারী শ্রমিকরা ছিনতাইকারী/মাস্তান কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া, রাস্তায় চলতে গিয়ে ভয়ভীতির সম্মুখীন হওয়া,পুলিশের হামলার শিকার,সুপারভাইজার কতৃক প্রহৃত হওয়া,কারখানার ভেতর ধর্ষণের শিকার চাকুরি থেকে বরখাস্তের হুমকি ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। পাল মজুমদার এক সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে শতকরা প্রায় ৭০ জন নারী পোশাক শ্রমিক বাসে চড়ার সময় ড্রাইভার এবং কন্ডাক্টরের দ্বারা খারাপ ব্যবহারের শিকার হোন।[৮]

---

৫. N Nahar,R N Ali and F Begum,Occupational Health Hazards in Garments Sector,Department of Rural Soclology,BAU,Mymensingh, 17 Februry 2010, P.-05

৬. Pratima Paul-Majumder,Anwara Begum,The Gender Imbalances,ibid, P.-17

৭. প্রতিমা পাল মজুমদার,প্রাগুক্ত, পৃ.-৮৬

৮. Pratima Paul-Majumder,Anwara Begum,The Gender Imbalances,ibid, P.-19

Dhaka University Institutional Repository

নারী শ্রমিকের মান ইজ্জতহানিকর বিভিন্ন ঘটনা সংঘটনের সংখ্যা:[৯]

(মোট নারী শ্রমিকের শতাংশ)

মান ইজ্জতহানিকর ঘটনাসমূহ	শ্রমিকের নিজের ক্ষেত্রে	সহকর্মীর ক্ষেত্রে
ছিনতাইকারী/ মাস্তান কর্তৃক আক্রান্ত	৪.৫	১০.০
রাস্তায় চলতে গিয়ে ভয় ভীতির সম্মুখীন	১৪.৩	৭.৮
কারখানায় আসা যাওয়ার পথে ঠট্টা বিদ্রূপের সম্মুখীন	১৯.০	২১.৫
কারখানায় আসা যাওয়ার পথে ধর্ষণের শিকার	০.০	৪.৭
পুলিশের হামলার শিকার	১.৪	১.৯
কারখানার ভেতর সুপারভাইজার কতৃক প্রহৃত	৫.৯	৬.৭
কারখানার ভেতর ধর্ষণের শিকার	০.২	৪.০
চাকুরি হতে বরখাস্তের হুমকির সম্মুখীন	১৮.৩	১৫.০

বাসস্থানের অবস্থা: বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের বেশিরভাগই গ্রাম থেকে আগত (প্রায় ৬০ শতাংশ)।[১০] এই স্বল্প আয়ের নারী শ্রমিকরা নিম্ন ভাড়ার বাড়িতে বাস করে। পাল মজুমদার দেখিয়েছেন যে শতকরা ৭৭ভাগ নারী শ্রমিক অস্থায়ী ভিত্তিতে বসবাস করে।[১১] এছাড়া বাড়ির মালিকরা অবিবাহিত মেয়েদের নিকট বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের বাসস্থানের ধরণ:[১২]

বাসস্থানের ধরণ	নারী (৫৮৯)	পুরুষ (২১৯)
পরিবার	৭৩.৪	৫৮.০
একাকী পরিবার	৫৪.৭	৩৭.০
যৌথ পরিবার	১৮.৭	২১.০
মেস/হোস্টেল	১৫.০	৩৩.৩
আত্মীয়ের বাড়ি	৭.৫	৪.৬
একাকী বসবাস	১.৫	২.৩

৯. প্রতিমা পাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ.-৮৭
১০. প্রতিমা পাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ.-৮১
১১. উন্নয়ন পদক্ষেপ, প্রাগুক্ত, পৃ.-৫১
১২. Syeda Sarmin Absar, P.-02

Dhaka University Institutional Repository

স্বল্প মজুরি এবং উচ্চ বাড়ি ভাড়ার কারণে নারী শ্রমিকরা কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে। সচরাচর একজন শ্রমিকের মাসিক মজুরির ৬০% ব্যয় হয় বাড়ি ভাড়া বাবদ। বর্তমান সময়ে ১.৫ মিলিয়ন শ্রমিকের জন্য আবাসন সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। নিচে নারী শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরণের আবাসন ব্যবস্থার বর্ণনা দেয়া হলো।

১. বস্তিঃ

বস্তি হচ্ছে ছন বা টিনের তৈরী এক কক্ষ বিশিষ্ট ঘর যেখানে একটি আরেকটির সাথে সংযুক্ত। সেখানে পর্যাপ্ত টয়লেটের ব্যবস্থা থাকে না। একটি টয়লেট ১০/১৫ টি পরিবার ব্যবহার করে। চুলা ব্যবহারের অবস্থাও প্রায় একই রকম। এসব বস্তির ভাড়া আবার ৮০০ থেকে ১৮০০ টাকার মধ্যে। যেখানে পর্যাপ্ত বিদ্যুতের সুবিধা থাকে না। বাতি এবং হারিকেন জ্বালাতে হয় কেরোসিন দিয়ে। অনেক বস্তিতে গ্যাস পর্যন্ত থাকে না,লাকড়ির আগুনে রান্না করতে হয়। অবশ্য শতকরা মাত্র ১৭ জন নারী শ্রমিক বস্তিতে বাস করে। তবে এদের বাসগৃহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে সহজেই মন্তব্য করা যায় যে শতকরা প্রায় ৩০ জন শ্রমিকের বাসগৃহই বস্তি প্রকৃতির যেখানে নগরগৃহের সুবিধাগুলি অনুপস্থিত। শতকরা ৫৭ জন শ্রমিকের বাসগৃহই কাঁচা। যেখানে চুরির ভয় নিত্য সঙ্গী।

এছাড়া বস্তি এবং বস্তি এলাকায় বিদ্যমান অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তাহীনতাতো তাদের ভোগ করতেই হয়। একটি বস্তি সমীক্ষায় দেখা যায় মদ,গাজা এবং জুয়ার আড্ডা বস্তিতে ব্যাপক। তাছাড়া একই সমীক্ষায় দেখা গেছে নারী ব্যবসায়ী এবং মাস্তানদের দৌরাত্ম্যও বস্তিতে ব্যাপক। এই ধরণের পরিবেশে তরুণ বয়সের নারী শ্রমিকরা বসবাস করলে তাদের সামাজিক নিরাপত্তহীনতার ব্যাপ্তি অনুমান করা কঠিন নয়।[১৩]

২. কারখানায় আবাসন ব্যবস্থাঃ

নারী শ্রমিকদের কারখানায় অবস্থান খুবই নিরাপদ। জহির এবং পাল মজুমদার(১৯৯৬) রামপুরায় অবস্থিত একটি কারখানায় জরিপ চালিয়ে দেখিয়েছেন যে সেখানে ৭০ জন গারো নারী শ্রমিকের আবাসন ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব শ্রমিকরা আবাসন বাবদ ১৫০ টাকা এবং খাবার বাবদ ৩০০ টাকা প্রদান করে থাকেন।

এলিফ্যান্ট রোডে অবস্থিত আরেকটি কারখানায় জরিপ চালিয়ে দেখিয়েছেন যে সেখানে ৩০ জন নারী শ্রমিকের আবাসন ব্যবস্থা করা হয়েছে বিনামূল্যে,যারা পাবনা থেকে এসেছেন। তবে কারখানায় নারী শ্রমিকের আবাসন ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ১৯৯০ সালের হিসাব অনুযায়ী ১.১% এবং ১৯৯৭ সালের হিসাব অনুযায়ী ০.৬% নারী শ্রমিক কারখানায় অবস্থান করেছেন।[১৪]

৩. মেস/হোস্টেলঃ

ইদানিংকালে নারী শ্রমিকদের মেসে অবস্থানের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে যদিও এগুলো তাদের জন্য মোটেও নিরাপদ আবাসন নয়। কারণ এগুলোর মালিক স্থানীয় প্রভাবশালী এবং মাস্তানরা।

---

১৩. প্রতিমা পাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. -৮৩

১৪. Syeda Sarmin Absar, P.-03

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বের একটি জরিপে দেখিয়েছি যে শতকরা ১৫ জন নারী শ্রমিক মেসে বাস করে। মেসগুলো অনেকটা জঞ্জালপূর্ণ এবং সেখানে বিনোদনের কোন ব্যবস্থা থাকে না। সম্ভবত নারী শ্রমিকরা একাকী থাকার জন্য বিশেষ করে অবিবাহিত মেয়েরা মেসে অবস্থান করে থাকে। নন-ইপিজেড কারখানাগুলোতে ১৯৯০ থেকে ১৯৯৭ সালে মেসে অবস্থানকারী নারী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ ৭.৬% থেকে ১৪.৯% হয়েছে।

নারী শ্রমিকদের বাসস্থান:[১৫] **(নন-ইপিজেড)**

বাসস্থানের ধরণ	১৯৯০(৩৫৬ শ্রমিক)	১৯৯৭(৪৭০ শ্রমিক)
বাড়ি	৮১.৭	৭২.৩
মেস	৭.৬	১৪.৯
আত্মীয়ের বাড়ি	৯.০	৭.৭
কারখানায় আবাসন	১.১	০.৬
অন্যান্য	০.৬	৪.৫

নারী উদ্যোগ কেন্দ্রের ডাইরেক্টর মাকসুদা খাতুন ১৯৯১ সালে ঢাকায় অবস্থিত ব্রিটিশ হাই কমিশনের আর্থিক সহায়তায় নারী শ্রমিকদের হোস্টেলে অবস্থানের উপর একটি প্রজেক্ট পেপার উপস্থাপন করেছেন। মহাখালী, মিরপুর, রামপুরা এবং শ্যামলীর চারটি পোশাক কারখানার ৬০০ শ্রমিকের উপর জরিপ চালিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে তাদের প্রত্যেককে প্রতি মাসে ২৩০ টাকা দিতে হয় ভাড়া বাবদ এবং৭৫০ টাকা দিতে হয় খাবার বাবদ। বস্তি এবং মেসের চেয়ে হোস্টেল অনেকটা নিরাপদ।[১৬]

৪. যোগাযোগ ব্যবস্থা:

নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার চিত্র অত্যন্ত নাজুক। আসা যাওয়ার পথে নারী শ্রমিকরা নানা রকম হয়রানির শিকার হন।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের যোগাযোগ ব্যবস্থা:[১৭]

যোগাযোগের ধরণ	নন-ইপিজেড		ইপিজেড	
	পুরুষ(১৯০)	নারী(৪৭০)	পুরুষ(২৭)	নারী(৯২)
হেঁটে	৫৭.৯	৬৮.৯	৭.৪	৭.৬
হেঁটে ও রিক্সায়	৩.৭	৭.০	৩.৭	৩.৩
হেঁটেও বাসে	২১.৬	১৫.৫	৩.৭	৩.৩
টেম্পো	৪.২	২.১	৩.৭	২.২
কারখানার বাস	০.৫	-	৭৭.৮	৭৯.৩
অন্যান্য	৫.৮	৩.৭	৩.৭	২.১

১৫. Syeda Sarmin Absar, P.-03

১৬. Syeda Sarmin Absar, P.-04

১৭. Syeda Sarmin Absar, P.-04

Dhaka University Institutional Repository

কারখানায় আসা যাওয়ার মাধ্যমটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা মহিলা শ্রমিকের পথের নিরাপত্তাকে সবচাইতে বেশি প্রভাবিত করে। বর্তমান জরিপের তথ্য থেকে দেখা যায় প্রায় ৬৯ শতাংশ নারী শ্রমিক পায়ে হেঁটে কারখানায় যায়। এমনকি ৫/৬ কিলোমিটার দুরত্বের পথ ও তারা পায়ে হেঁটেই অতিক্রম করে। তাদের স্বল্প মজুরি থেকে যাতায়াতের খরচটি বাঁচানোর জন্যই তাদের এই প্রয়াস। তবে রাতের বেলায় এত লম্বা পথ হেঁটে পার হলে অতি স্বাভাবিক ভাবেই তরুণ বয়সের মহিলাদের অনেক বিপত্তির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কারখানার হতে বাসস্থানের দুরত্ব এবং কারখানায় আসা যাওয়ার মাধ্যম অনুযায়ী নারী শ্রমিকের শতকরা বিভাজন:[১৮]

কারখানা হতে বাসস্থানের দুরত্ব	হেঁটে	বাস/টেম্পো	রিক্সা	রিক্সায়/ হেটে	ফ্যাক্টরী বাস	অন্যান্য
১ কি: মি: পর্যন্ত	৭৬.৮	২.০	৮.৬	২৫.০	-	-
২ কি: মি: পর্যন্ত	১০.৭	২১.৮	৪২.১	৩৯.৩	৪.৮	৬০.৫
৩ কি: মি: পর্যন্ত	৫.১	১৭.০	১৩.৬	১৬.৯	-	-
৪ কি: মি: পর্যন্ত	২.৫	১৫.০	২১.৪	৪.৯	-	১৪.৫
৫ কি: মি: পর্যন্ত	২.৫	১১.২	৩.৬	৬.১	১৯.১	১০.৫
৬ + কি: মি: পর্যন্ত	২.৩	৩২.০	১০.৭	৭.৩	৭৬.২	১৪.৫
সব দুরত্ব	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
৪২৬ জন শ্রমিকের শতাংশ	৬০.৫	১৭.৪	৪.২	১৪.২	২.৬	০.৭

স্বাস্থ্যগত অবস্থান:

স্বাস্থ্য শ্রমিকের মূলধন যা খাটিয়ে সে তার জীবিকা উপার্জন করে। একজন পোশাক শ্রমিক দিনে গড়ে প্রায় ১২ ঘন্টা শ্রম প্রদান করে। দিনের বাকী ১২ ঘন্টা সময়ের মধ্যে প্রায় ১ ঘন্টা সময় তারা কারখানায় আসা যাওয়ার পথে ব্যয় করে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বাকি ১১ ঘন্টা সময়ের মধ্যে তাকে অবশ্য করণীয় প্রাত্যাহিক কাজগুলি সম্পন্ন করতে হবে। বিশ্রাম এবং বিনোদন করতে হবে। নারী শ্রমিকের গৃহস্থালি কাজও সম্পন্ন করতে হবে এই সময়ের মধ্যে। তাই দেখা গেছে প্রায় ৭০ শতাংশ নারী শ্রমিক প্রতিদিন ৬ ঘন্টা সময়ের কম ঘুমায়।

পোশাক তৈরীর কাজ শ্রমিকের ঘুম এবং বিশ্রামের সময়টিকেই কেবল সংকুচিত করে না তাদের দৈহিক শক্তিরও অনেকখানি ব্যয় হয় এই কাজে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রায় ৬৯ জন নারী শ্রমিক পায়ে হেটে কারখানায় আসা যাওয়া করে এবং তাদের দৈনিক ১ থেকে ৬ কি: মি: পথ

১৮. প্রতিমা পাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ.-৯০

Dhaka University Institutional Repository

হেটে অতিক্রম করতে হয়। এই দীর্ঘ পথ পায়ে হেটে অতিক্রম করতে কতটা দৈহিক শক্তির প্রয়োজন তা অনুমান করা কঠিন নয়। তাছাড়া পোশাক তৈরীর কাজে চোখের ব্যবহার অত্যন্ত ঘন। প্রচন্ড রকম ধৈর্যেরও প্রয়োজন। দীর্ঘ ১২ ঘন্টা ধরে যা বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন। এ সমস্ত কারণে শ্রমিকের চোখের যন্ত্রণা এবং মাথা ব্যাথা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হেল্পার শ্রেণীর শ্রমিকদের আরও একটি বাড়তি কষ্ট করতে হয়। যেহেতু ১২ ঘন্টা কাজের প্রায় পুরো সময়টিতেই তাকে দাড়িয়ে কাজ করতে হয়। তাদের মধ্যে প্রায় ৭০ জনই উল্লেখ করেছে পোশাক কারখানায় তাদের কাজের প্রধান অসুবিধাটি হল দাড়িয়ে কাজ করা। যার ফলে তারা অনেকেই পায়ের ব্যথায় ভোগে,পা ফুলে যায়।

বয়সের স্তর অনুযায়ী নারী শ্রমিকের গার্মেন্টসে আসার পর বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা:[১৯]

বয়সের স্তর	মোট শ্রমিক সংখ্যা	চোখের যন্ত্রণা		সর্দি/কাশি		শারীরিক দুর্বলতা		জন্ডিস		পেটের অসুখ		প্রস্রাবের অসুবিধা		অন্যান্য	
		হয়	হয়না	হয়	হয়না	হয়	হয়না	হয়	হয়না	হয়	হয়না	হয়	হয়না	হয়	হয়না
১০-১৪	৭০	৫৩.৪	৪৬.৬	৭৭.১	২২.৯	৭৩.৪	২৬.৬	২০.০	৮০.০	৫৭.১	৪২.৯	১০.০	৯০.০	৮৬	১১.৪
১৫-১৯	১৩৯	৫২.৭	৪৭.৩	৮১.৭	১৮.৩	৭৫.১	২৪.৯	২১.৯	৭৮.১	৩৩.৭	৬৬.৩	২৫.৪	৭৪.৬	৮.৩	৯১.৭
২০-২৯	১০৩	৫৩.৪	৪৬.৬	৮৩.৫	১৬.৫	৭৪.৮	২৫.২	২৩.৩	৭৬.৭	৩২.০	৬৮.০	৩০.০	৭০.০	১৪.৬	৮৫.৪
৩০-৩৪	২৬	৫৭.৭	৪২.৩	৬৯.২	৩০.৮	৭৬.৯	২৩.১	৩৪.৬	৬৫.৪	১৫.৪	৮৪.৬	৩৪.৬	৬৫.৪	১১.৫	৮৮.৫
৩৫-৩৯	১	৫০.০	৫০.০	২৯	৭১	৮৫.৭	১৪.৩	২১.৪	৭৮.৬	৪২.৯	৫৭.১	১৪.৩	৮৫.৭	৪.৩	৮৫.৭
৪০-৪৫	৫	-	১০০.০	১০০.০	-	-	১০০.০	-	-	১০০.০	-	-	১০০.০	-	১০০.০
সব বয়স	৪২৬	৫৩.৮	৪৬.২	৮১.০	১৯.০	৭৪.৪	২৫.৬	২৩.০	৭৭.০	৩১.৫	৬৮.৫	২৫.৪	৭৪.৬	১১.০	৮৯.০

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে কারখানাগুলির কাঠামোগত ত্রূটির কারণে পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা। আলো পর্যাপ্ত হলেও বহুক্ষেত্রে জানালা বন্ধ থাকার কারণে বাতাস পর্যাপ্ত নয়। বহুজনে এক টয়লেট ব্যবহার করার ফলে টয়লেট সব সময়েই নোংরা থাকে এবং প্রায়ই টয়লেটের উদগত গন্ধে কারখানার পরিবেশ ভারী হয়ে থাকে। নোংরা টয়লেট এবং টয়লেটের গন্ধ শ্রমিকের স্বাস্থ্যকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে। অনেক কারখানাতে আবার টয়লেটে যাবার উপর বিধি নিষেধ আছে।

১৯. প্রতিমা পাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ.-১৪২

Dhaka University Institutional Repository

১২ ঘন্টা পর্যন্ত কাজের সময়ে ১ বার কিংবা ২ বার টয়লেটে যাওয়ার অনুমতি মেলে। টয়লেটে থাকার নামে শ্রমিকগন সময় নষ্ট করে সন্দেহেই এই ব্যবস্থা। কিন্তু এই ব্যবস্থা শ্রমিকের বিশেষ করে নারী শ্রমিকের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

প্রতিমা পাল-মজমদারের নেতৃত্বে ৩৯টি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে আট শতাধিক শ্রমিকের মাঝে পরিচালিত ব্যাপকভিত্তিক অনুসন্ধানে বিআইডিএস-এর শিল্প গবেষকদের কাছে ৪২ শতাংশ গার্মেন্টস নারী শ্রমিক এবং ২৪ শতাংশ পুরুষ শ্রমিক বলেছে, কাজে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পর থেকে তারা বহুবিধ স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে।[২০] যার মধ্যে রয়েছে গ্যাস্ট্রিক থেকে শুরু করে এসটিডির মত সমস্যা।

সর্দি কাশি এবং জ্বরে তারা প্রায়ই ভোগে। পোশাকের কাপড়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন কেমিকেল,কাপড়ের সুক্ষ্ম কণা এবং ধুলা অনবরত শ্রমিকের প্রবেশ করছে। যার ফলে সর্দিকাশি হওয়ার সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পায়। পোশাক শ্রমিকদের অসুস্থতার ব্যাপ্তি কত তা আরও পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় শ্রমিকদের ছুটি নেওয়ার কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে।

নারী ও পুরুষ শ্রমিকের ছুটি নেওয়ার কারণসমূহের শতককরা বিভাজন:[২১]

কারণসমূহ	নারী	পুরুষ
অসুস্থতা	৬৭.৮	৫৭.৬
ঘরের কাজ	৩.০	৯.১
পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতা	৮.৭	৪.৬
দেশের বাড়িতে যাওয়া	১৪.৭	২২.১
অন্যান্য	৬.৮	৬.৬
সব কারণ	১০০.০	১০০.০

অবশ্য পোশাক তৈরির কাজ পুরুষ ও নারী শ্রমিকের স্বাস্থ্য একইভাবে প্রভাবিত করে না। দেখা গেছে শতকরা ৬৮ জন নারী শ্রমিক যেখানে অসুস্থতার জন্য ছুটি নেয় ,সেখানে পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ৫৮ জন। সর্দি কাশি জ্বরের বেলাতেও একই রকম তথ্য পাওয়া যায়। চিকিৎসা খরচ দিয়ে বিচার করলেও পরিষ্কারভাবে দেখা যায় পুরুষ শ্রমিকের স্বাস্থ্য নারী শ্রমিকের চাইতে নিরাপদ। দেখা গেছে পুরুষ শ্রমিকের গড়ে চিকিৎসা খরচ হল ৭৩ টাকা যা নারী শ্রমিকদের এ খাতে খরচের চাইতে ৩৫ টাকা কম। অথচ নারী ও পুরুষ শ্রমিক উভয়ে একই পরিবেশে কাজ করছে এবং উভয়ের কাজের চাপ ও প্রায় সমান। বরং পুরুষ শ্রমিকরা নারী শ্রমিকের চাইতে বেশি অতিরিক্ত শ্রম করে।

---

২০. আলতাফ পারভেজ, প্রাগুক্ত, পৃ.-৪৬

২১. প্রতিমা পাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ.-৯৬

Dhaka University Institutional Repository

পদ মর্যাদা অনুযায়ী নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মাসিক চিকিৎসা খরচ:[২২] (টাকায়)

পদ মর্যাদা	নারী	পুরুষ
কোয়ালিটি কন্ট্রলার	১৬৩	৭২
কাটিং মাস্টার	৬০	১৭৩
সুপারভাইজার	২২৫	৯৭
অপারেটার	১২৫	৭২
সোয়িং হেল্পার	৫৪	৩৭
ফোল্ডিং/আয়রনিং	১৩৫	৩৪
ফিনিসিং কাটিং হেল্পার	১১১	৬১
সব পদ মর্যাদা	১০৮	৭৩

পিতা মাতা কতৃক বৈষম্যমূলকভাবে প্রতিপালিত হবার কারণে হয়তো নারী শ্রমিকের স্বাস্থ্য ছোট বেলা হতেই পুরুষ শ্রমিকদের চাইতে দুর্বলভাবে গড়ে উঠেছে যার ফলে তারা পুরুষের চাইতে বেশি অসুস্থ হয়।

একজন মানুষকে দৈনিক প্রায় ২২০০ কিলোক্যালরি মানসম্পন্ন খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন। দৈনিক শ্রমে নিযুক্ত মানুষের জন্য আরও বেশি কিলোক্যালরি মানসম্পন্ন খাদ্যেও প্রয়োজন।

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের জন্য একদিনের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সুষম খাদ্যের তালিকা:[২৩]

ক্রমিক নং	কিলোক্যালরি	পরিমাণ(গ্রাম)	আনুমানিক মূল্য(টাকা)
১	১৩৯৬	৩৯৭	১৬.০০
২	১৪৯	৪০	২.০০
৩	১৫৩	৪০	৪.০০
৪	৩৯	৫৮	৩.০০
৫	১৮০	২০	৪.০০
৬	১৪	১২	৩.০০
৭	৫১	৪৮	১০.০০
৮	২৬	২৭	০.৫০
৯	৩৬	১৫০	৬.০০
১০	৮২	২০	১.৫০
১১	৬	২০	২.০০
১২			১০.০০

তবে খাদ্য যা স্বাস্থ্যকে সবচাইতে বেশি প্রভাবিত করে তা গ্রহণের পার্থক্য থেকেও নারী পুরুষের মধ্যকার স্বাস্থ্য অবস্থার পার্থক্যটির কারণ পাওয়া যেতে পারে।

---

২২. প্রতিমা পাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

২৩. ১লা মে ২০১১, দৈনিক জনকণ্ঠ, পৃ. ০৭

Dhaka University Institutional Repository

নারী ও পুরুষ শ্রমিকের দুপুরের খাদ্য তালিকা:

বিভিন্ন প্রকার খাদ্য	নারী (৪২৮ জন)	পুরুষ(২৪৫ জন)
কিছুই খায়নি	২.৯	-
কেবল মাত্র রুটি	৩.৪	-
কেবল মাত্র চা বিস্কুট	১.৪	-
মাংস	৪.০	৮.০
মাছ	৫৩.৭	৫৭.৫
ডাল	২২.৩	২৪.৫
ডিম	৪.৯	৫.০
তরকারী	৫০.২	৪৫.৩

দৈনিক শ্রম ঘন্টা স্বাস্থ্য নিরাপত্তাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। দৈনিক শ্রম ঘন্টা দিয়ে শ্রমিকের চোখের যন্ত্রণা এবং শারীরিক দুর্বলতার গতি প্রকৃতি বিচার করে দেখা গেছে শ্রম ঘন্টা যত বেশি হয়েছে,ততই শ্রমিক এ দুটি রোগের শিকার হয়েছে। কিন্তু নারী এবং পুরুষ শ্রমিককে যখন আলাদা করে বিচার করা হয় তখন দেখা যায় পুরুষরা অধিক সময় কাজ করলেও নারী শ্রমিকের মত একই ব্যাপ্তিতে চোখের যন্ত্রণা কিম্বা শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করেনা। এর কারণ খুজতে গিয়ে দেখা যায় পুরুষ শ্রমিক যারা ১২ ঘন্টা কিম্বা তার উপরে কাজ করে তারা ঘুমের সময়টি ঠিক রাখে। তারা তাদের কিছুটা বিশ্রামের সময় এবং গৃহস্থালী কাজের প্রায় পুরো সময়টা কেটে নিয়ে অতিরিক্ত শ্রমে যোগ করে। কিন্তু নারী শ্রমিকের বেলায় দেখা গেছে অতিরিক্ত শ্রম করার জন্য বিশ্রামের পুরো সময়টি কাটার পরও তাদের কে ঘুমের সময় থেকে কিছুটা সময় কাটাতে হয়েছে। যেহেতু গৃহস্থালীর কাজে তাদেরকে কিছুটা সময় ব্যয় করতে হয়। বিশ্রামের সময় কেটে তারা গৃহস্থালী কাজে ব্যয় করে ২.৭ ঘন্টা সেখানে পুরুষরা ব্যয় করে মাত্র ০.৯ ঘন্টা।

নারী এবং পুরুষ শ্রমিকের স্বাস্থ্য প্রভাবক বিভিন্ন উপাদানগুলির বিভাজন:

স্বাস্থ্য প্রভাবক উপাদান	নারী	পুরুষ
দৈনিক ঘুম(ঘন্টায়)	৬.৮	৬.৮
দৈনিক বিশ্রাম(ঘন্টায়)	২.৩	৩.৫
দৈনিক গৃহস্থালীর কাজ(ঘন্টায়)	২.৭	০.৯
নিজের জন্য চিকিৎসা খরচ(মাসে)	১০৮.০	৭৩.০
নিজের জন্য অন্যান্য খরচ(খাদ্য ব্যতীত) (মাসে)	১১৮.০	১৬৭.০
খাদ্যে প্রোটিন(শতাংশ)	৫৮.০	৬৬.০
অসুখের জন্য ছুটি	৬৮.০	৫৮.০

Dhaka University Institutional Repository

নারী শ্রমিকের শ্রম পরিবেশ ও শ্রমিক অধিকার:

স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন অঙ্গনে জোরালোভাবে নারীদের পদচারনা দেখা গেছে। গার্মেন্টস শিল্প এর মধ্যে একটি । আমাদের দেশের পারিপার্শ্বিক সামাজিকতায় নারী শ্রমিকদের কারখানায় গিয়ে কাজ করাটা বিশাল ব্যাপার ছিল। এসব মেয়ের বেশির ভাগই অবিবাহিত,একটু শিক্ষিত, বয়সে ও ছোট । দলে দলে এসব মেয়েদের গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করতে আসাটা ছিল অর্থনীতিতে ইতিবচিক পরিবর্তনের একটি পদক্ষেপ। যা তখন সেভাবে বুঝা যায়নি।

আশির দশকের মাঝামঝি তৈরি পোশাক শিল্পের প্রসার হয়। নতুন উদ্যোক্তাদের অনেকেই এই সময় যোগ দেন। ধীরে ধীরে বিশ্ব বাজারে এর চাহিদা বাড়তে থাকে । সরকারের কাছ থেকে উদ্যোক্তারা ও অনেক সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন । কিন্তু বঞ্চিত হয়েছেন গার্মেন্টস শ্রমিকরা ,বিশেষ করে নারীরা । অথচ ২০০৬ সালের এক গবেষণায় দেখা যায়, শ্রমিকদের ৮৫% হচ্ছেন নারী।

এছাড়া উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী ব্যবসায়িক মনোভাব তৈরী হয়নি । এজন্য তারা শ্রমিকদের সুবিধা অসুবিধার দিকে খেয়াল রাখেনি তেমন। পাশাপাশি ফ্যাক্টরির ভেতর ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে কাজ করতে না দেওয়ায় নারী শ্রমিকেরা সংগঠিত হতে পারেনি। নিজেদের কথা তুলে ধরার আরেকটি বাধা ছিল এটি।

এছাড়া বাংলাদেশের শ্রম আইনের অনেক বিষয় বিট্রিশ আমল থেকে চলে আসছে। যে আইন পুরুষ শ্রমিকের কথা মাথায় রেখে প্রণীত হয়েছিল। ১৯৯৪ সালের নতুন লেবার কোড,যাতে অনেক আইন নারী শ্রমিকের কথা মাথায় রেখে করা হয়েছিল। কিন্তু এ আইনটি তৈরী হলে ও তা এখনো সংসদে পাস হয়নি।

তবে অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। শিশু নারী শ্রমিক এখন আগের চেয়ে অনেক কম। ফ্যাক্টরির পরিবেশ ও কিছুটা ভালো। তবে যতটা হওয়ার দরকার ছিল ততটা হয়নি। নিরাপত্তার বিষয়টি এখনো অনেকটা পিছিয়ে। কিছুদিন আগেও আগুনে পুড়ে মারা গেছেন কয়েকজন শ্রমিক। কিছু কিছু বিষয় নারী শ্রমিকদের অবস্থান ও অধিকারের বিষয়টি দুর্বল করে তুলেছে। একজন নারী শ্রমিকের কর্মশক্তি তৈরির সুযোগ দেওয়া এবং তৈরী করা হচ্ছে না। বিশেষ করে তাদের দক্ষতা তৈরির ক্ষেত্রে।

নারী শ্রমিকের অবস্থান দৃঢ় করার জন্য তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি হওয়ার প্রয়োজন আছে। এর মাধ্যমে তিনি উচ্চ পদে যেতে পারবেন। ফলে নিজের ও অন্যদের এ পেশার প্রতি স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। দ্বিতীয়ত,এ মেয়েগুলো ৪/৫ বছর কাজ করার পরিকল্পনা থাকে। এর মাধ্যমে বাবাকে টাকা পাঠান এবং কিছু জমান নিজের বিয়ের জন্য। তারা এখনো দীর্ঘমেয়াদী তৈরী পোশাক শ্রমিক ভাবেন না। তৃতীয়ত,কারখানার কাজ এখনো নারী বান্ধব হয়নি। যেমন নারীদের প্রাপ্য ছুটি এবং বিশেষ করে মাতৃত্বকালীন ছুটি এখনো সবসময় পাচ্ছেন না। এ রকম অনেক কারণে কর্মশক্তি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।[২৪]

---

২৪. সিমীন মাহমুদ,গার্মেন্টসে নারী শ্রমিকদের অধিকার, নারী দিবস সংখ্যা, প্রথম আলো, ৮ মার্চ, ২০১০, সোমবার, পৃ. ০৪

Dhaka University Institutional Repository

এখন আসা যাক অধিকারের কথায় যেটি সম্পর্কে অধিকাংশ নারী শ্রমিক অবহিত নন। এ কারণেই তারা সংগঠিত হতে পারছেন না। অধিকার রক্ষার প্রথম পদক্ষেপ হবে অধিকার সম্পর্কে তাদের সচেতন করা। শুধু জানলেই হবে না তাদের তৈরী ও করতে হবে। যেন ঠিক জায়গায় গিয়ে সঠিকভাবে নিজেদের কথা তুলে ধরতে পারেন।

শ্রম অধিকার বলতে আমরা মূলত ব্যক্তি হিসেবে একজন মানুষের মানবিক অধিকার এবং শ্রমিক হিসাবে তার প্রাসঙ্গিক অধিকারসমূহকে বুঝি। ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘ ঘোষনাপত্র অনুযায়ী মানবাধিকার হলো সেইসব মৌলিক স্বাভাবিক অধিকারসমূহ যা হস্তান্তরযোগ্য এবং সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। জীবন নির্বাহের যৌক্তিক মান বজায় রাখা ও স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন এসব অধিকারসমূহ। আর শ্রম অধিকার এসব মানবাধিকারের অতিরিক্ত হিসেবে আরো কিছু অধিকার নির্দেশ করে যা নিরাপদ, নিশ্চিত ও সম্মানজনক কর্মজীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

এসব শ্রম অধিকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরের আইনসমূহ ও নীতিমালাতে বিশেষ স্থান ও গুরুত্ব পেয়েছে। বিশ্বায়নের এই যুগে শ্রম অধিকারসমূহকে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা (বিশেষ করে রপ্তানিমুখী খাতে) অনুভূত হচ্ছে দুটি বিপরীত ধারার সংঘাতের কারণে। একদিকে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে উদ্যোক্তারা শ্রমিকদের মূল প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে পণ্যের মূল্য যতোটা সম্ভব কমানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রম অধিকারের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হচ্ছে। অন্যদিকে যথোপযুক্ত শ্রম অধিকার রক্ষণ ব্যতিত পণ্য গ্রহণে বিশ্ব বাজারের অনীহা উদ্যোক্তাদের শ্রম অধিকারসমূহ রক্ষায় বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে,যা পণ্যের অধিক উৎপাদনমূল্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শ্রম অধিকারের প্রশ্নে এই মিশ্র বাস্তবতার ফলে বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে অধিকারসমূহ প্রয়োগ করে। এছাড়াও শ্রম অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক বিভাজন একটি অতিরিক্ত মাত্রা প্রদান করেছে। মাঝে মাঝে নারী শ্রমিকদের অধিকারসমূহ পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে লঙ্ঘিত হয়; নারীদের ক্ষেত্রে শ্রম সম্পর্কেও প্রকৃতি ভিন্ন রূপ নেয়। সুতরাং শ্রম অধিকার সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বেশ জটিল এবং পর্যাপ্ত পর্যালোচনার দাবি রাখে।

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের শ্রমবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠিত ও পরিচালিত হয় লিঙ্গভিত্তিক অর্থনীতির পরিমন্ডলেই এবং শ্রমের লৈঙ্গিক বিভাজন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে প্রতিফলিত হয়। লিঙ্গভিত্তিক শ্রম অধিকার বলতে ব্যাপক অর্থনৈকি কর্মকান্ড বোঝায়,যার মধ্যে শুধু মজুরিই অন্তভুক্ত থাকে না, থাকে বাজারভিত্তিক নানা ধরনের কর্মকান্ড। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিভিন্ন ধরনের হতে পারে,যেমন আনুষ্ঠানিক মজুরিভিত্তিক নিয়োগ, অনানুষ্ঠানিক মজুরিভিত্তিক নিয়োগ এবংপুনরূৎপাদনশীল কাজ।

শ্রম অধিকারের বিষয়ে আন্তর্জাতিক নিয়মনীতিসমূহ তৈরিতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন(ILO) মূল বা প্রাথমিক উৎস হিসাবে কাজ করে। এসব নিয়মনীতি আইএলও কনভেনশন অথবা আইএলও সুপারিশমালা হিসাবে ব্যবহৃত হয়,যাতে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতি শ্রম পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়। এসব কনভেনশনস বা সমঝোতাসমূহকে আন্তর্জাতিক চুক্তি বলা যেতে পারে,যা বিভিন্ন রাষ্ট্র অনুমোদন করে এবং পালন করতে বাধ্য থাকে। অন্যদিকে সুপারিশমালা হলো জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নে সহায়ক নির্দেশনা যা ঐচ্ছিকভাবে গ্রহণযোগ্য। এগুলো আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় পড়ে না। সুপারিশমালা কোন বিশেষ বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে এবং কখনো কখনো

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক কনভেনশনের ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য করে। কনভেনশনের ঘোষণা এবং সুপারিশমালা প্রণীত হয় সারাবিশ্বে শ্রমিক অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যেই। এ দুটি একত্রে 'আইএলও শ্রম মান 'হিসাবে পরিচিত। ১৯৯৯ সাল থেকে শুরু করে ২০০৪ সাল পর্যন্ত যথাক্রমে ১৮৫ টি কনভেনশন এবং ১৯৫ টি পরামর্শ আন্তর্জাতিক শ্রম মান-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আইএলও কনভেনশনগুলো অনুমোদন করার মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহ সেগুলোকে সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। একবার অনুমোদিত হয়ে গেলে সদস্য রাষ্ট্র সমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে এ কনভেনশনগুলোকে জাতীয় আইনপ্রনয়ণ ও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। এ কনভেনশনগুলো পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য একটি পরিদর্শন প্রক্রিয়া চালু আছে। অনুমোদিত আইএলও কনভেনশনগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেকটি রাষ্ট্র বিভিন্ন পর্যায়ে নিজস্ব আইন গ্রহণ করতে পারে।তাছাড়া একটি রাষ্টের শ্রম আইন শুধু আ্ইএল্ও কনভেনশন দ্বারা গঠিত নয়। বরং ঐ রাষ্টের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ আ্ইন ও শ্রম আইন গ্রহণ করা হতে পারে। বাংলাদেশ ২০০৫ সাল পর্যন্ত ৩৩ টি আ্ইএল্ও সুপারিশমালা অনুমোদন করেছে।[২৫] এছাড়া ও বাংলাদেশে আরো কিছু শ্রম আ্ইন ও অধ্যাদেশ চালু আছে শ্রম অধিকার সুরক্ষার জন্য। নিচে বাংলাদেশের শিল্পে প্রচলিত শ্রম অধিকার রক্ষার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় শ্রম আইন আলোচনা করা হলো।

মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষার জন্য আইনসমূহ:

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে জাতীয় শ্রম আইন ও বিধিমালা রয়েছে তাতে শ্রমিকের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে আইএলও কনভেনশনের নীতিই অনুসৃত হয়েছে। আইএলও কনভেনশনের মূল ধারাগুলো কর্মক্ষেত্রের ৪ টি মৌলিক মানবাধিকারকে ব্যাপৃত করে। এগুলো হলো–

১. সমিতি বা সংগঠন বিষয়ক স্বাধীনতা ও দর কষাকষির অধিকার (সুপারিশ নং ৮৭ ও ৯৮)
২. বাধ্যতামূলক শ্রম থেকে স্বাধীনতা (সুপারিশ নং ২৯ ও ১০৫)
৩. বৈষম্য থেকে মুক্তি (সুপারিশ নং ১০০ ও ১১১)
৪. শিশুদের শিশু শ্রম থেকে মুক্তি (সুপারিশ নং ১৩০ ও ১৮২)

এ মূল সুপারিশমালা নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

সমিতি বিষয়ক স্বাধীনতা ও মজুরি নিয়ে দর কষাকষির অধিকার:

শ্রমশিল্প বিষয়ে ইউনিয়ন গঠনের অধিকার হলো মূল ভিত্তি যা শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। আইএলও সুপারিশ নং ৮৭ অনুসারে, শ্রমিক ও মালিক উভয়ের রয়েছে পূর্ব-কতৃত্ব ছাড়াই নিজ ইচ্ছানুযায়ী সমিতি তৈরি ও তাতে যোগদানের অধিকার। কিন্তু তাদেরকে সমিতি সংক্রান্ত নিয়মগুলোকে অনুসরণ করতে হবে। সুপারিশ নং ৯৮ শ্রমিক ও মালিকদের যৌথ দর কষাকষির সুযোগ করে দিয়েছে। এ সুপারিশের আওতায় যথাযথ পরিমাণে নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে যাতে কোন পক্ষ (মালিক বা শ্রমিক) অবাঞ্ছিতভাবে সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশাসনিক বা অন্য কোনো কার্যাবলীতে হস্তক্ষেপ না করতে পারে।

---

২৫. রঞ্জন কর্মকার সম্পাদিত বাংলাদেশের রপ্তানীমুখী গার্মেন্টস সেক্টরে শ্রম পরিবেশ ও শ্রমিক অধিকার, উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, লালমাটিয়া ঢাকা-১২০৭, দশম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে নারী শ্রমজীবীদের অধিকার সম্পর্কে ধারা ২৩ (গ) তে বলা হয়েছে-প্রত্যেকেরই নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।[২৬]

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।[২৭]

মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তি শ্রমিকরা সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন;কারণ তাদের মূল শক্তি হলো সাংগঠনিক কাঠামো। সুতরাং সমিতির অধিকার শ্রমিকদের জীবনে শুধু অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গই নয়,শোষণমুক্ত জীবনের জন্য এটা প্রয়োজন। এই অধিকার কর্মীবাহিনীকে আরো বেশি পরিমাণে উৎপাদনশীল ও দক্ষ করে তোলে। কিন্তু তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের সমিতি গঠনের মৌলিক অধিকার ও যৌথ দর কষাকষির ইউনিয়ন গঠনের বিষয়টি অনেক পিছিয়ে আছে। ২০০৬ সালের ১ নভেম্বর থেকে ইপিজেড গুলোতে ইন্ডাষ্টিয়াল রিলেশনস বিল ২০০৪-এর আওতায় সীমিত পরিসরে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার প্রদান করেছে। এ আইন মোতাবেক ইপিজেডে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে হলে বাধ্যতামূলক মালিকপক্ষের অনুমতি নিতে হবে।[২৮] তৈরি পোশাক শিল্পে প্রায় ৩৯০০ টি কারখানা আছে; আর এর বিপরীতে আছে মাত্র ৫০ টি ইউনিয়ন। বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতির মতানুসারে ,দেশে মাত্র ২৪টি শ্রমিক ফেডারেশন রয়েছে;কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্যিকার অর্থে পোশাক শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে না।[২৯]

এ বিশাল পোশাক শ্রমিকরা দাবি করে যে,তারা কোনো ইউনিয়নের সদস্য নন এবং মাত্র এক শতাংশ বলে যে তাদের কারখানায় একটি ট্রেড ইউনিয়ন আছে। পোশাক শ্রমিকদের সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকারে জানা যায় যে,ইউনিয়নের কাজ করতে গিয়ে অনিকে চাকরি হারিয়েছেন। যেহেতু বলতে গেলে পোশাক শিল্পে কোনো শ্রমিক সমিতি বা ইউনিয়ন নেই,সুতরাং অবাক হওয়ার কিছু নেই যে,এক-পঞ্চমাংশের কম শ্রমিক শ্রম কোড সম্পর্কে জানে অথবা শ্রমিক হিসাবে মৌলিক অধিকার বিষয়ে তারা অবগত। ইপিজেড গুলোর অবস্থা আরো কড়া। কারণ সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের প্রত্যাশায় সেখানে ইউনিয়ন গঠন নিষিদ্ধ। সম্প্রতি মার্কিন সরকারের চাপে সীমিত ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনির বিষয়ে ছাড় দেয়া হয়েছে। কিন্তু তৈরি পোশাক শ্রমিকরা এর বিরোধিতা করেছে এবং বাধাহীন ট্রেড ইউনিয়ন করতে দেওয়ার দাবী জানিয়েছে।

দেশ বিদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে নারী শ্রমিকদের সামনে এখন অধিকতর সংগঠিত হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-এর এক গবেষণায় দেখা যায়,সম্প্রতি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলো নারী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ সাংগঠনিক নীতি গ্রহণ করেছে। প্রায় প্রতিটি ফেডারেশনে একটি নারী সেল রয়েছে এখন। গার্মেন্টস শিল্প,গৃহস্থালী কাজসহ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাতে মহিলা শ্রমিক বৃদ্ধির পাশাপাশি বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির কারণে

২৬. আলতাফ পারভেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
২৭. বাংলাদেশের সংবিধান।
২৮. উন্নয়ন পদক্ষেপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
২৯. Daily Star, সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন, ৭ মে ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সাংগঠনিক শক্তি অটুট রাখতে নারী শ্রমিকদের বেশী বেশী করে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করাই শ্রমিক সংগঠনগুলোর সামনে বর্তমানে একমাত্র বিকল্প। নারী শ্রমজীবীদের জন্য পৃথক ট্রেড ইউনিয়ন করার বিষয়টিও এক্ষেত্রে ইউনিয়ন কর্মীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এক বিতর্ক হয়ে দেখা দিয়েছে।

বাধ্যতামূলক শ্রম থেকে মুক্তি:

আইএলও সুপারিশ নং ২৯ ও ১০৫-এর আওতায় বাধ্যতামূলক শ্রমকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অবশ্য কর্মের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কিছু ব্যতিক্রম ও ধরা হয়েছে। যেমন:জাতীয় সংকট অথবা কোনো জরুরি কারণে বাধ্যতামূলক শ্রম প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-"সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনভাবে লঙ্ঘিত হইলে তাহা আইনত: দন্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গন্য হইবে"।[৩০]

বৈষম্য থেকে মুক্তি:

আইএলও সুপারিশ নং ১০০ এর মাধ্যমে সমমজুরি নিশ্চিত এবং ১১১ নং ধারায় সমযোগ্যতাসম্পন্ন সকল শ্রমিকের ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সুপারিশ অনুযায়ী মজুরি ও সামগ্রিক প্রাপ্তির বিষয়ে কোনো প্রকার লৈঙ্গিক বৈষম্য করা যাবে না। কোনো একটি বিশেষ কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের বেলায় ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অগ্রাধিকার, তাকে বিশেষ আনুকূল্যে গ্রহণ কিংবা বিরূপ হয়ে বর্জন করা যাবে না।

তৈরি পোশাক শিল্প খাতে মজুরির ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য দৃশ্যমান হলে ও এ ব্যাপারে বাস্তব আলামত খুব একটা নেই। শ্রমিক স্তরে নারীদের মজুরি পুরুষ শ্রমিকের গড় মজুরি থেকে সবসময়ই কম। অথচ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে নারী শ্রমজীবীদের অধিকার সম্পর্কে ধারা ২৩(ক)-এ বলা হয়েছে প্রত্যেকেরই কোন বৈষম্য ব্যতিরেকে সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার রয়েছে।[৩১] সাধারণত দেখা যায়,নারী শ্রমিকদেরকে কম মজুরির কর্মে নিয়োগদানের প্রবণতা রয়েছে নিয়োগকর্তাদের মাঝে। অন্যদিকে পরিদর্শক, মান নিয়ন্ত্রক বা অপেক্ষাকৃত উচ্চপদে পুরুষদের প্রাধান্য দেয়া হয়। এ নিয়োগসমূহ স্থায়ী এবং এক্ষেত্রে নিয়োগপত্র ও দেয়া হয়।

শিশু শ্রম থেকে মুক্তি:

আইএলও সুপারিশ নং ১৩৮ ও ১৮২ অনুযায়ী শিশুদের চাকরিতে নিয়োগদান নিষিদ্ধ। এই সুপারিশ অনুসারে ১৫ বছরের কম বয়সী যে কোনো মানবসন্তান শিশু হিসেবে বিবেচিত হবে। অবশ্য কোনো রাষ্ট্র শিক্ষার সুযোগ সুবিধা ঘাটতি থাকলে এই বয়স সীমার হেরফের হতে পারে। সেক্ষেত্রে ১৪ বছর না হলে যে কাউকে শিশু হিসেবে বিবেচনা করা হবে। কোনো প্রকার স্বাস্থ্যগত বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে এমন কর্মে এমন কর্মে নিযুক্তির বয়সসীমা কমপক্ষে ১৮ বছর। এ ধরনের কাজে শিশুশ্রমকে নিকৃষ্ট পর্যায়ের শ্রম বলে গণ্য করা হবে। ১৩ থেকে ১৫ বয়সী শিশুদের হালকা কাজে নিযুক্ত করা যাবে।

---

৩০. বাংলাদেশ সংবিধান।

৩১. আলতাফ পারভেজ, প্রাগুক্ত,পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে শিশুশ্রমকে নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করা হয়েছে। ১৯৬৫ সালের ফ্যাক্টরি আইন অনুসারে ১৪ বছরের নিচের কোনো শিশুকে ক্যাক্টরিতে নিয়োগ করা যাবে না। এ আইনে আরো বলা হয়েছে,শিশু ও কিশোরদেরকে দিনে ৫ ঘন্টার জন্য কাজে নিয়োগ করা যাবে এবং কার্য সময় হবে সকাল ৭ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টার মধ্যে। আইন অনুসারে এ আইন লঙ্ঘনের শাস্তি সবেক্ষার্চ এক হাজার টাকা পরিমাণ পর্যন্ত জরিমানা। শিশু নিয়োগ আইন ১৯৩৮(১৯৭৪ সালে সংশোধিত) ১৪ বছরের নিচে কোনো শিশুকে ক্যাক্টরিতে নিয়োগ নিষিদ্ধ করেছে। অন্যান্য আইনের মধ্যে দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন ১৮৬৫,শিশু আইন ১৯৭৪ এবং শিশু বিধি ১৯৭৬ শিশু শ্রমকে নিষিদ্ধ করেছে।

অথচ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প খাতের সূচনা থেকেই সকল প্রকার আইনগত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও শিশু শ্রম একটি সাধারন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে স্থানীয় কর্মীদের বেশ বড় একটা অংশ যে শিশু শ্রমিক তা বোধহয় এখন তেমন বিস্ময়কর তথ্য নয়। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়,১৯৯০ সালের দিকে মোট শ্রমিকের মধ্যে ১৩ শতাংশ হলো শিশু এবং তার বিরাট একটি অংশ হলো নারীশিশু। পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রচন্ড চাপে তৈরি পোশাক শিল্প থেকে শিশুশ্রম বর্জন করা হয়েছে। সর্বনিম্ন পর্যায়ের শিশুশ্রম বর্জন করার জন্য ১৯৯২ সালে মার্কিন সিনেটে 'শিশুশ্রম নিরোধ আইন' উত্থাপিত হয়। হারকিনস বিলের সহায়তায় মার্কিন শ্রম ও ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণকারী সংগঠনগুলো বাংলাদেশে তৈরি পণ্যসমূহ বর্জনের হুমকি দেয়। ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে পোশাক শিল্প উদ্যোক্তা ও রপ্তানিকারকগণ বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে আইএলও এবং ইউনিসেফের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করে,যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো তৈরি পোশাক শিল্পে শিশুশ্রম বন্ধ করা।[৩২]

আনুষ্ঠানিক অধিকারসমূহ

নিয়োগের ক্ষেত্রে শ্রমিকের আনুষ্ঠানিক অধিকার হলো মৌলিক বিধি। এসব অধিকার চাকরির নিরাপত্তা,নিয়মিত মজুরি প্রদান এবং উপযুক্ত কাজের শর্তের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

চাকরির নিয়োগপত্রঃ

একজন শ্রমিকের সবচাইতে আনুষ্ঠানিক অধিকার হলো একটি লিখিত চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপত্র। অন্যান্য অধিকার বাস্তবায়িত হবে কি না তা নির্ভও করে চুক্তিপত্রে লিখিত শর্তাবলীর উপর। দু:খের বিষয় হলো বাংলাদেশে এ ধরনের কোনো আইন চালু নেই।

১৯৬৫ সালের ফ্যাক্টরি আইনে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে যে,প্রত্যেক কারখানা শ্রমিক নিবন্ধন করবে,শ্রমিকদেরকে পরিচয়পত্র প্রদান এবং হাজিরা টিকিটের ব্যবস্থা করবে । কিন্তু বাংলাদেশে অধিকাংশ পোশাক কারখানায় শ্রমিকরা চাকরির নিয়োগপত্র পায় না বা নিয়োগ চুক্তি করতে পারে না। এর পরিবর্তে প্রত্যহ উপস্থিতি কার্ড,একটি পরিচয়পত্র এবং গেটপাস পেয়ে থাকে। তারা একটি উপস্থিতি বই ও পেয়ে থাকে যেখানে তাদের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়।

পোশাকশিল্প শ্রমিক সমর্থিত কিছু ট্রেড ইউনিয়ন অনেকদিন ধরেই শ্রমিকদের জন্য চাকরির নিয়োগপত্রের দাবি জানিয়ে আসছে। এ বিষয়ে বিজিএমইএ-২০০২ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি।

---

৩২. উন্নয়ন পদক্ষেপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

লিখিত চুক্তিপত্রের অভাবে অধিকাংশ শ্রমিক অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হয় এবং এর ফলে কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক আকারে ওলটপালট হয়ে থাকে। আবার নিয়োগপত্রের অভাবে শ্রমিকদের চাকরি তিন মাসের মধ্যে আইন অনুসারে স্থায়ী করা যায় না। তাছাড়া শ্রমিকগণ ও তাদের ন্যায্য মজুরি ও অতিরিক্ত কাজের মজুরি দাবি করতে পারে না। পোশাকশিল্পে মাত্র ৮ শতাংশ নারী শ্রমিক তাদের চাকরি স্থায়ীকরণের মর্যাদা ভোগ করে;অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে ইপিজেডের মধ্যে অবস্থিত কারখানাগুলোতে ৩০ শতাংশের ও বেশি নারী শ্রমিক স্থায়ীভাবে নিযুক্ত।[৩৩]

কাজের সময়ঃ

দীর্ঘস্থায়ী কাজ শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও পরিবার জীবনে ব্যাপক বিরূপ প্রভাব ফেলে। এই প্রভাব বিশেষ করে বেশি পড়ে নারী শ্রমিকের ক্ষেত্রে,যারা কারখানার কাজের বাইরেও অনেক গার্হস্থ কর্ম সম্পাদন করে থাকে। আইইএলও সুপারিশ নং ১ অনুসারে কোনো রাষ্ট্রায়াত্ত বা ব্যক্তি মালিকাধীন শিল্পে শ্রমিকের কাজের সময়সীমা কোনক্রমেই দিনে ৮ ঘন্টা এবং সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার উর্ধ্বে যাবে না। ১৯৬৫ সালের ফ্যাক্টরি আইন অনুসারে সপ্তাহে শ্রমিকের কার্য সময়কাল হলো ৪৮ ঘন্টা।যদি অতিরিক্ত মজুরির সম্ভাবনা থাকে তবে প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক দিনে নির্ধারিত সময়ের বেশি কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত মজুরির পরিমাণ হবে স্বাভাবিক মজুরির তুলনায় দ্বিগুণ। সার্বিকভাবে একজন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক কোনো ক্রমেই সপ্তাহে ৬০ ঘন্টার বেশি বা বছরে ২ হাজার ৯১২ঘন্টার বেশি কাজ করতে পারবে না।

অথচ বাংলাদেশে পোশাক শিল্প খাতে শ্রমিকরা দিনে ১২ ঘন্টার মতো কাজ কওে থাকে। এর সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের ওভারটাইম ও করতে হয়। শ্রমিকদের একটি বিশাল অংশ কোনো ছুটি ছাড়াই পুরো মাস কাজ করে থাকেন।[৩৪]

সপ্তাহিক বিশ্রাম এবং অনিয়মিত অবকাশঃ

আইএলও সুপারিশ নং ১৪-এ শিল্প শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ছুটির অধিকার প্রদান করেছে। এই সুপারিশে বিশ্রামের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, শিল্প শ্রমিকরা প্রতি সাতদিন অন্তর বিশ্রাম পাবে এবং বিশ্রামের সময়কাল হবে কমপক্ষে একটানা ২৪ ঘন্টা। কারখানা আইন ১৯৬৫ অনুসারে সপ্তাহে একটি পূর্ণদিন অবকাশ থাকবে। যদি কোনো জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে নির্ধারিত দিনের পরিবর্তে অন্য আরেকদিন অবকাশকালীন ছুটি হিসাবে গণ্য হবে এবং কখনোই টানা ১০ দিনের বেশি শ্রমিকরা কাজ করবেন না। প্রত্যেক শ্রমিককে প্রতি বছর উৎসব ভাতাসহ কমপক্ষে ১০ দিনের উৎসবকালীন অবকাশ প্রদান করতে হবে।

ন্যূনতম মজুরিঃ

শিল্প ও পেশার ধরণ অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরি ও কর্মকাল নির্ধারণের জন্য বিধিমালা রয়েছে। ন্যূনতম মজুরি বলতে সেই উপযুক্ত মজুরিকে বোঝায় যা মৌলিক চাহিদাসমূহ যেমন-খাদ্য,পুষ্টি,চিকিৎসা,উপযুক্ত আবাসন ইত্যাদি নিশ্চিত করে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও নিয়োগ সংক্রান্ত মন্ত্রণালয় একটি ন্যূনতম মজুরি কমিশন গঠন করেছে। ২০০৬ সালের ন্যূনতম মজুরি

৩৩. উন্নয়ন পদক্ষেপ, প্রাগুক্ত,পৃ. ৫০

৩৪. Syeda Sharmin Absar,Problem Sorrounding Wages: The Readymade Garments Sector in Bangladesh, Asia Pacific Press 2001, Volume-2, Number-7, P. 06

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাদেশ অনুযায়ী একজন হেলপারের ন্যূনতম মাসিক মজুরি ধরা হয়েছে ১৬৬২ টাকা।[৩৫] দক্ষ শ্রমিকের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরির পরিমাণ ৫১৪০ টাকা।[৩৬]

নিয়মিত মজুরি প্রদান:

কারখানা আইন-১৯৬৫ অনুসারে সকল কারখানা,যেগুলোর শ্রমিক সংখ্যা ১ হাজারের কম,সেগুলোর অবশ্যই শ্রমিকদের নিয়মিত মজুরি প্রদান করবে এবং তা প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যেই।

অনানুষ্ঠানিক অধিকারসমূহ:

আনুষ্ঠানিক অধিকারসমূহ ছাড়াও শ্রম আইন আরো কিছু অধিকারকে সংযুক্ত ও সমন্বয় করে,যা কর্মজীবনের মান নিশ্চিত করে,কর্মের পরিবেশ ও নিয়োগের নিরাপত্তা বিধান করে। কর্মের পরিবেশ শ্রমিকের স্বাচ্ছন্দ্য, দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

কারখানায় অবকাঠামোগত পরিবেশ:

১৯৬৫ সালে প্রণীত কারখানা আইন পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মান নির্ধারণ করেছে। এ আইনানুযায়ী কারখানা ভবনের অবকাঠামো নিরাপদ হতে হবে; আগুন নিয়ন্ত্রণ ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা বিধানের জন্য উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। প্রতিটি কারখানায় অগ্নি সাংকেতিক যন্ত্র,অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা দ্বারা সমৃদ্ধ করতে হবে এবং অগ্নি নির্বাপণ মহড়া নিয়মিত পরিচালনা করতে হবে।

'কারখানা আইন ১৯৬৫' এবং 'কারখানা নিয়মাবলী ১৯৬৯'- উভয় অনুযায়ী সকল কারখানায় পর্যাপ্ত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা,বায়ু প্রবাহ ও স্বাস্থ্যানুকূল তাপমাত্রা,আলো,খাবার পানি ও ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। 'কারখানা আইন ১৯৬৫' ও 'কারখানা নিয়মাবলী ১৯৭৯'-তে প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা ও যান্ত্রিক সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে। প্রতি ১৫০ জন শ্রমিকের জন্য একটি প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স থাকবে। ১৯৭৯ সালের নিয়মাবলীর আওতায় আরো বলা হয়েছে,কারখানায় একজন দক্ষ ও যোগ্য নার্স, যোগ্য ডাক্তার,অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ও ডিসপেনসারি থাকবে। এছাড়া একটি রুম থাকবে,যেখানে অসুস্থ শ্রমিকরা বিশ্রাম নিতে পারে।

আবাসন, যাতায়ত ও পয়:নিষ্কাসন সুবিধাসমূহ:

পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত আবাসন ও নিরাপদ যাতায়ত ব্যবস্থা শ্রমিকদেও সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতার জন্য দু'টি মৌলিক শর্ত এবং এগুলো পূরণ হওয়া জরুরি। শতকরা ৭৭ ভাগ নারী শ্রমিক অস্থায়ী ভিত্তিতে বসবাস করে। তাদেও বাসস্থানগুলো নিচু ও সর্বদাই স্যাঁতস্যাঁতে ও বদ্ধ থাকে এবং এগুলোর চারপাশে নোংরা পরিবেশ বিরাজ করে। ২০ থেকে ৪০ জন শ্রমিক যৌথভাবে একটিমাত্র টয়লেট ব্যবহার করে ও সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি সরবরাহ করা হয় না। ৭৫ শতাংশ নারী শ্রমিক যৌন নিপীড়নের শিকার হয় নিরাপদ যাতায়ত ব্যবস্থা ও বাসস্থানের অভাবে। নারী শ্রকিরা কারখানায় যাতায়তের পথে শুধু নিপীড়নেরই শিকার হয় না,ধর্ষিত ও হয়।[৩৭]

---

৩৫. অবলা,কর্মজীবী নারী,৩/৬ সেগুনবাগিচা ঢাকা-১০০০,আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিসিং কোং,অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ২৪

৩৬. অবলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৩৭. উন্নয়ন পদক্ষেপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

রাত্রিকালীন শ্রমঃ

নিরাপত্তাজনিত কারণে আইএলও কনভেনশন ৮৯ নারী শ্রমিকদের রাত্রিকালীন শ্রমের জন্য নিয়োগ নিষিদ্ধ করেছে এবং বাংলাদেশ এই সুপারিশটি অনুমোদন করেছে। তাছাড়া প্রত্যেক কর্মচারীর রাতে বিশ্রাম নেয়ার অধিকার আছে।

অস্বাভাবিক ঘটনাবলি বিষয়েঃ

অস্বাভাবিক অবস্থা যেমন অসুস্থতা,পঙ্গুত্ব,কর্মকালীন আঘাত,বেকারত্ব ইত্যাদি সময়ে নিয়োগকর্তার কাছে সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে। আইএল্ও সুপারিশ নং ১৯-এ বিপদকালীন ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ব্যাপারে সবার ক্ষেত্রে সমপ্রয়োগের সুপারিশ করেছে। বাংলাদেশে বেশ কিছু আইন ও নিয়মাবলী আছে যা দুর্ঘটনা বা অস্বাভাবিক ঘটনার ক্ষেত্রে শ্রম ক্ষতিপূরণ পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে। মহিলা ক্ষতিপূরণ আইন ১৯২৩,শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন ১৯২৪,ভয়াবহ/মারাত্মক দুর্ঘটনা বিষয়ক আইন-১৯৫৫ এবং শ্রমিক রক্ষা আইন ১৯৩৮ ইত্যাদি আইনসমূহ উপরোক্ত নিশ্চয়তা দান করে।[৩৮]

পুনরুৎপাদনশীল জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিকারসমূহঃ

এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে,আইনগত বিধান থাকা সত্ত্বেও খুব কম নারী শ্রমিক মাতৃত্বকালীন অবকাশ ভোগ করতে পারেন এবং অধিকাংশ তৈরি পোশাক খাতের বিভিন্ন কারখানা ও শ্রমিকদের উপর সমীক্ষা চালিয়ে পাওয়া শ্রমিক অধিকারের বাস্তবচিত্র নিচে দেয়া হলো:

ক. শ্রমিক অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কারখানাগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে;কিছু ভালো কারখানা আছে যেখানে অধিকারসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয়।

খ. অধিকাংশ শ্রমিকেরই আইন ও বিধি মোতাবেক অধিকার সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।

গ. শ্রমিকরা অনেকেই নিয়োপত্র পায় না। বেশ কিছু ঘটনা পরিলক্ষিত হয় যেখানে তারা কোনো আগাম নোটিশ ছাড়াই চাকরি হারিয়েছেন।

ঘ. ক্রেতাদেও পরামর্শমতো মজুরি প্রদান করা হয় না। পুরুষ ও মহিলাদের মজুরিতে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

ঙ. নিয়মানুযায়ী শ্রমিকরা অতিরিক্ত কাজের ভাতা পায় না। তারা সরকারি ছুটিও পায় না। অনেক সময় অসুস্থকালীন অবকাশ তারা পায় না।

চ. খুব কম নারীশ্রমিক মাতৃত্বকালীন ছুটি পান,তবে আইন অনুযায়ী প্রাপ্য ছুটির চেয়ে তারা কম ছুটি পেয়ে থাকেন।

ছ. কারখানাসমূহে কাজের পরিবেশ নিম্নমানের।পর্যাপ্ত পরিমাণ টয়লেট,শিশুযত্ন কেন্দ্র ও বিশ্রাম কক্ষের অভাব রয়েছে।

জ. অধিকাংশ শ্রমিক শ্রম ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত নন। জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত শ্রমিক আন্দোলন ও সমাবেশে তারা মাঝে মধ্যে অংশগ্রহণ করেন।

---

৩৮. উন্নয়ন পদক্ষেপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

ঝ. শ্রমিকদের মতে মূলত ক্রেতাদের চাপেই নিয়োগকর্তারা তাদের অধিকারসমূহ বাস্তবায়ন করে থাকেন।

ঞ.অধিকাংশ পোশাক শিল্প কারখানায় স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তার নিযুক্ত আছেন; কিন্তু কোথাও অসুস্থ শ্রমিক পরিবহনের জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা নেই।

বাংলাদেশের নতুন শ্রম আইন ২০০৬: শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা হয়নি[৩৯]

ব্রিটিশ আমল থেকেই শ্রমিকদের জন্য শ্রম আইন তৈরি হওয়া শুরু হয়। পাকিশস্তানি আমলে শ্রমিকদেও স্বার্থ রক্ষায় অনেকগুলি আইন তৈরি হলেও এর পরে আর কোন আইন প্রণয়ন হয়নি। সময় বদলেছে,জীবন যাত্রায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু শ্রম আইনের কোন পরিবর্তন হয়নি।

শ্রমিক স্বার্থে যারা কাজ করেন তাদেও দাবীর মুখে ১৯৯২ সালে 'জাতীয় শ্রম আইন কমিশন' গঠিত হয়। তাদের দাবী ছিল সময়ের সাথে তাল রেখে একটি নতুন শ্রম আইন প্রণয়নের। মালিক ও সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনার পর 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬'নামে নতুন শ্রম আইন ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখে জাতীয় সংসদে পাশ হয়। কিন্তু শ্রমিকদের সমস্যার কথা বিবেচনা করে এই আইনটি প্রণীত হলেও বাস্তবে এই আইনের কিছু কিছু আইন শ্রমিকদের বিপক্ষে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ পাশ হওয়ার পরও অনেকেই বলেছেন,শ্রম আইনের দুর্বলতাগুলো দূর করার জন্য প্রয়োজন ছিল শ্রম আইনের মৌলিক ও গুণগত কিছু পরিবর্তন। এই অবস্থায় শ্রমিক ও সংশ্লিষ্টদের করণীয় বিষয়ে কর্মজীবী নারী ৫ অক্টোবর ২০০৬ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬' নামে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। এতে জাতীয় ঐক্যমঞ্চের নেতা ড.কামাল হোসেন,শাজাহান খান এমপি, শ্রমিক নেতা শফিকুর রহমান মজুমদার,জাতীয় নারী জোটের আহবায়ক আফরোজা হক রীনাসহ আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন।

ড. কামাল হেড়সেন বলেন,শ্রমিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি সমন্বিত আইন প্রয়োজন । কিন্তু সরকার তড়িগড়ি করে আইন পাস করেছে বলে এ আইনে ত্রম্নটি রয়ে গেছে।

আফরোজা হক রীনা বলেন,এ আইন পাস হওয়ার আগে সর্বসাধারনের সাথে আলোচনা করা উচিত ছিল। আইনে মালিকদের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

কর্মজীবী নারী মনে করে শ্রমিকের কর্মঘন্টা, সাপ্তাহিক ছুটি ও বাৎসরিক ছুটি,উৎসব ও অসুস্থতা ছুটি, ন্যূনতম মজুরি,নিরাপদ কর্মসংস্থান ও কারখানা ভবন,মাতৃত্বকালীন ছুটি,শিশু যত্ন কেন্দ্র এবং কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রগণ এইসব আইনগুলির বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক না হলে কোন শ্রমিকই দীর্ঘ সময় শ্রমিক হিসেবে টিকে থাকতে পারবে না।

নতুন শ্রম আইনে শ্রমিকের ভাল দিক ও মন্দ দিক:[৪০]

নিয়োগ ও চাকুরি বিষয়ক

ভাল দিক:

নতুন শ্রম আইন অনুযায়ী কোন মালিক শ্রমিক নিয়োগ করা মাত্রই তাকে নিয়োগপত্র ও ছবিসহ পরিচয়পত্র দেবেন। আইনের এই ধারা বাস্তবায়ন হলে গামেন্টস ও অন্যান্য খাতের শ্রমিকগণ সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে এবং মালিক শ্রমিকের অধিকার না মানলে এই আইন শ্রমিকের অধিকার রক্ষার সহায়ক হিসাবে কাজ করবে।

---

৩৯. অবলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৪০. অবলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭ – ২৯

Dhaka University Institutional Repository

মন্দ দিক:

নতুন আইনের ২৭ (১) ধারায় বলা হয়েছে, শ্রমিককে চাকুরি ছাড়ার ৬০ দিন আগে নোটিশ দিতে হবে। পূর্বেও আইনে এটা ছিল এক মাস। নতুন আইন অনুযায়ী , ৬০ দিন আগে নোটিশ না দিলে শ্রমিককে ৬০ দিনের মজুরি মালিককে ফেরত দিতে হবে।

মাতৃত্বকল্যাণ আইন

ভাল দিক:

এই আইনে নারী শ্রমিকদের জন্য ১৬ সপ্তাহের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধার অধিকার দেয়া হয়েছে। অবশ্য ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস করার ঘোষণা দিয়েছেন।

মন্দ দিক:

মালিকদের জন্য আইনগত ছাড়ের সবচেয়ে বিস্ময়কর উদাহরণ হলো-নারীদের ১৬ সপ্তাহের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা না দেয়ার শাস্তি রাখা হয়েছে মাত্র পাঁচ হাজার টাকার অর্থদন্ড। এর ফলে, বাংলাদেশে কোন কারখানা মালিক আর নারী শ্রমিকদেরকে মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা দেবে না বরং তারা ৫ হাজার টাকা অর্থদন্ডই দেবেন। কারণ চার মাসের ছুটি দেয়ার চেয়ে ৫ হাজার টাকা জরিমানা দেয়াই মালিকপক্ষের জন্য লাভজনক।

শিশু যত্ন কেন্দ্র আইন

ভাল দিক:

নতুন আইনে বলা হয়েছে, যে কারখানায় ৪০ জনের অধিক নারীশ্রমিক রয়েছে সেই কানখানায় এক বা একাধিক শিশুযত্ন কেন্দ্র থাকতে হবে।

কল্যাণমূলক আইন

ভাল দিক:

১. এখন থেকে যে কারখানায় ২০০ শ্রমিক থাকবে সেখানে শ্রমিকদেও জন্য গ্রুপ বীমা চালু থাকবে।

২. এ আইনের ২৬৪ নং ধারায় ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানেও ভবিষ্যত তহবিল গঠনের বিধান করা হয়েছে।

ক্ষতিপূরণ আইন

ভাল দিক:

নতুন আইনে দুর্ঘটনার শিকার শিল্প শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের টাকা বাড়ানো হয়েছে। নতুন আইনে বিধান করা হয়েছে, এখন থেকে দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকের পরিবার ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাবে এক লাখ টাকা। আর আহত শ্রমিক দুর্ঘটনার কারণে আজীবন শারিরীকভাবে কাজ করতে অক্ষম হলে পাবেন এক লাখ ২৫ হাজার টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্ঘটনা আইন

মন্দ দিক:

২০০৫ সালের এপ্রিলে সাভাওে স্পেকট্রাম গার্মেন্টস ধক্কসে ৭৭ জন শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা আমরা ভুলি নাই। ঘটনার তদন্তে বলা হয়েছে এই ঘটনার জন্য মালিকের অবহেলাই দায়ী এবং এই মৃত্যু আসলে হত্যাতুল্য। এ ধরনের অবহেলার জন্য এবং নির্মাণ আইন লঙ্ঘনের জন্য শ্রম আইনে মালিক বা সংশ্লিষ্টদের জন্য শাস্তির বিধান করা হয়েছে মাত্র চার বছরের কারাদন্ড। যেখানে এসিড নিক্ষেপের জন্য শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড-সেখানে একজন কারখানা মালিকের সচেতন অবহেলায় শ্রমিকের মৃত্যুর জন্য শাস্তি মাত্র চার বছরের কারাদন্ড- যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

অগ্নিদুর্ঘটনা আইন

মন্দ দিক:

১৯৬৫ সালের কারখানা আইন সংশ্লিষ্ট বিধিমালার ৫১ (৪) ধারায় অগ্নিকান্ডের সময় পালানোর জন্য প্রতি তলা থেকে নিচে নেমে আসার পৃথক সিঁড়ির জন্য বিধান ছিল। যা গার্মেন্টস কারখানার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান আইনে ৬২ (১) ধারায় বিকল্প সিঁড়ির বিধানে পৃথক সিঁড়ির ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

ছুটি সংক্রান্ত আইন

ভাল দিক:

নতুন আইনে বেতনসহ উৎসব ছুটি করা হয়েছে ১১ দিন।

মজুরি সংক্রান্ত আইন

ভাল দিক:

মজুরি নির্ধারণ পদ্ধতিও কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন থেকে বিভিন্ন সেক্টরের মজুরি ৫ বছর পর পর পুন:নির্ধারিত হবে। এছাড়া মজুরি নির্ধারণের সময় জীবনযাপনের ব্যয়,আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদিও বিবেচনার কথা বলা হয়েছে আইনে।

মন্দ দিক:

আইনে যে দুর্বলতার কারণে বিভিন্ন শ্রম ক্েশত্রে বছরের পর বছর নিম্নতম মজুরি নির্ধারিত হয় না তা দূরীভূত করা হয়নি।

ছাঁটাই

মন্দ দিক:

বেআইনী চাঁটাই, ডিসচার্জ, বরখাস্ত, শ্রমিক অপসারণ ইত্যাদির জন্য মালিকের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতের রায় অমান্যের শাস্তি রাখা হয়েছে তিন মাসের কারাদন্ড বা ৫ হাজার টাকা জরিমানা। অথচ কোন শ্রমিক বেআইনী ধর্মঘটের পক্ষে গেলে তার জন্য শাস্তি রাখা হয়েছে এক বছর কারাদন্ড।

Dhaka University Institutional Repository

ট্রেড ইউনিয়ন ও শিল্প সংশ্লিষ্ট আইন

মন্দ দিক:

১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ এর ৪৭ (খ) ধারায় ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি বা সম্পাদককে তাদেও সম্মতি ছাড়া বদলি না করার বিধান ছিল। কিন্তু নতুন াইনের ১৮৭ ধারায় একই জেলার অভ্যন্তরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বদলির বিধান রাখা হয়েছে। এর ফলে ট্রেড ইউনিয়ন গুলোর শক্তি কমে যাবে। কোন নেতা শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে সোচ্ছার হয়েই তাকে অন্যত্র বদলি করে দেয়া হবে।

বাংলাদেশর শীর্ষ রপ্তানীমুখী শিল্প হিসেবে তৈরি পোশাক শিল্পের সাফল্যের জন্য হাজার হাজার 'সস্তা' শ্রমিকের ক্লান্তি ও শান্তিহীন শ্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু সস্তা শ্রমিক হওয়ার মানে এই নয় যে,তারা মৌলিক মানবাধিকার ও শ্রমিকের প্রাপ্য অধিকার ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হবে। যদিও বাংলাদেশ আইএলও সম্পাদিত বেশ কিছু অনুমোদন করেনি, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতীয় প্রচলিত আইনসমূহ এ অধিকারসমূহকে রক্ষা করেছে। যেমন ন্যূনতম মজুরি বিষয়ে আইএলও বিধানকে অনুমোদন করেনি বাংলাদেশ, প্রচলিত জাতীয় আইন এ অধিকারকে সংরক্ষণ করছে।

বিশ্বায়নের চাপে সমগ্র বিশ্ব আরো প্রতিযোগিতাময় হয়ে উঠেছে এবং টিকে থাকার জন্য মানসম্পন্ন পণ্য এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণ জরুরি হয়ে পড়েছে। এর ফলে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির ও প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে কারখানার ভালো কাজের পরিবেশ এবং ভালো মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তৈরি পোশাকশিল্প খাতে শ্রম অধিকারসমূহের যথাযথ সংরক্ষণ এ খাতে শ্রম সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে পারে এবং একই সঙ্গে বৃদ্ধি করতে পারে উৎপাদনের পরিমাণ ও মাত্রা।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামে শ্রম ও কর্মসংস্থান নীতিতে নারীর অবস্থান

* ইসলামে শ্রম ও শ্রমের প্রকারভেদ
* শ্রম ও শ্রমিক বিষয়ক মতবাদ
* ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা
* ইসলামে শ্রম নীতির উৎস
* ইসলামে শ্রম নীতির বৈশিষ্ট্য
* ইসলামে শ্রমনীতির তাৎপর্য
* কর্মী সংগ্রহ, নির্বাচন ও কর্মসংস্থান
* শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন
* মজুরী নির্ধারণ
* ইসলামিক দৃষ্টিতে শ্রমিক মালিক সম্পর্ক
* শ্রমিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
* শ্রমিকের অধিকার
* ইসলামের দৃষ্টিতে নারীদের কর্মসংস্থান

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে শ্রম ও শ্রমিক:

শ্রম স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে উৎপাদনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শ্রম ব্যতীত উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ নিঃশ্চল-শ্রমই পারে তাদের গতিশীলতা দান করতে। শ্রমশক্তির দক্ষতা ও নৈপুণ্যের ওপর অবশিষ্ট উপকরণসমূহের অবদান নির্ভর করে। এই শ্রমকে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন।

আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক মার্শালের মতে শ্রম হল, "মানসিক বা শারীরিক যে কোন প্রকারের পরিশ্রম যা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে আনন্দ ছাড়া অন্য কোন উপকারের নিমিত্ত প্রদান করা হয়।"[১] অর্থাৎ অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন পরিশ্রম এইরূপ ক্ষেত্রে শ্রম বলে বিবেচিত হয়না। যেমন: সন্তান-সন্ততি প্রতিপালনে পিতা-মাতার পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার শ্রমের আওতায় পড়ে না। পক্ষান্তরে শাশ্বত জীবন বিধান ইসলামে শ্রম অত্যন্ত ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ নশ্বর পৃথিবীতে আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে সুনির্দিষ্ট কতকগুলো কার্যের দায়িত্বসহ সৃজন করেছেন। প্রতিটি বিশ্বাসী মানুষ উৎপাদনশীল ও মানবতার স্বার্থে কল্যাণকর কাজে রত থাকার জন্যই আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। পৃথিবীতে প্রেরণের প্রাক্কালে আল্লাহ মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'পৃথিবীই তোমাদের আবাসস্থল এবং ধারণোপযোগী উপায়-উপকরণসমূহ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ভোগ করতে পারবে।'[২] আর পৃথিবীর প্রতিটি কর্মের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জবাবদিহি করতে হবে এবং ভাল ও খারাপ কাজের বিনিময় দেয়া হবে, আর তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন।[৩] অর্থাৎ মানুষের কোন কর্মই সেদিন ব্যর্থ হবে না। প্রতিটি ব্যক্তি যে কাজে যে পরিমাণ শ্রম বিনিয়োগ করবে যথোপযুক্তরূপে তার বিনিময় প্রদান করা হবে। আল্লাহ কাউকে তার পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করবেন না। আল্লাহ আরো বলেন, 'তারপর সেদিন (শেষ বিচারের দিন) পৃথিবীতে প্রদত্ত সব নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'[৪] এছাড়া আরো কি প্রশ্ন করা হবে সে সম্পর্কেও হাদিসে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। এ থেকেই বুঝা যায় যে, সকল কার্যে মানুষের শ্রম বা উৎপাদিকা শক্তির এক বিরাট অবদান রয়েছে। এইরূপে ইসলামে বস্তুগত ও নৈতিক দিকসমূহ বিবেচনা সাপেক্ষে শ্রমকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

ফিকাহর পরিভাষায় শ্রমিকদের বুঝানোর জন্য 'আযীর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে মজুরীর বিনিময়ে শ্রম বিক্রয়কারী মাত্রই শ্রমিক হিসাবে বিবেচিত। ফলে রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী, আমলা, বিচারক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষক সকলেই শ্রমিক। বিশেষায়ণের (Specialisation) বিভিন্নতা সত্ত্বেও ইসলামে সমগ্র সমাজই শ্রমিক সমন্বয়ে গঠিত। অন্য কথায় কায়িক শ্রমে নিয়োজিত মজুর, উদ্যোক্তা, শিল্পী, শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, সকলেই শ্রমিক সম্পর্কিত ধারণার অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী সমাজ যে প্রকৃতপক্ষেই একটি শ্রেণীহীন সমাজ এই দৃশ্যমানতা এর ভিত্তিমূল বিশ্লেষণ করে।[৫] শ্রম ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভুত আয়ের ভিত্তিতে ফিকাহ্ শাস্ত্র অনুযায়ী শ্রম ধারণাকে দুইভাগে বিশ্লেষণ করা যায়। যথা: (১) আযীর আল মুশ্‌তারাক্ এবং (২) আযীর আল্ হাস্।

আযীর আল্ মুশ্‌তারাক্ বলতে ঐ সকল শ্রমিককে বুঝায় যারা কোন শ্রম দান অথবা নির্দিষ্ট কোন পণ্য উৎপাদনের বিনিময়ে মজুরী লাভ করে থাকে। যেমন দর্জি, মুচি, মুঝারাআত ও মুশাকাত (শ্রম জমি ও বৃক্ষ অংশীদারী), ইত্যাদিতে নিয়োজিত ব্যক্তি যে মুশ্‌তারাকের অন্তর্ভুক্ত।

---

১. মুহাম্মদ ফেরদৌস কোরেশী, 'ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কিত ধারণা' মাসিক পৃথিবী, আগষ্ট-১৯৮৮, পৃ. ১৭
২. আল-কুরআন, পৃ. ২:৩৬
৩. আল-কুরআন, পৃ. ৭ – ৮
৪. আল-কুরআন, পৃ. ৮
৫. মুহাম্মদ ফেরদৌস কোরেশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

সেই দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পী, গায়ক, দোকানদার যাদের সেবা সকলের জন্য উন্মুক্ত এবং স্বাধীন পেশাজীবী যেমন-চিকিৎসক ও আইনজীবী এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। একই সময়ে তারা নিয়োগকারীও হতে পারেন যদি তার নিজেদের কারবারে অন্য কোন শ্রমিক নিয়োগ করেন।[৬]

পক্ষান্তরে আযীর আল্ হাস্ হল ঐ ধরণের শ্রমিক যারা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করে। এদের মজুরী শ্রম-ঘন্টা, দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে পরিশোধ করা হয়। প্রচলিত পশ্চিমা ধারণা মতে শ্রম বলতে আযীর আল্ হাস্কে বুঝানো দোকানদার কর্তৃক সম্পাদিত শ্রমকেও বুঝায়। আফ্দ/আল্ ইজারা (ভাড়ার চুক্তি) একটি বিধি হিসাবে পরিগণিত, যা নিয়োগকারী ও নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিফলনের ওপর নির্ভর করে এবং যা একটি লেনদেনের সম্পর্ক সৃষ্টি করে।[৭]

ইসলামে একটি উন্নত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বিধান রয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রম যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ কাজ এবং অলসতাকে ইসলাম ঘৃণা করে। চিরাচরিত ব্যবস্থায় (বিশেষভাবে পুঁজিবাদে) শ্রমিকের শ্রমকে পণ্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক F.W.Taylor নিজেও শ্রমিককে অর্থনৈতিক মানুষ (Economic man) হিসাবে দেখিয়েছেন। কিন্তু ইসলামে মানুষের মন-মগজ ও দৈহিক শ্রম অন্যান্য সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মত কোন জিনিস নয়। তাই এর কোন মূল্য বা বাজার হার (Market rate) নির্ধারণ করা এবং এর যথেষ্ট ব্যবহার করা সম্ভব নয়। শ্রম এমন জিনিস নয় যা নিজে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবসর গ্রহণ করে অন্য কাজে নিযুক্ত হতে পারে। আসলে শ্রমিক তার সমগ্র সত্তাকেই কিংবা তার সমগ্র ব্যক্তিত্বকেই মূল উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করে। অন্যথায় একজন লোকের শ্রমকে ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যবহার করার ব্যাপারই নয়। বরং সমগ্র সত্তাটিই ব্যবহার করার ব্যাপার। এ মানব সত্তার অন্তরে রয়েছে তীব্র ভাবাবেগ ও অনুভূতি। তাতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং ঘৃণা ও আসক্তি উভয় অবস্থা দেখা দেয়। সে কোন কোন সিদ্ধান্ত নিজ থেকেই (Innovation) গ্রহণ করে। তার মন-মগজ ও দেহ অনেক ধরণের আত্মিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক অবস্থাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কার্যসম্পাদন করে থাকে। এই মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং তাঁর প্রতিনিধি। এই মানুষকে একটি নিছক ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্য, অস্ত্র বা হাতিয়ার, অর্থ যন্ত্রের একটি নিষ্প্রাণ, নিষ্পন্দ অংশ অথবা একটি জন্তু মনে করা কোনক্রমেই সমীচীন হতে পারে না।[৮]

ইসলামে শ্রমের প্রকারভেদঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম তিন প্রকার। যথাঃ

(ক) শারীরিক শ্রম/কায়িক শ্রম

(খ) শৈল্পিক শ্রম

(গ) বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম

(ক) শারীরিক শ্রম/কায়িক শ্রমঃ কায়িক শ্রম হলো মানুষের পুঁজিবিহীন জীবিকা অর্জনের আসল মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স.)-এর জীবনই উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নবী করীম (সা.) নিজের মেহনতী যিন্দেগীর কথা বলতে যেয়ে একদিন বলেছিলেন, "দুনিয়াতে আল্লাহ্ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি

৬. ঐ, পৃ. ২৯
৭. ঐ, পৃ. ২০
৮. ঐ, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

বকরী চরাননি। তখন সাহাবা-ই-কিরাম বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হুযূর! আপনিও!" নবী করীম (সা.) জওয়াবে বললেন, হ্যাঁ, আমি দু'কিরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরিয়েছি।

(খ) শৈল্পিক শ্রমঃ শৈল্পিক শ্রম বলতে বুঝায়, যে কাজে শিল্প ও কৌশল বিদ্যাকে অধিক পরিমাণে খাটানো হয়। যেমনঃ অংকন, হস্তশিল্প, স্থাপনা ইত্যাদি কার্যে শৈল্পিক শ্রমের ব্যবহার হয়ে থাকে।

(গ) বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমঃ বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম বলতে ঐ সকল পুঁজিহীন শ্রমকে বুঝায়, যেগুলোতে দেহের চাইতে মস্তিষ্ককে বেশি খাটানো হয়। যেমনঃ সাবধান, পরিচালনা, শিক্ষকতা, ডাক্তারী, আইনজীবী ইত্যাদি।

সাধারণ অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রমের পার্থক্যঃ

(ক) সাধারণ অর্থনীতিতে পারিশ্রমিকবিহীন কোন কাজই শ্রম নয়। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রমের জন্য পারিশ্রমিক শর্ত নয়।

(খ) সাধারণ অর্থনীতিতে যে কাজে আনন্দ আছে তা শ্রম নয়। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে সৃষ্টির সেবা, নৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি যে কোন কার্য যদিও আনন্দদায়ক হয়ে থাকে সবই শ্রম।

(গ) ইসলামী অর্থনীতিতে জনকল্যাণ বিরোধী কোন কাজই শ্রম হতে পারে না। কিন্তু সাধারণ অর্থনীতিতে এরূপ কোন শর্ত নাই। তাই এ শাস্ত্রে জনঅনিষ্টকর সকল কাজই শ্রম, যদি পারিশ্রমিক থাকে।

(ঘ) সাধারণ অর্থনীতিতে শ্রম অন্যান্য পণ্যের ন্যায় বিক্রয়যোগ্য, সুতরাং অন্যান্য পণ্য ব্যবহারে যেমন সহানুভূতি ও উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন উঠে না, তেমনি মানুষকে কাজে খাটানোর বেলায়ও সে প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রম অন্যান্য পণ্যের মতো বিক্রয়যোগ্য নয়। শ্রম হলো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানবের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং মানুষ যেমন বিক্রয়যোগ্য পণ্য হতে পারে না, ঠিক তেমনি তার কোন অংশও বিক্রয়যোগ্য পণ্য হতে পারে না।[৯]

শ্রম ও শ্রমিক বিষয়ক মতবাদঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লব যেমনভাবে মানুষের জীবনে অভূতপূর্ব প্রগতির জোয়ার নিয়ে আসে, তা তেমনি মানুষের অনাবিল ও জটিলতাহীন জীবনে অনেকগুলো জটিল সমস্যারও সৃষ্টি করে। এই সমস্যা হলো শ্রমিক সমস্যা-যা বর্তমানে পৃথিবীর রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিটি অণু-পরমাণুকে তীব্রভাবে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। শ্রমিকরা আজ হাজারো শোষণের নিগড়ে পিষ্ট। আজকের পৃথিবী তাদের সমস্যা প্রকৃতভাবে অনুধাবন করতে এবং এর যথার্থ সমাধান দিতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। নিম্নে সে সব ব্যর্থতার কিছু খন্ড চিত্র তুলে ধরা হলো-

পুঁজিবাদী মতবাদে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদাঃ

আজকের শ্রমিক শ্রেণী সাদা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিদের হাতে চরমভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে। তারা হিংস্র লোলুপতা নিয়ে তিলে তিলে তার সমস্ত জমাট রক্তটুকু চুষে খাচ্ছে। কিন্তু প্রতিদানে তারা তাকে কি দিয়েছে? দিয়েছে শুধু সীমাহীন অভাব ও দারিদ্র্য, অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা ও প্রবঞ্চনার আত্মপ্রসাদ। টুকরো টুকরো করে নিজেকে বেচে দিলেও মিলে না তার মাথা গুজবার ঠাঁইটুকু, আর পুঁজিপতি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সাত-মহলা প্রসাদে থেকে একান্ত আয়াসে মুখে তুলে নেয় তার শোণিতাক্ত লাল রক্তটুকু।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে ব্যক্তিমালিকানায়

---

৯. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

বাধাহীন অধিকার রয়েছে। আর শুধু দৈনন্দিন প্রয়োজনেই নয়, অধিকন্তু উৎপাদন উপাদানেও তার এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তি যা ইচ্ছা তাই নিজের অধিকারে আনতে পারে, যদৃচ্ছা মুনাফা লুটতে পারে। যার উপর ইচ্ছা এর দরওয়াজা বন্ধ করে দিতে পারে, যে কোন মূল্যে তা বিক্রি করতে পারে, তার এই স্বাধীনতায় বাধা দেওয়ার অধিকর সমাজের নেই। তাই পুঁজিপতি এত আত্মসর্বস্ব হয়ে ওঠে যে, টাকার জোরে নানা ফন্দী-ফিকির করে সে প্রথমে সাধারণ মানুষকে পুঁজিহীন ও নিঃস্ব করে তোলে। এরপর মজুরী নামক টকটকে মাকাল ফলটি তার সামনে তুলে ধরে। শ্রমিক ততক্ষণে এমন অসহায় হয়ে পড়ে যে, সে জীবিকার তাগিদে অন্য কিছুই আর ভাবতে পারে না। যে কোন শর্তে সে মালিকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যায়।

শিল্পপরিতরা এতই লোভী ও স্বার্থপর হয়ে উঠেছিল যে, তারা নারী এমনকি পাঁচ বৎসরের শিশুকেও যত ঘন্টা পারত খাটিয়ে নিত। গর্ভবতী মেয়েদেরকে পর্যন্ত কাজ থেকে রেহাই দেওয়া হত না। নারী-পুরুষের তফাৎ তাদের কাছে ছিল গুরুত্বহীন, পুরুষ-নারী সকলেই খাটবার যন্ত্র মাত্র।[১০]

শ্রমিকদের উপর মালিকদের শোষণের চরম উদাহরণ ১৮৩০ খৃস্টাব্দের লিয়নসের রেশন শ্রমিকদের মধ্যে দেখা যায়। দিনে আঠার ঘন্টা কাজ করেও একজন শ্রমিক সেখানে মাত্র আঠার 'সু' লাভ করতে পারত। আমাদের মুদ্রায় এ মাত্র তের পয়সার সমান।[১১]

পুঁজিপতিরা বাজার দরকে নিজেদের স্বার্থানুযায়ী রাখতে গিয়ে যেমনভাবে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনিভাবে অল্প মজুরিতে শ্রমিক লাভের আশায় তারা দেশে সুপরিকল্পিতভাবে বেকারত্বও সৃষ্টি করে থাকে শ্রমিকদের নিলামে চড়ায়। মানুষকে দরিদ্র, অসহায় ও সর্বহারা করে রাখার এক জঘন্য ইচ্ছায় মেতে ওঠে-নইলে তারা আপন স্বার্থপূরণ করতে পারে না।

পুঁজিবাদ মানুষকে এত নিষ্ঠুর করে তোলে যে, হাজারো পণ্যের সম্ভার সে পাচার করে দিতে জানে; কিন্তু বুভুক্ষুর হাহাকারেও তার দিল কেঁপে ওঠে না। এদের একমাত্র চিন্তা হলো চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশি হলে মুনাফার অংক কমে যাবে। তাই তারা অধিক মুনাফা লাভের আশায় লাখো শ্রমিককে ভুখা রেখে উৎপাদন পণ্য জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দিতেও দ্বিধা করে না।[১২]

এই ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক কাজ করতে বাধ্য করা হয়। ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করানো হয়। কিন্তু তাদের কোন নিরাপত্তা দেওয়া হয় না।[১৩] শিল্পপতির আশানুরূপ মুনাফা না হলে যে কোন মুহূর্তে সে শ্রমিকদিগকে ছাটাই করে দিতে পারে।

এমনভাবে শোষিত হয়ে মজুরী পাওয়ার পর নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস খরিদ করতে শ্রমিকদের অঘোর বুর্জোয়া গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্য দোকানদার, আড়তদার প্রমুখের শরণাপন্ন হতে হয়। ফলে মজুরী বাবদ দেয় টাকাটা এমনি করেই পুনরায় পুঁজিপতির পকেটেই চলে যায়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যেহেতু আত্মসর্বস্ব, ব্যক্তি-স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত তাই সেখানে মানবিক গুণাবলীর একান্ত অভাব। সে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের এক লীলাক্ষেত্র। পুঁজিপতি অপেক্ষাকৃত কম মজুরী দিয়ে বেশি কাজ আদায় করে নিতে সচেষ্ট থাকে। আর শ্রমিক যথাসম্ভব কম কাজ করে বেশি পারিশ্রমিক হাসিল করে নিতে প্রয়াস পায়। শিল্পমালিক শ্রমিককে নিজের প্রতিপক্ষ এবং তার বিনিয়োগকৃত অর্থের মুনাফার ভাগ ছিনিয়ে নিতে ওৎপেতে আছে বলে মনে করে। আর শ্রমিক ভাবে

---

১০. কবীর উদ্দীন মাসউদ, ইসলামে শ্রমিকের অবদান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ৬
১১. ঐ, পৃ. ৬
১২. ঐ, পৃ. ৫
১৩. ঐ, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

তার গায়ের সমস্ত রক্ত চুষে নিয়ে এই শিল্পপতি তার ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়িয়ে তুলছে। এ ডাকু-লুটেরা, তাই একে খতম করতে হবে। এ যেন যুদ্ধের ময়দানে প্রত্যেক পক্ষ তার প্রতিপক্ষের বুকের নিশানায় সঙ্গীন উঁচু করে আছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা মওদুদী (র.) বলেন, "তাহারা একই পেশার ব্যবসায় মালিকদের নিজস্ব সমিতি গঠন দ্রব্যমূল্য, কর্মচারীদের বেতন ও শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারণ করিবার অধিকার পুরোপুরি ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু চাকরিজীবী ও মজুরদেরকে সংঘবদ্ধ হইবার এবং সম্মিলিতভাবে মজুরী ও বেতনের হার নির্ধারণের জন্য প্রচেষ্টা চালাইবার অধিকার মোটেই দিতে প্রস্তুত নয়। এমনকি নিজেদের ইচ্ছামত কারখানা বন্ধ করিয়া হাজার হাজার কর্মচারী ও মজুর শ্রমজীবীদেরকে একই সময়ে বেকার সমস্যার সম্মুখীন করিয়া দেওয়া এবং এইভাবে অনশনক্লিষ্ট করিয়া কম মজুরীর বিনিময়ে কাজ করিতে বাধ্য করিবার জন্য তাহারা নিজেদের পূর্ণ অধিকারের পৌনপুণিকতা সহকারে দাবি জানাইতে ছিল, কিন্তু চাকর-নকর ও মজুর-শ্রমিকেরা ধর্মঘটের মাধ্যমে নিজেদের মজুরী বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতে পারে-এই অধিকারটুকু তাহারা দিতে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাহাদের প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতে করিতে কোন শ্রমিক, বৃদ্ধ, রুগ্ন কিংবা অকর্মণ্য হইয়া গেলে, কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়ার পূর্ণ অধিকার ভোগ করিতে চায়। কিন্তু বিদায়ী শ্রমিকের এই কাতর ফরিয়াদের কোন জওয়াবই তাহাদের নিকট নাই যে, "আপনাদেরই কারবারের উন্নতির জন্য স্বাস্থ্য, শক্তি ও যৌবন ব্যয় করিয়াছি। এখন অসহায় অবস্থায় আমি কোথায় যাইব, উদর জ্বালা কিরূপে নিবৃত্ত করিব।" ব্যক্তিগত স্বার্থলাভকে যে বর্জুয়া শ্রেণী কর্মানুপ্রেরণার একমাত্র উৎস বলিয়া থাকে উপরোক্ত পরিস্থিতিতে তাহাদের নিজেদের বারংবার পেশ করা এই যুক্তিকে তাহারা একেবারে ভুলিয়া যায়।[১৪]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকদের কোন সুনির্দিষ্ট অধিকার নেই। এর জন্যই হয়েছে পুঁজিপতিদের স্বার্থ সংরক্ষিত রাখার নিমিত্তে। তাই ধনবাদী অর্থনীতিতে শ্রমিকদের মনে করা হয় একটি উৎপাদন যন্ত্র। শ্রমিকদিগকে নিজেদের জান ও মালের সুবিদা আদায়ের জন্য এক চিরন্তন দর কষাকষির মধ্যে লিপ্ত হতে হয়। যতটুকু পারে, সংগ্রামের মাধ্যমেই তারা তা আদায় করে নেয়।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদে শ্রম ও শ্রমিকের অধিকারঃ

হাজারো লহর বন্যা বহায়ে, অনেক আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে, শ্রমিক শ্রেণীর রাজত্ব কায়েম করার আবেগময়ী বাণী শুনিয়ে, লাখো মানুষের কবরের উপর শ্রমিকদের তথাকথিত যে স্বপ্ন রাজ্যগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়, তা সত্যই কি মেহনতিদের তথা সর্বহারাদের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে পেরেছে? অন্য কথায় সমাজতন্ত্র, দাবির বেড়াজালে নয়, বাস্তবিকভাবেই কি পুঁজিবাদী স্বৈরাচারের ফলে যে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়, এদের সমস্যার কোন ন্যায়ানুগ ও কার্যোপযোগী সমাধান বের করতে পেরেছে? আজকের পৃথিবীর এ এক চরম প্রশ্ন-চরম জিজ্ঞাসা। একটি পর্যবেক্ষণশীল মন নিয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কার্যধারা যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তবে আমাদেরকে গভীরভাবে হতাশ হতে হয়।

সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ায় মার্ক্সবাদের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লেলিন-স্টালিনের বিপ্লবের মাধ্যমে। শ্রমিক-মজুরদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা সেইখানেই আজ কমিউনিজমের ছায়াতলে শ্রমিকদের জীবন ছিল বড়ই দুঃসহ, তাদের অবস্থা ছিল অতিশয় মর্মান্তিক।[১৫]

---

১৪. সাইয়িদ আলা-মওদুদী, ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ (অনু. মাওলানা আব্দুর রহীম), আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ৩৫–৩৬

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে মজুর-শ্রমিক ও চাষীদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলতে কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। এক কাজ ছেড়ে অন্য কাজ গ্রহণ করার কোন অধিকারও তাদের দেওয়া হত না। কেউ তা করলে ২৬ জুন ১৯৪০ সনের গৃহীত একটি আইন অনুযায়ী তাকে চার মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হত।[১৬] সামরিক রেলওয়ে এবং পানি সরবরাহকারী বিভাগসমূহের মজুরগণ বিনা অনুমতিতে কাজ পরিবর্তন করলে তাকে পাঁচ হতে আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হত।[১৭] কোন মজুর যদি এক মাসে তিনবার কিংবা দুই মাসে চার বার কাজে ২০ মিনিট সময় দেরী করে আসে। তবে উপরোক্ত আইনের বলে তাকে সেই স্থানেই ছয় মাসের শিক্ষামূলক শাস্তি দেওয়া হয় এবং এক-চতুর্থাংশ বেতন কেটে নেওয়া হত।[১৮]

এইরূপে রাষ্ট্রের নির্মম অক্টোপাসে বাধা কলুর বলদ মজুর শ্রমিকগণ সেখানে কিরূপ মজুরী পেত? এর উত্তর শোনা যায়: অনেক তুলনাহীন এবং তা হচ্ছে দু-দু'শ, চার-চার'শ রুবল ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, একজন মজুর হয়ত মাত্র ৬০.১ রুবলেরও কম এবং অন্য একজন ১১০০.০১ রুবলেরও বেশি বেতন পেত। মনে রাখতে হবে যে, এই রুবলের আন্তর্জাতিক মূল্য বাংলাদেশী টাকা অপেক্ষাও অনেক কম। আর দেশের অভ্যন্তরে এর ক্রয়-ক্ষমতা আরো অনেক কম।[১৯]

বাধ্যতামূলক শ্রম প্রথা রাশিয়ার জনগণের জীবনে এক মারাত্মক অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছিল। এখানকার অধিবাসী দাস-শ্রমিকগণ বাধ্যতামূলক শ্রম হতে কোনমতেই রেহাই পেত না। অসুস্থ হলেও তাকে কাজ করতে হত ঠিক জন্তু-জানোয়ারের মতো। অন্যদিকে তাদের জন্য খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের খাতে যথাসম্ভব কম খরচ করা হত। এইভাবে যথাসম্ভব বেশি মুনাফা লাভ করার সর্বাত্মক পুঁজিবাদী নীতি অনুসরণ করেই দাঁড়িয়েছিল সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া। সেখানে মনুষত্বকে চিরদিনের তরে কবর দিয়ে চলেছে পণ্যোৎপাদনের যন্ত্রদানব।

চীনে "সরকারী শিল্প ও কারখানায় শ্রমিকদের কর্মবিধান"[২০] পর্যায়ে শ্রমিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে যেসব আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, তা থেকেই সেখানকার শ্রমিকদের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। সেসব বিধানের মূল দৃষ্টিকোণ নিম্নরূপ:

শ্রমিকদিগের সামষ্টিক দর কষাকষি কিংবা সংগঠন করার আজাদী ভোগের কোন অধিকার নাই। নিয়ম ও শৃঙ্খলা এনে শ্রম করে যাওয়াই তাদের একমাত্র কর্তব্য। মজুরীর জন্য দর কষাকষি করা চলবে না বরং প্রত্যেকটির কাজেরই মজুরী নির্ধারিত মান অনুযায়ী নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে।

কোন শ্রমিক বা আমলার কর্মচারী ম্যানেজার অথবা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তার মঞ্জুরী ব্যতীত কাজ ত্যাগ করতে পারে না। তাকে স্থানান্তরে বদলীও করা যেতে পারে না ইহা মেনে কাজ করা না হলে সংগঠন ও বিধান-রীতির বিরুদ্ধতা করা হবে।

কাজের সময় নির্ধারণের পূর্ণ ইখতিয়ার কেবল কারখানার ব্যবস্থাপকদের থাকবে। কারখানায় প্রবেশকালে ও নির্গমনের সময় শ্রমিকের দেহ তল্লাশী নেওয়া হবে।

---

১৬. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ১২৫
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

'শ্রমিক রাজত্বের' এইসব আইন ও বিধান সম্পর্কে একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়, সে সমাজে শ্রমকেই আসল কার্যকর (Factor) মনে করা হয়। সেখানে স্বয়ং শ্রমিকদের মানবিক অধিকার বলতে কিছু নেই। তারা কাজ করার সময় কোন কথা বলতে পারে না। সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য কোন সভাও করতে পারে না। এর বিরোধীতা করা হলে অপরাধী হবে ও বিশেষ আদলে অভিযুক্ত হবে। একথায় তারা সেখানে সকল প্রকার স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত, নিছক কয়েদী জীবন যাপনে একান্তভাবে বাধ্য।

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম:

পরিচালকবিহীন ইঞ্জিন পরিচালনার কথা যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি শ্রম বিবর্জিত মানব জীবনের কথাও ভাবা যায় না। আল্লাহ্‌র ভাষায়: "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি।"[২১] শ্রমই হলো সকল উন্নয়ন ও উৎপাদনের চাবিকাঠি। যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী সে জাতি তত বেশি উন্নত। শ্রম আল্লাহ্ প্রদত্ত মানব জাতির জন্যে এক অমূল্য শক্তি ও সম্পদ। কিন্তু ইসলাম-বিবর্জিত বিভিন্ন সমাজে শ্রমের বিভিন্নতাকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেয়া হয়ে থাকে। তাদের দৃষ্টিতে কোন শ্রম অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আবার কোন কোন শ্রম অত্যন্ত মর্যাদাকার। সেখানে অর্থের মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। যে যত অর্থশালী সামাজিকভাবে তিনিই তত সম্মানী। যদিও ন্যায়নীতির মানদণ্ডে তিনি অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির হোন না কেন। কিন্তু অর্থহীন কায়িক পরিশ্রমী ন্যায়নীতির মানদণ্ডে যতই স্বচ্ছ হউক না কেন তারাই সমাজের নিকৃষ্ট ও অবহেলিত ব্যক্তি। তাই দেখা যায় জীবিকা নির্বাহে যারা কায়িক শ্রম নির্ভরশীল তারা আদি যুগের দাসদের চেয়েও হীন হয়ে পড়েছে।

কিন্তু ইসলাম মানুষকে মর্যাদা প্রদান করে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে। এখানে মর্যাদা লাভের জন্য ধন্যাঢ্য কিংবা বিশেষ কোন বিত্ত শর্ত নয়। সুতরাং যে কোন পর্যায়ের শ্রমিক যদি তিনি ন্যায়পরায়ণশীল হন তিনিই হবেন সম্মানী।

নবী করীম (সা.) শ্রমের মর্যাদা বর্ণনায় ইরশাদ করেছেন, "শ্রমজীবীর উপার্জনই উৎকৃষ্টতম, যদি সে সৎ উপার্জনশীল হয়।"[২২]

নবী করীম (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়, "ইয়া রাসূল! কোন্ ধরণের উপার্জন শ্রেষ্ঠতর? তিনি উত্তর করলেন-নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জন।"[২৩]

রাসূলে পাক (সা.) আরও ফরমান, "যে ব্যক্তি নিজের শ্রমের উপর জীবিকা নির্বাহ করে, তার চেয়ে উত্তম আহার আর কেউ করে না। জেনে রাখ, আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জনে জীবিকা চালাতেন।"[২৪]

আমরা জানি, নবী যিনি আল্লাহ্ প্রেরিত এবং মানবতার দীক্ষাগুরু হয়ে আসেন তিনি কখনও নীচ কাজ করতে পারেন না। উপার্জন করা, পরিজনদের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত পরিশ্রম করা ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদের মতোই।

রাসূল (সা.) শ্রমের মর্যাদায় বলেন, "নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জন অপেক্ষা উত্তম উপার্জন নেই।"[২৫]

---

২১. আল-কুরআন, ৯০:৪
২২. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, মুসনাদু আহমাদ, দারুল মায়ারিফ বায়রূত, ১৪০৯ হিজরী, হাদীস নং-৮৩৩৭
২৩. ঐ, হাদীস নং-৮৩৩৮
২৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল সহীহ আল-বুখারী, কুতুবখানা রশিদিয়া, দিল্লী, হিজরী-১৪০৯,কিতাবুল বুয়্যু, হাদীস নং-১৯৩০
২৫. মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ ইবন মাজাহ, সুনান ইবনু মাজাহ, কুতুবখানা রশিদিয়্যা, দিল্লী, কিতাবুত তিজারাত, হাদীস নং-২১২৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম যেমনিভাবে মানুষকে শ্রমের দিকে সৎ উপার্জনের দিকে উৎসাহিত করেছে, একে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছে ঠিক তেমনি রকমের উপার্জন না করে সমাজের গলগ্রহ হয়ে থাকা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য এক কাজ। বেকার থাকা ইসলাম কোনক্রমেই সহ্য করতে পারে না।

কোন রকমের উপার্জন না করে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়াকে নবী করীম (সা.) এত বেশি ঘৃণা করতেন যে, তিনি বলতেন, "যে ব্যক্তি আমার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হবে যে, সে কোনদিন ভিক্ষা করবে না। তার জান্নাত লাভের দায়িত্ব আমি নিলাম।"[২৬] তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবে সে আল্লাহর সঙ্গে এরকম অবস্থায় মুলাকাত করবে যে, তার চেহারায় এক টুকরো মাংসও থাকবে না।"[২৭]

একবার এক সুস্থ্য-সবল ব্যক্তি তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইতে আসে। তখন তিনি তাকে বললেন, "কেন ভিক্ষা করে বেড়াও? তোমার কি কিছুই নেই?" লোকটি বলল, "একটি পানি খাওয়ার লোটা এবং গায়ে দেওয়ার জন্য একখানা কম্বল আছে।"

নবী করীম (সা.) তাকে তাই নিয়ে আসতে বললেন। পরে নিজেই নিলাম ডেকে দুই দিরহামের বিনিময়ে তা বিক্রি করে দিলেন। এক দিরহাম দিয়ে একটি কুঠার কিনে এনে নিজেই এর হাতল লাগিয়ে দিয়ে তাকে বললেন, "যাও, জঙ্গলে যেয়ে কাঠ কেটে জীবিকা চালাও। পনের দিনের ভিতর যেন তোমাকে দেখতে না পাই।"

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, উক্ত ব্যক্তির যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হয়েছে। একদিন সুন্দর সুন্দর কাপড় পরে কিছু হাদিয়া নিয়ে এসে দরবারে নববীতে তিনি হাজির হলেন। তখন নবী করীম (সা.) তাকে বলেছিলেন, "অপরের সামনে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে কেয়ামতের দিন লাঞ্ছিত হওয়ার চেয়ে এই তো তোমার জন্য উত্তম পথ।"[২৮]

নবী করীম (সা.) শ্রমের মূল্যায়ন করতে যেয়ে অনেক সময়ই বলতেন, "তোমাদের কেউ দড়ি নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যাবে, লাকড়ি জমা করে পিঠে বোঝা বয়ে এনে তা বিক্রি করবে এবং এমনিভাবে আল্লাহ্ তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন। দোরে দোরে ভিক্ষা, করুণা ও লাঞ্ছনা পাওয়ার চেয়ে এ অনেক ভাল।"[২৯]

নবী করীম (সা.)-এর জীবিকার উপদেশ এবং শ্রমের প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক বাণীগুলো সাহাবা-ই-কিরামের জীবনে এত গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছিল যে, তাঁরা নিচু হতে নিচু কাজকেও কোন দিন ঘৃণার চোখে দেখেননি।[৩০]

উপরে বর্ণিত রাসূল (সা.)-এর মহিমান্বিত বাণীসমূহ হতে ইসলামে শ্রমের উচ্চ মর্যাদার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদা:

বস্তুতান্ত্রিক শিল্পজগৎ ও পৃথিবী শ্রমিকদের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে তা নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক। এই সমাজে শ্রমিক-কর্মচারী তার প্রয়োজন পূরণের প্রচেষ্টায় যখন প্রাণান্তকর অবস্থায় দিনাতিপাত করছে এবং অন্য দশজন সাধারণ মানুষের মত বাঁচার জন্য বার বার নিশ্চয়তা দাবী করছে ঠিক সেই মুহূর্তে পুঁজিপতি ও বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের নিয়ে হাসি-তামাশা করছে।

---

২৬. আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আশআছ, সুনান আবী দাউদ, কুতুবখানা রশিদিয়্যা, দিল্লী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং-১৪০০
২৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং-১৩৮১
২৮. আবু দাউদ সুলায়মান, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং-১৩৯৮
২৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৮৬
৩০. ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

তাই বিংশ শতকের ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়েও আজ অসংখ্য শ্রমিককে প্রাণবিসর্জন দিতে হচ্ছে। পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী দেশগুলো ইচ্ছামত বেতন কাঠামো শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে ও তাদের বাঁচার দাবীকে দু'পায়ে মাড়িয়ে অন্য দেশে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে অর্থ সম্পদ আজ হয়ে উঠেছে আত্মমর্যাদার ও সম্মানের মানদণ্ড। যার অর্থ-সম্পদ ও ব্যাংক ব্যালেন্স আছে-তা যেভাবেই অর্জিত হোক না কেন, তিনিই সমাজে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। কিন্ত ইসলাম এই ধরণের ঠুন্‌কো আত্মম্ভরিতায় বিশ্বাস করেনা। ইসলামে জন্মগতভাবে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই, সকল মানুষ সমান। মানুষের আমল ও আখলাক তাকে সম্মানিত করে, গৌরবের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। কোন গরীবের ঘরে বা একজন সাধারণ শ্রমিকের ঘরে জন্মেছে বলে সে নীচ বা হীন নয়। পক্ষান্তরে প্রাচুর্যের মধ্যে সোনার চামচ মুখে করে জন্মগ্রহণ করায়ও গৌরব নেই। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত ইবনে শিহাব জুহরী উমাইয়া বাদশাহ আব্দুল মালিকের নিকট তাশরীফ আনলে পরে তাঁকে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের নৈতিক নেতৃত্ব দানকারী ইমামদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। মক্কা, ইয়েমেন, মিশর, সিরিয়া, দজলা ও ফুরাত নদী বিধৌত অঞ্চল, খুরাসান, বসরা, কুফা-এই এলাকাগুলোর মধ্যে শুধু কুফা ব্যতীত সকল স্থানে আযাদীপ্রাপ্ত দাসগণ নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে জানানো হয়।'[৩১] আল্লাহ্ মানুষের সকল মিথ্যা অহমিকা, কৌলীন্য এবং আভিজাত্যের অসারতা ছিন্ন করে আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিকতর সম্মানিত যে অধিক খোদাভীরু।'[৩২]

মহানবী (স.) বলেন, 'ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি বা জাতি মানবতার উর্ধ্বে নয়। তার নিকট মনিব, চাকর, উঁচু, নীচু এবং গরীব ও আমীর সবাই সমান। এদের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে একমাত্র পরহেজগারিতা ও সৎকর্মের ভিত্তিতে পার্থক্য হতে পারে। তোমাদের প্রকৃত অবস্থা যখন এইরূপ তখন কেন অধীনস্থ লোকদেরকে হীন মনে কর?' যাদুল মাআদ গ্রন্থে নবী (স.) বলেন, "আজমের উপর আরবের, সাদার উপর কালোর এবং কালোর উপর সাদার কোন প্রাধান্য নেই।"[৩৩]

কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে ঘোষণা লাভ করেই ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদা মনিবের বা শিল্পপতির সমকক্ষরূপে স্বীকৃত হয়নি বরং ইসলামী শাসন ব্যবস্থার আওতায় তা বাস্তবায়ন করে দেখানো হয়েছে। মহানবী (স.) নিজে বকরী চরিয়েছেন, হযরত মুসা (আ.) নিজে হযরত শোয়াইব (আ.)-এর নিকট নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রম বিক্রি করেছেন, দাউদ (আ.) কর্মকার ছিলেন, হযরত আদম (আ.) কৃষক ছিলেন, নুহ (আ.) ছুতার ও ইদ্রিস (আ.) দর্জি ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পরে হযরত ওমর (রা.) নিজের কাঁধে করে ময়দা বয়ে নিয়ে দিয়ে এসেছেন ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে। নিজের চাকরকে যথার্থ সম্মান দিতে এবং তারও যে ক্লান্তি আসতে পারে সে কথার স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।[৩৪]

আজকের সমাজে ইসলাম বিস্মৃত হওয়ার কারণে শ্রমিককে অর্থনৈতিক মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তার যে সামাজিক কোন প্রয়োজন আছে, তার যে প্রাণ খুলে কথা বলার অধিকার আছে, অভিযোগের কথা বলার জন্য প্রাণ কাঁদে এ কথাগুলো ব্যবস্থাপকগণ বুঝতে চাননা। অধস্তন কর্মচারী

---

৩১. মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত,পৃ. ১২৪

৩২. আল-কুরআন, পৃ. ১–৬

৩৩. মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

৩৪. ঐ, পৃ. ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

লেখাপড়া জানে না বা কম জানে বলে সে মানবীয় মর্যাদাও হারাবে এটা অনভিপ্রেত ব্যাপার। ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ অনুসারে যতদিন না অধস্তন শ্রমিক-কর্মচারীদের মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করা যাচ্ছে ততদিন তারাও প্রতিষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতিশীল হবেনা, প্রতিষ্ঠানকে নিজের বলে মনে করবে না এবং উদ্দেশ্য অর্জনে (Achievement of objectives) জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেনা।[৩৫]

শ্রমিক ও কর্মচারীর মর্যাদা প্রদান, নিয়োগ ও নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, আচার-ব্যবহার, পদোন্নতি, সুবিধা প্রদান, শৃঙ্খলা আনয়ন প্রভৃতি বিষয়ে ন্যায়নীতি অনুসরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কোন সুবিধা প্রদান করার সময় (যেমনঃ যাতায়াতের জন্য বাস প্রদান) যদি প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় তবে শ্রমের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

ইসলামী শ্রমনীতি ও তার উৎসঃ

কর্মী ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের অন্যতম প্রধান বিষয় হল শ্রমনীতি। কারণ শ্রম প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অধ্যাপক পিটার ড্রাকার বলেন যে, মানুষ ছাড়া মূলধন অর্থহীন কিন্তু মানুষ মূলধন ছাড়াই পর্বত পর্যন্ত স্থানান্তর করতে পারে।[৩৬] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শ্রম ছাড়া উৎপাদনের সকল উপাদান অর্থহীন। ব্যক্তির নিকট থেকে শ্রম ও প্রচেষ্টা যথাযথরূপে আদায় করতে হলে যে আদর্শ অনুসরণ করা হয় তাকে বলে শ্রমনীতি। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পর থেকে কর্মী নির্বাচন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি, পদ-মূল্যায়ন, কার্য ও মেধা মূল্যায়ন, অভিযোগ পরিচালনা (Grievance handling) শৃঙ্খলা বিধান কার্য (Disciplinary Action), শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা, মজুরী নির্ধারণ, বিভিন্ন ভাতা ও সুবিধা প্রদান, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধান, শ্রমিক-সংঘ গঠন প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ে কর্মীদের স্বার্থ জড়িত থাকে। এই সমস্ত বিষয়ে ইসলামের আদর্শ প্রয়োগ এবং উদ্ভূত সমস্যার সম্পূর্ণ ন্যায়, ইনসাফ ও বৈধ উপায়ে সমাধান করা হলে তাকে ইসলামী শ্রম নীতি বলা যাবে। উল্লিখিত শ্রম সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদনের সময় বিভিন্ন প্রলোভন ও প্রভাবের কাছে নতি স্বীকার না করে সম্পূর্ণ ইনসাফ ও বৈধ পন্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ইসলামী শ্রম নীতির বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কর্মীদের নিয়োগের সময় স্বাভাবিক নৈতিক এবং ইসলামের দাবী হল সুযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করা। কিন্তু একই বা অন্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চ নির্বাহীর অনুরোধ বা অবৈধ প্রভাব (Undue influence), রাজনৈতিক চাপ, সামাজিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের চাপ, স্বজনপ্রীতি, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি উপায়ে নিয়োগ করা হতে পারে। আবার কোন প্রকার প্রভাবের কাছে নতিস্বীকার না করে সম্পূর্ণ যোগ্য প্রার্থীকেও নিয়োগ করা যেতে পারে। শেষোক্ত প্রকারের নিয়োগ তখনই সম্ভব হতে পারে যদি ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিবেকবোধ থাকে। প্রথম প্রকারের নিয়োগে পার্থিব স্বার্থ নিহিত আছে আর শেষোক্ত নিয়োগে উভয় স্বার্থই নিহিত আছে। শেষোক্ত শ্রমনীতিই ইসলামী শ্রমনীতি হিসাবে পরিগণিত।

ইসলামী শ্রমনীতির উৎসঃ

ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রমিক, কর্মচারী তথা মালিক ও ব্যবস্থাপনা সকলের জন্যই অত্যাবশ্যকীয়। কারণ এ নীতি প্রণীত হয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদিস থেকে। আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক, তিনি খুব ভাল করেই জানেন যে, আমাদের ব্যক্তিক সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংস্কৃতিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের জন্য সর্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক কি? তাই যুগে যুগে

---

৩৫. ঐ, পৃ. ১২৫

৩৬. M.R. Kanwar, Lecture on Economic Development and planning New Academic Publishing Company, Jullandhar, 1993, P. 76

Dhaka University Institutional Repository

নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের জন্য পবিত্র ইসলামকে পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যমূলক জীবন বিধান হিসাবে প্রদান করেছেন। সুতরাং ইসলামী শ্রমনীতির মূল উৎস কুরআন এবং হাদিস। কুরআন ও হাদিসের নির্দেশ থেকেই আমরা এ প্রমাণ পাই।

আল্লাহ কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমাদের যখন কোন বিষয়ে মত বিরোধ দেখা দেয় তখন তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক মীমাংসা কর। রাসূলুল্লাহ (স.) বিদায় হজ্জে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন তাতেও তিনি বলেন যে, তোমরা যদি দুটি জিনিসকে আঁকড়ে থাক তাহলে তোমরা কোনদিন বিভ্রান্ত হবে না। তার মধ্যে একটি হল আল্লাহর কুরআন এবং অন্যটি রাসূলের হাদিস। মহানবীর আরেকজন প্রধান সাহাবী হযরত মায়াজ ইবনে জাবাল (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে ইয়েমেন প্রেরণের প্রাক্কালে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, যখন তোমার সামনে কোন সমস্যা দেখা দেবে তখন তুমি কিভাবে সে সমস্যার মোকাবিলা করবে। হযরত মায়াজ জবাব দিলেন, আমি আল্লাহর কিতাব অনুসারে সকল সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করব। রসূল (স.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, যদি আল্লাহর কিতাবের মধ্যে কোন বিষয়ের ফয়সালা খুঁজে না পাও? তিনি জবাব দেন, তাহলে রসূলের (স.) সুন্নত অনুসারে ফয়সালা করব। রসূল (স.) তাঁকে পুনরায় প্রশ্ন করেন যে, যদি রসূলের সুন্নতের মধ্যেও কোন বিষয়ে সমাধান খুঁজে না পাও তখন? জবাবে হযরত মায়াজ বলেন, আমি নিজেই ইজতিহাদ করে সে কাজের ফয়সালা করার চেষ্টা চালাব এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করব না। মহানবী (স.) জবাব শুনে সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর বুকের ওপর হাত রেখে বলেছিলেন যে, আল্লাহ রসূলের প্রতিনিধিকে রসূলের মন:পুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফিক দান করেছেন।[৩৭]

সুতরাং, যাঁর মনোনীত জীবন বিধান ইসলাম, তিনি ইসলামী শ্রম নীতিরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন কারণ ও পরিস্থিতিতে সৃষ্ট অসংখ্য সমস্যার কোনটির সমাধান স্পষ্টরূপে কুরআন ও হাদিসে না মিললে ধর্মানুরাগী জ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। উল্লিখিত পন্থা পুরোপুরি অনুসৃত হলে শ্রমনীতির এমন কোন সমস্যা থাকতে পারে না যার সমাধান সম্ভব নয়। যেহেতু পূর্ণ ইসলামী শ্রমনীতি কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রণয়ন করা সম্ভব, সুতরাং শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মী ব্যবস্থাপকদের উচিত অবিলম্বে সে নির্দেশ অবলম্বনে শ্রমনীতি প্রণয়ন করা।

ইসলামী শ্রমনীতির বৈশিষ্ট্য:

ইসলাম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা তাই ইসলামী শ্রমনীতির বৈশিষ্ট্যও কুরআন নির্দেশিত এবং রসূল (স.) প্রদর্শিত তথা বাস্তবায়িত। ইসলামী শ্রম নীতি প্রতিপালিত হলে কোন প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার শ্রম অসন্তোষ দেখা দিতে পারে না। এই নীতির শাশ্বত বিধান সকল স্তরের মানুষই গ্রহণ করতে পারে।

এই শ্রমনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. এই শ্রমনীতি সম্পূর্ণরূপে কুরআন ও হাদিসের আলোকে প্রণীত হয়ে থাকে;[৩৮]

২. কর্মী ব্যবস্থাপনার সকল কার্য সম্পূর্ণরূপে ন্যায়, ইনসাফ এবং বৈধ পন্থায় সম্পাদিত হয়;

---

৩৭. আবু দাউদ সুলায়মান, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত দ্রষ্টব্য।

৩৮. কবির আহমদ মজুমদার, ইসলামী শ্রমনীতি কি? মজদুর প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

৩. কোন সময় কোন প্রকার প্রভাব, চাপ ও ভীতির কাছে নতি স্বীকার করেনা;

৪. ইহকাল ও পরকালের শান্তি তথা মুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত ও বাস্তবায়িত হয়;

৫. সাময়িকভাবে কোন কর্মী অসন্তুষ্ট হলেও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বৈষম্যহীন হওয়ার কারণে পরবর্তীকালে সকলেই এ নীতির প্রতি সন্তুষ্ট চিত্তে আনুগত্য প্রকাশ করে;

৬. নিয়োগ প্রাপ্তদের সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ যেমন বিভিন্ন ধরণের কল্যাণমূলক ব্যবস্থা করে তেমনি যারা বেকার বা অসুস্থ তাদের ব্যাপারে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হয়;

৭. বেকার হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত বা হ্রাস না করা পর্যন্ত এই নীতি অনুসারে কর্তৃপক্ষ কোন সর্বাধুনিক প্রযুক্তি স্থাপন করতে পারেনা;

৮. প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিক কেউ কোন প্রকার অমঙ্গলের চিন্তা করেনা এবং প্রতারণা করে না;

৯. মালিক-শ্রমিক সম্পূর্ণ ভাই ভাই, কোন শ্রেণী বৈষম্য নেই;

১০. শ্রমিক-কর্মচারীদের শোষণহীন ব্যক্তি মালিকানা আছে;

১১. কর্মচারী ও নিয়োগকর্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সম্মতির ভিত্তিতে মজুরী নির্ধারিত হয়;

১২. বেতন স্কেলের পার্থক্য সর্বনিম্ন হয়ে থাকে;

১৩. পরিবারের অতিরিক্ত সদস্য থাকার কারণে বাড়তি মজুরীর প্রয়োজন হলে তাকে পৃথক তহবিল থেকে দেয়;

১৪. ইসলামী শ্রমনীতিতে শ্রম শোষণ অবৈধ;

১৫. শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার কোন নীতির মর্যাদা পায় না। কেবল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত পন্থা হিসাবে গ্রাহ্য করা হয়;

১৬. ইসলামী শ্রম নীতি অনুযায়ী কোন কর্মচারীকে হারাম কাজে নিয়োগ করা যায় না;

১৭. কর্মচারীদের ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্য মনে করেনা বরং সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মনে করে।

ইসলামী শ্রমনীতির তাৎপর্যঃ

শ্রমনীতি হওয়া তখনই সার্থক হয় যদি তা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে। ইসলামের আদর্শ স্মরণে না রেখেও যে সমস্ত শ্রমনীতি প্রণীত হয় তাতেও ঢালাওভাবে বৈষম্য এবং বে-ইনসাফি প্রশ্রয় পায়না। কিন্তু উক্ত শ্রমনীতি বাস্তবায়িত হওয়ার প্রাক্কালে যে সমস্ত প্রভাব এবং প্রলোভন আসে তা কাটিয়ে ইনসাফের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে ওঠে। ফলে নানাবিধ অবিচারের পরিণামে প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মালিক তখন শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি খড়গহস্ত হয় এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক অত্যাচারিত এবং অত্যাচারীর সম্পর্কে পর্যবসিত হয়।

একটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পরিবার ও পরিবেশ থেকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, চরিত্র, মেজাজ ও মানসিকতার ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে। সুতরাং যে কোন একটি বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বিবেকবোধ, সততা, সংযম, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি না থাকলে মতানৈক্য দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার এবং এড়াবার পর্যাপ্ত নৈতিক প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে অনেক বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রণীত শ্রমনীতিও কাগুজে শ্রমনীতির রূপ পরিগ্রহ করে।[৩৯]

---

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত অবস্থার অবসানকল্পে ইসলামী শ্রমনীতির আবশ্যকতা দেখা দেয়। এই শ্রমনীতির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এতে কোন প্রকার বে-ইনসাফি ও বৈষম্যের অবকাশ না থাকায় শ্রমিক কর্মচারীগণ সর্বদা এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। এ শ্রমনীতির প্রতি মালিক ও শ্রমিকের শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন রাখার জন্য 'খোদা-ভীতি ও ধর্মানুরাগ' পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সকলের থাকে পর্যাপ্ত নৈতিক প্রশিক্ষণ। পার্থিব কিছু প্রভাব ও প্রলোভন আসলেও পরকালীন শাস্তির ভয়ে তা ম্লান হয়ে যায়।

কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচন, কর্মসংস্থান:

কর্মসংস্থান, কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচন (Recruitment & Selection) আধুনিক মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান কার্য। শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য যত উন্নত ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তিই আমদানি করা হোক না কেন, যোগ্য কর্মী সংগ্রহ করে উপযুক্ত স্থানে নিয়োগ করা না গেলে সেগুলোর পূর্ণ উপযোগিতা লাভ করা সম্ভব নাও হতে পারে। বিভিন্ন উপায়ে কর্মীদের সংগ্রহ করে নিয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু ইসলামী শ্রমনীতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ না হয়ে যে উৎসই ব্যবহার করা হউক না কেন তাতে বৈষম্যের আশঙ্কা থাকবে। তাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশেও ১৯৬৪ সালে (Civil Rights Act) সংশোধন করে Equal Employment Oppotunity Act পাশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ এবং জাতীয় পরিচিতির বৈষম্য দূরীকরনের জন্য Equal Employment Opportunity Commission গঠন এবং ১৯৬৭ সালে Age Discrimination in Employment Act পাশ করতে হয়।[৪০] ইসলামী শ্রমনীতি অনুসারে সম্পূর্ণ যোগ্য, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। এই নীতিতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গগত প্রভেদ করা হয় না।

স্বজনপ্রীতি নির্বাচনের সময় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বৈষম্যের জন্ম দেয়। ইসলামে এই ধরণের স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বকে কঠোর ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত যুবাইর ইবনে মুতায়েম থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, সে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে সামিল নয় যে পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে যুদ্ধ করে। আর সে ব্যক্তিও আমার দলভুক্ত নয় যে পক্ষপাত করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।[৪১]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে (কোন অবৈধ ব্যাপারে) স্বজাতির সাহায্য করে তার দৃষ্টান্ত হল যেন কোন উট কুয়ায় পতিত হচ্ছে আর সে ব্যক্তি তার লেজ ধারণ করে আছে। ফলে সেও উটের সাথে কুয়ায় পতিত হল।[৪২] অপরের পার্থিব স্বার্থে নিজের পরকাল বরবাদ করা সম্পর্কেও হাদিসে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। হযরত আবু উমামার বর্ণনা মতে রসূল (স.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী নিকৃষ্ট অবস্থায় পতিত হবে যে ব্যক্তি অপরের জাগতিক স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে নিজের পরকাল বরবাদ করেছে।[৪৩]

কুরআনে মজুর নিয়োগের জন্য শক্তি-সামর্থ্য এবং বিশ্বস্ততা এই দুটো বিষয় বিবেচনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৪৪]

---

৪০. Gray Dessler, Personal Management, Reston Publishing Company, Virginia, 1978, P. 62–63
৪১. আবু দাউদ সুলায়মান, প্রাগুক্ত,
৪২. আতাউর রহমান, 'ইসলামী রূপরেখা' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকার, সংখ্যা-৪৬, জুন-১৯৯৩, পৃ. ৪৩
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৪৪. আল-কুরআন, ২৮:৪৬

Dhaka University Institutional Repository

অতএব দেখা যায় যে ইসলামী শ্রমনীতি অনুযায়ী কর্মী প্রবেশন ও নির্বাচন কার্য সমাধা করলে সৎ, যোগ্য ও দক্ষ লোক নিয়োগ সম্ভব। ইসলামী শ্রমনীতিতে নির্বাচনের ব্যাপারে সংখ্যা গুরু এবং সংখ্যালঘু উভয়ের সমান অধিকারের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এতে সংখ্যালঘু উভয়ের সমান অধিকারের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যোগ্য ব্যক্তিগণ নিয়োগ লাভ করতে পারে। কুরআন ঘোষণা করেছে, তোমরা সেই সব লোকদেরকে গালি দিও না বা মন্দ বলো না, যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদেরকে ডাকে।[৪৫] রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মনে রেখো যদি কোন মুসলমান কোন অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার ওপর সাধ্যাতীত বোঝা (জিজিয়া বা প্রতিরক্ষা কর) চাপিয়ে দেয় অথবা তার কোন বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করব।[৪৬]

ইসলামী শ্রমনীতির আরেকটি দাবি হল সমাজের সকল প্রকার কর্মহীন লোকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারকে অবশ্যই এই কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত বা ছদ্মবেশী যেরকম বেকারত্বই হোক না কেন, তার ফলে সমাজে দারিদ্র্য বিরাজ করতে সহায়ক হয় যা মানুষকে কুফরীর দিকে ঠেলে দেয়।[৪৭] এছাড়া বেকার যুবকগণ সমাজের নানা অনাচার সৃষ্টি করে বেড়ায়। রাষ্ট্র যদি বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে অপরাগ হয় তাহলে সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি বেড়ে যায়। অথচ মহানবী ভিক্ষাবৃত্তিকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ভিক্ষা করে অথচ এ থেকে মুক্ত থাকার সম্পদ বা শক্তি সামর্থ্য তাদের রয়েছে তারা যখন কিয়ামতের দিন খোদার সম্মুখে হাজির হবে, তখন তাদের মুখমণ্ডল একেবারে মাংসহীন ও বীভৎস হয়ে যাবে।"[৪৮] তিনি আরো বলেন, "ভিক্ষা করা আর নিজের মুখে আঘাত করা সমান। অতএব যার খুশী সে তার মুখমণ্ডলকে অক্ষত রাখুক আর যার খুশী সে তা ক্ষত-বিক্ষত করুক।"[৪৯]

ভিক্ষালব্ধ খাদ্যকে নবী (স.) "জাহান্নামের অগ্নিদগ্ধ পাথর" বলে অভিহিত করেছেন। হযরত উমর কোন উপার্জনক্ষম বেকার পুরুষ দেখলে বলতেন, "মুসলমানদের সমাজের গলগ্রহ ও অন্য লোকের ওপর নির্ভরশীল হবে না।" ইসলামী শ্রমনীতির প্রধান বাস্তবায়নকারী নবী (স.) রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রোজগারহীন লোকদের জন্য কর্মের সংস্থান করার দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি নিজে বেকার লোকদের কাজে নিযুক্ত করতেন এবং জীবিকার্জনের কার্যকর পন্থা বলে দিতেন।

নিয়োগ সম্পর্কিত চুক্তি:

আধুনিক কর্মী ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কার্যাবলীতে শ্রমিক ও মালিক বা ব্যবস্থাপনার মধ্যে নানাবিধ চুক্তি সম্পাদনের আবশ্যকতা দেখা দেয়। যেমন নিয়োগ, বদলি, কাজের প্রকৃতি, সময়, মজুরী, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ভাতাদি, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি অনেক বিষয় চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হয়। শ্রমিক ও নিয়োগ-কর্তার মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি এড়ানোর জন্য এই ধরণের চুক্তি লিখিত হওয়া উচিত। ইসলামী শ্রমনীতিতে এই ধরণের চুক্তির ওপর গুরুত্বআরোপ করা হয়েছে।

৪৫. আল-কুরআন, ৬:১০৯
৪৬. উদ্ধৃত: আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৪৭. ঐ, পৃ. ৪৩
৪৮. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৮১
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৮৬

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ বলেছেন, "এক ব্যক্তি উভয় পক্ষের সহিত সুবিচারপূর্ণ চুক্তিপত্র লিখে দেবে।" সংশ্লিষ্ট পক্ষ অশিক্ষিত হলে শিক্ষিত ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনের সহায়তা করবে। এতে সুবিধা হল যে একজন সাক্ষীও পাওয়া গেল। যিনি লেখাপড়া জানেন। সুতরাং, সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে চুক্তি সম্পাদনে অস্বীকার করা তার উচিত নয়। শুধু চুক্তিবদ্ধ হলেই চলবে না সে চুক্তি প্রতিপালনের জন্যও ইসলাম জোর তাগিদ করেছে। সূরা বনি ইসরাইলে আল্লাহ বলেন, "ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর। ওয়াদা সম্পর্কে তোমাদের যে জবাবদিহি করতে হবে তাতে সন্দেহ নেই।"[৫০] সূরা বাকারাতেও বলা হয়েছে, "চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর তা পূর্ণ কর।"[৫১]

হযরত মুহম্মদ (স.) তাঁর জীবদ্দশায় কিভাবে ওয়াদা ও চুক্তি প্রতিপালন করতে হয় তা দেখিয়ে গেছেন। কোন একদিন জনৈক ব্যক্তির সাথে ওয়াদা পূরণের জন্য তিন দিন পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করেছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি পালনের জন্য মুসলমানগণের স্বার্থ সাময়িকভাবে ক্ষুন্ন হলেও চুক্তি ভঙ্গ করেননি-যদিও কুরাইশগণ তা লঙ্ঘন করেছিল। সমাজের অশুভ শক্তি সদা-সর্বদা শ্রমিক ও মালিক উভয়কে বিভ্রান্ত করার জন্য তৎপর রয়েছে। কোন একটি পক্ষকে দিয়ে চুক্তি ভঙ্গ করাতে পারলেই শিল্পে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করানো যাবে এবং নিজের স্বার্থ উদ্ধার করা যাবে। লিখিত চুক্তি এই ধরনের অশুভ তৎপরতা প্রতিহত করে এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে সকল শর্ত পালনে বাধ্য করে। ইসলামী শ্রমনীতিতে চুক্তির শর্তে হ্রাস-বৃদ্ধি করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

কার্যসময় ও প্রকৃতি:

কারবার ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজের সময় ও প্রকৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজের সময় যদি উপযুক্ত না হয় তাহলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শ্রমিকের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, শ্রান্তি বাড়ে, উৎপাদনে দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হয় এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার শক্তি বিনষ্ট হয়। কাজের নির্দিষ্ট সময় ছাড়া শিফ্‌ট বদলের বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। রসূল (স.) বলেন: "মজুরগণ যে পরিমাণ কাজ সহজে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারবে, যে পরিমাণ কাজ করা তাদের সাধ্য ও শক্তিতে কুলাবে, তাদেরকে সেই পরিমাণ কাজেই নিযুক্ত করবে।"[৫২]

ILO কনভেনশন অনুসারে একজন শ্রমিককে দৈনিক আট ঘন্টা এবং সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টা কাজ করানো যাবে।[৫৩] বাংলাদেশসহ প্রায় সারা বিশ্বের শ্রমিকরা যেহেতু এতে সম্মত আছে তাই বর্তমানের দৈনিক ৮ ঘন্টা কার্য সময়কে স্বীকৃত আদর্শ কার্যসময় (Standard time) হিসাবে বহাল রাখা যেতে পারে। শ্রমিকদের সম্মতি ব্যতিরেকে অতিরিক্ত সময়ের জন্য (Over time) কাজে নিযুক্ত রাখলে সেই সময়ের জন্য বাড়তি মজুরী দিতে হবে। নবী (স.) বলেছেন, "তোমরা যদি তাদের ওপর অধিক কাজ করার দায়িত্ব অর্পণ কর তাহলে সে অনুপাতে বাড়তি মজুরী দিয়ে তাদের সাহায্য কর।"[৫৪]

শ্রমিকদের কাজের প্রকৃতিও তাদের সামর্থ অনুযায়ী হতে হবে। যে কাজ করার সামর্থ্য শ্রমিকের নেই সে কাজে তাকে নিয়োগ করা ইসলামী শ্রমনীতির পরিপন্থী। এব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা হল, "কারো ওপর সামর্থ্যের অতিরিক্ত কিছু ছাপ চাপিয়ে দেয়া যাবে না।"[৫৫] কাজের প্রকৃতি ও পরিমাণ না জানিয়ে কাউকে কাজে নিয়োগ করা যাবে না। ইসলামী অর্থ বিজ্ঞানের দাবী হল শ্রমিকদের সাথে

৫০. আল-কুরআন, ১৭:৩৪
৫১. আল-কুরআন, ২:৪০
৫২. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৯, কিতাবুল ঈমান।
৫৩. আইএলও বুলেটিন, আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর, ঢাকা-১৯৮৬, ধারা-২, পৃ. ২
৫৪. মুসলিম আল-হাজ্জাজ আল কুশাইরী, সহীহ আল-মুসলিম, কুতুবখানা রশিদিয়্যা, দিল্লী-১৪০৮ হিজরী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-৩১৪০
৫৫. উদ্বৃত: আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

কোন অমানবিক আচরণ যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করা। এমনকি কোথাও এমন হতে থাকলে তা বন্ধ করতে হবে। সহীহ্ মুসলিম শরীফে বলা হয়েছে, "তাকে দিয়ে এমন কাজ করাবে না যা তার সাধ্যের অতীত। ঘটনাক্রমে তার ওপর আরোপিত কার্যভার অধিক হয়ে পড়লে নিজেও তাকে সে কাজে সহায়তা করবে।

শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে এমন কোন কাজে তাদের নিয়োগ করা অনুচিত। এ সম্পর্কে মুহাল্লা ইবনে হাজম বলেন, "কর্মচারীদের নিকট থেকে কেবলমাত্র সেইরূপ কার্য আদায় করা নিয়োগকারীর কর্তব্য যা তারা সহজে সম্পাদন করতে পারবে। তাদের দ্বারা এমন কাজ করানো যাবেনা যাতে তাদের স্বাস্থ্য বিনষ্ট হতে পারে।"[৫৬] নবী (স.) কে কাজের প্রকৃতি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "কোন ধরণের কাজ উত্তম?" উত্তরে তিনি বলেন "ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন কাজ যদিও তা পরিমাণে কম হোক না কেন।" তিনি শ্রমিক কর্মীদের প্রতি আহবান করেছেন, "যে পরিমাণ কাজ তোমরা সহজে সম্পন্ন করতে পার, সেই পরিমাণ কাজেরই দায়িত্ব গ্রহণ করা।"[৫৭]

কর্মীদের ওপর সাধ্যমত কাজ অর্পণ করলে পরকালেও পুরস্কারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নবী (স.) বলেছেনঃ "তোমরা তোমাদের কর্মচারীদের থেকে যতটা হাল্কা কাজ নেবে, তোমাদের আমলনামায় ততটা পুরস্কার ও পুণ্য লেখা হবে।"[৫৮] এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, ইসলাম কঠিনতম কাজে শ্রমিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করেছে। বরং উপযুক্ত সংখ্যক লোক নিয়োগকে বা দক্ষ লোক নিয়োগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। অনেক সময় মালিকের অজ্ঞাতে শ্রমিকদের ওপর সাধ্যাতীত কাজ অর্পিত হতে পারে। এজন্য মালিকের উচিত মাঝে মধ্যে তত্ত্বাবধান করে দেখা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। হযরত উমর (রা.) রাতে মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে বেড়াতেন এবং যেখানে কোন মজুর বা দাসকে কোন সাধ্যাতীত কাজে নিযুক্ত দেখতে পেতেন তাকে তা হতে মুক্ত করে দিতেন।৩৭ নবী (স.) বলেন, "শ্রমিককে এমন কাজে বাধ্য করা যাবে না যা তাকে দুঃসাধ্যতার কারণে অক্ষম ও অকর্মণ্য বানিয়ে দেবে।"[৫৯]

অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নিয়োগঃ

কিশোর ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকারা সমাজের স্নেহের পাত্র এবং জাতির ভবিষ্যৎ। বাল্যকাল তাদের শিক্ষা লাভের সময়। সেই মূল্যবান জীবন গড়ার সময় যদি তাদের জীবিকার্জনের মত বাস্তবতার সংগ্রামে নামতে হয় তাহলে জাতি ভবিষ্যতে কর্মক্ষম নাগরিক থেকে বঞ্চিত হতে বাধ্য। সুতরাং, তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্য ইসলামে তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। কুরআনের বাণী হল, "আল্লাহ্ কাউকে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কষ্ট আরোপ করেননা।"[৬০] অর্থাৎ সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপানো আল্লাহ্র নীতি নয়। সেদিক থেকে আমাদেরও উচিত নয় অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ওপর সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপানো। এটা রীতিমত মানবতা এবং নৈতিকতা বিরোধী কাজ। অপ্রাপ্ত বয়স্করা স্নেহে বড় হলে তারা আত্মনির্ভরশীল হতে শেখে, পক্ষান্তরে অবহেলায় বড় হলে ভীত হতে শেখে। রসূল (স.) ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ করেছেন। বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিয়োগ সম্পর্কে বিধান রয়েছে। এর প্রয়োগ যথাযথ করলে এবং সরকার তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ভাতার ব্যবস্থা করলে এ সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে।

---

৫৬. উদ্বৃতঃ মুহাম্মদ জাকির হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯
৫৭. উদ্বৃতঃ আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৫৯. আল-কুরআন, ২.২৮৬
৬০. আল-কুরআন, ৪:৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে দেশে স্বাভাবিক কারণে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের সংখ্যাল্পতার কোন কারণ নেই। যদি যুদ্ধবিগ্রহ বা অন্য কারণে এদের সংখ্যা হ্রাস পায় তাহলে শ্রমিকের ঘাটতি পড়তে পারে। অন্যথায় শ্রমিকের ঘাটতি পড়ার কথাও নয়, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নিয়োগেরও প্রশ্ন আসে না। যদি জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নিয়োগ করতেই হয় তাহলে তাদের ওপর হাল্কা কাজের ভার অর্পণ করতে হবে। যদি স্বাস্থ্য হানিকর কোন কাজ অর্পণ করা হয় তাহলে কম পারিশ্রমিকে অধিক কাজ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু জাতির দীর্ঘকালীন ফলাফল হবে মারাত্মক। সুতরাং নিয়োগকারীর এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত।

পদোন্নতি:

একজন কর্মচারী দীর্ঘদিন এক পদে দায়িত্ব পালনের পর অধিক আর্থিক সুবিধা, সম্মান ও মর্যাদা লাভের জন্য পদোন্নতির আশা করে। তার কামনার পেছনে যুক্তি হল যে, সে অধিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। পদোন্নতির প্রধান দুটো ভিত্তি হল জ্যেষ্ঠত্ব (Seniority) এবং সামর্থ্য (Ability) উল্লিখিত ভিত্তি দুটোর বেলাতেই বৈষম্য প্রদর্শনের অবকাশ রয়েছে। কারণ কাউকে বঞ্চিত করে অপরকে পদোন্নতি দেয়ার ইচ্ছা করলে তাকে অধিক সমর্থ বা দক্ষ দেখানোর সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ইসলামী শ্রমনীতিতে সম্পূর্ণ ন্যায় পরায়ণতা তথা ইনসাফের ভিত্তিতে পদোন্নতির কথা বলা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমাদের সেই সব ধন সম্পদ যা আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবনে প্রতিষ্ঠার উপকরণ স্বরূপ বানিয়েছেন তা অজ্ঞ লোকদের আয়ত্তে ছেড়ে দিও না। অবশ্য তাদের খাওয়া ও পরার জন্য ব্যবস্থা কর এবং তাদের সদুপদেশ দাও।"[৬১]

উৎকলিত আয়াতে পদোন্নতির যে ভিত্তির কথা বলা হয়েছে তা অত্যন্ত সুদূর প্রসারী এবং ব্যাপক। একজন কর্মীর চাকুরীর মেয়াদ অন্য জনের চাইতে বেশী হলেও সে উচ্চ পদের দায়িত্ব পালনের উপযোগী নাও হতে পারে। তেমনি আরেকজন কর্মচারীর পর্যাপ্ত দৈহিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তার পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা শান্তিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের যোগ্যতা নাও থাকতে পারে। সুতরাং, উচ্চ পদের দায়িত্ব পালনের জন্য একমাত্র জ্যেষ্ঠত্বই যোগ্যতার নির্ভযোগ্য ভিত্তি হতে পারে না। বরং সৎ, ন্যায়-পরায়ণ, পারদর্শী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিই পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্য বিবেচিত হতে পারে। কুরআনের আয়াত বিশ্লেষণ করলে প্রধানত নিম্নের কয়েকটি বিষয় স্পষ্টরূপে ফুটে উঠে:

(ক) অজ্ঞ বা অশিক্ষিত লোকজন বিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত লোকজনই পদোন্নতির উপযোগী;

(খ) অজ্ঞ কর্মচারীদের তাই বলে উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা যাবে না বরং তাদের জীবিকার্জন এবং বাড়তি খরচ নির্বাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে;

(গ) তারা যাতে হতাশ না হয় বরং পরবর্তীকালে পুনরায় পদোন্নতির সুযোগ লাভ করতে পারে সেজন্য অনুপ্রাণিত (Motivated) করতে হবে উপদেশ দানের মাধ্যমে;

(ঘ) উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোন কোন সময় উচ্চ পদে পদোন্নতি না হয়ে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সামর্থ্য, যোগ্যতা এবং সেই সঙ্গে বিশ্বস্ততার গুণ থাকা আবশ্যক বলে কুরআন ঘোষণা করেছে। মোট কথা পদোন্নতির সময় জ্যেষ্ঠত্ব ও সামর্থ্যের দোহাই দিয়ে যাতে কোন বৈষম্যের সৃষ্টি করা না হয় সেদিকে নজর রাখা ইসলামী শ্রমনীতির দাবী।

---

৬১. আল-কুরআন, ৯৬:১

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন:

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্য মোটামুটি এক হলেও এগুলোর মধ্যে কিছু পার্থক্য বিভিন্ন লেখক নির্দেশ করেছেন। যাহোক, ইসলাম কর্মচারীর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়নের ব্যাপারেও নীরব থাকেনি। বর্তমান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় যে গাইড সরবরাহ করা হয় তা ইসলামের নবী ও রাসূলদের নিকট আসমানী কিতাব নাযিলের হুবহু অনুকরণ বৈ কিছু নয়। এছাড়াও ইসলাম মুসলমানদের প্রতিদিন পাঁচবার ও সপ্তাহে একবার নামাজে, বৎসরে দুই ঈদে, জীবনে একবার হজ্জে একত্রিত করে যে প্রশিক্ষণের বিধান দিয়েছে সেরূপ নিয়মিত প্রশিক্ষণের কোন বিধান, কোন মতবাদ আজ পর্যন্ত প্রচলন করতে পারেনি। পবিত্র কুরআনে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার উপর সর্বাগ্রে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। "পড় তোমার প্রভূর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"[৬২] জ্ঞানার্জনের উপর গুরুত্বআরোপ করে আরো বলা হয়েছে, "বলে দিন, যাদের জ্ঞান আছে এবং যাদের নেই, তারা কি সমান হতে পারে।"[৬৩] বিংশ শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে মানবতাবাদী, মনো আচরণ বিজ্ঞানী (Behavioral Scientists) নির্দেশ মাফিক কাজ না করে অবাধ্য হলে ঋণাত্মক প্রেষণার (Negative Motivation) যে সমস্ত পদ্ধতির কথা বলেছেন, তা গোটা মানব জাতিকে অসৎভাবে জীবন যাপন থেকে বিরত রাখা ও সৎ, সুশৃঙ্খল এবং শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করার উদ্দেশ্যে দোজখের ভীতি ও বেহেশতের ভরসা প্রদর্শনের দৃষ্টান্তের অবিকল অনুকরণ। উক্ত প্রশিক্ষণের পরে কোন বিচ্যুতি ঘটলে কি হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, তিনি সর্বদাই "তাঁর বাণীই প্রচার করেন ও বাস্তবায়িত করেন। যদি এর বরখেলাপ হত হবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হস্ত ধরতেন।"[৬৪] এত কড়া নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের মধ্যে প্রশিক্ষণের নজীর ধর্মীয় ইতিহাসে বিরল। রসূলুল্লাহ (স.) জ্ঞানার্জনের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয।" সুষ্ঠুভাবে জ্ঞান অর্জন করলে কর্মচারীরা কর্মদক্ষতা অর্জন করে এবং তাতে প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাই মহানবী দক্ষ কর্মীদের উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "চৌকস এবং সুদক্ষ শিল্পীকে আল্লাহ্ ভালবাসেন।" প্রশিক্ষণের ফলপ্রসূতার জন্য প্রয়োজন নির্ধারণ (Needs Assessment), কর্মসূচী প্রণয়ন (Designing Programmes), কর্মসূচী বাস্তবায়ন (Implementation), পদ্ধতি, সহায়ক প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষার্থী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ সুবিধা ও ভাতা প্রদান প্রভৃতি অনেক বিষয় জড়িত। কর্মচারীদের উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিয়োগকারী সংস্থা অথবা সরকারের। যাতে করে প্রতিটি কর্মচারী ও তাদের সন্তানগণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে তার জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। ফলে ভবিষ্যত দক্ষ কর্মী পাওয়া সহজ হবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বৈষম্য প্রদর্শন না করা ইসলামী সার্বজনীন বিধানের দাবী।

মজুরী নির্ধারণ:

আধুনিক কর্মী ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিল্প ও কারবার প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে প্রধানত: এই বিষয়টি নিয়ে অধিকাংশ মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। একজন শ্রমিক বা কর্মচারী তার দৈহিক বা মানসিক শ্রম বিনিয়োগ করে কিছু পাওয়ার জন্য।

৬২. আল-কুরআন, ৫৩:৩৯
৬৩. আল-কুরআন, ২:৪৯
৬৪. উদ্বৃত: আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. পৃ. ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োগকর্তার চাহিদামত শ্রম দেয়ার পর তাই সে স্বভাবতঃই ন্যায্য পারিশ্রমিক কামনা করে। মজুরী হিসাবে শ্রমিক যা পায় তা দিয়ে সে পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে এবং সমগ্র মাস হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। ইসলামী শ্রমনীতির তাই অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হল মজুরী। ইসলামের মজুরী-নীতি অত্যন্ত কল্যাণকর। এই শ্রমনীতিতে তাই সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ। মজুরী প্রদান পদ্ধতির আওতায় নিম্নের বিষয়সমূহ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবী রাখে।

১. মজুরী চুক্তি: নিয়োগের সময় মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে মজুরী প্রদানের শর্ত, পরিমাণ প্রভৃতি সম্পর্কে লিখিত চুক্তি থাকা আবশ্যক এবং উক্ত সম্মতিতে শ্রমিককে স্বত:স্ফূর্তভাবে রাজী থাকতে হবে। এ ব্যাপারে রসূল (স.) বলেছেন, "মজুরী নির্ধারণ করা ব্যতীত কোন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করোনা।" অন্য হাদিসে বলা হয়েছে, "তুমি যখন কোন মজুর নিয়োগ করবে তখন তাকে তার মজুরী কত হবে তা অবশ্যই জানিয়ে দেবে।"[৬৫] অন্যথায় উভয়ের মধ্যে অসন্তোষ, অন্যকে ঠকানোর প্রবণতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পেতে পারে।

২. মৌলিক প্রয়োজন: শ্রমিকের মজুরী নির্ধারণের সময় তার নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের মৌলিক প্রয়োজনের কথা মনে রাখতে হবে। ইসলামী ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ ছয়টি প্রয়োজনকে মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এগুলো হচ্ছে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং বিবাহ। শ্রমিকের এইসব মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য যে অর্থ দরকার তাকে সে পরিমাণ পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করতে হবে। মৌলিক প্রয়োজনের কয়েকটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে যে, হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত (স.) বলেছেন: "এই বস্তুগুলোর মধ্যে প্রতিটি আদম সন্তানের অধিকার রয়েছে। বাসস্থানের জন্য ঘর, লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য বস্ত্র এবং স্বাভাবিক খাদ্য ও পানীয়।" আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে, "আমাদের অধীনে চুক্তিবদ্ধ কোন শ্রমিকের যদি বাসগৃহ না থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে; যদি যাতায়াতের খরচ বহন করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে অবশ্যই তা তাকে দিতে হবে।" একজন শ্রমিকের ওপর কিছু সংখ্যক লোকের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব থাকে, তাদের প্রতিপালনের খরচ স্বীকার করে বেতন নির্ধারণ করতে হবে। অন্যথায় শ্রমিক তার দায়িত্ব পালনে অপারগ হতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, রসূল (স.) বলেন, "যার ওপর যার লালনপালন করার দায়িত্ব রয়েছে তা উপেক্ষা করাই একজন ব্যক্তির গুনাহ্গার হওয়ার জন্য যথেষ্ট।" মুসলিম শরীফে বলা হয়েছে, "অধীনস্থদের খোরপোষ দিতে হবে।"[৬৬] শ্রমিকদের নানা প্রকার সুবিধা প্রদানের সাথে উৎপাদনশীলতা একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অবশ্যই রয়েছে। উৎপাদনশীলতা ও মুনাফা বৃদ্ধি না পেলে উল্লিখিত বাড়তি সুবিধাদি সৃষ্টি করা কর্তৃপক্ষের পক্ষে কষ্টকর হয়।

৩. মূল্যস্তর বিবেচনা: বাজার মূল্যস্তর শ্রমিকের প্রকৃত আয়কে প্রভাবিত করে। মূল্যস্তর বৃদ্ধি পেলে শ্রমিকের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং প্রাপ্ত অর্থে তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয় না। তাই মজুরী নির্ধারণের সময় ইসলামী শ্রমনীতির দাবি অনুসারে বাজারস্তরের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে তা করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর বেতন ও মজুরী কমিশন গঠন করে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মূল্যস্তর বিশ্লেষণপূর্বক বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা যেতে পারে। মূল্যস্তর বৃদ্ধি পেলে কাঁচামালের ও অন্যান্য উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদক ও পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে। দেখা যায় এমনিভাবে বছরে কয়েকবার পণ্যমূল্য নির্ধারণ করা হয়। ব্যতিক্রম দেখা যায় শুধু কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধির বেলায়।

---

৬৫. হাদীসগুলো উদ্বৃত: আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৬৬. সাইয়িদ আবুল আলা-মওদুদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে এই ধরণের প্রবণতা কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ। হযরত (স.)-এর আমলে একবার এইরূপ দ্রুত মূল্যস্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলে তিনি পণ্য মূল্য নির্ধারণ করে না দিয়ে বরং নৈতিক প্রচারণা ও প্ররোচনার মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের মধ্যে খোদাভীতি সৃষ্টি করে তা সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করেন।[৬৭]

৪. **বেতনে সমরূপতা আনয়নঃ** মৌলিক প্রয়োজনের দিক থেকে মালিক ও শ্রমিক উভয়ই সমান। জীবন ধারণের জন্য মালিকের যেসব উপকরণ অত্যাবশ্যক, স্বাভাবিকভাবে শ্রমিকেরও তাই দরকার। সেদিক থেকে ইসলামের দাবী হল মালিক ও শ্রমিকের প্রাপ্য "অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে সমান হতে হবে।" এ ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে নবী (স.) বলেন, "তারা (শ্রমিকরা) তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। কারো ভাই তার অধীনে থাকলে তার উচিত নিজে যা খাবে তাকেও তাই খেতে দিবে, নিজে যা পরিধান করবে তাকেও তাই পরতে দেবে।"[৬৮] মোটকথা হল মালিক পক্ষ শ্রমিকদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত থাকলেই তাদের সমস্যা অনেকটা হ্রাস পেতে পারে।

৫. **বেতনের পার্থক্যঃ** ইসলাম প্রতিটি মানুষকে যেমন 'ভাই ভাই' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই বলে ঘোষণা দিয়েছে, ঠিক তেমনি যোগ্যতা ও সামর্থ্যের মূল্য দিতেও কার্পণ্য করেনি। মানুষ কষ্ট করে যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করে। আল্লাহ মানুষকে সে ক্ষমতা দিয়েছেন, এমনকি আল্লাহ কারো পরিশ্রমকে কখনও ব্যর্থ করেন না; এই নীতিতে ইসলামী শ্রমনীতিতে শ্রমিক ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার মধ্যে মজুরীতে পার্থক্য থাকতে পারে। হযরত উমর (রা.) নিম্নের পাঁচটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে মজুরী হার নির্ধারণ করতেনঃ

(ক) সেই ব্যক্তি ইসলামের জন্য কী পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে।

(খ) সেই ব্যক্তি ইসলাম প্রচারে কতখানি অগ্রসর হয়েছে।

(গ) সেই ব্যক্তি ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কতখানি দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করেছে।

(ঘ) সেই ব্যক্তির ইসলাম মোতাবেক জীবন-যাপনের জন্য প্রকৃত প্রয়োজন কত?

(ঙ) তার ওপর পরিবারের কতজনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রয়েছে।[৬৯]

সুতরাং দেখা যায় যে, কার্যের পরিমাণ, ত্যাগের পরিমাণ এবং প্রয়োজনের পরিমাণের ওপর বেতনের পার্থক্য নির্ভর করে। এছাড়া শিক্ষার মান, আমানতদারী, শারীরিক যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা প্রভৃতি অবস্থার ওপর ভিত্তি করে কর্মচারীদের বেতনে পার্থক্য হতে পারে। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের বাণীসমূহ প্রণিধানযোগ্যঃ

১. যারা জানে আর জানেনা, তারা কি কখওন সমান হতে পারে?[৭০]

২. হযরত ইউসূফ (আ.) বলেনঃ "দেশের অর্থ ভাণ্ডার আমার নিকট সোপর্দ করুণ আমি হেফাজতকারী ও জ্ঞানী।"[৭১] অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সম্পদ হেফাজত, বণ্টন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা ও জ্ঞান যার আছে তাকেই প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেয়া যেতে পারে। তৎকালীন মিশরের অধিপতি হযরত ইউসুফ কে সে সুযোগ দিয়েছিলেন।

---

৬৭. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-২৯

৬৮. কবির আহমদ মজমুদার, ইসলামের শ্রমনীতি ও ট্রেড ইউনিয়ন, মজদুর প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯১, পৃ. ৪৪

৬৯. আল-কুরআন, ৩৯:৯

৭০. আল-কুরআন, ১২:৫৫

৭১. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান।

Dhaka University Institutional Repository

৩. সর্বোত্তম শ্রমিক সেই যে শক্তিশালী ও আমানতদার (দায়িত্বশীল)।

৪. চৌকস ও দক্ষ শ্রমিককে আল্লাহ্ ভাল বাসেন।

ইসলামী শ্রমনীতি বেতনের পার্থক্য স্বীকার করে বটে। কিন্তু এমন পার্থক্য স্বীকার করেনা যাতে ধনী-দরিদ্র, শোষক-শোষিত, উঁচু-নীচু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় এবং শ্রেণী বৈষম্যের পথ প্রশস্ত করে।

৬. **অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা:** ইসলাম শ্রমিক-কর্মীদের ন্যায়সঙ্গত মজুরী দেয়ার নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে ভবিষ্যৎ ঝুঁকি, বিপদ, বাড়তি প্রয়োজন পূরণ প্রভৃতি কারণে কিছু অতিরিক্ত অর্থ প্রদানেরও নির্দেশ দেয়। একজন কর্মী তার চাকুরী জীবনে হঠাৎ দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে পড়তে পারে, পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতা দেখা দিতে পারে বা সামাজিক কোন প্রয়োজনে বাড়তি অর্থ প্রয়োজন পড়তে পারে। এছাড়া ঈদ বা অন্যান্য উৎসবে সন্তানসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সন্তুষ্ট করার আবদার থাকতে পারে।

এ অবস্থায় তাদের বাড়তি কিছু অর্থ দেয়া যেতে পারে। কর্মচারীদের ঘরবাড়ী নির্মাণ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি প্রভৃতি প্রয়োজনেও বাড়তি অর্থ দরকার হতে পারে। উপরন্তু ছেলে-মেয়ের বিবাহ, শিক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনতো রয়েছেই। কর্মচারীর মৃত্যুর পর তার সন্তান ও পরিবার-পরিজনকে যাতে অন্যের দ্বারস্থ হতে না হয় সেজন্যও সঞ্চয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বুখারী শরীফে বলা হয়েছে 'তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের সর্বশান্ত করে অপর লোকদের মুখাপেক্ষী করে রেখে যাবে তার চেয়ে তাদেরকে সচ্ছল ও পরমুখাপেক্ষীহীন করে রেখে যাওয়া উত্তম।"[৭২]

মালিকের সামর্থ্য বিবেচনা: কারবারী ও শিল্প জগতে মালিকের প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের হতে পারে। কোন মালিকের শিল্প প্রতিষ্ঠিত ও ঐতিহ্যবাহী আবার কারো শিল্প নব প্রতিষ্ঠিত এবং বিদেশী প্রতিযোগী শিল্পের সাথে মোকাবিলারত। এমতাবস্থায় শ্রমিকদের উচিত মালিকের সামর্থ্য বিবেচনা করে মজুরীর জন্য দাবী করা। অনেক সময় কর্মী তার দক্ষতার মূল্য স্বরূপ অধিক বেতন দাবী করে বসে-আর মালিক তা প্রদানে অপারগ হলে কর্মী চাকুরী পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। ফলে প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত এবং প্রতিযোগিতার শক্তি বিনষ্ট হয়। ইসলামী শ্রমনীতি উল্লিখিত অবস্থায় কর্মীদের পরামর্শ দেয় যেন তারা মালিকদের অপরাগতার সুযোগ গ্রহণ না করে এবং প্রার্থিত মজুরীর জন্য জিদ না করে ও অপেক্ষাকৃত কম মজুরীতে রাজী হয়। হায়সামী থেকে বর্ণিত, রসূল (স.) বলেন: "নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না।[৭৩] এখানে আপাত: দৃষ্টিতে বক্তব্যটি বিপরীতমুখী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে পারস্পরিক সহযোগিতার ওপরই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে-এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৮. **চাকুরীর উদ্দেশ্যে হিজরত:** অনেক সময় শ্রমের চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ বেড়ে গেলে মজুরী হ্রাস পায়। ফলে কর্মীরা মৌলিক প্রয়োজন পূরণ উপযোগী মজুরী লাভ করতে পারেনা। তাদের জন্য এই অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন হয়ে থাকে। কুরআনে এই সমস্যার সমাধানকল্পে বর্ণিত যে, এমতাবস্থায় তাদের দেশ-বিদেশে আসা-যাওয়া এবং মজুরীর সন্ধানে স্থানান্তরে যাবার পথ উন্মুক্ত রাখতে হবে-যেন প্রত্যেকেই নিজের শ্রম শক্তির সঠিক মূল্য লাভের অনুকূল ক্ষেত্রের সন্ধান করতে পারে। কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহর পথে যে হিজরত করবে, সে দুনিয়ায় স্বাচ্ছন্দ্য ও বিপুল প্রাচুর্য লাভ করবে।"[৭৪]

---

৭২. উদ্ধৃত: আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৭৩. আল-কুরআন, ৪:১০০

৭৪. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মজুরী পরিশোধঃ

ইসলাম শ্রমিকের মজুরী পরিশোধের ব্যাপারে অত্যন্ত স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছে। চুক্তি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক অধীর আগ্রহে তার পাওনার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে। সুতরাং, তার পাওনা পরিশোধ করা মালিকের অবশ্য কর্তব্য। এতে কর্মচারীর মধ্যে প্রেরণা বৃদ্ধি পায়, মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং কাজের দুঃখ-কষ্ট বিদূরিত হয়। "শ্রমিকের কাজ সমাপ্ত হবার সাথে সাথে তার মজুরী পুরোপুরি পরিশোধ করে দিতে হবে।"[৭৫] রসূল (স.) আরো বলেন, "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার মজুরী পরিশোধ কর।" হাদিসে আরো বলা হয়েছে, "নবী (স.) মজুরের মজুরী দানের ব্যাপারে কোনরূপ জুলুম করতেন না এবং জুলুমের প্রশ্রয় দিতেন না।" যথার্থরূপে মজুরী পরিশোধ না করার পরিণাম সম্পর্কে হাদিসে চরম হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত (স.) বলেন, "শেষ বিচারের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিপক্ষ গ্রহণ করব; যে ব্যক্তি আমার নামে প্রতিজ্ঞা করে অথচ অবিশ্বাসীর মত কার্য করে, যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে সে অর্থ নিজে গ্রহণ করে এবং সেই ব্যক্তি যে কোন লোককে কার্যে নিয়োগ করে সে অর্থ নিজে গ্রহণ করে এবং সেই ব্যক্তি যে কোন লোককে কার্যে নিয়োগ করে তার নিকট থেকে পূর্ণ কাজ আদায় করে কিন্তু পারিশ্রমিক পরিশোধ করেনি।"[৭৬]

উপরে উল্লেখিত হাদিস থেকে প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ব্যবস্থাকদের সতর্ক হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

অন্যান্য সুবিধাঃ

পারিশ্রমিক ছাড়াও কর্মচারীর আরো অন্যান্য আর্থিক এবং অনার্থিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। ন্যায়সঙ্গত মজুরীনীতি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শুধু আর্থিক মজুরী বিধানই ইসলামী শ্রমনীতি দেয়নি বরং অর্থনৈতিক প্রণোদনার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। নিম্নে এই ধরণের কিছু সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ করা গেল:

১. **উৎপাদিত পণ্যে অংশঃ** শ্রমিক মজুরদের হাতে যে পণ্য উৎপাদিত হয় তার একটা অংশ তাদের বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে দিতে হবে। এই মর্মে হাদিসে বলা হয়েছেঃ "শ্রমিককে তার শ্রমোৎপন্ন জিনিস থেকে অংশ দান কর। কারণ খোদার শ্রমিককে কিছুতেই বঞ্চিত করা যেতে পারেনা।" রসূল (স.) আরো বলেন, "তোমাদের কোন ভৃত্য যদি তোমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে আনে তখন তাকে নিজের সঙ্গে খেতে বসাবে। যদি না বসাও তাহলে দু'এক মুটি খাদ্য অন্ত তঃ তাকে অবশ্যই দেবে। কারণ সে আগুনের উত্তাপ এবং খাদ্য প্রস্তুত করার কষ্ট সহ্য করেছে।"[৭৭]

২. **বাসস্থানঃ** শ্রমিক ও তার পরিবারবর্গকে বাসস্থান চিকিৎসা, শিক্ষা, নির্দোষ, আমোদ-প্রমোদ ও অন্যান্য দিক দিয়ে সুবিধা প্রদান করতে হবে।

৩. **মুনাফাঃ** মুনাফা বণ্টনের সময় বোনাস হিসেবে কিছু পরিমাণ অর্থ তাদের দিতে হবে।

৪. **কারবারের অংশঃ** বোনাস ছাড়াও (কিংবা বোনাসের পরিবর্তে কারবারসমূহে) এক বা একাধিক শেয়ার দিতে হবে। এভাবে চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে সাথে মূল ব্যবসায়ে তার শেয়ারের পরিমাণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এর ফলে সে ব্যবসায়ের কল্যাণকামী, উৎসাহী হয়ে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করবে।

---

৭৫. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান।
৭৬. উদ্ধৃতঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬
৭৭. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

৫. **কর্জে হাসানা:** বিপদ-আপদে ব্যবসায়ের কোন তহবিল থেকে কর্মচারীদের আর্থিক সাহায্য (কর্জে হাসানা) দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।

৬. **সহৃদয় সম্পর্ক:** মালিক ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের কর্মচারীদের কর্তব্য হল, অধীন শ্রমিকদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখা; কথা-বার্তা, উঠা-বসার ক্ষেত্রে ভ্রাতৃসুলভ আচার-ব্যবহার প্রদর্শন করা, মৃত্যু, রোগ-শোক ও অন্যান্য ঘটনা-দুর্ঘটনাকালে নিজেরা উপস্থিত হয়ে সহানুভূতি ও সহৃয়তা প্রদর্শন করা।[৭৮]

৭. **ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ:** সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুবিধার্থে কর্মচারীদের সাথে পরামর্শ করে তা করার জন্য ইসলামে তাগিদ দেয়া হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে: "তুমি লোকদের সাথে প্রত্যেক বিষয়ে পরামর্শ কর।"[৭৯]

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক:

আজকাল শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক সম্পর্ক এক বিরাট সমস্যা নিয়ে বিদ্যমান। ধনবাদী অর্থনীতির ভিত্তি যেহেতু আত্মসর্বস্ব ব্যক্তিস্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই সেখানে মালিক-শ্রমিকের মধ্যে এক রুক্ষ ও কৃত্রিম সম্পর্ক বিরাজমান। সকলেই নিজ স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত। এর প্রতিক্রিয়ায় কার কি হচ্ছে না হচ্ছে সেদিকে তাকাবার ফুসরত নেই কারও।

এই স্বার্থান্ধতার ফলে শ্রমিক ও মালিক আজ দুটি মারমুখী প্রতিদ্বন্দ্বী দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আজ একজন শ্রমিক ততক্ষণই শিল্প-মালিকের কাছ থেকে তার মানবিকতার মর্যাদা পায়, যতক্ষণ কোন মালিক তার কাজ আদায় করে নিতে গিয়ে কোন শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল থাকে। কিন্তু যখনই এই প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে আসে তখনই মালিক মেহনতি শ্রমিকশ্রেণীর উপর অত্যাচারের ষ্টিম রোলার চালাতেও দ্বিধা করে না।

আর অন্যদিকে শ্রমিক ও মালিকের কাজে ততক্ষণই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে, যতক্ষণ তার জীবিকা কোন মালিকের উপর নির্ভর করে। কিন্তু যেখানেই এই বাধ্যবাধকতা থাকে না সেখানেই শ্রমিক কাজে গাফলতি ও মালিকের বিরুদ্ধে হরতাল এবং ঘেরাও অভিযান করতেও পিছপা হয়না। যার পরিণতিতে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে এক চিরন্তর দর-কষাকষি বিদ্যমান এবং তাদের পরস্পরে কোন সৌহার্দপূর্ণ ও গঠনমূলক সম্পর্ক কায়েম হয়ে উঠতে পারছে না।

পক্ষান্তরে ইসলাম এদিকে সবসময়ই লক্ষ্য রেখেছে যে, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক যেন একেবারে শুষ্ক ও কৃত্রিম না হয়ে পড়ে। কারণ এ সর্বজনমান্য কথা যে শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ব্যতিরেকে কোনদিন সুষ্ঠু উৎপাদন আশা করা যেতে পারে না। ফলে, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে না।

ইসলাম তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ভিত্তিতে এক সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক কায়েম করে। ইসলাম উভয়কে এমন কতকগুলো বিধি-নিষেধ দ্বারা আবদ্ধ করে দিয়েছে যাতে তাদের ঐ ব্যবসাগত সম্পর্ক কঠিন না হয়ে হয়েছে ভ্রাতৃমূলক প্রীতির।

একটি কারবার প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও মালিক একই সূত্রে ও উদ্দেশ্যে বাঁধা দুইটি পক্ষ। এদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকা প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতা ও নির্বিঘ্নে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অত্যাবশ্যক।

---

৭৮. আল-কুরআন, ৩:১৫৯

৭৯. মুহম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান।

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক মধুর না হলে উভয়ের মধ্যে রেষারেষি, দ্বন্দ্ব, বিরোধ প্রভৃতি শুরু হয়ে যেতে পারে। পরিণামে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন বিঘ্নিত হতে পারে। শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক ভাল থাকলে মালিক পক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীদের মঙ্গলের চিন্তা করবে, শ্রমিকগণও নিজের প্রতিষ্ঠান মনে করে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করবে। ফলে উভয়ের কল্যাণ ত্বরান্বিত হবে।

রসূল (স.)-র ভাষায়, ভাই সর্বদা অন্য ভায়ের মঙ্গল কামনা করে এবং তার পছন্দ-অপছন্দকে নিজের সাথে একত্রিত করে ফেলে। হযরত আনাস (র.) বলেন, নবী (স.)-এরশাদ করেন: "যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারে না যে পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্য ভায়ের জন্যও তা পছন্দ করে।"[৮০] আল্লাহর নবী শ্রমিকের অন্তরের অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আন্তরিকভাবে আহবান জানিয়ে বলেন: "তোমরা অধীনস্থদের সহিত সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদেরকে কোন রকমের কষ্ট দেবে না। তোমরা কি জান না যে তাদেরও তোমাদের ন্যায় একটি হৃদয় আছে; ব্যথা দিলে তারা দুঃখিত হয় এবং কষ্টবোধ করে। পক্ষান্তরে আরাম ও শান্তি দিলে সন্তুষ্ট হয়। তোমাদের কি হয়েছে যে, তাদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন কর না।"[৮১]

শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ হওয়ার পর তাদের অপরাধ ক্ষমা করার জন্য মালিক পক্ষকে আহবান জানানো হয়েছে। একদিন জনৈক সাহাবী চাকর-খাদেমদের অপরাধ কতবার ক্ষমা করা যাবে জিজ্ঞেস করলে রসূল (স.) বলেছিলেন, "প্রতিদিন সত্তর বার হলেও তাকে ক্ষমা করে দিও" (এ যে তোমার ভাই)"[৮২] অন্যত্র বর্ণিত আছে, "মজুর-চাকরদের অপরাধ অসংখ্যবার ক্ষমা করা মহত্ত্বের লক্ষণ।" অসদাচরণকারী মালিক সম্পর্কে তিনি বলেন, "অসদাচরণকারী মালিক বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[৮৩] হযরত আনাস (রা.) তাঁর জীবনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, "রসূল (স.) তাঁকে কোন কাজে পাঠিয়ে সে কাজের পরিবর্তে খেলা করা অবস্থায় হাতে নাতে ধরার পরও রুষ্ট হননি বা ভৎর্সনা করেননি।"[৮৪] তিনি আরো বলেন যে, সুদীর্ঘ ১০ বছরকাল সময়ের মধ্যে হযরত (স.) কোনদিন তাঁর অধীনস্থদের কাছ থেকে কড়াকড়িভাবে ও ধমকের সুরে কাজের হিসাব নেননি।"[৮৫]

ওপরের আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কম শিক্ষিত বা অশিক্ষিত কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ হয়েই তাদের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নিতে হবে। তবেই শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক মধুর হতে পারে। মালিক পক্ষ যখন কর্মীদের দোষ-ত্রুটি খুঁজতে থাকলে কর্মীগণও মালিকদের প্রতি অনুরূপ আচরণ প্রদর্শন করবে।

শ্রমিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ রাখার জন্য মালিক ও ব্যবস্থাপনার যেমন কর্তব্য আছে তেমনি শ্রমিকদেরও তা রক্ষা করার দায়িত্ব রয়েছে। শুধুমাত্র এক পক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ওপর সম্পর্ক এবং শৃঙ্খলা তথা উন্নতি নির্ভর করেনা বরং শ্রমিকদেরও দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন ও কর্তব্য পরায়ণ হতে হবে।

---

৮০. ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৮১. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত তিরমিযি, সুনান আত তিরমিযী, কুতুবখানা রশিদিয়্যা, দিল্লী, ১৪০৯ হিজরী, কিতাবুল বিররি, হাদীস নং-১৮৭২

৮২. উদ্বৃত: ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৮৩. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং-৫৫৭৮

৮৪. আল-কুরআন, ১৬:৯৩

৮৫. উদ্বৃত: আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

এ পর্যায়ের শ্রমিকের সর্বপ্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য হল তাকে বিশেষ আন্তরিকতা ও গভীর মনোযোগ সহকারে অর্পিত কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় পুরোপুরি কাজের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত করতে হবে। কাজে অমনোযোগিতা, উপেক্ষা বা অবহেলা প্রদর্শন কিংবা কাজ না করে যেন তেন প্রকারে সময় কাটিয়ে দেয়া ইসলামের শ্রম আইনের দৃষ্টিতে বিশেষ অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছে। এরূপ করা হলে তাতে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ হবে এবং এজন্য তাকে আল্লাহর নিকট দোষী সাব্যস্ত করা হবে। কারো ওপর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দায়িত্ব অর্পণ করা হলে এক্ষেত্রে স্বাভাবিক নৈতিকতার দাবি হল সে উক্ত দায়িত্বপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে পালন করবে। আর এজন্য অবশ্যই তাকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। কুরআনের ঘোষণা হল; "তোমরা যা কিছু করছিলে সে বিষয়ে আমরা তোমাদিগকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব।"[৮৬] রসূল (স.) বলেন, "শিল্প মজুর যখন কাজ করবে তখন সে উত্তমরূপে কাজ করবে, আল্লাহ্ এটাই ভালবাসেন ও পছন্দ করেন।"[৮৭] ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ বলেন: "যার কাজ পূর্ণাঙ্গ, উত্তম, নিঁখুত ও মজবুত হবে, তার পুণ্য কয়েকগুণ বেশী হবে।"[৮৮]

শ্রমিক-কর্মীগণ অনেক সময় ইচ্ছাকৃত বা অবহেলা বশতঃ যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল বা অন্যান্য উপকরণের ক্ষতি করে থাকে। কুরআনের ভাষায় একে খিয়ানত বলা হয়েছে: "যে লোক বিশ্বাস ভঙ্গ করে-অর্পিত কাজ বা জিনিস বিনষ্ট করে, আল্লাহ্ তাকে ভাল বাসেন না।"[৮৯] নবী (স.) ও এ ব্যাপারে সতর্কবাণী উল্লেখ করেছেন, "যে লোক আমার সঙ্গে ধোকাবাজী করবে, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হবে না।"[৯০] তিনি ভাই তাদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন: "শ্রমিকের সবচেয়ে মঙ্গলজনক উপার্জন হল তার নিয়োগকারীর জন্য শ্রদ্ধা ও যত্ন নিয়ে কার্যসম্পাদন করা।"[৯১]

উল্লেখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক-কর্মীদের অবশ্যই তাদের ওপর অর্পিত কর্তব্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করতে হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিকের অধিকার:

ইসলাম শ্রমিকদের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে এর জন্য সুনির্দিষ্ট মৌল আঙ্গিক ধারা নিরূপণ করেছে এবং এর বুনিয়াদী সমাধান পেশ করেছে। যার সাহায্যে আমরা অতি সহজেই একটি ন্যায়ানুগ শ্রমনীতি নির্ধারণ করতে পারি। যা আজকের এই সংঘাতমুখর পৃথিবীকে শ্রেণী-সংগ্রামের অভিশাপ থেকে চিরন্তন মুক্তি দিতে পারে।

এ ব্যাপারে ইসলামের প্রথম কথা হলো, সে শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক সম্মানজনক চুক্তিকে স্বীকার করে, একে সমর্থন জানায়। আজকাল দেখা যায় শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকরা যে চুক্তি করে তা পূরণ করতে যেয়ে অত্যন্ত দীর্ঘসূত্রিতার ছত্রছায়া গ্রহণ করার অপকৌশলে তারা মেতে উঠে বিরক্তিকর টালবাহানা করতে শুরু করে দেয়। ইসলাম একে অসহ্য রকমের এক জুলুম বলে ঘোষণা করে। নবী করীম (স.) ফরমান, "সঙ্গতিসম্পন্নদের টালবাহানা করা (মারাত্মক) জুলুম।"[৯২]

---

৮৬. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮
৮৭. ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
৮৮. মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযিদ, সুনানু ইবন মাজাহ, কুতুবখানা রশিদিয়্যা, দিল্লী, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং-২৫৬৫
৮৯. মুহাম্মদ জাকির হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮
৯০. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হাওলা, হাদীস নং-২১২৫
৯১. আল-কুরআন, ৫:১
৯২. আল-কুরআন, ১৭:৩৪

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্‌পাক অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের চুক্তিগুলো অবশ্যই পূরণ কর।"[৯৩] তিনি আরো বলেন, "আর নিশ্চয়ই চুক্তি সম্পর্কে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।"[৯৪]

আবার অনেক সময় শিল্প-মালিকগণ শ্রমিকদের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে, তাদেরকে নিকৃষ্টতম ও নিম্নতম শর্তের চুক্তিতে আবদ্ধ করার প্রয়াস পায়। আর বেচারা শ্রমিক যখন নিজের ক্লিষ্ট, ক্ষুধার্ত, হাড্ডি-জিরজিরে রোগগ্রস্ত পরিবার-পরিজন ও ছেলে-মেয়েদের অন্ন সংস্থানের এবং নিজের বিপর্যস্ত অবস্থার কথা চিন্তা করে আর ভাবে এ ছাড়া তার কোন উপায় নেই, তখন সে যে কোন শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে পিছপা হয় না। আর মালিকরা তার জিগরের খুন এমনি করেই বিষাক্ত লোলুপতা নিয়ে চেটে খায়।

কিন্তু ইসলাম বলে, কারো অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তার বিপর্যস্ততার ছত্রছায়ায় যে চুক্তি করা হয়, এর শর্তাবলীর কোন মূল্য নেই। এই জুলুমের চুক্তি অবশ্যই ভেঙে ফেলতে হয়। একে ইসলাম কোন সময়ই পারস্পরিক সম্মতিক্রমে সম্মানিত ও অনুমোদিত চুক্তিপত্র বলে স্বীকার করে না। এ সম্পর্কে বলতে যেয়ে প্রাচ্যের মহান ইসলামী চিন্তাবিদ দার্শনিক হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র.) বলেন,

অনন্তর আর্থিক লাভ যদি এইভাবে হাসিল করা হয়, যার মধ্যে চুক্তিকারীদের পারস্পরিক সাহায্য এবং কার্যকরী মেহনতের সম্পর্ক না থাকে যেমন জুয়া বা দল নিজেদের সঙ্গতিহীনতার দরুণ (বর্তমান অভাব মেটানোর নিমিত্ত) এমন অনেক শর্তের দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে তৈরি হয়ে যায়, যেগুলো আদায় করা তার শক্তির বাইরে। তখন তার ঐ সম্মতি সত্যিকারের সম্মতি হয়না। তাই এমম্বিধ সমস্ত প্রকারের চুক্তি ও লেনদেন সম্মতিক্রমে অনুমোদিত বলে ধরা যায় না। আর এইগুলোর আমদানির পবিত্র ও ন্যায়ানুগ উপকরণ হতে পারে না। নিঃসন্দেহে বলা যায় এ সমস্ত চুক্তি একটি সংস্কৃতিবান দেশের জন্য নিকৃষ্টতম, বীভৎস ও বাতিল চুক্তি।[৯৫]

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মামুলী ধরণের অধ্যয়নও এর প্রমাণ ব্যক্ত করে যে, ইসলামে উভয়পক্ষের পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্মতিই কোন বিষয়ের গ্রহণীয় হওয়ার মাপকাঠি নয়। অন্যের হাতে খুন হয়ে যাওয়ার সম্মতি দিয়ে দিলেই খুনী তার অপরাধ থেকে মুক্তি পেতে পারে না। তেমনি অবস্থার চাপে কেউ কোন ব্যাপারে সম্মতি দিয়ে দিলেও তার উপর জুলুম জালানোর এখতিয়ার কোন পুঁজিপতির হতে পারে না।

তাই দেখা যায়, যেসকল বিষয় ইসলামের দৃষ্টিতে মূলত অন্যায় এবং যা দিয়ে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের ব্যাপারে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে, সেখানে পারস্পরিক সম্মতিকেই ইসলাম গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃতি দেয় না।

নবী করীম (স.) বলেছেন, "মানুষ তাদের চুক্তিবদ্ধ শর্তানুযায়ী দায়িত্বশীল হবে, যদি তা হক ও ন্যায়ানুগ হয়।"[৯৬]

---

৯৩. উদ্বৃত: ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯
৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯
৯৬. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইদী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-৩১৪১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম সর্বস্তরে ন্যায়নীতি প্রচলন করতে চায়। ন্যায়কে সে অগ্রে স্থান দেয়। যেখানেই তা আহত হয় সেখানেই সে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ইসলামের মূল কথা হলো নবী করীম (স.) বলেন, "নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়োনা এবং অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করোনা।"[৯৭]

১. মজুরীঃ আজকের সবচেয়ে মারাত্মক সংঘাত হলো, মজুরী নির্ধারণ সমস্যা। কি করে মজুরি নির্ধারণ করা হবে, এ সম্পর্কে আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ নানা মত পোষণ করে থাকেন। পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থানুসারে মজুরী নির্ধারণের সর্বাধুনিক সূত্র হলো যেমনভাবে দ্রব্যমূল্য চাহিদা ও যোগানোর অনুপাতে নির্ধারিত হয়, শ্রমের দামও তেমনি ও যোগানোর অনুপাতে নির্ণীত হবে। অর্থাৎ চাহিদা বেশি হলে মজুরী বেশি হবে কিন্তু চাহিদার তুলনায় যোগান বা সরবরাহ অধিক হলে মজুরী কমে যাবে। তারা বলেন, দ্রব্যের দাম যেমন প্রান্তিক উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল, তেমনি শ্রমিকের মজুরীও তার প্রান্তিক উৎপাদনের উপর নির্ভর করে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মজুরী নিরূপণের প্রধান সূত্র হলো-দক্ষতানুসারে কাজ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মজুরী। অর্থাৎ প্রত্যেকেরই দক্ষতা অনুযায়ী তার থেকে কাজ নেওয়া হবে কিন্তু তার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাকে মজুরী দেওয়া হবে।

সমাজবাদী দেশগুলোর বর্তমান কার্যক্রম সমাজতন্ত্রের মূল আদর্শ হতে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আজকাল সেখানেও কাজের দক্ষতানুসারেই মজুরী দেওয়া হয়ে থাকে, শ্রমিকদের প্রয়োজনানুযায়ী নয়।

মননশীলতার সাথে যাঁচাই করলে দেখা যায়, উপরোক্ত একটি মতও মজুরী নির্ধারণের সুষ্ঠু ও সুসংহত ধারা হতে পারে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিককে দ্রব্যবস্তুর মতোই প্রাণহীন ও অসহায় করে তুলেছে। দ্রব্য যেভাবে চাহিদা ও যোগানোর অধীন, তার কোন নির্দিষ্ট ধারা নেই, তেমনি শ্রমিককেও চাহিদা ও যোগানের অধীন করে ফেলা হয়েছে। এতে পুঁজিপতিদের খামখেয়ালীর উপর শ্রমিকদিগকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে পুঁজিপতিদের খামখেয়ালীর উপর শ্রমিকদিগকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমনিভাবে ক্রেতার মর্জির উপর দ্রব্যের অবস্থা নির্ণীত হয়, ঠিক তেমনি এখানে শ্রমের ক্রেতা অর্থাৎ পুঁজিপতির মর্জির উপর শ্রমিকদের অবস্থা নির্ভর করে।

এটি সর্বজনবিদিত কথা যে, আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্য দেশের অধিকাংশ অর্থ এবং কর্মবিনিয়োগ হুল পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। পরিণামে মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। এতে শ্রমিকের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে শ্রমের যোগান বেড়ে যায়। এতে শিল্প-মালিকগণ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার যথেষ্ট সুযোগ পায়, বিশেষ করে অনুন্নত দেশের শ্রমিকদের জন্য এ এক চরম অভিশাপ। আর এই জন্যই বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদগণ একে একতরফা সূত্র বলে অভিহিত করেছেন।

এ সর্বজন স্বীকৃত কথা যে, শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় করা কখনই সহজ নয়। কারণ প্রত্যেকটি উৎপাদনই কয়েকটি উৎপাদন-উপাদানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎপাদিত হয়, সম্পূর্ণ দ্রব্য হতে প্রত্যেকটি উপাদানের ব্যক্তিগত অংশ নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়।

এর বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে শ্রমিকদের দক্ষতার কোন বিবেচনাই করা হয়নি।

---

৯৭. উদ্বৃতঃ ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে নজরই দেওয়া হয়নি। মজুরী নির্ধারণের বেলায় শুধু শ্রমিকদের প্রয়োজনের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে এই ব্যাপারটি কানে মধু বর্ষণ করলেও এ দ্বারা কোনদিন কার্যোপযোগী কোন অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, হতে পারে না। কারণ শ্রমিক যদি তার দক্ষতার দাম না পায়, এর প্রতিদানে সে যদি কিছুই লাভ করতে না পারে, তবে সে দক্ষতা অর্জনের জন্য কখনই আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে না।

প্রয়োজন কখনও সমান হতে পারে না। এর মধ্যে তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। একজন ইট বহনকারী শ্রমিক যদি তার প্রয়োজন অনুযায়ী পাঁচশত টাকা মজুরী পায়, আর একজন দক্ষ মিস্ত্রী যদি তার প্রয়োজন অনুসারে দু'শত টাকা মজুরী পায়, তবে কেন সে দক্ষ মিস্ত্রী হতে যাবে? কিসে তাকে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। তাই এর ফলে উৎপাদনের কার্যধারার উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে যাবে,সু-কঠিন আইনের শাসনও একে রোধ করতে পারবে না। এই সূত্রানুযায়ী ও মজুরী নির্ধারণ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান আশা করা যায় না। আর এটিই সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্য সোভিয়েত রাশিয়ার পতন ঘটিয়েছেন এবং সমাজতন্ত্রকে জাদুঘরে নিক্ষেপ করেছে।

এর সামঞ্জস্য সমাধান করেছে একমাত্র ইসলাম। ইসলামই একমাত্র জীবন-বিধান যা পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের সকল চরম প্রান্তিকতা হতে মুক্ত।

ইসলামী অর্থনীতির মজুরী নির্ধারণ সূত্র হলো-ন্যূনতম মজুরী প্রত্যেক শ্রমিকের প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হবে, অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রমিককে কমপক্ষে এমন মজুরী দিতে হবে যেন সে তার ন্যায়ানুগ ও স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাতে পারে।

পূর্বে ওয়ালীউল্লাহ (র.)-এর যে উদ্বৃত্তি দেয়া হয়েছে এর দ্বারা এই কথাই বোঝা যায়। কারণ, শ্রমিক একান্তভাবে অসহায় না হয়ে পড়লে কোনদিন সে তার প্রয়োজনের চেয়েও কম মজুরী লাভের চুক্তিতে আসতে পারে না। আর যে চুক্তি শ্রমিকের অসহায়ত্বের সুযোগ করা হয়, ইসলামের কাছে তার কোন মূল্যই নেই।

আল্লাহ্পাকের কালাম এবং নবী করীম (সা.)-এর হাদীস দ্বারাও উপরোক্ত সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। হুযূরপাক (সা.) ফরমান, "অধীনস্থদের খোরপোষ দিতে হবে।"[৯৮]

তিনি আরও বলেন, "এদেরকে (অধীনস্থদেরকে) পরিতৃপ্ত করে দেবে।" আল্লাহপাক ইরশাদ ফরমান, "যে সমস্ত মাকে সন্তানের পিতা ত্যাগ করেছে, তাদেরকে দুধ খাওয়ানোর নিমিত্তে নিয়ে আসলে সন্তানের পিতা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে জীবিকা ও কাপড়-চোপড় দেবে।"[৯৯]

উপরোক্ত আয়াত ও আল-হাদীস পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত দু'টি সিদ্ধান্তে আনায়াসেই পৌছা যায়। যথা-

(ক) মালিক শ্রমিকদের ভরণ- পোষণের দায়িত্ব নেবে।

অথবা, (খ) এমন মজুরী দেবে, যা দিয়ে তাদের প্রয়োজন মিটে যায়।

কারণ ইসলামের মজুরী নির্ধারণ নীতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এখানে শ্রমিক চাহিদা ও যোগানের, বাজারের সব রকম ওঠা-নামার অধীন নয়।

---

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

Dhaka University Institutional Repository

এখন প্রশ্ন হলো, নিম্নতম মজুরী কি করে নির্ধারণ করা যাবে? এর উত্তরও আমরা সাহাবা-ই-কিরামের কার্যক্রমের মধ্যে পাই।

হযরত উমর (রা.) এইভাবে খোরাকী নির্ধারণ করতেন যে, সুস্থ-সবল ভাল খেতে পারে এমন কয়েকজনকে ডেকে এনে খেতে দিতেন এবং তাদের খাওয়ার অনুপাতে তা নির্ধারণ করে দিতেন।[১০০] তিনি তাঁর খিলাফতের আমলে কর্মচারীদেরকে তাদের প্রয়োজন এবং যে শহরে বাস করবে তার পারিপার্শ্বিক অনুযায়ী ভাতা দিতেন।[১০১]

আমরাও আজকাল আমাদের পরিবেশ, চাহিদা, জীবনযাত্রা ইত্যাদির পর্যালোচনা করে নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ করতে পারি। কারণ মানুষের প্রয়োজন, স্থান, কাল ইত্যাদি অনুসারে পরিবর্তিত হয়। এ ব্যাপারে সমসাময়িক সরকার মধ্যস্থতা করতে পারেন।

সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম কাজের দক্ষতারও মূল্য দেয়। অর্থাৎ কাজের দক্ষতা হিসাবে মানুষের উপার্জনের তারতম্য ইসলাম স্বীকার করে। কারণ, এ না হলে কোনদিন কার্যোপযোগী ও সহজাত শ্রমনীতির বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়না। আর এর দ্বারা ইসলাম সমাজতন্ত্র হতে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পেরেছে। এদিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে আল্লাহ্পাক বলেন, "আমি মানুষের জাগতিক জিন্দিগীতে তাদের জীবিকা উপকরণসমূহ বণ্টন করে দিয়েছি এবং তাদের মধ্যে কতকজনকে কতকজনের উপর মর্যাদার প্রাধান্য দিয়েছি-যাতে একে অন্য থেকে কাজ নিতে পারে।"[১০২] কিন্তু এই তারতম্য ও স্তরভেদ থাকা সত্ত্বেও এমন কতিপয় বিধি-নিষেধ দ্বারা একে আবদ্ধ রাখা হয়েছে যাতে উক্ত তারতম্য মাত্র ততটুকুই থাকে যতটুকু একটি সুসংহত ও কার্যকরী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে আবশ্যক, এর বেশি নয়।

এমন অনেক পুঁজিপতিকে দেখতে পাওয়া যায়, যারা শ্রমিকের বিপর্যস্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে মজুরী নির্ধারণ না করেই তার কাছ থেকে কাজ নেয় এবং নিজে যা মন চায় তাই মজুরী দিয়ে তাকে বিদায় করে দিতে চায়। শ্রমিক তার আর্থিক দুর্বলতার কারণে এর কিছুই করতে পারে না, সবকিছু তার নীরবে সহ্য করে নিতে হয়। ইসলাম এই সমস্ত ব্যাপারকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন-নবী করীম (স.) পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা ব্যতিরেকে মজুর থেকে কাজ নেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক কাজ করা মাত্রই পারিশ্রমিক দাবি করতে পারে। কিন্তু অগ্রিম বা অন্য কোন রকম শর্ত থাকলে সে শর্তানুযায়ী কাজ হবে।

২. কাজের সময় নির্ধারণ: মজুরদের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো কাজের সময় নির্ধারণ। পূর্বে পুঁজিবাদী দেশগুলোতে মালিক যতক্ষণ ইচ্ছা মজুরদের দ্বারা কাজ করিয়ে নিত। এমনকি বার হতে ষোল ঘন্টা পর্যন্ত একজন শ্রমিককে কাজ করতে হত। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদিগকেও এ থেকে রেহাই দেওয়া হত না। এই রকমের জুলুমের প্রতিবাদে শ্রমিক সংঘগুলো তৎপর হয়ে ওঠে এবং ১৮৮০ সালের মে মাসে শিকাগোর শ্রমিকগণ আট ঘন্টা ডিউটি দানের দাবিতে ব্যাপক ধর্মঘট করে, কিন্তু নির্মমভাবে একে দমন করার চেষ্টা করা হয়। অনেক সংগ্রামের পর আট ঘন্টা দাবী প্রায় সমস্ত দেশই মেনে নেয়।

---

১০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
১০১. আল-কুরআন
১০২. আল-কুরআন

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম শ্রমিকদের এই মৌলিক সমস্যাটির অত্যন্ত সুন্দর সমাধান দেয়। আমরা জানি- পরিবেশ, জীবনযাত্রার মান, আবহাওয়া ইত্যাদির তারতম্য-হেতু মানুষের কর্মদক্ষতাও সমান হয় না। আঞ্চলিক জলবায়ুর প্রভাব মানুষের উপর পড়েই থাকে। একজন বৃটেনের শ্রমিক তার দেশে যতক্ষণ কাজ করতে পারে আমাদের দেশের শ্রমিকও ততক্ষণ পারবে এ কথা ঠিক হতে পারে না। আবার অনেক সময় কাজের প্রকৃতি হিসেবেও এর মধ্যে তারতম্য হয়ে থাকে। খনিতে নিয়োজিত শ্রমিক আর একজন সেলস্‌ম্যান একই সময় পর্যন্ত উভয়ই কাজ চালিয়ে যেতে পারবে তা নয়। আয়াস-সাধ্য ও কঠিন কাজে শ্রমিকগণ স্বভাবত অপেক্ষাকৃত কম সময়েই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে সহজতর কাজে লিপ্ত একজন শ্রমিক একটানা অনেকক্ষণ কাজ চালিয়ে যেতে পারে। এইজন্য আট ঘন্টা বা দশ ঘন্টা সকল দেশ ও সকল কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে নেওয়া কখনই যুক্তযুক্ত হতে পারে না।

তাই ইসলাম কাজের কোন নির্ধারিত সময় ঠিক করে দেয়নি বরং এর ন্যায়ভিত্তিক মূলনীতি বর্ণনা করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে ততক্ষণই একজন শ্রমিকের নিকট হতে কাজ নেওয়া যেতে পারে যতক্ষণ সে স্বাভাবিকভাবে তা কুলিয়ে উঠতে পারে। আল্লাহ্‌পাক ইরশাদ ফরমান, "কাউকে এমন কাজের দায়িত্ব আল্লাহ্ দেন না, যা তার সাধ্যাতীত।"[১০৩] আর এই বক্তব্যটিই আরও বিকশিত করতে যেয়ে নবী করীম (সা.) ফরমান, "যে কাজ তার জন্য অতি কষ্টকর সে কাজের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিও না।"[১০৪]

ঐ মূলনীতির অনুসরণ করে আমাদের দেশের পরিবেশ কার্যক্ষমতা ও কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী কাজের সময় নির্ধারণ করা জরুরী।

৩. কাজের প্রকৃতিঃ শ্রমিককে দিয়ে কি ধরণের কাজ মালিক নিতে চায়-তাও পূর্বেই নির্ধারণ করে নিতে হবে। মজুরের সম্মতি ব্যতিরেকে তাতে যে কোন কাজে নিয়োগ করার স্বাধীনতা ইসলাম পুঁজিপতিকে দেয়নি। ইসলামের দৃষ্টিতে মজুর পুঁজিপতির হাতের খেলনা নেয়, বরং সে তারই সমমর্যদার অধিকারী স্বাধীন এক সত্তা। এই সম্পর্কে আলোকপাত করতে যেয়ে সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী আইনগ্রন্থ 'হিদায়ায়' বলা হয়েছে-মালিক কি রকমের উপকৃত হতে চায় তা নির্ধারণ ব্যতিরেকে শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা সহীহ হয়না। কাজের প্রকৃতি কি ধরণের হতে হবে এ ব্যাপারেও ইসলামের মূলনীতি হলো শ্রমিককে দিয়ে এমন কাজ করানো যাবে না, যা তার জন্য অতি কষ্টকর। এমনিভাবে কোন শ্রমিককে এক কাজেয় জন্য নিয়োগ করে তার সম্মতি ছাড়া তাকে অন্য কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

৪. স্থানান্তর গমণের অধিকারঃ

অধিকতর সুবিধাজনক স্থানে চলে যাওয়ার অধিকার মানুষের অন্যতম জন্মগত অধিকার। এতে হস্তক্ষেপ করা মানেই একজন মানুষের স্বাধীন সত্তায় হস্তক্ষেপ করা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একে স্বীকার করে নেওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে এমন অনেক জটিলতা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে যার কারণে শ্রমিকগণ এ থেকে পুরোপুরিভাবে লাভবান হতে পারে না।

---

১০৩. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৮৬৮

১০৪. উদ্ধৃতঃ ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

Dhaka University Institutional Repository

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে মানুষের ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে পিষে মারা হচ্ছে যে, শ্রমিককে তার এই মানবিক স্বাধীনতাটুকু হতেও আজ বঞ্চিত রাখা হয়েছে। সেখানে নিজের ইচ্ছামতো একজন শ্রমিক কাজ বাছাই করে নিতে পারে না বা স্থানান্তর গমন করতে পারে না। সেখানে একহজন শ্রমিক কতকজন কমরেডের খেয়াল-খুশির অধীন। স্টালিনের আমলে এ এক অসহনীয় রূপ ধারণ করেছিল। ১৯৪০ সনের ২৬ জুনের এক সরকারী নির্দেশনামায় বলা হয়েছিল-মাসিক অথবা রোজভিত্তিক যে কোন মজুরই হোক না কেন, তাকে স্বাধীনভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করা হতে নিষেধ করা হলো। এ অধিকার শুধু কারখানা ডাইরেক্টরেরই আছে। এই আদেশ অমান্য করলে দুই থেকে চার মাস জেলের ভোগান্তি সহ্য করতে হবে।

ইসলাম মজুরের এই স্বাভাবিক ও স্বাধীন অধিকারকে অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিয়েছে এবং এর নিশ্চয়তা বিধান করেছে। এ সংশ্রবেই রাসূলপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফরমান, "সমস্ত দেশ ও জমীন আল্লাহ্‌র, আর সমস্ত মানুষ আল্লাহ্‌র বান্দা। তাই যেখানেই তুমি মঙ্গলজনক মনে কর সেখানেই বাস কর।"[১০৫]

উপরোক্ত হাদীসটি পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত তিনটি ধারা পাওয়া যায়-

(ক) সমস্ত দেশ আল্লাহ্‌র। তাই আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ স্থানান্তর গমন হতে বিরত রাখতে পারে না।

(খ) সমস্ত বান্দা আল্লাহ্‌র। তাই আল্লাহ্‌র বিধান ব্যতীত কারো উপর অন্যায় বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যেতে পারে না।

(গ) যেখানে সুবিধা হয় সেখানেই থাকা যাবে।

লাভের অংশীদার:

আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিই সমস্ত লাভের অংশ হাতিয়ে নেয়। বোনাসের নামে শ্রমিককে যৎসামান্যই দেওয়া হয়। আর এমনি করেই অতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা পুঁজিপতিদের পকেট ফুলে ফেঁপে ওঠে। রক্ত পানি করে মেহনত করার পর একজন শ্রমিক দেখে সমস্ত কিছুই পুঁজিপতির হাতে চলে গিয়েছে। সে হয়েছে রিক্ত, আর রিক্তের নেই মাথাগুজবার ঠাঁইটুকুও।

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিকদের লাভের মধ্যে অংশীদার হওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এর নিমিত্তে ইসলাম মুদারাবাত, মুসাকাত, মুজারাআত প্রভৃতি পন্থা নির্ধারণ করেছে। এ ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাদেরকে মুনাফার অংশীদার হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। নবী করীম (স.) ফরমান, "শ্রমিকদেরকে তাদের শ্রমার্জিত সম্পদ (লাভ) হতেও অংশ দিও। কারণ আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করা যায় না।"[১০৬]

স্বাস্থ্য সংরক্ষণ:

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্য হলো আল্লাহ্‌র পবিত্র এক আমানত। তাই স্বাস্থ্যহানিকর কিছু করা অপরাধ। ইসলাম মজুরদের স্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদ দিয়েছে। ইসলাম বলে-শ্রমিকদের জন্য এমন স্থান নির্ধারণ করতে হবে, তাকে এমন পরিবেশে রাখতে হবে যা সাধারণভাবে স্বাস্থ্যের উপযোগী। এই সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী অর্থনীতিবিদ ইবনু হাযম (র.) বলেন, "মালিকের জন্য উচিত

১০৫. আহমাদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৮২৫০

১০৬. ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিকের কাছ থেকে এতটুকু কাজ নেওয়া, যতটুকু সে আনায়াসে সুষ্ঠুভাবে করতে পারে, তার সামর্থ্যে কুলায়। এমন কিছু তার দ্বারা করাতে পারবে না, যার ফলে তার স্বাস্থ্যহানি ঘটে, তার লোকসান হয়।"[১০৭]

তাই তাকে এমন পরিবেশে রাখা যাবে না, যাতে তার স্বাস্থ্যের উপর খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। নবী করীম (স.) নিজে ভৃত্য কর্মচারীদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। কেউ রোগাক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। হযরত উমর (রা.) অসুস্থ কর্মচারীদের সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসা হচ্ছে কি-না এর খোঁজ-খবর নিতেন। কেউ এই কর্তব্যে অবহেলা করলে তাকে পদচ্যুত করতেন।

শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ দান:

আজকাল শ্রমিকদের জন্য এ এক মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার ব্যয়বাহুল্যের জন্য নিজেরাও শিক্ষিত হতে পারে না। আর ছেলে-মেয়েদিগকেও শিক্ষিত করে গড়ে তোলার সুযোগ পায় না। ফলে শিক্ষিতের হার আমাদের দেশে অত্যন্ত কম এবং শিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব অত্যন্ত প্রকট। এতে জাতীয় উৎপাদনে যে কতটা ঘাটতির সৃষ্টি হচ্ছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইসলাম উক্ত সমস্যারও একটা ন্যায়ভিত্তিক সমাধান দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা মূলত রাষ্ট্রের কর্তব্য, হুকুমের উপরই তা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষা সাধারণত অবৈতনিক এবং রাষ্ট্রই সকল ব্যয়ভার বহন করবে। হযরত ওজীল ইবনে আতা (রা.) বর্ণনা করেন-"মদীনায় তিন জন ছিলেন, যারা শিশুদেরকে শিক্ষা দিতেন। আর হযরত উমর (রা.) তাঁদেরকে (বায়তুলমাল হতে) মাসোহারা দিতেন।"[১০৮]

বাসস্থান:

পূর্বে শ্রমিকদের এই সমস্যা আজকালের মতো এত প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি। এমন করে শিল্প-কারখানারও সম্প্রসারণ ঘটেনি। নিজের বাড়িতে থেকেই মেহনতীজনেরা নিজেদের মেহনত বিনিয়োগ করার অফুরন্ত সুযোগ পেত। আহার্য সংগ্রহে তাদের বাড়ি ছেড়ে বেরুনোর বিশেষ প্রয়োজন হত না। কিন্তু আজকাল অবস্থার বিরাট পরিবর্তন হয়েছে।

ইসলাম এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য সমসাময়িক ইসলামী সরকারকে ক্ষমতা দিয়েছে ন্যায় ও ইনসাফের সঙ্গে এর সমাধান করার-যেন কারও উপর জুলুম না হয়। হযরত উমর (রা.) সরকারী কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলতেন, সবচেয়ে ভাল এবং নেকবখ্‌ত শাসনকর্তা সে-ই যার অধীনে সাধারণ মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার সাথে থাকে। আর সবচেয়ে বদবখ্‌ত্ শাসনকর্তা সে-ই, যার প্রজা-সাধারণ অভাব ও অশান্তিতে দিন যাপন করে।"[১০৯]

ক্ষতির দায়িত্ব:

অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে, আত্মসর্বস্ব, অর্থ-গৃধ্নু পুঁজিপতিরা শ্রমিকদেরকে অনর্থক হয়রানী করতে আরম্ভ করে দেয়। আত্মস্বার্থ পূরণের এক জঘন্য লালসায় মেহনতীদের বিরুদ্ধে কাজ খারাপের অভিযোগ এনে ক্ষতিপূরণের নামে শোষণ করতে তৎপর হয়ে ওঠে।

---

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬
১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম এখানেও এক ন্যায়ভিত্তিক সমতার ফয়সালা করে। ইমাম ইবনে হাযম লিখেন, যাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শ্রমিক হিসেবে রাখা হয়েছে, তার হাতে যদি ক্ষতি বা কোনকিছু নষ্ট হয়ে যায়, তাতে ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব শ্রমিকের উপর বর্তায় না। হ্যাঁ, সে যদি ক্ষতি করার ইচ্ছা নিয়ে তা করে তবে অন্য কথা। আর এই ব্যাপারে কোন স্বাক্ষী না থাকলে মজুরের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে কসমসহ।[১১০]

আজকাল দেখা যায়, পুঁজিপতিরা কৌশলে কৃত্রিম ঘাটতির সৃষ্টি করে এবং মজুরদের মজুরী কমিয়ে দেওয়ার এক অপপ্রয়াস পায়। এতে মজুরদের অবস্থা কতটুকু অবর্ণনীয় হয়ে ওঠে, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যে সমস্ত শ্রমিককে নিয়োগ করা হয়, উৎপাদনের ঘাটতির জন্য তার সম্মতি ব্যতিরেকে পারিশ্রমিকে কোন প্রকার কমতি করা যাবে না। ঘাটতির লোকসান পুঁজিপতিকেই বহন করতে হবে। এ ঝুঁকি অসহায় মজদুর কোন প্রকারেই নিতে পারে না।

চাকরির নিরাপত্তা:

এই ব্যাপারেও ইসলাম দৃষ্টি দিয়েছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে যেহেতু প্রশাসন বিভাগের সাথে সম্পর্ক রাখে, তাই সমসাময়িক ইসলামী প্রশাসকদেরকে ন্যায়ভিত্তিক পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। অনেক সময় নানাবিধ কারণে শ্রমিকদের চাকরি ছেড়ে দিতে হয়, ইসলাম মুজরকে এ স্বাধীনতা দিয়েছে। আল্লামা সারাখসী (র.) বলেন, "শ্রম সম্পর্কীয় চুক্তি বিশেষ অসুবিধার জন্য বাতিল করা যায়। কারণ শ্রমের বিনিময় মেহনতীদের সুবিধা বিধানের নিমিত্তই প্রচলিত রাখা হয়েছে। তাই যখন মেহনতী জনতা করতে না চায় বা তার পূর্ব মত পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখন তাকে এর উপর বাধ্য করা তার জন্য কষ্টেরই কারণ হবে।"[১১১]

এমনিভাবে নিয়োগকারীর মারাত্মক অসুবিধা দেখা দিলে, সে শ্রমিকের সঙ্গে কৃত চুক্তি বাতিল করতে পারে। কিন্তু এসকল ব্যাপারে ইসলামী সরকারের কর্তব্য হলো, সবকিছু ন্যায়নীতির ভিত্তিতে হচ্ছে কিনা এদিকে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সতর্ক দৃষ্টি রাখা, যেন কোন রকমের বিপর্যয়ের সৃষ্টি না ঘটে। শ্রমিকের যদি চাকরি চলে যায় তখন তারও চাকরির ব্যবস্থাকরণ এবং যতদিন কোন সুবিধা না হচ্ছে ততদিন তার ও তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব।

দাবি-দাওয়া পেশের অধিকার:

ইসলাম মূলত এমনই এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়, যেখানে সবারই অধিকার সংরক্ষিত থাকে এবং চাইবার আগেই স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে প্রত্যেকের অধিকার আদায় করে দিতে সকলই উদ্বুদ্ধ থাকে- কোন দাবি পেশের দরকারও যেন না পড়ে।

এরপরও যদি কারও অধিকার আদায় না হয় তবে তাকে দাবি পেশ করারও অধিকার দিয়েছে। নবী করীম (সা.) বলেন, "যাচঞ্ঞা করা একটি পেষণ যন্ত্র যা দ্বারা মানুষ তার নিজের চেহারাই পিষে ফেলে। কিন্তু কোন মানুষ যদি কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করে বা যা ছাড়া সে বাঁচতে পারেনা এমন জিনিসের দাবি নিয়ে আসে তবে সেটা তার যাচঞ্ঞা হবে না।"[১১২] অর্থাৎ অধিকার আদায়ের দাবি-এ প্রার্থনা নয় বা কারও কাছে অনুকম্পা সন্ধান করা নয় এবং এ তার বাঁচার অধিকার।

---

১১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

১১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

১১২. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইস্তিকরাদ ওয়া আদায়ুদ দুয়ুন, হাদীস নং-২২২৪

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধ বা অসুস্থকালীন ভাতা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান:

আজকাল এ এক মারাত্মক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। শ্রমিকের একমাত্র পুঁজিই হলো শ্রম। কিন্তু শ্রমিক বৃদ্ধ বা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর পুঁজি বলতে কিছুই থাকে না, রা খাটিয়ে সে অন্ন সংস্থানের উপায় করবে। তখন একান্তভাবে অসহায় হয়ে পড়ে সে। যার জন্য সে তার যৌবনের উষ্ণ রক্ত ও সামর্থ্য ব্যয় করে আজ সে নিঃস্ব ও রিক্ত। সেই পুঁজিপতি তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

বিরাট সংসারের বোঝা কিন্তু আয়ের উপায় বলতে নেই কিছুই। এই অবস্থায় একজন মানুষ কতটা দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে-কতটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ধনবাদী অর্থ ব্যবস্থায় প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদির নামে যা কিছু দেওযা হয়ে থাকে তা এত অপ্রতুল যে, হাস্যকর ঠেকে। তা-ও আবার তার পারিশ্রমিক হতে কেটে নিয়ে দেওয়া হয়।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে অবস্থা আরো মারাত্মক হয়ে ওঠে। কারণ সেখানে শ্রমই একমাত্র উৎপাদন উপাদান। এ না থাকলে কেউ উৎপাদিত পণ্যে অংশই পেতে পারে না। তাই সেখানকার শ্রমিকরা অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে পড়লেও অবসর গ্রহণের নামে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তারা অত্যন্ত কম পেনশন পায়।"

এর এক বাস্তব সমাধান দেয় ইসলাম। ইসলামের দৃষ্টিতে বৃদ্ধ, পঙ্গু, অসুস্থ, নিঃসহায়, ইয়াতিম, বিধবা এবং দুর্বলজনদের ভরণ-পোষণ ও তাদের যাবতীয় দায়িত্বভার ইসলামী সরকার গ্রহণ করতে বাধ্য। সরকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় জাতীয় কোষাগার হতে তাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করবে, প্রয়োজন অনুযায়ী ভাতা নির্ধারণ করবে এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করবে এ হলো সাধারণ নাগরিক অধিকার।

নবী করীম (স.) যখন মদীনায় আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন তখন এর চরম নিদর্শন দেখিয়ে গেছেন। নবী করীম (স.) বলেন, "যে সব ব্যক্তি অসহায় পরিজন রেখে গেছে, তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার অর্থাৎ সরকারের উপর।"[১১৩]

হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর খিলাফত আমলে এই ব্যাপারে কে কতটুকু মর্যাদার অধিকারী সেদিকেও চাইতেন না, বরং সমভাবে অর্থ বণ্টন করে দিতেন। একবার তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, বলেছিলেন, "কে কতটুকু ইসলামের খিদমত করেছেন তা আমার জানা আছে। এর বিনিময় আল্লাহ্পাক দেবেন। কিন্তু এ (জাতীয় কোষাগারের সম্পদ) জাগতিক জীবন-নির্বাহের উপায় মাত্র। তাই এখানে কাউকে প্রাধান্য না দিয়ে সমতার ভিত্তিতে বণ্টন করে দেওয়াই অধিকতর শ্রেয়।[১১৪]

"হযরত উসমান (রা.) খিয়ারে জেহেন্দী (রা.)-এর বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও সন্তানের আধিক্য দেখে তাঁর জন্য এবং ছেলেমেয়েদের জন্য বায়তুল মাল থেকে পৃথক পৃথক ভাতার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।"[১১৫]

এমনকি এর মধ্যে মুসলিম-অমুসলিমের কোন তারতম্য করা হয়নি। ইসলামের দৃষ্টিতে এসকল নাগরিকের সমান অধিকার। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) প্রখ্যাত সালারে আজম খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) কে মুসলিম ও অমুসলিম সকল বাসিন্দার অর্থনৈতিক সমতার কথা উল্লেখ করে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি লেখেন, "আমি বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে

১১৩. ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
১১৪. ঐ, পৃ. ১১৮
১১৫. ইমাম আবু ইউসুফ কিতাবুল খারাজ, লাহর, প. ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

পৌঁছেছি যে, জিম্মীদের মধ্যে (ইসলামী রাজ্যে বসবাসকারী অমুসলিম বাসিন্দা) যারা বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে কাজে অক্ষম হয়ে পড়ে, বালা-মুসিবতের দরুণ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে বা কোন ধনী দরিদ্র হয়ে পড়ে এবং তার সমধর্মিগণ তাকে খয়রাত করতে শুরু করে-এই সমস্ত লোকের জিযিয়া মওকুফ করে দেওয়া হবে। আর যতদিন সে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করবে ততদিন সরকার তার এবং তার পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়ে নেবে।"[১১৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম শ্রমিককে যে অধিকার প্রদান করেছে, পৃথিবীর কোন ধর্ম বা মতবাদই তা প্রদান করেনি। কেবলমাত্র ইসলামই শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ করছে।

নারীদের কর্মসংস্থান:

পৃথিবীর অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। রাসূল (স.) শুধু পুরুষ বেকারদের কর্মসংস্থানেরই ব্যবস্থা করেননি। নারী বেকারদেরও কর্মসংস্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, দিয়েছেন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা।

একজন স্ত্রীর প্রধান কর্মশালা হলো তার সংসার। রাসূল (স.) সাংসারিক কার্যক্রম পরিচালনাকেই নারীর প্রধানতম কর্মসংস্থান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। একজন গৃহিনীর দায়িত্ব হলো সন্তান ধারণ, লালন-পালন, শিক্ষা, মানুষের মতো মানুষ করে তোলা, স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা-যত্ন করা, সংসারের যাবতীয় কার্যাদি দেখাশুনা করা, সাংসারিক হিসাব সংরক্ষণ করা ইত্যাদি। এই সমস্ত মৌলিক কার্যক্রম ছাড়াও ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে।

ইসলামী অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবস্থান কি হবে, এক্ষেত্রে আল-কুরআনের জবাব হলো: "পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।"[১১৭] "আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক।"[১১৮] "যে মন্দ কর্ম করে, সে তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে পুরুষ অথবা নারী মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করে, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় বেহিসাব রিযিক দেওয়া হবে।"[১১৯]

এসব আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, কিয়ামতের দিন পুরুষ বা নারী কেউ কারো জন্য জবাবদিহি করবে না বা দায়িত্ব নেবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ী থাকবে। তাদের পুরস্কার হবে এই দুনিয়াতে তাদের কৃতকর্মের ফল।

রাসূলে করীমের যুগে মহিলাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কি ছিল? এর উত্তর পাওয়া যাবে তাঁর হাদীসএবং তিনি যে সব কাজ-কর্মের অনুমোদন দিয়েছেন সেসব থেকে। নিচে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হল:

১. হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, "আমাদের মধ্যে যয়নব ছিলেন সবচেয়ে দয়ালু। তিনি নিজের কাজ নিজেই করতেন এবং দান করতেন।[১২০]

---

১১৬. আল-কুরআন, ৪:৩২
১১৭. আল-কুরআন, ৩:১৯৫
১১৮. আল-কুরআন, ৪০:৪০
১১৯. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, কিতাবু কাদায়িলিস সাহাবা, হাদীস নং-৪৯০
১২০. মোঃ আব্দুল খালেক, ইসলামী অর্থনীতি, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃ. ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

২. হযরত জুবায়ের (রা.) বলেন: "একবার মহানবী (স.) এসে দেখলেন তাঁর স্ত্রী যয়নব চামড়া ট্যান করছেন।[১২১]

৩. রাসূল (স.) বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে (মহিলা) তোমাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।[১২২]

প্রসঙ্গত ইসলামের ইতিহাস হতে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে:

(ক) প্রথম পর্যায়ের মুসলমানদের মধ্যে অনেক মহিলা ছিলেন যারা নানা ধরণের কাজ করতেন। রাসূল পত্নী খাদিজা ব্যবসায়ের কাফেলার সাথে না গেলেও তিনি তাঁর সমুদয় সম্পদ এবং ব্যবসায়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করতেন।

(খ) রাসূলের যুগে মহিলারা কৃষি কাজে তাদের স্বামীদের সহায়তা করতেন। হযরত যুবায়েরের স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে আবু বকর বাড়ি থেকে দুই মাইল দূরে খেজুর বাগানে কাজ করতেন এবং সেখান থেকে খেজুর বিচির বস্তা নিজ মাথায় বহন করে আনতেন।[১২৩]

(গ) হযরত আসমা বিনতে মুহাররামা আতরের ব্যবসা করতেন।[১২৪]

(ঘ) হযরত উমরা বিনতে তাবিজা (রা.) বাজারে যেতেন এবং সংসারের প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করে আনতেন।[১২৫]

(ঙ) হযরত উমর (রা.) হযরত শিফা (রা.) নামক এক মহিলা সাহাবীকে বাজার দেখাশুনার দায়িত্ব দেন।[১২৬]

(চ) মহিলা সাহাবীগণ নবী করীম (স.) এর সাথে বিভিন্ন জিহাদে সেবিকা ও সাহায্যকারী হিসেবে যোগদান করতেন। কখনো কখনো তারা আসল যুদ্ধেও যোগদান করতেন।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলাম নারীদের মৌলিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে, নির্ধারণ করে দিয়েছে তাদের কর্মনীতি ও কর্মজগত। এভাবেই ইসলাম তাদের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করেছে।

---

১২১. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবু তাফসিরিল কুরআন, হাদীস নং-৪৪২১
১২২. মোঃ আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
১২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
১২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
১২৬. প্রাগুক্ত, পৃ.১২৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প: নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থান, সমস্যা নিরসন ও ইসলামী বিধান

* পোশাকশিল্পে কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা
* গার্মেন্টস শিল্পের কোটামুক্ত পরিবেশে পোশাকশিল্প
* পোশাক শিল্পের সংকট ও সম্ভাবনা
* সংকট ও আন্তর্জাতিক বাজার
* পোশাক শিল্পকে বাচাতে প্রয়োজন
* পোশাক শিল্পে নারী-শ্রমিক প্রাসঙ্গিক অবস্থা
* পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের অর্থনৈতিক উন্নয়নে করণীয়
* নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থান নীতি
* পোশাকশিল্পে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের জন্য সুপারিশমালা
* বাংলাদেশে নারীদের কর্মসংস্থান ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ
* পোশাকশিল্পের শ্রমিকের মজুরী ও ইসলামের নীতি
* বাংলাদেশে প্রচলিত মজুরী আইন ও বাস্তবতা
* মজুরী সমস্যা ও ইসলাম
* বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে দুর্ঘটনা
* প্রচলিত আইন ও ইসলাম
* বাংলাদেশে পোশাকশিল্পে দুর্ঘটনার চিত্র
* সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ
* পোশাকশিল্পে দুর্ঘটনা পরবর্তী আর্থ-সামাজিক অবস্থা
* শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয়ে পূর্বের ও বর্তমান শ্রম আইনসমূহ
* শ্রমিকের স্বার্থে আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবতা
* পোশাক শিল্পে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কতিপয় প্রস্তাবনা
* ইসলামে শ্রমের মর্যাদা ও বিধান

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাময় খাত পোশাক শিল্প:

আমাদের রপ্তানি আয় মূলত নির্ভরশীল ছিল পাটের ওপর। কিন্তু দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রতিকূল বিশ্ব পরিস্থিতি এবং সরকারের ক্রমাগত ব্যর্থতায় আমাদের রপ্তানিতে পাটের অবদান নাটকীয়ভাবে কমতে থাকে। ১৯৭৩ সালে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি আয় হত মোট জাতীয় রপ্তানি আয়ের ৮৭ শতাংশ, আর ২০০৩–২০০৪ সালে তা কমে এসে দাঁড়ায় মাত্র ৪.২ শতাংশে। রপ্তানি বাণিজ্যের এই ক্রমবর্ধমান পতনের প্রেক্ষাপটে তৈরি পোশাক শিল্প বা গার্মেন্টস খাতের অভিনব উত্থান ও বিকাশ যেন এক নতুন আশা জাগানিয়া ঘটনা। মূলত ৭০-এর দশকের শেষদিকে মাত্র ৯টি কারখানা দিয়ে এই খাতের যাত্রা শুরু। ১৯৭৮ সালে রিয়াজ গার্মেন্টস তাদের ৬৯ হাজার ডলারের রপ্তানি পণ্যের প্রথম চালান মার্কিন মুল্লুকে পাঠায়। এরপর থেকে সস্তা শ্রমের কার্য-কারণের প্রেক্ষাপটে তৈরি পোশাক শিল্প খাতের বার্ষিক ১৫ শতাংশ হারের ঈর্ষণীয় ও বিস্ময়কর অগ্রগতি সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। তবে কোটা ও জিএসপি সুবিধা এক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য শাপেবর হয়। শুধু অর্থনৈতিকভাবে নয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও আজ গার্মেন্টস খাতের অবদান অনস্বীকার্য। কর্মসংস্থানের দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষমতায়নের (বিশেষত নারীর) ক্ষেত্রেও গামেন্টস শিল্পের রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা।[১]

১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানি থেকে আয় করেছিল মাত্র ১৩ লাখ মার্কিন ডলার। আর ২০০৩–২০০৪ অর্থ বছরে দেশের মোট রপ্তানি ৭৬০ কোট ডলারের মধ্যে তৈরি পোশাক খাতের অংশ ৫৬৯ কোটি মার্কিন ডলার। যা মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৭৬ শতাংশেরও বেশি। জিডিপিতে গার্মেন্টস খাতের অবদান এখনও ৫ শতাংশ। এক শ্রমঘন শিল্প হিসাবে ৮০ দশকের মাঝামাঝি এখানে কর্মসংস্থানের পরিমাণ ছিল ১ লাখ (০.১ মিলিয়ন), আর পরবর্তী ২০ বছরে তা উন্নীত হয় প্রায় ২০ লাখে। আরো ৩০ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই খাতের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদন বা ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থানের ৩৫–৪০ শতাংশ এখন আসে গার্মেন্টস শিল্পখাত থেকে। ১৯৮০–২০০৪ এই সময়কালে গার্মেন্টস খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ছিল প্রতি বছর ২৪ শতাংশ। সামষ্টিক অর্থনীতিতে অবদান রেখে বাণিজ্য ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার ক্ষেত্রেও এই খাতের ভূমিকা যথেষ্ট ইতিবাচক। বর্তমানে আমেরিকা ও ইউরোপে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের স্থান যথাক্রমে ৭ম ও ৮ম। শুধু তাই নয়, আজ বাংলাদেশ যে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর দেশ থেকে বাণিজ্য নির্ভর দেশে পরিণত হয়েছে তার পেছনেও গার্মেন্টস খাতের অবদান কম নয়।[২]

এক নজরে গার্মেন্টস শিল্পের বহুমুখী অবদান:

* বিশ্বের ৮০টি দেশে এখন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়।
* গার্মেন্টস শ্রমিকরা কেবল ২০০২ সালেই মজুরি হিসাবে ৩১৫.২৫ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে।
* জাতীয় আয়ে গার্মেন্টস শিল্পের অবদান প্রায় ১০ শতাংশ (২০০২ সালের হিসাব)।
* এই খাত প্রত্যক্ষ মূল্য সংযোজন করছে ২৫ শতাংশ।
* গার্মেন্টস শিল্পের কল্যাণে বস্ত্র খাতে আরো ৫২৪টি নতুন মিল গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৫৮টি স্পিনিং মিল, ৩১২টি ওয়েভিং মিল, ৫৮টি ডায়িং ও ফিনিসিং মিল।

---

১. উন্নয়ন পদক্ষেপ, দ্বাদশ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০০৬, পৃ. ৫
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

* নিটওয়্যার উপখাতের ৬০% থেকে ৭০% এবং ওভেন উপখাতের ১২% থেকে ১৫% কাপড় এখন দেশীয় বস্ত্র শিল্প খাত সরবরাহ করছে।

* ২০০২ সালে দেশীয় বস্ত্র ও ফেব্রিক উৎপাদকের জাতীয় রপ্তানি আয়ের ৩৮ শতাংশ অবদান এসেছে গার্মেন্টস খাত থেকে, যার পরিমাণ ১,৪৯৫ মিলিয়ন ডলার। তাছাড়া ইয়ার্ণ ফেব্রিক মার্কেট ছিল ৩ বিলিয়ন ডলার যা ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প গড়ে তোলার সুযোগ এনে দিয়েছে।

* এ্যাকসেসরিজ ইন্ডাস্ট্রিগুলি তৈরি পোশাক শিল্প থেকে বর্তমানে বছরে ২০০ কোটি টাকারও বেশি আয় করছে।

* ২০০২ সালে ব্যাংকগুলি এই খাতের মাধ্যমে আয় করেছে ৩৭ মিলিয়ন ডলার।

* ইন্স্যুরেন্স বা বীমা কোম্পানিগুলি বার্ষিক প্রিমিয়াম হিসাবে পেয়েছে ৬ মিলিয়ন ডলার।

* চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে যে মালামাল উঠানামা হয় তার ৭০ ভাগ পোশাক শিল্পের। বন্দর তাদের আয়ের ৪০ ভাগ করেছে গার্মেন্টস শিল্প থেকে।

* শিপিং ব্যবসা ২০০২ সালে গার্মেন্টস-এর মাধ্যমে আয় করেছে ৬৫ মিলিয়ন ডলার।

* গার্মেন্টস এর কারণে অভ্যন্তরীণ পরিবহন শিল্প আয় করেছে ৬৫ মিলিয়ন ডলার।

* ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চলাচলকারী ২০ হাজার ট্রাকের ১২ হাজার ট্রাক পোশাক শিল্প সামগ্রী বহনকারী।

* গার্মেন্টস শিল্প ২০০২ সালে স্ট্যাম্প, পোস্টেজ, লাইসেন্স নবায়ন ফি ইত্যাদি বাবদ সরকারকে দিয়েছে ৬.৩ মিলিয়ন ডলার।

* ২০০২ সালে এই খাত ২.৪ মিলিয়ন ডলার প্রত্যক্ষ কর দিয়েছে সরকারকে।

* গার্মেন্টস খাত থেকে সরকার ২০০২ সালে ইউলিটিজ সার্ভিস থেকে অর্থাৎ বিদ্যুত বিল বাবদ ১৪.৭৪ মিলিয়ন ডলার এবং গ্যাস ও ওয়াসা বাবদ ৩.৭৫ মিলিয়ন ডলার পেয়েছে।

* ইঞ্জিনিয়ারিং খাত ২০০২ সালে এই খাত থেকে লাভ করেছে ১৪.২ মিলিয়ন ডলার।

* চার্টার্ড একাউন্ট ফার্ম, লিগ্যাল সার্ভিস, বিজনেস কনসালটেন্ট এসব প্রফেশনাল সার্ভিসকে ২০০২ সালে এই খাত দিয়েছে ৩.৬১ মিলিয়ন ডলার।

* প্রায় ২ লাখ মানুষ (০.২ মিলিয়ন) মানুষ এখন গার্মেন্টস শিল্পের ওয়েস্ট রি-সাইক্লিং করছে।

* তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) সার্ভিস খাত ২০০২ সালে লাভ করেছে ৯.৮৮ মিলিয়ন ডলার।

* ২০০২ সালে গার্মেন্টস খাত রিয়েল এস্টেট খাতকে দিয়েছে ২৬.২৪ মিলিয়ন ডলার।

* প্রতি বছর প্রায় ১.৫ হাজারেরও বেশি বিদেশি ক্রেতা ও তাদের প্রতিনিধিরা দেশে আসায় পর্যটন শিল্প ২০০২ সালে বাণিজ্য করেছে ৪.৪২ মিলিয়ন ডলার।

* গার্মেন্টস শিল্পের প্রায় ২০ লাখ শ্রমিক দেশীয় বাজারে ভোগ্য পণ্যের বিপুল চাহিদা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

* এই খাতে ৮০ শতাংশ নারী শ্রমিক প্রতি বছর শুধু লিপস্টিক ও আলতা ব্যবহার করছে ১০০ কোটি টাকার। শাড়ি কিনেছে ১৫০ কোটি টাকার।

Dhaka University Institutional Repository

* প্রতিদিন সকাল-বিকাল গার্মেন্টস শ্রমিকরা প্রায় দেড় কোটি টাকার নাস্তা খায়।

* গার্মেন্টস শ্রমিকদের প্রতি পরিবারে গড়ে ৫ জন সদস্য হলে প্রায় ১ কোটি মানুষ এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল।[৩]

গার্মেন্টস শিল্পের সামাজিক সুফল:

* কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন

* সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি

তবে গার্মেন্টস শিল্পখাতের এই উজ্জ্বল চিত্রের বিপরীতে রয়েছে গার্মেন্টস শ্রমিকদের প্রতি বঞ্চনাজনিত নিরাশার অন্ধকার। ক্রমবর্ধমান রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে তারাই মূল চালিকা শক্তি হলেও তাদের জীবন মান উন্নয়ন ঘটেনি। বরং বর্তমান প্রেক্ষিতের তুলনায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের অবস্থার আরো অবনতি হয়েছে। সাম্প্রতিক এই খাতের গণবিদ্রোহ এর প্রমাণ। শ্রম অধিকার কর্ম নিরাপত্তা, উন্নত কর্ম পরিবেশ, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, ন্যূনতম বাঁচার মতো মজুরি, নিয়োগপত্র ইত্যাদি সবকিছু থেকেই তারা বঞ্চিত। এখানে এক নজরে সেই দুর্দশার চিত্র তুলে ধরা হল।

* গার্মেন্টস শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে ৫৪ শতাংশ কিন্তু তাদের ন্যূনতম মজুরি এখনও ৯৩০ টাকা।

* ১৯৯২ সনে গার্মেন্টস শিল্পে শোষণের হার ছিল ১১৮ শতাংশ; ২০০৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৫০ শতাংশ।

* গার্মেন্টস কারখানায় প্রতি ঘন্টায় মজুরি জার্মানিতে ২৫ ডলার, আমেরিকায় ১৬ ডলার, শ্রীলংকায় ০.৪৫ ডলার, নেপালে ০.৩০ ডলার এবং বাংলাদেশে মাত্র ০.১৫ ডলার।

* গার্মেন্টস কারখানায় ১৫ বছরে ঘটনা অসংখ্য দুর্ঘটনায় মারা গেছে ৫৫০ জন, আহত ও পঙ্গু সহস্রাধিক।

* বাংলাদেশের একজন গার্মেন্টস শ্রমিক প্রতি বছর ২,৫০০ ডলারের সম পরিমাণ মূল্য সংযোজন করে, অর্থাৎ সে তার মালিককে বছরে ২,৫০০ ডলার এনে দেয়। অথচ সে মালিকের কাছ থেকে বছরে পায় মাত্র ৭০০ ডলার যা বিশ্বের সর্বনিম্ন। (বিশ্ব ব্যাংক)

* বাংলাদেশের একজন গার্মেন্টস শ্রমিক বছরে ২,৫৩৬টি টি-শার্ট উৎপাদন করে মজুরি পায় মাত্র ২৯০ ডলার। আর এর চেয়ে মাত্র ৫৬টি বেশি তৈরি করে ভারতে একজন শ্রমিক পায় ৬৬৮ ডলার। (বিশ্বব্যাংক)

* ২০০১–২০০২ অর্থ বছরে তৈরি পোশাক শিল্পে রপ্তানি আয় আসে ৪৫৮ কোটি মার্কিন ডলার। এর মধ্য থেকে শ্রমিকদের দেয়া হয় মাত্র ২২ কোটি ১০ লাখ ডলার, যা মোট আয়ের মাত্র ৫ শতাংশ (সিপিডি)।

* মাত্র ৩ শতাংশ গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের আওতায়।[৪]

---

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৪. The Daily New Ages, 13, January, 2005

Dhaka University Institutional Repository

* ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের (OCC) তথ্য মতে যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে গার্মেন্টস শিল্পের নারী শ্রমিকরা শীর্ষে রয়েছে।

* বর্তমানে যক্ষ্মার ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে লাখ লাখ গার্মেন্টস শ্রমিক।[৫]

* ইপিজেড ছাড়া অন্যান্য গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করা হয় (BKMEA & NUK)

* দুর্ঘটনার ঝুঁকি মধ্যে রয়েছে প্রায় ১৫ লাখ শ্রমিক।

* ৩ হাজার গার্মেন্টস কারখানার মধ্যে মাত্র ৫০০ কারখানায় কর্মজীবী নারীর শিশু সন্তানদের জন্য ক্রেস বা দিবা যত্ন কেন্দ্র রয়েছে।[৬]

কোটামুক্ত পরিস্থিতিতে গার্মেন্টস শিল্প: আশা ও আশংকার দোলাচল–

২০০৫ সাল থেকে মাল্টি ফাইবার এগ্রিমেন্ট (MFA) বা কোটা পদ্ধতি উঠে যাবার পর গার্মেন্টস শিল্পে ধ্বস নামবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলেই তখন তীব্র আশংকা প্রকাশ করেছিল। ২০০৩ সালে সাংবাদিক সম্মেলনে বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ উদ্বেগ জানায় যে, ২০০৫ সালের কোটামুক্ত পরবর্তী অবস্থার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুতি না নিলে তৈরি পোশাক শিল্পে বিপর্যয় নেমে আসবে। প্রায় ৮ লাখ শ্রমিক বেকার হবে। ঝুঁকির মুখে পড়বে ১২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ।[৭] কোটা উঠে যাবার ঠিক দু'সপ্তাহ আগে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা 'ক্রিশ্চিয়ান' এইড-এর অনুমান ছিল, বাংলাদেশে প্রায় ১০ লাখ শ্রমিক চাকুরি হারাবে, যার অধিকাংশ নারী এবং এরা বাধ্য হয়ে পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত হতে পারে। আইএমএফ-এর আশংকা অনুযায়ী কোটামুক্ত হবার পর দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের প্রায় ৫ শতাংশ শ্রমিক চাকুরিচ্যুত হবে, ২ শতাংশ রপ্তানি কমবে, জিডিপি হ্রাস পাবে ২.৩ শতাংশ। অনুরূপভাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা অনুমান করেছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি অর্ধেকে নেমে আসবে।[৮]

২০০৪ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শ্রমিক কংগ্রেসে বলা হয়েছিল, কোটা সুবিধা বিলুপ্ত হলে বাংলাদেশের ১০ লাখ নারী শ্রমিক চাকুরি হারাবে।[৯] অন্যদিকে সরকারেরও উদ্বেগ ছিল, ৬০০ গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে পড়বে এবং ৮ লাখ শ্রমিকের কোনো কর্মসংস্থান থাকবে না।[১০] গার্মেন্টস শ্রকিরাও তাদের সংগঠনের মাধ্যমে নানাভাবে এই কোটামুক্ত পরবর্তী অবস্থায় আসন্ন কর্মচ্যুতি মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানায়।

তবে আশাবাদী বা মিশ্র প্রতিক্রিয়াও এ সময়ে পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'এমএফএ ফেজ আউট' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, পোশাক শিল্পের উপর কোটামুক্ত বিশ্বের প্রভাব বোঝা যাবে ২০০৭ সালের পর।[১১] আবার কোটা প্রথা উঠে যাবার পরপরই অনেক গার্মেন্টস শিল্প উদ্যোক্তা ও অর্থনীতিবিদ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, গার্মেন্টস শিল্পে কোটামুক্ত বাণিজ্যে এক দেড় বছরের আগে এ খাতের রপ্তানি আয়ে

---

৫. দৈনিক সমকাল, ২নভেম্বর, ২০০৫
৬. উন্নয়ন পদক্ষেপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
৭. দৈনিক যুগান্তর, ৭ মার্চ, ২০০৩
৮. দৈনিক প্রথম আলো, ১ জানুয়ারী, ২০০৫
৯. দৈনিক আজকের কাগজ, ৮ ডিসেম্বর, ২০০৪
১০. The Daily New Ages, 23, April, 2004
১১. দৈনিক সংবাদ, ৪ ডিসেম্বর, ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না।[১২] কোটামুক্ত পরিস্থিতজানিত বিপর্যয় মোকাবেলা সে সময় সরকার-মালিকপক্ষ, দাতাগোষ্ঠী ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে নানা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। অবশেষে সকল আশংকা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। কোটা উঠে যাবার দেড় মাস পর দেখা গেল যে, তৈরি পোশাক শিল্পে কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি এবং এজন্য কোনো গার্মেন্টস শ্রমিক চাকুরিচ্যুত হয়নি।[১৩]

কোটা বিলুপ্তির পর ২০০৫ সালের প্রথম ৫ মাসের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, দেশের তৈরি পোশাক শিল্প ৯ শতাংশ মাঝারি প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। ইউরোপে ওভেন শিল্প বেশ চাপের সম্মুখীন হলেও নীটওয়্যার শিল্প উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০০৬) মতে ২০০৫–২০০৬ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে পরবর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় নীটওয়্যার ৩০.৮০ শতাংশ এবং ওভেন ১০.৭৭ শতাংশ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। আবার কোটা পরবর্তী অবস্থায় কর্মসংস্থানের বিষয় দেখার জন্য ইউএনডিপি ছোট-বড়-মাঝারি মিলিয়ে ৩৫টি গার্মেন্টসে এক জরিপ চালায়। এই জরিপে দেখা যায় যে, কোটা উঠে যাবার পর এই ৩৫টি ফ্যাক্টরির কোনোটি থেকেই কেউ ছাঁটাই বা কর্মচ্যুত হয়নি। বরং ১৯টি ফ্যাক্টরি আরো নতুন কর্মী নিযুক্ত করেছে। তবে কোটামুক্ত বিশ্বে তৈরি পোশাক শিল্প রপ্তানি ভবিষ্যত সম্ভাবনা নিশ্চিতভাবে অনুমান করার সময় এখানো আসেনি। কেননা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নানা শর্তেও নিয়ম-কানুন বাংলাদেশ কতটা দক্ষতার সাথে কাজে লাগাতে পারছে তার ওপর এই সম্ভাবনার বাস্তবায়ন নির্ভর করছে। আর সরকার কিরূপ দায়-দায়িত্ব পালন করছে সেটাও এক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আবার কোটা বিলুপ্তি গার্মেন্টস খাতের কর্মসংস্থান ও শ্রমি পরিবেশের ওপর কি প্রভাব ফেলবে তা সহজ-সরলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। রপ্তানি প্রবণতা, কমপ্ল্যায়েন্স, কাঠামোগত পরিবর্তন, শ্রবাজারের চাহিদা যোগান শ্রম দক্ষতা ইত্যাদি নানা বিষয় এখানে ক্রিয়াশীল। এছাড়াও সুনির্দিষ্ট তথ্য উপাত্তের অভাবে কোটা উঠে যাবার পর দেশের গার্মেন্টস খাতে কর্মসংস্থান ও শ্রম পরিবেশের ওপর কি কি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে তা যথাযথভাবে এখন পর্যন্ত জানা যায় বা। সামগ্রিক অবস্থা গভীরভাবে পরিবীক্ষণ করার জন্য কোনো সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগও নজর পড়েনি।

কিছু গার্মেন্টস বন্ধ হয়েছে:

নানা সূত্র মতে কোটামুক্ত হবার দরুণ না হলেও বিভিন্ন সময়ে নানা কারণে দেশের বেশ কিছু গার্মেন্টস বন্ধ ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রমিক কর্মচ্যুতির শিকার হয়েছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর দেশের ১,২৭৬টি গার্মেন্টস এবং অন্যান্য সমস্যার জন্য আরো ৫০১টি গার্মেন্টস বন্ধ হয়। এর ফলে মোট ৩ লাখ শ্রমিক-কর্মচারী চাকুরি হারান বলে পত্রিকায় খবর এসেছে। পরে বিভিন্ন সময়ে ৩০০ ফ্যাক্টরি পুনরায় চালু হলেও ইরাক যুদ্ধের কারণে আবারও সেগুলি নতুন করে সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।[১৪] বাংলাদেশ সংযুক্ত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের তথ্যমতে ২০০৩ সালের শুরুতে ৬০০টি গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৯০০টি ফ্যাক্টরিকে রুগ্ন শিল্প বলে ঘোষণা করা হয়। বিজিএমইএ-এর তথ্য অনুযায়ী দেশে রুগ্ন গার্মেন্টস কারখানার সংখ্যা ৫০০টি, যারা হরতাল, বন্যা, বন্দর সমস্যায় পড়ে স্টক লট হয়ে রুগ্ন শিল্পে পরিণত হয়েছে।[১৫] আবার বিজিএমইএ-র সিক এ্যাপারেলস কমিউনিটির সভাপতিও স্বীকার করেছেন যে, ব্যাংকগুলির

---

১২. দৈনিক আজকের কাগজ, ৪ জানুয়ারী, ২০০৫
১৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ জানুয়ারী, ২০০৫
১৪. দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ এপ্রিল, ২০০৩
১৫. দৈনিক ইনকিলাব, ৩০ নভেম্বর, ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

অসহযোগিতার কারণে দেশের ১৯০০টি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি রুগ্ন হয়ে এখন বন্ধ। গাজীপুরের কোনাবাড়িতে গার্মেন্টস থেকে চাকুরিচ্যুত হয়ে প্রায় অর্ধশতাধিক নারী শ্রমিকের আত্মহত্যার খবরও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[১৬]

গোল্ডেন হ্যান্ডশেক এবং শ্রমিকদের বিপন্নতা:

বিশ্বব্যাংক আইএমএফ-এর কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস কর্মসূচির (SAP) আওতায় রাষ্ট্রীয় খাত সংকোচনের একটি কৌশল হিসাবে বাংলাদেশে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক চালু হয়। ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট প্রজেক্ট যা গোল্ডেন হ্যান্ডশেক নামেই অধিক পরিচিত, তার শুরু '৮০-র দশকের গোড়ায়। '৯০-র প্রথমদিকে এটি তীব্র লাভ করে। নামে যতই শ্রুতিমধুর হোক না কেন, এই গোল্ডেন হ্যান্ডশেক আসলে এক ধরণের বাধ্যতামূলক ছাঁটাই। এর ফলে ১৯৯৭ সাল নাগাদ রাষ্ট্রায়াত্ত খাতের অধীনস্থ ৬টি সেক্টর কর্পোরেশনের ৮৯ হাজার ৯৭১ জন কর্মী তাদের চাকুরি হারান। পরবর্তী দু'বছরে আরো ৮৮ হাজার ৬১২ জন ছাঁটাইয়ের শিকার হন। এসব ছাঁটাইকৃত শ্রমিক-কর্মচারির মধ্যে ৪২ শতাংশ দক্ষ কর্মী, ২২-৫ শতাংশ আধা দক্ষ এবং ২৮ শতাংশ অদক্ষ। এভাবে ২০০২ সালে ১ লাখেরও বেশি শ্রমিক-কর্মচারী রাষ্ট্রায়াত্ত খাত থেকে বিদায় নেয়। শুধু সরকারি চিনিকলেরই ৭ হাজার কর্মী কর্মসংস্থান হারান। গোল্ডেন হ্যান্ডশেক এর আওতায় চাকুরিচ্যুতদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এককালীন কিছু অর্থ প্রদান করার কথা। কিন্তু এই অর্থ প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা, অনিয়ম-দুর্নীতি, ঘোষিত পরিমাণের কম অর্থ প্রদান ইত্যাদি নানা অভিযোগ ভুক্তভোগীদের তরফ থেকে উত্থাপিত হয়েছে। আর ছাঁটাইকৃতরা সকলে টাকা পেয়ে বিকল্প কর্মসংস্থান করতে পেরেছেন এমন আশাব্যঞ্জক চিত্র নানা সমীক্ষা থেকে উঠে আসেনি।

এখন প্রশ্ন হল কোটামুক্ত বিশ্বে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন গার্মেন্টস শ্রমিকও সরকারি-বেসরকারি খাতের শ্রমিকদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং ক্ষমতায়ন কীভাবে সম্ভব? এক্ষেত্রে দুটি সমাধানের পন্থার কথা প্রচলিত রয়েছে। এর একটি বৈপ্লবিকভাবে সমাধানের পথ নির্দেশ। অন্যটি বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যেই শ্রমিকদের জন্য যতটা সম্ভব বেশি আদায় করে নেওয়া। একথা আজ স্বীকৃত যে, দারিদ্রের মূল কারণ হলো সম্পদের ওপর অসম অধিকার, বাজারের ওপর অসম অংশীদারিত্ব, মানব উন্নয়নের অসম সুযোগ এবং ন্যায়নীতিহীন শাসন বা কুশাসন। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে গার্মেন্টস এবং ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের পক্ষে এসব কারণেই কোনোটাকেই মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সংগঠিতভাবে লাগাতার সংগ্রাম। তবে সমাধানের দ্বিতীয় পন্থাটি বিদ্যমান বাস্তবতায় কতগুলি কারণে অর্জনযোগ্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে। প্রথমত সাম্প্রতিক গার্মেন্টস শ্রমিকের গণবিদ্রোহ বাঁচার মতো ন্যূনতম মজুরি এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের মতো মৌলিক বিষয় দুটিকে সামনে নিয়ে এসেছে। শ্রমিকদের এই প্রাণের দাবির পক্ষে সমাজের সকল অংশের সমর্থন আদায়েও সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয়ত শ্রমমান উন্নয়নের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা সরকার ও মালিক পক্ষকে এখন বাধ্য করছে শ্রমিকদের এই ন্যায্য দাবি পূরণে উদ্যোগ নিতে। এই অনুকূল পরিস্থিতিতে তাই আমরা কতগুলি আশু করণীয় চিহ্নিত করতে পারি।

আশু পূরণযোগ্য দাবি-দাওয়া:

* গার্মেন্টিসসহ প্রতিটি শিল্প-কারখানায় শ্রমিকদের নিয়োগপত্র, পরিচয় পত্র ও সার্ভিস বুক চালু করা;

* সকল খাতের জন্য বাঁচার মতো ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ;

---

১৬. The Daily Star, 30, November, 2005

Dhaka University Institutional Repository

* সবেতন সাপ্তাহিক ছুটি ও মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রচলন;

* ৮ ঘন্টার বেশি কাজ করালে ওভারটাইম প্রদান;

* প্রতিটি কারখানায় শ্রমিক কর্ম নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ;

* দুর্ঘটনা রোধ এবং দুর্ঘটনাকালে জীবনহানি না ঘটার জন্য সম্ভাব্য সকল ধরণের অবকাঠামোগত উন্নয়ন;

* প্রতিটি কারখানায় কর্মজীবী নারীর শিশু সন্তানের জন্য দিবা যত্ন কেন্দ্র স্থাপন।

* প্রতিটি কারখানায় পর্যাপ্ত বাথরুম, বিশুদ্ধ পানীয়সহ স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, শ্রমিকদের কর্মস্থলে যাওয়া-আসার জন্য পরিবহন সুবিধা দেওয়া;

* শ্রমিকদের জন্য সস্তায় স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন তৈরি;

* প্রতিটি গার্মেন্টস কারখানাকে কমপ্ল্যায়েন্স করা;

* দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণকারীর পরিবারের জন্য যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ এবং পঙ্গুদের পুনর্বাসন;

* ইপিজেডসহ সকল শিল্প-কলকারখানায় শ্রমিকদের ট্রেড অধিকার প্রতিষ্ঠা করা;

* ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্য কাউকে চাকুরিচ্যুত না করা;

* সম্প্রতি সরকার, মালিক ও শ্রমিক-এই ত্রিপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির দ্রুত বাস্তবায়ন;

* নারী কর্মীদের নির্যাতন ও যৌন হয়রানির হাত থেকে রক্ষার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া;

* গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন কলকারখানায় সন্ত্রাসী ও পুলিশ দিয়ে শ্রমিক আন্দোলন স্তব্ধ করার অপচেষ্টা বন্ধ করা।

কতিপয় দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব:

* গার্মেন্টস শিল্পে মজুরি বৃদ্ধিসহ শ্রমিকদের প্রাপ্তি আরো কীভাবে বাড়ানো যায় তা খতিয়ে দেখা।

* দেশের মিল্কভিটা কিংবা ভারতের আমূল দুধ কোম্পানির মতো সমবায় ভিত্তিতে কোনো কারখানা চালানো যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা।

* কারখানার পুঁজির এক-তৃতীয়াংশ শেয়ার শ্রমিকদের হাতে প্রদান।

* শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক সংগঠন বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে এই শেয়ার কিনতে পারেন, যা আবার বিক্রি করা যাবে না। এভাবে শ্রমিকরা কারখানার মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও লাভ-লোকসানে ন্যায্যভাবে অংশগ্রহণ (equity participation) করতে পারে কিনা তা যাচাই করা।

পোশাক শিল্পের সংকট ও সম্ভাবনা:

বাংলাদেশের অন্যতম রফতানিজাত পণ্য পোশাক শিল্প আবারো বড় ধরনের সংকটে পড়েছে। এ শিল্পের উদ্যোক্তারা মনে করেন, এবারের সংকট অতীতের চেয়েও অনেক বড় এবং ভয়াবহ। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সকল দিক দিয়েই এবার ঘিরে ধরেছে সম্ভাবনাময় এ শিল্পকে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে দেশের অনেক বড় বড় উদ্যোক্তাই ইতোমধ্যে তাদের কারখানা বিক্রি করে দিচ্ছেন। অবশ্য বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে সচেতন এবং সমস্যা সমাধানে উৎসাহী।

Dhaka University Institutional Repository

এখানকার মালিকরা বলছেন, সম্প্রতি এ শিল্পকে নিয়ে শুরু হয়েছে এক অশুভ তৎপরতা; যা শুধু দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের ভাবমূর্তিও ক্ষুন্ন করছে এবং কমে যাচ্ছে বিদেশি ক্রেতাদের আস্থা। বলা যায় বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে।

বিজিএমইএ সূত্রে জানা যায়, নানা অজুহাতে কারখানা ভাঙচুর এবং শ্রমিক অসন্তোষ সমস্যার কারণে ইতিমধ্যে দেশের ১৪০টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। আরও প্রায় দুই শতাধিক কারখানা বন্ধের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। আর বিদেশী কোম্পানির কাছে বিক্রি হয়ে গেছে প্রায় ৫০টি কারখানা। পরিস্থিতি এতো ভয়াবহ যে আতঙ্কিত গার্মেন্টস মালিকেরা আগামী মৌসুমের কাজ নিতে সাহস করছেন না।[১৭]

সম্প্রতি জাতীয় পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে এক বৈঠকে বিজিএমই'র কর্মকর্তারা কয়েকটি গার্মেন্টসে ভাঙচুরের ঘটনা তুলে ধরে বলেন উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এগুলোতে আক্রমণ, ভাংচুর এবং লুটপাট করা হয়েছে। যেমন-আশুলিয়ার অনন্ত গার্মেন্টস, হা-মীম ফ্যাশন, ইসলাম গার্মেন্টস, এনভয় গার্মেন্টসে বেতন ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা পর্যাপ্ত দেয়া হয়। বায়ারদের তালিকা অনুযায়ী এগুলো কমপ্লায়েন্স কারখানা। এ সেক্টরের শ্রমিক মালিক সর্বত্রই এসব গার্মেন্টস-এর সুখ্যাতি রয়েছে। কিন্তু নানা অজুহাতে কখনও কখনও গুজব ছড়িয়ে এ কারখানাগুলোতে ভাঙচুর ও লুটতরাজ চালানো হয়। কেন এই ধ্বংসলীলা-এ প্রশ্নের জবাব কারোরই যেন জানা নেই। বিজিএমইএ-এর ভাষ্যমতে, বর্তমানে একথা কোন মালিকই নিশ্চিন্তে বলতে পারবেন যে তিনি নিরাপদ। যেকোন সময়ে যে কারও উপরে এ হামলা শুরু হতে পারে।[১৮]

বর্তমান গার্মেন্টস সমস্যায় মনে হয়, সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য একটি মহল কাজ করছে। তাই এ ব্যাপারে কেউ উস্কানি দিচ্ছে কিনা দেখতে হবে। মজুরি ১৬০০ টাকা থেকে এক লাফে ৫০০০ টাকা বা তার বেশি করার জন্য যারা বিলাপ করছেন তাদের সত্যিকার উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে বিদেশিদের হয়ে কেউ কোন ধরণের ষড়যন্ত্র করছে কিনা; অতি ডান এবং অতি বামেরা শ্রমিকদের বন্ধু সেজে নিজেকে উপস্থাপন করছে এবং জনদরদী সরকারকে বিপদগ্রস্ত করছে। এসব কিছু মিলিয়ে নানা রকম উস্কানি ও কারখানা ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনার সঙ্গে বিদেশী চক্রও জড়িত কিনা সরকারের এটা খতিয়ে দেখা উচিত। শুধু মজুরির কথা চিন্তা করে শিল্প ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র কিনা সেটা ভেবে দেখা প্রয়োজন। আমি মনে করি প্রারম্ভিক পর্যায়ে ৩০০০ টাকা বেতন হলে চলে কিনা এটা দেখতে হবে। তবে বেতন সময়মত দেয়ার দারকার রয়েছে। আমাদের দেখতে হবে মজুরি নিয়ে এত বাড়াবাড়ি আমাদের বড় ধরণের সংকটে ফেলতে পারে। যেখানে প্রতিবেশী দেশগুলো সুযোগ খুঁজছে সেখানে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান সরকার বেশ জনদরদী। সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে সরকার প্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনা সব সময় সচেষ্ট। এখন শ্রমিকদের কথা এ শিল্পকে বাঁচানোর কথাও ভাবতে হবে।[১৯]

প্রসঙ্গঃ গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষ, সাংবাদিকসহ বেশিরভাগ মানুষের ধারণা এখানে শ্রমিকদের তুলনামূলক কম বেতন দেয়া হয়। অপরদিকে মালিকদের বক্তব্য কম বেতন দেয়ার সুযোগ এখন আর নেই। উপরন্তু তাদের মতে দেশে অন্য সেক্টরের চেয়ে এ খাতে তুলনামূলক বেশি বেতন দেয়া হয়। মালিকদের যুক্তি কম মজুরি দিয়ে এখানে আর শ্রমিক পাওয়া যায় না। এছাড়া বিদেশি ক্রেতাদের তদারকির কারণে কম বেতন দেয়ার

---

১৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ জুলাই, ২০১০

১৮. প্রাগুক্ত।

১৯. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কোন সুযোগ নেই।[২০] অর্থাৎ বেতন ভাতার সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কোন কারখানা কমপ্লায়েন্স না হলে বিদেশি বায়াররা এখন কাজ দেয় না। তদন্তেও দেখা যায় এখন শ্রমিকদের বেতন আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। বর্তমানে ন্যূনতম মজুরি নিয়ে একটা কমিটি কাজ করছে। তাই এ বিষয়ে বেশি না বলে পূর্বে ন্যূনতম মজুরি কেমন ছিল সেগুলো নিয়ে একটু আলোকপাত করব। শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী কোন শিল্পের নিযুক্ত শ্রমিকের জন্য স্থিরকৃত ন্যূনতম মজুরি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পুনঃনির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রতি মজুরি বোর্ড গঠন করেছে। ১৯৯৪ সালে দ্বিতীয়বারের মত পোশাক শিল্পের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ১২ বছর পর ২০০৬ সালে তা পুনঃনির্ধারণ হয়। ২০০৬ সালে সপ্তম গ্রেডের ন্যূনতম মজুরি ৭৮.৮০% বাড়িয়ে ৯৩০ টাকা থেকে ১৬৬২.৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়। গার্মেন্টস মালিকদের দেয়া হিসেবে দেখা যায় সপ্তম গ্রেডে ১৬৬২.৫০ টাকা মজুরির সাথে সাথে হাজিরা বোনাসসহ বিভিন্ন ভাতাসহ ইন্সুরেন্স বাবদ শিক্ষানবীশ শ্রমিকরা মাসে মোট ২৭০০ টাকা আয় করে থাকে।[২১]

এটা সত্য যে, শিল্প টিকিয়ে রাখার জন্য শ্রমিক সবচাইতে বড় বিনিয়োগ, তদুপরি শিল্পের সার্বিক সামর্থ্যের কথা বিবেচনায় রেখে মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে যাতে করে শ্রমিক ও শিল্প উভয়ই লাভবান হয়। পাশাপাশি এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, এই শিল্প একটি শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প এবং এর মূল্য নির্ধারণ করে থাকেন বিদেশি ক্রেতাগণ। তাই বাজার ধরে রাখার বিষয়টি আমাদের প্রতিযোগী ক্ষমতার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। প্রতিযোগী দেশগুলোর সাথে তীব্র প্রতিযোগিতা করে আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের অবস্থান ধরে রাখতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, সরকার সম্প্রতি নৌযান শ্রমিকদের জন্য ২১৯০ টাকা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করেছেন। আর ইপিজেডভুক্ত কারখানার পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি হচ্ছে ৩০ ডলার বা ২১০০ টাকা।[২২]

সংকট ও আন্তর্জাতিক বাজার:

বর্তমানে জ্বালানি, বন্দর, শ্রমিক অসন্তোষসহ প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে অনেক মালিক কারখানা বিক্রি করে দিচ্ছেন।

চিন্তার বিষয় এই যে, আজকে বড় বড় এসব গ্রুপ যেখানে কারখানা বিক্রি করে দিচ্ছে সেখানে ছোটদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। গোটা সেক্টরের মালিকেরা বর্তমান সংকটে পড়ে মুক্তির উপায় খুঁজছেন। কিন্তু ব্যাংকের ঋণসহ বিভিন্ন রকম দায়বদ্ধতার কারণে সবার ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। নানামুখী সংকটে টিকতে না পেরে তাদের দীর্ঘদিনের গড়ে তোলা স্বপ্নকে এভাবে বিক্রি করে দিয়ে কোন রকমে দায়মুক্তি পেয়েছেন। আরও আশঙ্কার বিষয় এগুলো ক্রয় করছেন বিদেশী মালিকেরা যা কোনভাবেই এই পোশাক শিল্পের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে না। বিদেশী মালিকেরা সচরাচর মুনাফা নিজ দেশে স্থানান্তর করে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন ২০০৬ পরবর্তী সময়ে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক বাজারে পোশাকের দর কমতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকা স্থিতিশীল অবস্থান নেয়। আর ২০০৮ এর সেপ্টেম্বর পরবর্তী সময়ে বিশ্বমন্দার কারণে পোশাকের দর আশংকাজনক হারে হ্রাস পায় সেই ধারা এখনও বিদ্যমান রয়েছে। অপরদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে

২০. প্রাগুক্ত।
২১. প্রাগুক্ত।
২২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তুলা ও সুতাসহ অন্যান্য কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, দেশে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহের অবনতি ইত্যাদি কারণে উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে অনেক। পোশাক শিল্পখাতে শুধুমাত্র চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ না পাওয়ার কারণে বার্ষিক মোট ক্ষতির পরিমাণ ২১৫০ কোটি টাকা। আর গ্যাস-বিদ্যুৎ সমস্যার কারণে শুধুমাত্র নভেম্বর ২০০৯ থেকে এপ্রিল ২০১০ এই ৬ মাসে প্রায় ৪০ হাজার টন তৈরি পোশাক এয়ারশিপমেন্ট করতে হয়েছে। যার কারণে পোশাক শিল্পের প্রত্যক্ষ ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা, যা উক্ত সময়ে রপ্তানিকৃত পোশাকের (সিএম) মূল্যের প্রায় ৩.৮%। এছাড়াও ২০০৬ এর পরবর্তী সময়ে বিদ্যুতের মূল্য দু'বার বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত ১ মার্চ ২০১০ থেকে শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম প্রায় ৬% থেকে ৯% বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ঘাটতির কারণে একটি মাঝারি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের বছরে প্রায় ৯০ লাখ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পায় যা ডিজেল ক্রয় ও জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয় হয়।

গত অর্থ বছরের জুলাই-মে এই ১১ মাস সময়ে সামগ্রিক পোশাক রপ্তানি ০.৫২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ভারত ও চীন সরকার তাদের অর্থনীতি ও শিল্পখাতকে চাঙ্গা রাখার জন্য ৩টি প্রণোদনা প্যাকেজ দিয়েছে। যার মধ্যে এ দেশগুলোর পোশাকখাতের জন্য বেশ কিছু সহায়তা রয়েছে। ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, চীন, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামের পোশাক রপ্তানিকারকগণ তাদের সরকার কর্তৃক দফায় দফায় প্রণোদনা প্যাকেজ পেয়ে তাদের শিল্পে উৎপাদন ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করতে সমর্থ হয়েছে। যার কারণে তারা মূল্য ছাড়ের মাধ্যমে পরিমাণগত দিক থেকে বাজার দখল করছে। গত এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানিকৃত বাংলাদেশের পোশাকের মূল্য হ্রাস পেয়েছে প্রায় ৯.৪৩ ভাগ এবং গত জানুয়ারি মাস থেকে ইউরোপে আমাদের পোশাকের দরপতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, পোশাক শিল্প আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। সরকার মন্দার কবল থেকে এই শিল্পকে রক্ষা করার জন্য দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন, যা নানা রকম জটিলতার কারণে তা এখনও আলো দেখেনি। পোশাক শিল্পে মালিকদের অভিযোগ বাণিজ্যিক খাতে বাড়ির উপর ১৫% ভ্যাট ও রপ্তানির উপর আরোপিত ০.২৫% সোর্স ট্যাক্স ০.৫% তে উন্নীত করা হয়েছে, যার জন্য বাড়তি বোঝা তৈরি করছে। চীনে বর্তমানে শ্রমিক মজুরি বেড়ে তাদের সাথে যে সমস্ত বিদেশী ছিল তারা ব্যবসা সেখান থেকে ফিরিয়ে আনছে। বাংলাদেশ সে সুযোগ কাজে লাগাতে পারতো।[২৩]

পোশাক শিল্পকে বাঁচাতেঃ

এ প্রসঙ্গে আমি এ শিল্পের কথা তুলে ধরবো। কারণ যারা দেশের শিল্পকে ধ্বংস করতে চায় তাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ১৯৮৫ অর্থ বছরে এখান থেকে ৩১.৫৭ মার্কিন ডলার মূল্যের পোশাক রপ্তানী হয়েছিল, যা মোট রপ্তানির মাত্র এক শতাংশ। সেখানে ১৯৮৬–৮৭ তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ২৯৮.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিলো তৎকালীন মোট রপ্তানির এক শতাংশ। আর গত ২০০৯–১০ অর্থ বছরে তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ১২.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। কোটি টাকা যা মোট রপ্তানির শতাংশ।

পাশাপাশি একথা দেশের সবাই অবগত যে, এ শিল্পের কারণে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ, ফরোয়ার্ড শিল্পসহ অনেক পরিপূরক ও শিল্প গড়ে উঠেছে। যেমন-ব্যাংক, সড়ক ও রেল পরিবহন, দেশের অভ্যন্তরে বিমান ও নৌপথে শিপিং কার্গো হ্যান্ডলিং, সিএন্ডএফ ব্যবসা হাউস, হোটেল, পর্যটন কার্টুন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনাময় ব্যবসার সুযোগ এনে দিয়েছে এই পোশাক শিল্প।

---

২৩. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের বেশিরভাগ পোশাক কারখানাই হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শ্রেণীর। এই শ্রেণীর কারখানার সংখ্যা মোট কারখানার প্রায় ৭০% এবং দেশের রপ্তানীতে এদের অবদানই বেশি। আমরা চাই, পোশাক শিল্প বাঁচুক, সেই সাথে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই বেঁচে থাকুক। আমরা চাই জাতীয় অর্থনীতির, কর্মসংস্থান সৃষ্টির ও দারিদ্র্য বিমোচনে পোশাক শিল্পের অবদান, অবকাঠামো দুর্বলতা বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকট, বিশ্ব বাজারে তৈরি পোশাকের অব্যাহত ভাবে দরপতন এবং সর্বোপরি পোশাক শিল্পের প্রতিযোগী সক্ষমতা প্রভৃতি বিবেচনায় রেখে ন্যূনতম মজুরি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হোক।[২৪]

সরকার উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি এ শিল্পের অন্যতম প্রাণ শ্রমিকদের অবদান সবচেয়ে বেশি। সবার শ্রম, আন্তরিকতায় আজ আমরা এ শিল্প থেকে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ অবদান রাখতে পারছি। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প আজ শুধু দেশের সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পখাতই নয় বরং দেশের সবচেয়ে বড় কর্মক্ষেত্র। এ শিল্পে প্রত্যক্ষভাবে ৩৫ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যাদের ৮০ ভাগই নারী। এসব নারী শ্রমিকরা অধিকাংশই এসেছেন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র পরিবার থেকে। পোশাক শিল্প সমগ্র আর্থ-সামাজিক কাঠামো পাল্টে দিয়েছে, এতে এনেছে বহুমাত্রিক পরিবর্তন ও অভূতপূর্ব ভারসাম্য। জনদরদী বর্তমান সরকারের কাছে প্রত্যাশা, পোশাক শিল্পকে বাঁচাতে পোশাক শিল্প খাতের জন্য 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ' গঠন করা এবং পোশাক শিল্প পল্লীতে বিশৃঙ্খলা যাতে সৃষ্টি না হয় সে জন্য স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃবৃন্দকে কাজে লাগাতে হবে।

পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের প্রাসঙ্গিক অবস্থা:

শ্রমজীবী নারীরাও দারিদ্র মুক্ত নয়:

নারীর অধিকার সংখ্যায় শ্রম বাজারে অংশগ্রহণকে বাংলাদেশে বিদ্যমান বিস্তৃত দারিদ্র্য মোচনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই বিবেচনার ফলে অধিক সংখ্যায় নারীর অংশগ্রহণ আজ বাংলাদেশের শ্রমবাজারের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে নারীদের মজুরিকর্মের ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব বহু সমীক্ষার ফলাফলেই প্রকাশ পেয়েছে। একাধিক সমীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যায়, নারীর মজুরিকর্ম পরিবারের আয় স্তরকে কয়েক ধাপ উপরে তুলে দেয়।[২৫] যার ফলে পরিবারগুলো ব্যাপক দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের সুযোগ লাভ করে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই দারিদ্র্য মাপা হয়েছে ভোগমাত্রার মানদণ্ডে। ভোগমাত্রা ছাড়াও দারিদ্র্যের যে আরো মাত্রা আছে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে শ্রমজীবী নারীর ক্ষেত্রে তা অবহেলা করা হয়েছে। ভোগমাত্রা ব্যতীত দারিদ্র্যের অন্যান্য মাত্রার বিচারে নারীরা কম মজুরি গ্রহণ করে কতটা তাদের বিস্তৃত দারিদ্র্য লাঘবের সুযোগ পেয়েছে তা খুঁজে দেখা হয়নি। অথচ বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে কর্মসংস্থান বাড়িয়ে দারিদ্র্য মোচনের কৌশলটি দারিদ্র্য মোচনের জন্য পারিবারিক শ্রমশক্তির স্বেচ্ছাশোষণ মাত্র।[২৬] এটা সত্য যে, নারীদের মজুরি কর্ম তাদের শূন্য হাতে কিছু অর্থের যোগান দিয়েছে এবং এটাও সত্য যে, এই অর্থের বলে তারা তাদের ভোগমান যা কিনা দারিদ্র্য অবস্থা পরিমাপ করার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মানও, তা কিছুটা উন্নত করতে পেরেছে। কিন্তু এই প্রাপ্তির জন্য অন্যদিকে তাদের হারাতে হয়েছে বিশ্রাম, নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য বা উন্নত জীবনের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। নারীর দারিদ্র্য পরিমাপ করার সময় এই বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয়েছে সামান্যই।

---

২৪. প্রাগুক্ত।

২৫. Protima Paul Majumder and Salma Chowdhury, Zahir, 'Empowering Women: Wage Exmployment in the Government Industry, Empwerment, A Journal of Women for Women, Vol-2, Dhaka-1995, P.45

২৬. Rushedur Islam Rahman, The Wage Employment market for Rural Women in Bangladesh, Research Monograph, 6 BIDS, Dhaka-1992, P. 47.

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক ক্ষমতাহীনতাই বাংলাদেশের নারীর দারিদ্র্যের জন্য বহুলাংশে দায়ী। তাই বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের বিশ্লেষণে অনেকগুলো মাত্রাই বিবেচনায় নেয়া হয়নি। যখন বিশ্লেষণ করা হয়েছে কীভাবে দারিদ্র্যের আপতন একই সমাজে বসবাসকারী নারী পুরুষের মধ্যে অসমভাবে বণ্টিত হয়,[২৭] তখনো কিন্তু নিরাপত্তা, বিশ্রাম, ভগ্নস্বাস্থ্য ইত্যাদিও যে নারী ও পুরুষের মধ্যে অসমভাবে বণ্টিত তা গবেষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। তাছাড়া মজুরিকর্ম গ্রহণের পর এই অসমতা যে আরো বিস্তৃত হয়-এ সত্যটিও উপেক্ষা করা হয়েছে। দারিদ্র্য উপশমের জন্য আজ নারীরা শিল্পক্ষেত্রে, যা কিনা তাদের সনাতনী কাজের আওতার বাইরে, সেখানে কাজ গ্রহণ করতেও পিছপা হচ্ছে না। যার ফলে শিল্পশ্রমে তাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত চমকপ্রদ। ঢাকা শহরের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের শিল্প কারখানাগুলোতে নিয়োজিত মোট শিল্প শ্রমিকের প্রায় ১৬ শতাংশেরও বেশি নারী শ্রমিক, যেখানে, সত্তর দশকের দিকে এদের সংখ্যা ছিলো নিতান্তই নগণ্য। এই অবস্থায় শহরাঞ্চলের শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত নারীর নিরাপত্তাহীনতা যে ব্যাপক হবে তা কিছুটা অনুমান করা যায়। এই নিরাপত্তাহীনতা যুক্ত হয়েছে তাদের সামাজিক এবং কর্মজীবন-এই দুই ক্ষেত্রেই। সামাজিক জীবনের নিরাপত্তাহীনতা উত্থিত হয় তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে, কর্মক্ষেত্রে যাওয়া আসার দীর্ঘ পথ থেকে, এমনকি বাসস্থান থেকেও।

নিরাপত্তা:

আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা উন্নত জীবনের একটি জরুরি শর্ত। অথচ শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত নারীর জীবনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শর্তটি পূরণ হয়না। যে আর্থিক নিরাপত্তার আশায় তারা গ্রামের শান্ত নিরাপদ পরিবেশ পেছনে ফেলে এসে শহরের শিল্পকারখানাগুলোতে চাকরি গ্রহণ করেছেন, সে আশা তো পুরোপুরি পূরণ হয়ইনি; সেই সঙ্গে তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছেন এক চরম নিরাপত্তাহীনতায়। মালিক যে কোনো সময় বরখাস্ত করতে পারেন এবং বরখাস্ত করলে তারা আইনের আশ্রয় নিতে পারেন না, যেহেতু চাকরির কোনো নথিপত্রই তাদের নেই। বস্তুতপক্ষে পোশাক কারখানায় স্থায়ী শ্রমিক বলে কারো অস্তিত্ব নেই। এই অনিশ্চিত চাকরি নারীকে কতটা দারিদ্র্য উত্তরণে সাহায্য করবে তা সহজেই অনুমেয়। এই অনিশ্চয়তা তাদের চাকরি জীবনকে বরং দুঃসহ করে তোলে। তারা সবসময় চাকরি হারানোর ভয়ে ভীত থাকেন। এটা কোনো উন্নত জীবনের লক্ষণ নয়। চাকরির অনিশ্চয়তা শ্রমজীবী নারীর জীবনে এক নতুন দারিদ্র্যমাত্রা যোগ করে।

সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা:

ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা শ্রমজীবী নারীর জীবনযাত্রায় একটি নতুন সংযোজন। নারী পোশাক শ্রমিকদের জীবনযাত্রা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কারখানার ভেতরের নিরাপত্তাহীনতা, রাস্তার নিরাপত্তাহীনতা এবং ঘরের নিরাপত্তাহীনতা। অথচ সামাজিক নিরাপত্তা জীবনযাত্রা মানের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। সামাজিক নিরাপত্তা অনেক ক্ষেত্রে ভালো খাওয়া-পরারও আগে আসে। জীবনের এই অতি জরুরি উপাদানটিই নারীরা মজুরি কর্ম গ্রহণের পর অনেক ক্ষেত্রে বিসর্জন দেন।

কারখানার ভেতরের নিরাপত্তাহীনতা :

কারখানার ভেতরেও ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে নারী শ্রমিকদের কাজ করতে হয়। পোশাক কারখানায় নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের মধ্যে মান-সম্ভ্রমের নিরাপত্তাহীনতা ব্যাপক। নারী শ্রমিকদের সঙ্গে কারখানায় ম্যানেজমেন্ট স্টাফ খারাপ ব্যবহার করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের পুরুষ

২৭. Shamim Hamid, Gender Diminshion of poverty in Bangladesh: A case study, Bangladesh-A National Strategy for Economic Groth, Poverty Reduction and Social Development, Economic relation Division-Ministry of Finance, 1995, P. 72

Dhaka University Institutional Repository

সহকর্মীও খারাপ ব্যবহার করেন। সবচেয়ে ভয়ংকর ঘটনা হলো সুপারভাইজার কর্তৃক মারধোরের ব্যাপার। নারী শ্রমিকদের, যাদের গড় বয়স ১৯ বছর, তারা সুপারভাইজারের (যাদের অধিকাংশই পুরুষ) হাতে মার খেলে তাদের মান-সম্ভ্রম কতটুকু নেমে যায় তা ধারণা করা কঠিন নয়। নারীর মান-সম্ভ্রমের আরো যে কঠিন আক্রমণ হয় তাহলো কারখানা উর্ধ্বতন কর্মচারী কর্তৃক নারীশ্রমিককে ধর্ষণ। এমন ঘটনাও গার্মেন্টসগুলোতে অহরহ ঘটে। এসব ঘটনাই প্রমাণ করে কারখানায় কাজ করতে এসে নারীরা কতটা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। অথচ কারখানায় কাজ গ্রহণের আগে তাদের কাছে এ ধরণের নিরাপত্তাহীনতা ছিলো সম্পূর্ণ অপরিচিত।

কারখানায় যাতায়াতের পথের নিরাপত্তাহীনতা:

রাস্তার নিরাপত্তাহীনতা আরো ব্যাপক। কারখানায় আসা-যাওয়ার পথে তারা মাস্তান-বখাটে ও পুলিশের দ্বারা আক্রান্ত হন। বহু ক্ষেত্রে ছিনতাইকারী তাদের বহু কষ্টার্জিত মাসিক আয়টুকুও লুট করে নিয়ে যায়। পথে তারা সবচাইতে বড় যে নিরাপত্তাহীনতার শিকার হন তা হচ্ছে যানবাহন দুর্ঘটনা। নারী শ্রমিকরা গ্রাম থেকে এসে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পরিবেশে নিক্ষিপ্ত হন। এখানে রাস্তা চলাচলের নিয়ম-কানুনগুলো তাদের জানা থাকে না। তার ওপর একজন নারী শ্রমিককে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করতে হয় এবং প্রায় ৬১ শতাংশ নারী শ্রমিকই এই রাস্তা পায়ে হেঁটে পার হন। যার ফলে অতি সহজেই তারা দুর্ঘটনার শিকার হন। এ ধরনের নিরাপত্তাহীনতা নারী শ্রমজীবীদের সমস্যার তালিকায় একটি নতুন সংযোজন।[২৮]

বাসস্থানের নিরাপত্তাহীনতা:

যে ধরণের বাসস্থানে শিল্প শ্রমিকরা বাস করেন সেখানে নিরাপত্তাহীনতা যে ব্যাপক হবে তা বলাই বাহুল্য। ঢাকা শহরে শ্রমজীবী নারীর অন্তত ৩০ ভাগ বস্তিতে বাস করেন। এ ধরণের বাসস্থানে রয়েছে উচ্ছেদের ভয়। তারা সব সময় উচ্ছেদের ভয়ে ভীত থাকেন। চুরি এবং মস্তানের ভয় ছাড়াও আগুন লাগা অথবা ঝড়-তুফানের ভয় তো রয়েছেই। নড়বড়ে পাখির বাসার মতো বস্তিঘরগুলো নিমিষেই উড়ে যায় যে কোনো হাল্কা তুফানেও। আর ঝড়-তুফান বাংলাদেশে নিয়মিত বাৎসরিক ঘটনা। পোশাক শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা প্রায় ১০ জন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বাস করেন। এ বসবাসে অন্য এক ধরণের নিরাপত্তাহীনতা রয়েছে। তা হচ্ছে, আত্মীয়-স্বজনদের খুশি করতে অপারগ হলেই তাদের বাসা থেকে বের করে দেয়া হয়। টাকা-পয়সা দেয়া ছাড়া বহুক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের নিজের মান ইজ্জত দিয়েও আত্মীয়-স্বজনদের খুশি করতে হয়। গৃহস্থালি কাজে শ্রম দিয়ে খুশি করা তো রয়েছেই। নারী শ্রমিকরা যখন স্বাধীনভাবে নিজেদের মধ্যে মেস (Mess) করে বাস করেন তখনো তারা নানাবিধ সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা থেকে রেহাই পান না। মেসে বসবাসের ক্ষেত্রে প্রথমেই বাধার সম্মুখীন হতে হয় বাড়িওয়ালার কাছ থেকে। তাদের কোনো বাড়িওয়ালাই বাড়িভাড়া দিতে চান না![২৯] যার ফলে তারা কোনো ভালো এলাকাতেই ঘর ভাড়া পান না। এ ধাক্কাটি কোনোমতে কাটিয়ে উঠতে পারলে তারা কোনো ভালো এলাকাতেই ঘর ভাড়া পান না। এ ধাক্কাটি কোনোমতে কাটিয়ে উঠতে পারলে তারা সম্মুখীন হন দ্বিতীয় ধাক্কাটির, যা আসে স্থানীয় মাস্তানদের কাছ থেকে। তারা নানাভাবে একা বসবাসকারী তরুণীদের উত্ত্যক্ত করে। এ ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে ভুগে শ্রমজীবী নারীরা জীবনের যে মহামূল্যবান সম্পদটি হারায় তা হলো মানসিক শান্তি। অথচ শারীরিক সুস্থতার মতো মানসিক সুস্থতাও জীবনের অপরিহার্য অংশ।

---

২৮. Protema Paul & Others, Opcit, P. 45

২৯. চিরঞ্জন সরকার, নারী ও দারিদ্র্য, স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা-২০০৭, পৃ. ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক মর্যাদা:

শ্রমজীবী নারীর জীবনযাত্রার মান বিচারে তাদের সামাজিক মর্যাদার ব্যাপ্তিও আয় বর্হিভূত একটি জরুরি মাপকাঠি। আমাদের দেশের নারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘরে এবং বাইরে অমর্যাদার সন্মুখীন হন। তারা একলা কোথাও যেতে পারেন না। ঘরের মধ্যে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারেন না। সামাজিক এই অমর্যাদার পেছনে প্রধান কারণটি ধরা হয় পরিবারের পুরুষ সদস্যদের ওপর তাদের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা। মজুরিকর্মের মাধ্যমে যখন তারা এই নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি পান তখন স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যেতে পারে যে সমাজে তাদের মানমর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মাপকাঠিতে নারী পোশাক শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বিচার করলে দেখা যায় অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের পরেও নারীরা এ ব্যাপারে বেশি দূর এগুতে পারেননি। শ্রমজীবী নারীর সম্পর্কে তাদের আত্মীয়-শ্বশুর-শাশুড়ি-স্বামীর ধারণা খুব একটা ভালো নয়। প্রতিবেশীদের ধারণা আরো খারাপ। মজুরি কর্মের মাধ্যমে নারীরা যে ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছেন, তার শক্তিতেই তারা তাদের মনের দারিদ্র্য ঘোচাতে পারেননি। অনেকেই মজুরিকর্ম গ্রহণ করে মনের দিক থেকে বরং আরো পিছিয়ে গেছেন। অবিবাহিত নারী শ্রমিকের অবস্থা আরো করুণ। বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় নারীর বিয়ে একটি ব্যয়বহুল ঘটনা। যৌতুক প্রতা অভিশাপের মতো নারীর জীবন গ্রাস করে। সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, মজুরি কর্মের মাধ্যমে নারীরা এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হবেন। যেহেতু যৌতুকের পরিবর্তে মাসে মাসে তারা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ স্বামীর হাতে তুলে দিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এ ব্যাপারেও তারা সামান্যই এগুতে পেরেছেন। উল্টো অনেকের বিয়ের সম্ভাবনা কমে যায়। যেহেতু সমাজ মনে করে, মেয়েরা কারখানায় কাজ করে খারাপ মেয়ে হয়ে গেছে।[৩০]

শ্রমঘণ্টা:

বিশ্রাম সুস্থ জীবনের জন্য অতি জরুরি প্রয়োজন। কেননা মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য পঙ্গু হয়ে যায় বিশ্রামের অভাবে। অথচ শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী জীবনের এই জরুরি প্রয়োজনটি বহুক্ষেত্রেই মেটাতে পারেন না। দীর্ঘ শ্রমঘণ্টা নারীর বিশ্রামের অনেকটাই কেড়ে নেয়। শ্রমজীবী নারীর ৭০ শতাংশই নিয়োজিত আছে পোশাকশিল্পে যেখানে দৈনিক শ্রমঘণ্টার ব্যাপ্তি প্রায় ১২ ঘণ্টা। দেখা গেছে, এই শিল্পে প্রায় ৩০ শতাংশ ক্ষেত্রে তারা দৈনিক ১৩ ঘণ্টারও অধিক সময় প্রদান করছেন। এর বাইরেও তাদের গৃহস্থালি কাজে দৈনিক গড়ে ২.৫ ঘণ্টা ব্যয় করতে হয়।[৩১] প্রতিদিন নারী শ্রমিকরা গড়ে ১.৩০ ঘণ্টা ব্যয় করেন কারখানায় আসা-যাওয়ার পথে, যেখানে পুরুষ শ্রমিকরা ব্যয় করেন মাত্র .৫০ ঘণ্টা।[৩২] সবকিছুর পর দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নারী শ্রমিকদের কাছে অবশিষ্ট থাকে মাত্র ৭.৫ ঘণ্টা। এই সময়ের মধ্যে প্রাত্যহিক কাজ (গোসল, খাওয়া, টয়লেট ইত্যাদি) সম্পন্ন করে বিশ্রাম এবং ঘুমের জন্য অতি সামান্য সময়ই অবশিষ্ট থাকে। বিশ্রাম এবং বিনোদন শব্দটি তাদের কাছে প্রায় অপরিচিত। অথচ চাকরি গ্রহণের আগে তারা সবাই প্রয়োজনীয় ৮ ঘণ্টারও অধিক সময় ঘুমাতে পারতেন এবং দৈনিক প্রায় ৫ ঘন্টা বিনোদন ও বিশ্রামে কাটাতেন। যদিও খেতে এবং পরতে পারতেন সামান্যই। এখানে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, দরিদ্র্যের কেবল রূপ বদল হয়েছে। দরিদ্র নারীরা মজুরি শ্রমের মাধ্যমে এক দারিদ্র্য থেকে অন্য দারিদ্র্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন মাত্র। মজুরিশ্রমের আগে পর্যাপ্ত খেতে পেতেন না। আর মজুরি শ্রম গ্রহণ করার পর বিশ্রাম পাচ্ছেন না। অথচ সুস্থ এবং সুন্দর জীবনের জন্য দুই-ই প্রয়োজন।

---

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৩১. Protima Paul & Other, Op.cit. 47
৩২. Ibid, P.47

Dhaka University Institutional Repository

ছুটি প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা:

শ্রমজীবী নারীর বিশ্রামের পরিধি আরো সংকুচিত হয় সাপ্তাহিক ছুটি, যা কিনা প্রতিটি শ্রমিকের মৌলিক অধিকার, তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে। ছুটি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীরা জেন্ডার বৈষম্যেরও শিকার হন। দেখা গেছে পুরুষ শ্রমিকরাই নারী শ্রমিকের তুলনায় বেশি ছুটির অনুমোদন পান। পদমর্যাদা অনুযায়ীও মজুরিসহ ছুটির অংশ দারুণভাবে ভিন্ন হয়েছে। কোয়ালিটি কন্ট্রোলার, কাটার ইত্যাদি উচ্চপদস্থরা যেখানে তাদের প্রাপ্ত ছুটির বেশির ভাগটাই মজুরিসহ ভোগ করেন, সেখানে হেল্পার শ্রেণীর শ্রমিকরা তাদের অনুমোদিত ছুটির অতি সামান্যই মজুরিসহ ভোগ করতে পারেন। আর এই শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭০ জনই হচ্ছেন নারী।

স্বাস্থ্য নিরাপত্তা:

দীর্ঘ শ্রমঘণ্টা এবং একনাগাড়ে মাসের ৩০ দিন কাজ করা নারীর ঘুম এবং বিশ্রামই শুধু কেড়ে নেয় না, শ্রমবাজারে বিক্রি করার মতো তাদের একমাত্র মূলধন শারীরিক শক্তিটিও কেড়ে নেয়। রোগ-প্রকৃতি বিচার করলে দেখা যায় পোশাক কারখানায় চাকরি গ্রহণের পর ৭৪ শতাংশ নারীশ্রমিক শারীরিক দুর্বলতার শিকার হয়েছেন। এটি আসলে রোগ নয়, উপসর্গ মাত্র। এই রোগ শ্রমিকের শ্রমশক্তি তো হরণ করেই, একই সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও কেড়ে নেয়। এই রোগের চিকিৎসা খুব ব্যয়বহুল যা স্বল্পমজুরির শ্রমিকদের পক্ষে গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব। নারী শ্রমিকদের মধ্যে শারীরিক দুর্বলতার আরেকটি কারণ হলো রক্তশূন্যতা। রক্তশূন্যতা নারী শ্রমিকের শ্রমশক্তি এবং জীবনীশক্তি দুই-ই ধীরে ধীরে পঙ্গু করে দেয়। দেশে প্রায় ৯০ শতাংশ গর্মেন্টকর্মী শ্বাসসংক্রান্ত রোগ, পেট ব্যথা এবং সর্দি-কাশি সমস্যায় ভোগে। একই সঙ্গে তারা মাথাব্যথা, জ্বর, যক্ষ্মা এবং জন্ডিসে ভোগে। সবচেয়ে বেশি ভোগে যারা তুলা ও কাপড় নিয়ে কাজ করে। কিন্তু প্রায় ১২ শতাংশ কর্মীই জানে না যে, তুলা ও কাপড়ের ক্ষুদ্র অংশের কারণে তাদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা হয়। প্রায় ১১ শতাংশ কর্মীই জানে না যে, তুলা বা আঁশের ক্ষুদ্র অংশ নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভেতরে যাওয়া প্রতিরোধ করতে পারলেই তারা এসব সমস্যা এড়াতে পারে। ৮ শতাংশ কর্মী জানায় তারা অসুবিধা এড়ানোর জন্য কোনো মাস্ক ব্যবহার করে না। ৪১ শতাংশ কর্মী বিজিএমইএ প্রদত্ত মেডিকের সুবিধা ভোগ করে না।[৩৩]

এখানে ধারণা করতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, মজুরি শ্রমের মাধ্যমে ভোগমান উন্নত করতে গিয়ে নারী শ্রমিকরা কত ব্যাপক হারে তাদের স্বাস্থ্য হারাচ্ছেন। অথচ স্বাস্থ্য জীবনযাত্রা মানবিচারের একটি অতিপ্রয়োজনীয় মানদণ্ড। স্বাস্থ্য মানব জীবনের মৌলিক প্রয়োজন। এর অভাবে আর কোনো বিচারেই জীবনকে উন্নত বলা যায় না।

স্বাস্থ্যের ওপর মজুরি শ্রমের প্রভাব বহুদূর প্রসারী। ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে তাদের শ্রমশক্তিই কেবল বিঘ্নিত হচ্ছে না, হচ্ছে অর্থের খরচ। দেখা গেছে নারী পোশাকশ্রমিকের মাসে গড়ে ১০৮ টাকা চিকিৎসার জন্য খরচ করেন যা তাদের কষ্টার্জিত আয়ের প্রায় ১২ শতাংশ।[৩৪] এছাড়া তাদেরকে শ্রমদিনও হারাতে হয়। পোশাক কারখানায় যেহেতু ছুটি পাওয়া যায় না সেহেতু এই ছুটির সিংহভাগই বিনা বেতনের ছুটি। দেখা যায় অসুস্থ শ্রমিকরা গড়ে মাসে ৪টি কর্মদিবস হারায়, টাকাতে যার ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৮ টাকা (দৈনিক আয় ২৯.৫ টাকা)। পোশাক শ্রমিকদের স্বল্প বেতন থেকে

---

৩৩. The Daily Star, 17, August, 2005

৩৪. Protima Paul & other, Op.cit, P. 47

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসা খরচ ১০৮ এবং কর্মদিবস ক্ষতির জন্য ১১৮ টাকা চলে গেলে যা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে কতটা তাদের রিক্তৃত দারিদ্র্যমোচনে হবে তা অনুমান করা কঠিন নয়। মজুরিকর্ম গ্রহণের আগে অনাহার, অর্ধাহার এবং অপুষ্টির কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি যতটা ছিল মজুরিকর্ম গ্রহণের পর তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে দুর্ঘটনা থেকে মৃত্যুর আশঙ্কার কারণে। শিল্প ক্ষেত্রে যে সব দুর্ঘটনা হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার শিকার হন নারী শ্রমিকরা। পোশাক কারখানায় যখনই কোনো দুর্ঘটনা হয়েছে দেখা গেছে তুলনামূলকভাবে নারীশ্রমিকরাই বেশি সংখ্যায় প্রাণ দিয়েছেন। পোশাক কারখানাগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দ্বিতল, ত্রিতল, অথবা তারও উঁচু তলায় অবস্থিত। তাদের জীবনের নিরাপত্তাহীনতার চরমতম প্রকাশটি ঘটে যখন দেখা যায় নারী পোশাক শ্রমিককে উঁচু কারখানা ভবনের কক্ষগুলোতে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। দেখা গেছে, প্রতি বছরই একটি কি দু'টি কারখানায় আগুন লাগে এবং তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। দেখা গেছে, প্রতি বছরই একটি কি দুটি কারখানায় আগুন লাগে এবং তালাবদ্ধ অন্তরীণ নারী শ্রমিকরাই বেশি সংখ্যায় প্রাণ বিসর্জন দেন। একটু ভালো খাওয়া ও পরার বিনিময়ে বহুক্ষেত্রে তাদের জীবনের ঝুঁকি নিতে হচ্ছে।

গত ২০ বছরে অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মোট ৩৫০ জন গার্মেন্টস শ্রমিক মারা গেছে, আর আহত হয়েছে প্রায় ১৫০০ শ্রমিক। হতাহতদের বেশিরভাগই নারী শ্রমিক। গার্মেন্টস শ্রমিকের এই পুড়ে মরার ঘটনাগুলো এখন খুবই স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। শ্রমিকদের ন্যূনতম কল্যাণ ও কারখানা আইনকে তোয়াক্কা না করেই বেশিরভাগ গার্মেন্টস কারখানা গড়ে তোলা হয়েছে। মালিকরা দেশের প্রচলিত শ্রমিক ও শ্রমআইন, কারখানা আইন, শ্রমঘণ্টা মোটামুটি উপেক্ষা করেই ওই গার্মেন্টসগুলো পরিচালনা করছে। সরকার শ্রমিকদের ন্যূনতম নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। গার্মেন্টস কারখানার নিরাপত্তার বিষয়টি এখন কেউ দেখার নেই। এমনকি আদালতের আদেশ পর্যন্ত মানা হচ্ছে না। আদেশ অনুযায়ী গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিকদের কাজ করার সময় কারখানার মূল ফটক খোলা রাখার বাধ্যবাধকতা আছে। কিন্তু কোনো গার্মেন্টস মালিকই সেই আদেশ মানছে না। এছাড়া কারখানা আইনও মানা হচ্ছেনা। গার্মেন্টস মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর কারখানার ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা দেখার কথা থাকলেও আদৌ সেই বিষয়টির প্রতি নজর দেয়া হয় না। কোনো গার্মেন্টস কারখানায় আগুন লাগলেই বিজিএমই এ তদন্ত কমিটি গঠন করে মালিকদের বাঁচিয়ে দেয়ার নানা রকম ফন্দি-ফিকির করে থাকে।

নিজের রক্ত পানি করে গার্মেন্টস শ্রমিকরা যে শ্রম দেয় তারা সেই শ্রমের মূল্য তো পায়ই না, এমনকি জীবন পর্যন্ত দিতে হয়। যারা বিপজ্জনকভাবে কারখানা তৈরি করে, নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে দুর্ঘটনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, শ্রমিক হত্যার আয়োজন করছে, তাদের শাস্তি হচ্ছে না। আর শাস্তি না হওয়ার কারণে অপরাধের সংখ্যা ও মাত্রা দুটোই বেড়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট ঘটনার জন্য ছোট ছোট গার্মেন্টস মালিকরা তবু হয়তো ধরা পড়ে। কিন্তু রাঘববোয়ালদের স্পর্শ করা সম্ভব হয়না। কারণ তাদের প্রতি সরকারি দলের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা থাকে। তারাই ব্যবসায়ী হিসেবে রাজনৈতিক দলে অর্থ সহায়তা দেয়। তাই যে যত বড় অপরাধী সে তত স্বাধীনতা ভোগ করে। মালিকরা শ্রমিকদের আধিক্য দেখা যায়। এদেশে বেকারের সংখ্যা এত বেশি যে, শ্রমিকেরা কোনো অভাব ঘটে না। একজন চলে গেলে দশজন বেপরোয়াভাবে ঠ্যালা-ধাক্কা দিয়ে প্রবেশ করে। কাজের শর্ত, মজুরি, ঝুঁকি, পরিবেশ-কোনো কিছুই তারা বিবেচনার ভেতর আনার সুযোগ পায়না। গার্মেন্টস মালিকরা যত বেশি টাকার মালিক, তত তাদের ক্ষমতা। তারা বিনা উপদ্রবে অবৈধ কাজ করে যায়, ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা তৈরি করার ব্যাপারে তাদের বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। কারণ তরা জানে শ্রমিকদের মৃত্যু হলে সামান্য টাকা খরচ করে পার পাওয়া যাবে।[৩৫]

---

৩৫. দৈনিক যুগান্তর, ৮ মার্চ, ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশঃ

তালাবদ্ধ ঘরেই যে তারা দুর্ঘটনার শিকার হন তা নয়, শিকার হন পরিবেশগত দারিদ্র্যের, যা কিনা মজুরিকর্ম গ্রহণের আগে তাদের কাছে প্রায় অপরিচিতই ছিল। আমাদের দেশে শতকরা ৭৫ জন মহিলা শিল্পশ্রমিকই গ্রাম থেকে আসে। পোশাকশিল্পে এদের সংখ্যা ৯০ শতাংশেরও বেশি। গ্রামাঞ্চলে পরিবেশগত দারিদ্র্য রয়েছে অতি সামান্যই। গ্রামে তারা বৈদ্যুতিক আলোবিহীন কাচা ঘরে বাস করতেন সত্যি, কিন্তু চারদিকে ছিল খোলা মাঠ, বিশুদ্ধ বাতাস, রোদের আলো এবং অসংখ্য গাছ-গাছালি। তারা মুক্ত, বিশুদ্ধ ও অক্সিজেনপূর্ণ বাতাস প্রাণভরে গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু শহরে এসে কারখানায় চাকরি গ্রহণ করে তারা বন্দি হয়ে যান চার দেয়ালের মাঝখানে, যেখানে অনেক ক্ষেত্রেই আলো বাতাস প্রবেশের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া শ্রমিক প্রতি স্থান সঙ্কুলানও অতি অল্প। সিঁড়ি অতি সংকীর্ণ এবং ছাদ নিচু। এই পরিবেশে দৈনিক গড়ে ১২ ঘন্টা কাজ করলে তাদের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা কি হবে তা সহজেই পরিমাপ করা যায়। তাছাড়া পোশাক কারখানাগুলোতে শ্রম আইন অনুযায়ী খুব কম ক্ষেত্রেই খাবার ঘর আছে। ফলে তারা দুপুরের খাবার খান খোলা আকাশের নিচে কারখানার ছাদের ওপর। ঘিঞ্জি এবং নোংড়া সিঁড়িতে বসেও অনেককে খাবার খেতে হয়। তার ওপর আছে টয়লেটের দুর্গন্ধ। এই পরিবেশ গ্রাম থেকে আসা দরিদ্র নারীর জীবনযাত্রায় এক নতুন সংযোজন। এই পরিবেশের বিচারে একটি নারীশ্রমিকের জীবনকে কোনো প্রকারেই আগের চাইতে উন্নত বলা যায় না।

পরিবেশগত দারিদ্র্য কারখানার চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তা বিস্তৃত হয় নারী শ্রমিকদের বাসস্থান অব্দি। ঘনবসতিপূর্ণ ঢাকা শহরে এসে তারা চাকরি খুঁজে পেলেও বাসস্থান খুঁজে পাননা। ফলে তারা আশ্রয় নেন বস্তিগুলোতে যেখানকার পরিবেশে রয়েছে কার্বন ডাই অক্সাইডের বিষ এবং সীমাহীন নিরাপত্তাহীনতা। ঢাকা শহরের প্রতিটি বস্তিতেই রয়েছে গাছপালাহীন ধুধু পরিবেশ। অপসারণ এবং পয়ঃনিষ্কাশনের অভাবে যেখানে-সেখানে জঞ্জাল জমে থাকে। রোগ জীবাণুবাহী লাখ লাখ মশা, মাছি এবং কীটের সূতিকাগারে পরিণত হয় এই স্তূপ। এই আবর্জনা থেকেই মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে রোগজীবাণু। তাছাড়া ড্রেন থেকে উপচানো মলমূত্র এবং আবর্জনার স্তূপ থেকে উদগত বিষবাষ্প নিয়তই জর্জরিত করে বস্তিতে বসবাসকারী শ্রমিকদেরকে। তারপর বর্ষা নামলে আবর্জনা, কাদা আর বিষ্ঠায় মাখামাখি হয়ে পথ-ঘাট এক হয়ে যায়। পায়ের তলায় থিকথিক করে নোংড়া পূঁতিগন্ধময় আবর্জনা। এরকম পরিবেশে দিনের পর দিন বাস করলে নারী শ্রমিকদের আয়ুষ্কাল কত হবে তা অনুমান করতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

শিল্প প্রতিষ্ঠান নারী শ্রমিকদের জন্য হয়ে উঠেছে অনিরাপদ কর্মস্থল। অধিকাংশ কারখানাই বিপজ্জনক ফাঁদে পরিণত হয়েছে। সর্বাধিক শ্রমের বিনিময়ে নারী শ্রমিকরা পাচ্ছে নামমাত্র বেতন। একটির পর একটি শিল্প দুর্ঘটনার কারণে ন্যায্য মজুরিসহ সব দাবিকে ছাপিয়ে এখন নারীশ্রমিকদের জীবন রক্ষার দাবিই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

এদিকে বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় নারীশ্রমিকদের কোনো ধরনের চুক্তির বাধ্যবাধকতা ছাড়াই সামান্য বেতনে কাজ করতে হয়। যা নারী শ্রমিকের মানসিক চাপ ও জীবনের নিরাপত্তাহীনতার দিকে ঠেলে দেয়। এছাড়া নারী শ্রমিকরা একই ধরণের কাজ করে পুরুষশ্রমিকের তুলনায় অনেক কম বেতন পান। এক হিসাব থেকে জানা গেছে, দেশের তৈরি পোষাক শিল্প-কারখানাগুলোতে বর্তমানে ২০ লাখ শ্রমিক কাজ করছে, যাদের ৮৫ শতাংশই নারী। মোট শ্রমিকের ৮৫ শতাংশ নারী শ্রমিক হওয়ায় সবচেয়ে বেশি প্রতারণার শিকার হন নারীরা। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্রের এক হিসাব

Dhaka University Institutional Repository

অনুসারে, একই ধরনের কাজে নিয়োজিত পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় নারী শ্রমিকরা প্রায় ৪০ ভাগ কম বেতন পান। জানা গেছে, এখনো শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন ১২শ টাকা করার দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হয়নি। শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের বেতন ন্যূনতম ১২শ টাকা করার জন্য ২০০৪ সালে সরকারের পক্ষ থেকে খসড়া প্রকাশিত হলেও মালিকপক্ষের উচ্চ আদালতে মামলার কারণে তা এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। ১৯৯৪ সালে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি বোর্ড ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি ৯৩০ টাকাও অনেক শ্রমিক পাচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে।[৩৬]

নারী-পুরুষ ভিত্তিক বৈষম্য:

নারীর মজুরিকর্ম সবচাইতে যে কঠিন মাত্রাটি তাদের দারিদ্র্য অবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে তা হলো নারী-পুরুষ ভিত্তিক বৈষম্যর। আমাদের এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ঘরের ভেতরে নারী যুগ যুগ ধরে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। যখন তারা ঘরের বাইরে বের হলেন এবং পুরুষের মতো অর্থকর্ম গ্রহণ করলেন তখন এই বৈষম্য তো কমলোই না বরং আরো নতুন মাত্রা পেলো। মজুরিকর্ম গ্রহণের আগে তারা কেবল ভোগ, শিক্ষা এবং চিকিৎসা গ্রহণের বেলায় বৈষম্যের শিকার হতেন। মজুরিকর্ম গ্রহণের পর আগের এই বৈষম্যগুলো দূরীভূত হয়েছে সামান্যই।

পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকের অর্থনৈতিক উন্নয়নে করণীয়:

দক্ষতা বৃদ্ধি: শ্রমজীবী নারীর দারিদ্র্য মোচনের জন্য প্রথম যে পদক্ষেপটি গ্রহণ করা প্রয়োজন তা হচ্ছে শ্রমযুদ্ধের জন্য যথাযথভাবে তাদের তৈরি করা। এই তৈরি করার জন্য প্রথমেই দরকার ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার। কিন্তু আমাদের দেশে নারী শিক্ষার হার এখনো হতাশাব্যঞ্জকই রয়ে গেছে। এখানে একটি প্রচণ্ড ধাক্কার প্রয়োজন, যা কেবল সরকারি এবং বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে সম্ভব। এখানে বিশেষ করে শিল্পোদ্যোক্তাদের হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। পোশাক শিল্পোদ্যোক্তাদের মতামত জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায়, প্রত্যেক উদ্যোক্তাই মনে করেন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানই নারী শ্রমিকের জীবন উন্নয়নের প্রধান চাবিকাঠি।[৩৭] এই উপলব্ধি থেকেই বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিকারক সমিতি (Bangladesh Garment Manufactirers And Exporters Association BGMEA) আইএলও'র (ILO) অর্থানুকূল্যে পোশাক শ্রমিকের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করেছিলেন।[৩৮] তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই হচ্ছে পুরুষ অথচ পোশাকশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের শতকরা ৮০ জনেরও বেশি হচ্ছেন নারী। পোশাক শিল্পে দেখা গেছে অনেক উদ্যোক্তাই নারী শ্রমিকদের চাকরির মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। তবে এইসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানও জরুরি। কেননা মৌলিক শিক্ষার অভাব অনেক ক্ষেত্রেই নারীরা তাদের প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগাতে পারেন না।

শ্রম আইন কার্যকর করা :

নারীশ্রমিকদের দারিদ্র্য অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শ্রম আইন কার্যকর করা দরকার। ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতাই নারী শ্রমজীবীদের দারিদ্র্যের জন্য অনেকাংশে দায়ী এবং এই নিরাপত্তাহীনতার বেশিরভাগই উত্থিত হয়েছে শ্রম আইনের ব্যাপক লঙ্ঘন থেকে। তাই শ্রম আইনের সফল প্রয়োগ যে

---

৩৬. দৈনিক সংবাদ, ৮ মার্চ, ২০০৬

৩৭. Paul Majumder, Op.cit, P. 47

৩৮. প্রতিমা পাল ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

নারী শ্রমিকদের অনেক নিরাপত্তাহীনতা থেকে রক্ষা করবে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এক্ষেত্রে শ্রম আইনের প্রয়োগ কীভাবে কার্যকর করা যায় তার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। সরকার সংবেদনশীল হলে শ্রমআইনের প্রয়োগ সহজেই করা সম্ভব।

নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা:

শ্রমবাজারে নারীর স্বাস্থ্য বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। কেননা নারীর স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো বহু ক্ষেত্রেই পুরুষদের চাইতে ভিন্ন। যেমন শ্রমিক হলেও নারীকে পুনরুৎপাদনমূলক কাজও (Reproductive function) সম্পাদন করতে হয়; ঘরেও তাদের অনেক গৃহস্থালি কাজ করতে হয়। ফলে তাদের কাজের বোঝাও পুরুষদের চাইতে অনেক বেশি। তাছাড়া নারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিম্নপদে কাজ করেন যেখানে ঝুঁকি বেশি। শ্রমিকের সুস্বাস্থ্য যে উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে এটা বহু গবেষণায় প্রমাণিত। উদ্যোক্তারা যদি শ্রমিকের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন তবে স্বাস্থ্যজনিত দারিদ্র্যের মাত্রাটি দীর্ঘমেয়াদে নারীশ্রমিকদের জীবন থেকে দূরীভূত হবে। এক্ষেত্রে সরকার এবং এনজিওগুলো উদ্যোক্তাদের সাহায্য করতে পারে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষার একটি অন্যতম ব্যবস্থা হচ্ছে স্বাস্থ্যবীমা। বীমা কোম্পানিগুলোকে এ ব্যাপারে জড়িত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। তাছাড়া বীমা খরচে সরকারের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এবং কর মওকুপের মাধ্যমে শিল্পোদ্যোক্তাদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে।

তথ্যভাণ্ডারে প্রবেশ:

নারীশ্রমিকদের কর্ম সম্পর্কিত তথ্যে প্রবেশ ঘটানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। তাদের মধ্যে শিক্ষার হার বাড়লে অবশ্য তাদের তথ্যভাণ্ডারে প্রবেশ ও বৃদ্ধি পাবে। তথ্য সরবরাহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এনজিওগুলোকে জড়িত করতে হবে যাতে তারা কর্মজগৎ সম্পর্কে অতি সহজ ভাষায় নিয়মিত সংবাদ বুলেটিন বের করে শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করে। পোশাক রফতানিকারক সমিতি (BGMEA) এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। পোশাক শিল্প জগতের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে তারা একটি মাসিক পত্রিকা বের করতে পারেন এবং তা প্রতিটি কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করতে পারেন।

সচেতনতা বৃদ্ধি:

তবে যতক্ষণ পর্যন্ত নারীরা নিজের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন না হবেন ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমজীবী নারীর দারিদ্র্যমুক্তির জন্য যত পন্থাই অবলম্বন কর না কেন তা সুফল বয়ে আনতে পারবে বলে মনে হয় না। দেখা গেছে সচেতনতার কারণে তারা শ্রম বাজারের অনেক রীতিনীতিই জানেন না। তারা জানেন না দৈনিক মাত্র ৮ ঘন্টা শ্রম প্রদান করার জন্য তারা আইন দ্বারা বাধ্য। অতিরিক্ত শ্রম প্রদান করতে কেউ তাদের বাধ্য করতে পারেন না। তারা জানেন না প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে মজুরির দুটি ভাগ আছে। একটি মূল বেতন (basic pay) এবং অপরটি হলো অন্যান্য আর্থিক সুবিধা (fringe benefit) । তাদের কেউই জানেন না, অতিরিক্ত শ্রমের মজুরি মূল মজুরির দ্বিগুণ হারে হয়। যার ফলে দেখা গেছে শতকরা ৮৬ জন নারী পোশাক শ্রমিকই অতিরিক্ত শ্রমের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হন। তারা জানেন না বছরে ১৫ দিন বেতনসহ ঐচ্ছিক ছুটি তাদের প্রাপ্য। সপ্তাহে একদিন সাপ্তাহিক ছুটিতে যে তাদের আইনগত অধিকার আছে তাও তারা জানেন না। ফলে পোশাক কারখানায় মাসের ৩০ দিনই তারা খেটে মরেন। পোশাক শ্রমিকের ওপর পরিচালিত এক জরিপতথ্য থেকে জানা যায়, নারী শ্রমিকরা কেউই কখনো প্রসূতি ছুটি দাবি করেননি। অথচ শ্রম আইন অনুযায়ী তারা ৯০ দিন

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি পেতে পারেন। তারা কেউই জানেন না কার্যক্ষেত্রে আইনগতভাবে তারা একটি বিশ্রামের ঘর পাবেন। একঘণ্টা দুপুরের খাবার সময় যে তাদের আইনস্বীকৃত অধিকার, সে সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ। যার ফলে পোশাকশ্রমিকদের বেলায় দেখা যায় প্রায় ৬৯ শতাংশ ক্ষেত্রে নারী দুপুরে খাবারের জন্য ১ ঘন্টার অনেক কম সময় পেয়েছেন।[৩৯] এভাবে সচেতনতার অভাবের কারণে নারী শ্রমিকরা শ্রমবাজারের অধিকাংশ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে এক নতুন ধরণের দারিদ্র্যাবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হন।

তাই ব্যাপকভাবে তাদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা নিজেরাই বুঝতে পারেন কী কী কারণে তারা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না। এই সচেতনতার কারণে তারা নিজেরাই উদ্যোগী হবেন ওই কারণগুলো অপসারণ করতে। স্ব-উদ্যোগ ছাড়া কোনো কিছুই পাওয়া যায় না।

এমএফএ পরবর্তী পরিস্থিতি: নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থান নীতি:

জরিপে দেখা যায়, পোশাক শিল্পে নিয়োজিত মহিলা শ্রমিকদের বেশির ভাগই যন্ত্রচালক হিসেবে কাজ করে। পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় কমসংখ্যক মহিলা শ্রমিক চাকরিতে থাকাবস্থায় প্রশিক্ষণ পায়। একই ধরণের পার্থক্যের প্রমাণ পাওয়া যায় পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের উপার্জনেও। অর্থাৎ মহিলা শ্রমিকদের চেয়ে পুরুষ শ্রমিকরা বেশি পরিমাণে আয় করে। স্বল্প প্রশিক্ষণের কারণেই প্রধানত মহিলা শ্রমিকদের কম দক্ষতার কাজ করতে দেখা যায়। যেকারণে তারা আয়ের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। তবে জেন্ডার বা নারী-পুরুষ বৈষম্যের কারণেও মহিলা শ্রমিকরা কম মজুরি পায়।

তবে পোশাক শিল্পে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে এখনো মহিলা শ্রমিক নিয়োগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। কারণ মূলত পোশাক-পণ্যের একক প্রতি দামের চেয়ে রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে এই খাতের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা হয়েছে। তবে জরিপে যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তারা জানায়, বাংলাদেশ যেহেতু সর্বনিম্ন দামের মাধ্যমে প্রতিযোগিতাশীল থাকার চেষ্টা করছে সেহেতু শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ানো ও প্রযুক্তি পরিবর্তন বা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে। এ দুটো প্রক্রিয়া শুরু করতে গেলেই মহিলা শ্রমিকের নতুন কর্মসংস্থানের ওপর যেমন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তেমনি ভবিষ্যতে মহিলা শ্রমিকদের এই শিল্পে ধারণ করা কঠিন হবে। এই অবস্থায় পোশাক শিল্পের উন্নয়নে এমন নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে যাতে এই খাতে জেন্ডার তথা নারী-পুরুষ শ্রমিকের ভারসাম্য বজায় থাকে। যেমন-

* পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের বিশেষ করে মহিলা শ্রমিকদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। সেই সাথে উৎপাদনশীলতা কম হওয়ায় এবং উচ্চ মূল্যের পণ্য তৈরির সামর্থ্যের অভাব থাকায় এই শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কম বলে মনে করা হয়। সুপারভাইজার ও মান নিয়ন্ত্রকের পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য মহিলা শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ থাকা দরকার। তাহলে পোশাক শিল্পে নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে মজুরির হারে তারতম্য কমবে এবং মহিলাদের দারিদ্র্য হ্রাস পাবে। তবে অধিকতর শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকার পরেও পোশাক শিল্পে মহিলা শ্রমিকদের দক্ষতা না থাকার অজুহাতে সহকারীর মতো সর্বনিম্ন ক্যাটাগরির চাকরিই দেওয়া হয়। সেজন্য মহিলাদের চাকরিরত অবস্থায় প্রশিক্ষণের সুযোগ দিতে হবে। যাতে তারা উচ্চ ক্যাটাগরিতে পদোন্নতি পায়।

---

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

এই অবস্থায় পোশাক শিল্পকে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করে তোলার স্বার্থে দেশে বেসরকারি খাত ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর দ্বারা একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন জরুরি হয়ে পড়েছে। এটি করা হলে পোশাক শিল্পে উচ্চ মূল্যের পণ্য উৎপাদন বাড়বে এবং মহিলা শ্রমিকরাও দক্ষতা অর্জনের সুবাদে পদোন্নতির সুযোগ পাবে।

* পোশাক খাতে পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় মহিলা শ্রমিকরা তাদের অধিকার ভোগ ও চাহিদা পূরণ থেকে বেশি বঞ্চিত হয়। আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে সরাসরি জেন্ডার বৈষম্য থাকায় এবং অন্যান্য ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই এমনটি ঘটে থাকে। মহিলা শ্রমিকদের মজুরিসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি, ন্যূনতম মজুরি, নিয়োগপত্র, সাপ্তাহিক ছুটি, রাতের বেলায় কারখানা থেকে বাসায় ফেরার জন্য পরিবহন সুবিধা, চিকিৎসা ভাতা ও শিশু পরিচর্যার সুযোগ ইত্যাদি দেওয়া উচিত। পোশাক কারখানায় চাকরি করার কারণে পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় মহিলা শ্রমিকরা অধিকহারে স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত হয়। অথচ তাদের মধ্যে পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে চিকিৎসা গ্রহণের হার অনেক কম। পোশাক শিল্প মালিকরা কারখানায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করাসহ সার্বিকভাবে কমপ্লায়েন্সের শর্তগুলো সঠিকভাবে মেনে না চলার কারণে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার হার বাড়ে। সেজন্য পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের চিকিৎসার্থে সরকার, পোশাক শিল্প মালিক ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ ও এনজিওগুলোর শুধু পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে পারে।[৪০]

* শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে পোশাক শিল্প শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। মহিলা শ্রমিকরা যেহেতু কম আয় করে সেহেতু তারা বেশি করে দারিদ্র্যে জর্জরিত থাকে। যেমন সর্বশেষ ২০০৬ সালের অক্টোবর ঘোষিত নতুন ন্যূনতম মজুরি-প্যাকেজ কিন্তু শ্রমিকদের দারিদ্র্যসীমার ওপরে জীবনযাপন করার জন্য যথেষ্ট নয়।

* দেশের পোশাক শিল্পে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রচলনের কারণে এই খাতের মহিলা শ্রমিকরা আরও বেশি বৈষম্যের শিকার হবে। সেজন্য সরকারি নীতিমালায় পোশাক খাতে নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সেই সঙ্গে তাদের জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যাতে পোশাক খাতে নারী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের হার বজায় থাকে। বিজিএমইএ এবং এনজিওগুলোও মহিলা শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারে।

* দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করার কারণেই প্রধানত পোশাক শিল্পের মহিলা শ্রমিকরা অসুস্থ হয়ে থাকে বা তাদের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ এতে তাদের প্রয়োজনীয় অবসর ও বিশ্রাম নেওয়ার সময় কমে যায়। যেহেতু মালিকদের ওপর সময়মত পোশাক সরবরাহের চাপ থাকে সেহেতু তারা নির্ধারিত কাজের পরে অতিরিক্ত সময়ের কাজ এড়াতে পারবেন না। এজন্য তারা একই শ্রমিককে দিয়ে ওভারটাইম না খাটিয়ে কারখানায় দুই শিফটে কাজ করানোর ব্যবস্থা চালু করতে পারেন। তবে আগের একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, দক্ষ শ্রমিকের প্রকট অভাব থাকার কারণে অধিকাংশ উদ্যোক্তাই দুই শিফটে কাজ করানোর ব্যবস্থা প্রবর্তনে অনিচ্ছুক।[৪১] এই অবস্থায় শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া অপরিহার্য। এটি করা হলে তাতে শুধু শ্রমিকই নয় মালিকদেরও যথেষ্ট লাভ হবে। কারণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকরা দক্ষতা অর্জন করলে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়বে,

---

৪০. সংকলন, কোটামুক্ত বিশ্বে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প, সাম্প্রতিক প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জ, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, ঢাকা-২০০৮, পৃ. ৯২

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

পোশাকের মান উন্নত হবে এবং ভুলের হারও কমবে। অন্যদিকে শ্রমিকদের জন্যও বেশি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের জন্য সুপারিশমালা[৪২]

সমস্যা	করণীয়	কার্যক্রম	জেন্ডার সূচক	দায়িত্বপালনকারী সংস্থা
স্বল্প প্রশিক্ষণ	* মহিলা শ্রমিকদের অবারিত সুযোগ প্রদান	* মহিলা শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যাতে তারা উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কাজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে	* প্রশিক্ষিত মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি * উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন কাজেও মহিলা শ্রমিকদের নিয়োগ	* বাংলাদেশ সরকার * বিজিএমইএ * এনজিও
স্বল্প আয়	* মহিলা শ্রমিকদের আয় বাড়ানো	* মহিলা শ্রমিকদের দক্ষ ক্যাটাগরির কাজে নিয়োগ করা	* মহিলা শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধি * একই কাজের জন্য মহিলা শ্রমিকদের পুরুষ শ্রমিকদের সমান আয় লাভের সুযোগ * মহিলা ও পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যকার আয়ের ব্যবধান হ্রাস * মহিলা শ্রমিকদের সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ার সুযোগ সৃষ্টি, যা তাদের পরিবারের জন্য অধিকতর মঙ্গল বয়ে আনবে	* কারখানার মালিক * সরকার * সংশ্লিষ্ট এনজিওগুলো * ট্রেড ইউনিয়নসমূহ

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪ – ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

সারণি:

সমস্যা	করণীয়	কার্যক্রম	জেন্ডার সূচক	দায়িত্বপালনকারী সংস্থা
দুর্বল স্বাস্থ্য	* শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে পদক্ষেপ নেয়া	* স্বাস্থ্য সেবা দেয়া * পোশাকশিল্প শ্রমিকদের জন্য একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা * প্রত্যেক কারখানায় একটি করে স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র খোলা	* অধিকসংখ্যক মহিলা শ্রমিক চিকিৎসা সুবিধা পাবে * মহিলাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে * স্বাস্থ্য ভালো থাকলে মহিলা শ্রমিকরা দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে পারবে * মহিলা শ্রমিকদের সামনে ছুটি না পাওয়ার প্রতিবন্ধকতা কমবে	* বাংলাদেশ সরকার * বিজিএমইএ * এনজিওসমূহ * ট্রেড ইউনিয়নসমূহ
ছুটির সীমিত সুযোগ	* প্রয়োজনীয় ছুটি প্রদান	* মহিলা শ্রমিকদের যখন ছুটির প্রয়োজন হবে তখন চাকরির নিয়ম বা সার্ভিস রুল অনুযায়ী তা ভোগের সুযোগ দেয়া * সরকারি নিয়ম অনুযায়ী মহিলা শ্রমিকদের পূর্ণ বেতনসহ ৩ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান	* পোশাক খাতে অধিকসংখ্যক মহিলা শ্রমিক নিয়োজিত হবে * মহিলা শ্রমিকরা মাসের শুরুতেই তাদের প্রাপ্য সকল মজুরি পাবে এবং গোটা মাসের খরচের পরিকল্পনা করতে পারবে	* কারখানা মালিক * বিজিএমইএ * এনজিওসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

দেরিতে বেতন প্রদান	* শ্রমিকদের সময়মত বেতন দেয়া	* প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহেই বেতন প্রদান * মাসিক বেতন বা মজুরির সাথে ওভারটাইমের পাওনাও পরিশোধ করা		

বাংলাদেশে নারীদের কর্মসংস্থান ও ইসলামী দৃষ্টিকোণঃ

শুরুতেই অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিলাদের অবদান সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণার উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের মহিলাদের বেকার বলে বিবেচনা করা হয় এবং সেজন্যে তাদেরকে উৎপাদনক্ষম জনশক্তির অপচয় বলে অভিহিত করা হয়। সাধারণ লোক বিশ্বাস করে এজন্যে উন্নতি ব্যহত হয় এবং দেশ পিছনে পড়ে থাকে। তাই মহিলাদের উচিৎ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা এবং পুরুষদের সাথে সমান তালে কাজ করা। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই মুসলিম দেশসহ বহু উন্নয়নশীল দেশে পুরুষদের সাথেই মহিলাদের কাজ করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পুরুষদের মতোই তাদেরকে সাইকেল ও মোটর সাইকেল ব্যবহার করে হাটে-মাঠে-ঘাটে দূর-দূরান্তে স্বাধীনভাবে সব ধরণের কাজ করতে পরামর্শ ও উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। অথচ চিন্তা করা হচ্ছে না এর সুদূরপ্রসারী সামাজিক ফলাফল কি হতে পারে?

দুভার্গ্যজনক হলেও সত্য, মহিলাদের সাধারণভাবে বেকার ও অনুৎপাদনশীল বিবেচনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের কথাই ধরা হোক। এদেশ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের গ্রামীণ মহিলারা শুধু সন্তান লালন-পালন ও ঘর-গৃহস্থালির কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেনা, তারা ধান ভানা, গরু-ছাগল পালন করা, সব্জী বাগান করা, সূচী কাজ, বাঁশ-বেতের কাজ, দর্জির কাজ, তাঁতের কাজ, চিড়া-মুড়ি-খাজা-গজা বানানো, ঠোঙ্গা বানানো ইত্যাদি অসংখ্য উৎপাদনধর্মী কাজ করে থাকে। এসব কাজে তাদের বাড়ির বাইরে যেতে হয়না। এজন্যে তারা দিনে ১৫ ঘন্টারও বেশি কাজে ব্যস্ত থাকে। এসব মহিলা সূর্যোদয়ের আগে উঠে, আর শুতে যেতে ক্যালেন্ডারের তারিখ পাল্টে যায়। এদের বিপরীত যারা শুধু অফিসে বা কলে-কারখানায় কাজ করে তাদের শ্রম সময় শুধু আট ঘন্টা। মহিলারা শহরেও পুরুষদের চেয়ে বেশি কাজ করে থাকে। গবেষণা সমীক্ষায় দেখা গেছে, শহরের শিক্ষিত মহিলারা ঘর-গৃহস্থালির কাজ ছাড়াও তাদের ছেলে- মেয়েদের পড়াতে দৈনিক বেশ কয়েক ঘন্টা সময় দেয়। তারা বাড়িতে মাইনে করা গৃহ শিক্ষক রাখেন না। এরপরেও কি বলতে হবে এরা বেকার ও অনুৎপাদনশীল?

সৌভাগ্যের কথা, মহিলাদের 'অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের' সংজ্ঞা বদলাচ্ছে এবং ক্রমশই আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের অবদান স্বীকৃতি লাভ করছে। এই স্বীকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু আয়ের হিসাব থেকে। মহিলাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিধি স্বীকৃতি ও বিস্তৃতির ফলে বহু উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে মহিলারা প্রধানত গৃহস্থালির কাজে নিয়োজিত, জনগণের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে বহু উন্নত দেশে, যেখানে মহিলারা তথাকথিত 'উৎপাদনশীল' কাজে নিয়োজিত, তাদের মাথাপিছু আয় হ্রাস পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ

Dhaka University Institutional Repository

মোট জাতীয় আয়ের ক্রয় ক্ষমতার সমতার (Purchasing Power Parity Or, PPP') হিসাব অনুসারে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মাথাপিছু আয় যথাক্রমে মার্কিন ডলার ২৪০ হতে ১৩৮০, ৪৬০ হতে ২,২৩০ এবং ৩৪০ হতে ১,৪০০ তে উন্নীত হয়েছে। অপরদিকে সুইজারল্যান্ড, জাপান ও নরওয়ের মাথাপিছু আয় যথাক্রমে মার্কিন ডলার ৪০,৬৩০ হতে ২৫,৮৬০ ; ৩৯,৬৪০ হতে ২২,১১০ এবং ৩১,২৫০ হতে ২১,৯৪০ নেমে এসেছে।[৪৩]

বাংলাদেশেও মহিলাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সংজ্ঞা বদলাতে শুরু করেছে। দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে মহিলাদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ এরই প্রতিফলন।

এই পটভূমিতে ইসলামী অর্থনীতির আলোচনায় আধুনিক সমাজে মহিলাদের অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্রের পরিধি চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন:

নিজের ব্যবসা ও সহায়-সম্পত্তি দেখাশুনা:

ইসলামের বিধান অনুসারেই মহিলারা তাদের মাতা-পিতা, স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভের অধিকারী। স্বভাবতঃই সম্পত্তির মালিক হিসেবে যখন প্রয়োজন হবে তখন সেসবের দেখাশুনা য়া ব্যবস্থাপনার জন্য তাকে বাইরে যেতে হতে পারে।

নার্সারী ও শিশু রক্ষণাবেক্ষণ:

আবহমান কাল হতে নার্সারী মহিলাদেরই এলাকা। মুসলমানদের জন্য বিশেষত মুসলিম দেশে নার্সারী ও প্লে গ্রুপ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় দক্ষতাসম্পন্ন মুসলিম মহিলার অভাব খুবই প্রকট।

শিশুদের দেশাশুনা করা গৃহভিত্তিক উত্তম পেশাও বটে। বিশেষত যেসব মহিলা কাজে বাইরে যান তাদের জন্যে পেশায় দক্ষ মহিলা প্রয়োজন। যেসব মহিলা বাচ্চাদের দেখাশুনার কাছ পছন্দ করেন তারা স্বাচ্ছন্দ্যে এই পেশা বেছে নিতে পারেন।

বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষকতা করা:

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতার সকল পদই মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত রাখা উচিত। যদি এটা এখনই করা সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত পুরুষদের উপরে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

মেয়েদের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের (যদি থাকে) সকল পদই মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত রাখা উচিত। শুধু বাংলাদেশ নয় অন্যান্য বহু দেশের, যার মধ্যে মুসলিম দেশসমূহও রয়েছে, সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে একথা কেউ বলতে সাহস করবে না যে মহিলারা এসব প্রতিষ্ঠান সফলভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম নয়।

হাসপাতাল:

সকল শিশু হাসপাতাল ও মাতৃসদন মহিলাদের হাতেই হস্তান্তর করা উচিত। সমস্ত সাধারণ হাসপাতালের অর্ধেকই মহিলা শাখায় রূপান্তর করে তার সার্বিক দেশাশুনার দায়িত্ব মহিলাদেরকে দেওয়া যায়।

কুটির শিল্প ও সমাজ কল্যাণমুখী কাজ:

মুসলিম মহিলারা সাফল্যের সাথেই কুটির শিল্পে অংশগ্রহণ করতে পারে। সূচী কাজ, বাঁশ-বেতের কাজ ইত্যাদির মতো ঐতিহ্যগত কাজ ছাড়াও তারা পেশাকের ডিজাইন তৈরি, পোশাক তৈরি

---

৪৩. See, World Development Report, 1997, P. 214-15

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি নতুন নতুন কাজও নিতে পারে। মুসলিম দেশের মতো অমুসলিম বহু দেশেও হিজাবের এখন ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সাধ ও সাধ্যের সমন্বয় করা যায় এমন হিজাব তৈরি করতে পারলে ঘরে বসেই রোজগার করা সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশেও এখন মুসলিম মহিলারা পোশাক তৈরির জন্যে সমবায় প্রতিষ্ঠান করেছেন; তাদের তৈরি পোশাক ডাকযোগে বিক্রী হচ্ছে। এর ফলে যাদের হাতের নাগালে ইসলামী পোশাকের দোকান নেই সেসব বোনেরাও উপকৃত হচ্ছে।

বহু মুসলমানদের মনে কোন না কোনভাবে এই ধারণা ঢুকে পড়েছে যে, ইসলামী জীবন খুব নীরস। বাস্তবতা অবশ্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত। পুরনো দিনের গান শুনলে, মুসলমানদের শহর বাজার ও মসজিদ দেখলে একথা বিশ্বাস হবে না। তবু আজকের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ প্রযুক্তিগত উন্নতি ও রুচির উৎকর্ষ সাধনের জন্যে মহিলারা তাদের প্রয়োজনীয় শরীয়াহ্‌র সীমার মধ্যে থেকেই ইসলামী সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করতে এগিয়ে আসবে।

পৃথক সমাজকল্যাণ দপ্তর ও ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন স্থাপন করে সেগুলির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মহিলাদের হাতেই ন্যস্ত করা যায়।

মহিলারা আমাদের দেশের কিশোর আদালত ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহে কার্যকর ভূমিকা পালনে সমর্থ। তারা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত স্নেহ-ভালবাসার পরশে কিশোর অপরাধী, স্কুলত্যাগী ছাত্র এবং হতাশ যুবকদের আলোকময় নতুন জীবনের পথে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম।

বয়স্ক মহিলাদের শিল্প-কারখানায় হাল্কা কাজে নিয়োগ করা যায়।

কম্পিউটার যোগাযোগ ও প্রচার মাধ্যমঃ

আধুনিক প্রযুক্তির বিস্ময়কর উদ্ভাবন কম্পিউটার যোগাযোগ, ফ্যাক্স ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ঘরে বসেই এখন সেক্রেটারিয়েল ও টাইপের কাজ করে অর্থ উপার্জন সম্ভব। এই কাজে যে ধৈর্য মনোযোগ দরকার তা মেয়েদেরই বেশি। তাই ডাটা এন্ট্রি করে বা ডকুমেন্টস, থিসিস ও রিপোর্ট টাইপ করে ঘরে বসেই মুসলিম মহিলারা উপার্জন করতে সক্ষম। প্রয়োজন শুধু প্রশিক্ষণের, সরঞ্জামের এবং যথোচিত মানসিকতার।

গণযোগাযোগ ও প্রচার এরকম আরেকটি খাত যেখানে মুসলিম মহিলারা সফলতার সাথে অংশ নিতে পারে। তারা স্বাধীনভাবে পত্র-পত্রিকায় লিখতে পারে এবং জার্নাল ও ম্যাগাজিনের সম্পাদনার দায়িত্বও গ্রহণ করতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে মহিলাদের অর্থনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে লেখালেখির যে প্রচুর সুযোগ ও প্রয়োজন রয়েছে তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

আইন-শৃঙ্খলাঃ

মহিলা দুষ্কৃতিকারী ও অপরাধীদের দমনের জন্য ক্ষুদ্র আকারের মহিলা পুলিশ বাহিনী থাকতে পারে। টহলদান বা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কাজে মহিলা পুলিশদের ব্যবহার করা আদৌ উচিত হবে না।

জীবিকা অর্জনের চেষ্টা :

যে ক্ষেত্রে পরিবারের দেখাশুনা বা ব্যয় নির্বাহের জন্যে কোন পুরুষ সদস্য নেই সেখানে মহিলাদের বাইরে কাজের অনুমতি রয়েছে। এই শ্রেণীর আওতায় রয়েছে বিধবা, অবিবাহিত মেয়ে, শুধু কন্যাবিশিষ্ট পরিবার, যেসব পরিবারে কন্যারা পুত্রদের চেয়ে বড়, যে সব পরিবারে মাতাপিতা খুবই বৃদ্ধ বা শারীরিকভাবে অক্ষম এবং যে সব পরিবারের আয় তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে নগণ্য।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে উল্লেখ করা বাঞ্চনীয় যে, উপরে উল্লেখিত অনুমোদিত কাজগুলি করার সময়ে মহিলারা আল-কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত পোশাক পরবে। পোশাকের ব্যাপারে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, 'হে রাসূল! আপনি আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মু'মিনদের স্ত্রীকে বলুন তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে।[৪৪] আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে, "বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না তারা যদি তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে তাতে তাদের জন্যে দোষ নেই। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৪৫]

একজন মহিলা অর্থনৈতিক কাজ হতে বিরত থাকবে এটাই প্রত্যাশিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা জৈবিক দিক দিয়ে পূর্বনির্ধারিত ও নির্দিষ্ট। তাদের ভিন্ন ধরণের শারীরিক গঠন ও জৈবিক কার্যক্রমের কারণে পরিবারে তাদের স্ব-স্ব ভূমিকা নির্দিষ্ট। ইসলাম লিখিতভাবেই এই পার্থক্য স্বীকার করে। তাই একজন মহিলার নর্তকী, মডেল, ওয়েট্রেস, মদ পরিবেশিকা বা সিনেমা অভিনেত্রী হওয়ার সুযোগ নেই। এমনকি স্বামীর সম্মতি নিয়েও অর্থ উপার্জনের জন্যে এমনভাবে নারীত্ব বিক্রি বা নারীদেহ প্রদর্শনীর অনুমতি ইসলাম দেয়নি।

একজন মহিলা সেক্রেটারীর কাজও করবে না যদি তার কাজের পরিবেশ পুরুষ-বেষ্টিত হয় অথবা এমন পরিবেশ হয় সেখানে তাকে অব্যাহতভাবে ও একান্তে তার 'বস'-এর সাথে থাকতে হয়। প্রায়শঃই দেখা যায়, এ ধরনের পরিবেশে সেক্রেটারী শেষ-অবধি 'বস'-এর গোপন রক্ষিতায় পর্যবসিত হয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে, যখন কোন পুরুষ ও মহিলা নির্জনে বসে থাকে তখন শয়তান-যার কাজই হলো মানুষকে বিপথগামী করা-তাদের কুমন্ত্রণা দেয়, প্ররোচিত করে। পাশ্চাত্য সমাজে পুরুষের পাশাপাশি অফিসে-আদালতে, কলে-কারখানায় কর্মরত নারীদের অভিজ্ঞতা খুবই করুণ। এদের প্রসঙ্গকেই হান্নান বলেন, "পাশ্চাত্যে এই অবাধ মেলামেশার ফলে পরিবারের বন্ধন শিথিল হয়ে যাচ্ছে, তালাকের সংখ্যা বাড়ছে, সন্তানেরা মাতা-পিতার স্নেহ ও তত্ত্বাবধান হতে বঞ্চিত, এমনকি ধর্ষণের ঘটনা বাড়ছে আশংকাজনক হারে।"[৪৬]

গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকের মজুরী ও ইসলামের নীতিঃ

একবিংশ শতাব্দীতে মুক্তবাজার অর্থনীতির বিশ্বেও সেই সুপ্রাচীন মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব এখনও বিরাজমান। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে মালিক-শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিক ছাঁটাই ও আন্দোলন ইত্যাদি অনভিপ্রেত পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে এবং পরিস্থিতি দিন দিন জটিল হচ্ছে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গার্মেন্টস শিল্প শক্তিশালী ভূমিকা রেখে চলেছে। রপ্তানী আয়ের প্রায় শতকরা ৭৬ ভাগ আসে গার্মেন্টস শিল্প থেকে।[৪৭] কেবল রপ্তানী বাণিজ্যই নয়, এর সাথে সম্পৃক্ত আছে প্রায় অর্ধকোটি মানুষের কর্মসংস্থান। গার্মেন্টস শিল্প দেশের নিরক্ষর ও স্বল্প শিক্ষিত বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মহিলাদের আয় বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে আরও অনেকগুলো ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে।

১৯৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে যাত্রা শুরু করা এ শিল্প সারা বিশ্বে পোশাক রপ্তানীতে অষ্টম স্থান অধিকারের মর্যাদা লাভ করেছে।[৪৮] কিন্তু বর্তমানে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন।

---

৪৪. আল-কুরআন, ৩৩:৫৯
৪৫. আল-কুরআন, ২৪:৬০
৪৬. Hannan Shah, Thought on Islmic Economic, Islamic Economics Research, Bareau, 1980, P. 420
৪৭. Khandaker Nasreen, Op.cit, P. 420
৪৮. আল-কুরআন, ৪:৩২

Dhaka University Institutional Repository

বেশীরভাগ শ্রমিকরা সঠিক ও সুবিচারপূর্ণ মজুরী ও পারিশ্রমিক পায় না। মজুরী দীর্ঘদিন যাবত বকেয়া রাখা, খেয়াল খুশীমতো জরিমানা আদায় করা, বিভিন্ন অজুহাতে মজুরী কর্তন করে কম মজুরী দেয়া নিত্ত নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে ওঠেছে। মালিক পক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা আইন সম্পর্কে শ্রমিকদের অসচেতনতা দিন দিন অসন্তোষ বৃদ্ধি করছে ও তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশ শ্রম বিষয়ক প্রচলিত ৫০টি আইনের সমন্বয়ে যুগোপযোগী করে 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬' পাস করা হয়। একই সাথে পূর্ববর্তী ২৭টি শ্রম আইন বাতিল করা হয়।[৪৯] এমনকি ২০০৬ সালে গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ আইনও পাস করা হয়। শ্রমিকদের মজুরী সমস্যার সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ সমাধানের উপর শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রা এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। দেশে শ্রম আইন আছে। মালিকদের সমিতি ও শ্রমিক ফেডারেশন আছে এবং পর্যাপ্ত প্রতিকারের জন্য আদালত ব্যবস্থাও আছে। তথাপি শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত। কারণ এসব আইন পালন ও প্রয়োগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও মহলকে উৎসাহিত ও প্রেরণাদায়ক নৈতিক ও আদর্শিক কোন ভিত্তি এ আইনের মধ্যে নেই। ফলে এগুলো তেমন সুফল দিচ্ছে না। বস্তুত এসব সমস্যার সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান একমাত্র ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব। ইসলামী অর্থনীতি ও শ্রমনীতি চর্চা ও পালন করার মাধ্যমে সৃষ্ট সকল সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে।

শ্রমিকের মজুরী আইনের পটভূমি:

মজুরী পরিশোধ বিষয়ক আইন শ্রমিকের জন্য একটি সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিধান।[৫০] শিল্প শ্রমিকদের মজুরী আইনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মজুরী প্রদানে অনিয়ম দূর করতে তৎকালীন ভারত সরকার ১৯২৬ সনে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। পরবর্তীতে ১৯২৯ সনে গঠিত শ্রম বিষয়ক রয়্যাল কমিশন উক্ত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে শ্রমিকদের মজুরি প্রদানে অনিয়ম প্রতিরোধে আইন প্রণয়নের সুপারিশ করে। অবশেষে তৎকালীন বৃটিশ শাসনামলে ১৯৩৬ সনের ২৩শে এপ্রিল মজুরী পরিশোধ আইনটি পাস হয়। সে সময়ে তো অবশ্যই এবং একালেও এ আইনটিকে একটি পরিচ্ছন্ন আইন বলা যায়। এই আইন ১৯৪৭ সনে তৎকালীন পাকিস্তান শাসনামলে কার্যকর থাকে এবং স্বাধীনতার পর বাংলাদেশেও প্রচলিত থাকে তবে ১৯৮০ সালে প্রথম আইনটিতে সংশোধনী আনা হয়। এই আইনের মূল লক্ষ্য ছিল শ্রমিকদের প্রকৃত বণ্টনযোগ্য মজুরী প্রদান এবং কোন রকম কর্তন ছাড়া শ্রমিক কর্মচারীদের পূর্ণ মজুরী প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এ আইনের অধীনে মামলা বিচারের জন্য শ্রম আদালতের চেয়ারম্যানের এখতিয়ারভুক্ত করা হয় এবং হাইকোর্ট বিভাগের সমমানের শ্রম আপীল ট্রাইবুনালে আপীল করার বিধানের ব্যবস্থা করা হয়।[৫১]

মজুরী নির্ধারণ বোর্ড গঠনের পটভূমি:

যদিও বৃটিশ ভারতে নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ করার জন্য বোর্ড গঠন করে ১৯৪৬ সনে ড. আম্বেদকর আইন সভায় একটি নিম্নতম মজুরীর বিল পেশ করা হয় কিন্তু ইতোমধ্যে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হওয়ায় নিম্নতম মজুরী আইন আর পাস হয়নি। পরবর্তীতে পাকিস্তান শাসনামলে ১৯৫৭ সনের ২৮শে সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান পার্লামেন্টে 'নিম্নতম মজুরী আইন ১৯৫৭ পাস হয়'। যদিও

---

৪৯. এমএ হামিদ, ইসলামী অর্থনীতি: একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ, রাজশাহী, ১৯৯১, পৃ. ৩৩১

৫০. A news letter of Bangladesh Garment Manufacture & Export Associatio, April, May, 2006, P. 3

৫১. Dr. Pratima Paul-Majumder, 'Social Security Challenges in the Manufacturing Sector: A Gender Perspective' Human Rights in Bangladesh-2004, Published by Ain O Salish Kendra (ASK), First Published-2005, Dhaka, P.174

Dhaka University Institutional Repository

এটি ছিল একটি প্রাদেশিক আইন। পরবর্তীতে ১৯৬১ সালে এই আইনটি সম্পূর্ণ বাতিল করে দেয়া হয় এবং এটির পরিবর্তে ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশ পাস করা হয়। যেসব প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে মজুরী নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই এমন সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতাভুক্ত করা হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর উল্লেখিত ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশটি বহাল রাখা হয়। তবে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই যৌথ চুক্তির মাধ্যমে মজুরী নির্ধারণ করার ব্যবস্থা করা হয়। যে ক্ষেত্রে যৌথ দর কষাকষির কোন ব্যবস্থা নেই সেখানে ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণের জন্য ১৯৬১ সালের ন্যুনতম মজুরী অধ্যাদেশের অধীনে ন্যূনতম মজুরী বোর্ড গঠন করা হয়। তবে জাতীয় ন্যূনতম মজুরী ঘোষণার এখতিয়ার এই বোর্ডের ছিল না।[৫২] ১৯৮৮ সালে আইনটিতে কতিপয় সংশোধনী আনা হয়। শ্রম আদালতকে এই অধ্যাদেশের আওতাভুক্ত অপরাধ বিচার করার ক্ষমতা দেয়া হয়। সংশোধিত আইনে যে কোন সংযুক্ত ব্যক্তি অধ্যাদেশের আওতাধীন কৃত কোন অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারতেন।[৫৩] অবশেষে ২০০৬ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন পাস করা হয়। যদিও এই শ্রম আইনেও খুব একটা পরিবর্তন সাধন হয়নি। এই আইনের দশম অধ্যায়ের ১২০ ধারা থেকে ১৩৭ ধারা পর্যন্ত মজুরী ও তা পরিশোধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং একাদশ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারা থেকে ১৪৯ ধারা পর্যন্ত মজুরী বোর্ড সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে। বর্তমান ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইনের একাদশ অধ্যায়ে ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশের প্রায় সকল বিধানই স্থান পেয়েছে।

বাংলাদেশে প্রচলিত মজুরী আইন ও বাস্তবতা:

২০০৬ সালের শ্রম আইনে শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরী আদায়ের জন্য সহজ ও দ্রুত প্রতিকার প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আইনের ১২১ ধারাতে মজুরী পরিশোধের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে –

ধারা ১২১:

প্রত্যেক মালিক তৎকর্তৃক নিযুক্ত প্রত্যেক শ্রমিককে, এই আইনের অধীন পরিশোধ করতে হবে এরূপ সকল মজুরী পরিশোধ করার জন্য দায়ী থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, ঠিকাদার কর্তৃক নিযুক্ত কোন শ্রমিকের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রমিকের ক্ষেত্রে, কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক অথবা তার তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য কোন ব্যক্তি ও উক্তরূপ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকবেন। আরো শর্ত থাকে যে, ঠিকাদার কর্তৃক নিযুক্ত কোন শ্রমিকের মজুরী উক্ত ঠিকাদার কর্তৃক পরিশোধ না করা হলে সে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃক উক্ত শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ করা হবে, যা ঠিকাদারের নিকট হতে সমন্বয় করা হবে। এছাড়াও ১২২ ধারাতে মজুরীকাল স্থিতিকরণ বিষয়ে বলা হয়েছে –

ধারা ১২২:

(১) ১২১ এর অধীন মজুরী পরিশোধের জন্য দায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি উক্তরূপ মজুরী পরিশোধ সম্পর্কে মজুরীকাল স্থির করবেন।

(২) কোন মজুরীকাল এক মাসের উর্ধ্বে হবে না।

---

৫২. নাহিদ ফেরদৌসী, 'গার্মেন্টস শিল্পে দুর্ঘটনা, প্রচলিত আইন ও বাস্তবতা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার, সংখ্যা: ১০, এপ্রিল-জুন ২০০৭, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ৬৩

৫৩. গাজী শামছুর রহমান, 'শ্রম ও শিল্প আইন', আলীপুর প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ. ২৫৪

Dhaka University Institutional Repository

মজুরী পরিশোধের সময় সম্পর্কে এই আইনের ১২৩ ধারায় বলা হয়েছে –

ধারা ১২৩:

কোন শ্রমিকের যে মজুরীকাল সম্পর্কে তার মজুরী প্রদেয় হয় সেই কাল শেষ হওয়ার পরবর্তী সাত কর্মদিবসের মধ্যে তার মজুরী পরিশোধ করতে হবে।

যেক্ষেত্রে কোন শ্রমিকের চাকুরী তার অবসর গ্রহণের কারণে অবসান হয়, অথবা মালিক কর্তৃক তার ছাঁটাই, ডিসচার্জ, অপসারণ, বরখাস্ত অথবা অন্য কোন কারণে অবসান করা হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত শ্রমিককে প্রদেয় সকল মজুরী তার চাকুরী অবসানের তারিখ হতে পরবর্তী সাত কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

সকল মজুরী কর্মদিবসে পরিশোধ করতে হবে।

এছাড়াও মালিক যেন বিনা কারণে মজুরী কর্তন করতে না পারে সেজন্য ১২৫ ধারায় মজুরী হতে কর্তনযোগ্য বিষয়াদি সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান আছে। এই ধারার বিধানসমূহ নিম্নরূপ–

ধারা ১২৫ :

এই আইন দ্বারা অনুমোদিত কর্তনের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে কোন শ্রমিকের মজুরী হতে কিছুই কর্তন করা যাবে না।

কেবলমাত্র এই আইনের বিধান অনুযায়ী কোন শ্রমিকের মজুরী কর্তন করা যাবে এবং উক্তরূপ কর্তন কেবলমাত্র নিম্নলিখিত প্রকারের হবে যথা:

(ক) আরোপিত জরিমানা;

(খ) কর্তব্য কাজে অনুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য কর্তন:

(গ) কোন শ্রমিকের হেফাজতে প্রদত্ত মালিকের কোন মালামালের ক্ষতি বা লোকসান, অথবা তিনি যে অর্থের জন্য হিসাব দিতে দায়ী, সে অর্থ বিনষ্টের জন্য কর্তন, যদি উক্তরূপ ক্ষতি বা বিনষ্টের জন্য সরাসরি তার অবহেলা বা গাফিলতি দায়ী হয়;

(ঘ) মালিক কর্তৃক সরবরাহকৃত বাসস্থানের জন্য কর্তন;

(ঙ) চাকুরীর প্রয়োজনে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ব্যতীত, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং মালিক কর্তৃক সরবরাহকৃত সুযোগ-সুবিধা ও সেবার জন্য কর্তন;

(চ) কোন অগ্রিম বা কর্জ আদায়ের জন্য কর্তন, অথবা কোন অতিরিক্ত মজুরী প্রদানের ক্ষেত্রে তা সমন্বয়ের জন্য কর্তন;

(ছ) শ্রমিক কর্তৃক প্রদেয় আয়কর বাবদ কর্তন;

(জ) কোন আদালতের আদেশে কর্তন, অথবা উক্তরূপ কর্তনের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন কোন কর্তৃপক্ষের আদেশে কর্তন;

(ঝ) ভবিষ্য তহবিল আইন ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ১৯নং আইন) প্রযোজ্য হয় এই রকম কোন ভবিষ্য তহবিল অথবা আয়কর আইন ১৯৮৪ (১৯৮৪ সনের ৩৬নং আইন) এ সংগায়িত কোন স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন ভবিষ্য তহবিলের জন্য চাঁদা কর্তন অথবা তা থেকে প্রদত্ত অগ্রিম আদায়ের জন্য কর্তন;

Dhaka University Institutional Repository

(ঞ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন সমবায় সমিতিকে প্রদানের জন্য অথবা বাংলাদেশ ডাকবিভাগ অথবা সরকারী কোন বীমা কোম্পানী কর্তৃক সংরক্ষিত কোন বীমা স্কীমকে প্রদানের জন্য কর্তন;

(ট) শ্রমিকগণের অথবা তাদের পরিবারের সদস্যগণের কল্যাণের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে মালিক কর্তৃক গঠিত কোন তহবিল অথবা তৎকর্তৃক প্রণীত কোন স্কীমের জন্য শ্রমিকগণের লিখিত সম্মতিতে, চাঁদা কর্তন এবং

(ঠ) চেক-অফ পদ্ধতিতে সিবিএ ইউনিয়নের জন্য চাঁদা কর্তন।

এছাড়াও ২০০৬ সালের শ্রম আইনে নিম্নতম মজুরী বোর্ড গঠন সংক্রান্ত বিধানও ১৩৮ ধারাতে বর্ণিত হয়েছে। তাতে নিম্নতম মজুরী বোর্ড প্রতিষ্ঠার বিধান নিম্নরূপ বলা আছে –

ধারা ১৩৮: সরকার নিম্নতম মজুরী বোর্ড নামে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করবে।

নিম্নতম মজুরী বোর্ড, অতঃপর এই অধ্যায়ে মজুরী বোর্ড বলে উল্লেখিত, নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে, যথা:

(ক) চেয়ারম্যান;

(খ) একজন নিরপেক্ষ সদস্য;

(গ) মালিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী একজন সদস্য।

ধারা ১৩৯ এ উল্লিখিত দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে, মজুরী বোর্ডে নিম্নলিখিত সদস্যদ্বয়ও অন্তর্ভুক্ত হবেন, যথা:

(ক) সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী একজন সদস্য;

(খ) সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী একজন সদস্য।

মজুরী বোর্ডের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

মজুরী বোর্ডের চেয়ারম্যান ও নিরপেক্ষ সদস্য এমন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে হতে নিযুক্ত হবেন যাদের শিল্প শ্রমিক ও দেশের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান আছে, এবং যারা কোন শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট নন অথবা কোন শ্রমিক বা মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়নের সাথে সংযুক্ত নন।

সরকারের মতে, যে সকল প্রতিষ্ঠান মালিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী এবং যেসকল প্রতিষ্ঠান শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী সে সকল প্রতিষ্ঠানের কোন মনোনয়ন থাকলে তা বিবেচনা করে উপধারা (২) বা (৩) এর অধীন মালিক এবং শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যগণকে নিযুক্ত করা হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি একাধিক প্রচেষ্টায় মালিক কিংবা শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন না পাওয়া যায় তহলে সরকার, নিজ নিবেচনায়, যাকে উপযুক্ত মনে করবেন তাকেই মালিক কিংবা শ্রমিক প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করতে পারবেন। এছাড়াও নিম্নতম মজুরী হার বিষয়ে ১৪৯ ধারাতে কম হারে মজুরী প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ–

ধারা ১৪৯ :

(১) কোন শ্রমিককে এই অধ্যায়ের অধীন ঘোষিত বা প্রকাশিত নিম্নতম হারের কম হারে কোন মজুরী প্রদান করতে পারবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

(২) উপ-ধারা (১)-এর কোন কিছুই কোনভাবে কোন শ্রমিকের এই অধ্যায়ের অধীন ঘোষিত বা প্রকাশিত নিম্নতম হারের অধিক হারে মজুরী অথবা অন্য কোন সুযোগ-সুবিধা অব্যাহতভাবে পাবার অধিকার ক্ষুন্ন করবে না, যদি কোন চুক্তি বা রোয়েদাদের অধীন বা অন্য কোন কারণে তিনি উক্তরূপ অধিক হারে মজুরী পাবার অথবা কোন প্রথা অনুযায়ী উক্তরূপ সুযোগ-সুবিধা পাবার অধিকারী হন। ২০০৬ সালের এই শ্রম আইন এখনও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি। অতিসত্বর এই আইন ও পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি শিল্পমজুরীর ক্ষেত্রে কার্যকর হওয়া প্রয়োজন।[৫৪] এই শিল্পে সাধারণত: ১৫ থেকে ২৪ বয়সের শ্রমিকরা কর্মরত এবং তারা গ্রাম থেকে শহর অভিমুখী শ্রমিক। নিয়োজিত শ্রমিকরা যেমন তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন তেমনি তাদের কর্মক্ষেত্রে তারা অবিরাম শোষণের শিকার। ফলে দেখা যায় যে, তারা শুধুমাত্র দীর্ঘ সময়ই কাজে নিয়োজিত থাকছেন না, তাদেরকে রাত্রিকালিন সময়েও কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং বাধ্যতামূলকভাবে ওভারটাইম করানো হচ্ছে, সাপ্তাহিক ছুটি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারা সঠিক সময়ে তাদের মজুরী পাচ্ছে না। বিগত সময়ে বেশ কিছু অগ্নিকাণ্ডের ফলে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, এই ক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কাজের পরিবেশ অতি নিম্নমানের এবং বিপজ্জনক।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরী দেশের যে কোন শিল্প শ্রমিকদের তুলনায় কম। ১৯৮৭ সালে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত ন্যূনতম মূল মজুরী ছিল মাত্র মাত্র ২৭০ টাকা। তখন সরকারী খাতের শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মূল মূজরী ছিল ৪৫০ টাকা। অপরদিকে ১৯৯৪ সালে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মূল মজুরী ছিল মাত্র ৬০০ টাকা। একই সময়ে সরকারী শ্রমিকদের ন্যূনতম মূল মজুরী ছিল ৯৫০ টাকা। বর্তমানে পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের জন্য সর্বনিম্ন মজুরি ১৬৬২ টাকা হওয়া সত্ত্বেও দেখা গেছে যে, বেশীর ভাগ শ্রকিরাই তাদের ন্যূনতম মজুরী পাচ্ছে না। এই সামান্য মজুরীও গার্মেন্টস মালিকেরা যথাসময়ে শ্রমিকদের দেয় না। গার্মেন্টস মালিকেরা মাসের পর মাস কাজ করিয়ে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ না করে ছাঁটাই করে। কোন কোন মালিক দুই-তিন মাস কাজ করানোর পর কারখানা বন্ধ ঘোষণা দিয়ে আবার দুই তিন মাস পর কারখানা চালু করে। ততদিনে ঐ কারখানার শ্রমিকেরা হয়তো জীবন-জীবিকার তাগিদে অন্য কারখানায় চলে যান। এইভাবে নানা কৌশলে গার্মেন্টস মালিকেরা শ্রমিকদের শোষণ ও বঞ্চিত করে।

ইসলামে শ্রমিকের মজুরী অধিকার:

আল্লাহতাআলা জীবিকার উপাদান বিশ্বে ছড়িয়ে রেখে দিয়েছেন। জীবিকা অর্জনের অন্যতম উপায় হচ্ছে শ্রম। ইসলামে শ্রমিক আর মালিকের কোন দ্বন্দ্ব ও সংঘাত নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধান অনুসারে এ দুনিয়ার কল্যাণ বা পরকালের কল্যাণের জন্য প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করতে হবে।[৫৫] মালিকের কর্তব্য হচ্ছে সময় ও মজুরী নির্ধারণ করে শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করা। অন্যথায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিবে এবং উৎপাদন বিঘ্নিত হবে। এ কারণেই মহানবী (স.) শ্রম বিনিয়োগের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে কাজ শেষ করা মাত্রই শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক প্রদান করা মালিকের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। রাসূল (স.) শ্রমিকের মজুরী সম্বন্ধে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।[৫৬]

---

৫৪. এন.এ.এম. জসিম উদ্দীন, 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং প্রাসঙ্গিক শ্রম আইনসমূহ', সেন্ট্রাল ল বুক হাউজ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ২২০

৫৫. এন.এ.এম. জসিম উদ্দীন, 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং প্রাসঙ্গিক শ্রম আইনসমূহ', সেন্ট্রাল ল বুক হাউজ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৭, পৃ. ২৩২

৫৬. তানজিলা রহমান 'বাংলাদেশে শ্রমিক আইন ও নারী শ্রমিকের অদিকার', দৈনিক সংগ্রাম, ১ মে ২০০৭, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

অপর এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহতা'আলা তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ উত্থাপন করবেন, তারমধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন যে ব্যক্তি কাউকে মজুর হিসাবে খাটিয়ে ও তার দ্বারা পূর্ণ কাজ আদায় করা সত্ত্বেও শ্রমিকের মজুরী দেয় না।[৫৭] এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, 'শ্রমিকের মজুরী নির্ধারণ না করে তাকে নিয়োগ করতে রসূলুল্লাহ (স.) নিষেধ করেছেন।[৫৮]

ইসলামী অর্থনীতির মজুরী নির্ধারণ সূত্র হলো, ন্যূনতম মজুরী প্রত্যেক শ্রমিকের প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রমিককে কমপক্ষে এমন মজুরী দিতে হবে, যেন সে এর দ্বারা তার ন্যায়ানুগ ও স্বাভাবিক চাহিদা মেটাতে পারে। রসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, অধীনস্থদের খোরপোষ দিতে হবে।[৫৯] রসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেছেন, "শ্রমিকের পারিশ্রমিক ও ঋণ পরিশোধ নিয়ে ধনী ব্যক্তিদের টালবাহানা করা যুলুম।[৬০]

উপরোক্ত হাদীসসমূহের আলোকে একথা বোঝা যায় যে, ইসলাম শ্রমিকের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে এবং এর জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ঘোষণা করেছে। ইসলামের নীতিমালা হল মালিক শ্রমিকদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিবে অথবা এমন জরুরী দিবে, যাতে তাদের প্রয়োজন মিটে যায়। কারণ তারা তাদের নিজেদের এবং পরিবারবর্গের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য এ পরিশ্রম করে এবং এই মজুরীই তাদের একমাত্র উপায়। এ ব্যাপারে ইসলামের প্রথম কথা হল শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী দিতে হবে। কোনরূপ টালবাহানা করা যাবে না। তার প্রতি তার ক্ষমতার অধিক কোন দায়িত্ব চাপানো যাবে না। তাদের সন্তানদের শিক্ষার অধিকারও নিশ্চিত করতে হবে। এমনিভাবে তাদের বাসস্থানের বিষয়টিও নিশ্চিত করা মালিক বা সরকার পক্ষের কর্তব্য।

ইসলাম মূলত: এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়, যেখানে সবার অধিকারই সংরক্ষিত থাকে এবং চাওয়ার আগেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রত্যেকের অধিকার আদায় করে দিতে সকলেই উদ্বুদ্ধ থাকে।[৬১] এভাবে ইসলাম যেমন একদিকে মালিককে তার কর্মে নিযুক্ত শ্রমিককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে নির্দেশ করেছে। অন্যদিকে শ্রমিককেও আপন মালিকের নির্ধারিত কাজে নিজের একনিষ্ঠ শ্রমটুকু নিয়োগ করতে বলেছে।[৬২] দায়িত্ব গ্রহণের পর শ্রমিক কাজে কোনরূপ গাফলতী করতে পারবে না। সৎ কর্মশীল একজন শ্রমিক যে আল্লাহর ও মালিকের হক আদায় করে থাকে সে ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হয়।[৬৩] রসূল (স.) এর পেশকৃত শ্রমনীতিতে এমন ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক পারিশ্রমিক বা মজুরী প্রদানের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে যাতে প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনাদি সুষ্ঠভাবে নির্বাহ করা যায়। রসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিরা অবশ্যই তোমাদের ভাই, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন।[৬৪]

---

৫৭. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, 'ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার' প্রকাশকাল: পঞ্চম প্রকাশ জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ১২

৫৮. শামসুল আলম 'ইসলামী রাষ্ট্র' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশকাল-১৯৮৬, পৃ. ১২৪

৫৯. ইবনে মাজা, সূত্র: হিদায়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৩

৬০. বুখারী শরীফ, পৃ. ২২৬

৬১. বায়হাকী, সূত্র: ইসলামের অর্থনীতি, পৃ. ১১৭

৬২. মুসলিম শরীফ, সূত্র: ইসলামে শ্রমিকের অধিকার।

৬৩. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ২৫১

৬৪. 'দৈনন্দিক জীবনে ইসলাম', ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ৫০০

Dhaka University Institutional Repository

মজুরী সমস্যা ও ইসলাম:

মজুরী হচ্ছে কিছু অর্থ কিছু যা চুক্তি অনুযায়ী সেবা প্রদানের জন্য নিয়োগকারী শ্রমিককে প্রদান করে। মজুরী শ্রমিকের প্রাপ্য। মালিক কর্তৃক মজুরকে তার মজুরী প্রদান করা আবশ্যক। আল-কুরআনে মজুরী প্রদানের স্পষ্ট বিধান রয়েছে। আল্লাহ্ হযরত শুআইব (আ.) কর্তৃক হযরত মূসা (আ.) কে তাঁর মজুরী প্রদান করার ঘটনার উদ্বৃতি দিয়ে বলেন, "আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন যাতে আপনি যে আমাদের পানি পান করিয়েছেন তার বিনিময়ে মজুরী প্রদান করেন।"[৬৫] এ ব্যাপারে রাসূল (স.) বলেছেন, "তোমরা শ্রমিককে তার ঘাম শুকানের আগেই প্রাপ্য পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।"[৬৬] কিন্তু কোন পদ্ধতিতে মজুরী নির্ধারিত হবে তা নিয়ে বিভিন্ন অর্থ শাস্ত্রের পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন নীতি রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল:

১. পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মজুরী নির্ধারণ পদ্ধতি:

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থানুসারে মজুরী নির্ধারণের আধুনিক সূত্র হলো দ্রব্যমূল যেমন চাহিদা ও যোগানের অনুপাতে নির্ধারিত হয়ে থাকে তেমনি শ্রমের দাম (মজুরী) চাহিদাও যোগানের অনুপাতে নির্ণীত হবে। অর্থাৎ চাহিদা বেশি হলে মজুরী বেশি কিন্তু চাহিদার তুলনায় যোগান বা সরবরাহ কম হলে মজুরী কমে যাবে। তারা বলেন দ্রব্যের দাম যেমন প্রান্তিক উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল, তেমনি শ্রমিকের মজুরী ও তার প্রান্তিক উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল।[৬৭]

২. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মজুরী নির্ধারণ পদ্ধতি:

দক্ষতানুযায়ী কাজ এবং প্রয়োজনানুযায়ী মজুরী। অর্থাৎ মালিক প্রত্যেক শ্রমিকের দক্ষতানুযায়ী তার থেকে শ্রম গ্রহণ করবে কিন্তু মজুরী প্রদান হবে তার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে। এখানে মজুরী নির্ধারণের ব্যাপারে দক্ষতার কোন বিবেচনা করা হয়নি। শুধুমাত্র প্রয়োজনানুসারে মজুরী নির্ধারণ করা হয়।[৬৮]

৩. ইসলামের দৃষ্টিতে মজুরী নির্ধারণ পদ্ধতি:

প্রধানত চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ইসলামে শ্রমিকের মজুরী নির্ধারিত হয়ে যাবে। এগুলো হচ্ছে-[৬৯] (ক) ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক (খ) শ্রমের অবদানের যুক্তিসঙ্গত অংশ (গ) নিয়োগকর্তার মালে মৌলিক চাহিদা পূরণ (ঘ) কাজের যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ ও অনুকূল পরিবেশ। নিম্নে মূলনীতিগুলো আলোচিত হলো:

(ক) ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক: একজন রুচিবান লোক যেমন তার পরিবারের সদস্যদের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখে, একজন নিয়োগকর্তাও তেমনি তার শ্রমিক বা কর্মচারীর কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখে। একটি পরিবারে এক ভাই যেমন অপর ভাইকে দেখে একজন নিয়োগকর্তাও একজন কর্মচারী বা শ্রমিককে ভাই-এর চোখে দেখবে। রাজা-প্রজা নয়, উপরস্থ-অধীনস্থ নয় বরং পরস্পর আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হবে নিয়োগকর্তা শ্রমিক-কর্মচারী সম্পর্কের ভিত্তি। এই ভিত্তিতে কাজ করলে মজুরী অবশ্যই ভাই-রে মর্যাদা সম্পন্ন হবে।

---

৬৫. ড. সাইদুল্লাহ কারী, 'রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আদর্শের আলোকে শ্রম ও শ্রমিক', মাসিক মদীনা সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা, জুন-২০০২, পৃ. ৮৪

৬৬. 'ফাতাওয়া ও মাসাইল ৬ষ্ঠ খন্ড' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল জুন, ২০০১, পৃ. ২১৯

৬৭. ড. খালিক দাদ, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং শ্রমজীবিদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা' মাসিক মদীনা, মে. ২০০৬, পৃ. ৬৫

৬৮. আল-কুরআন, ২৮:২৫

৬৯. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, প্রাগুক্ত, পৃ. কিতাবুল আহকাম, হাদীস নং-২৪৩৪

Dhaka University Institutional Repository

(খ) **শ্রমিকের অবদানের অংশ :** উৎপাদনে শ্রমিক অংশগ্রহণ কযে যে উৎপাদন করে, তাতে তার যুক্তিসঙ্গত ন্যায্য অংশ আছে। শ্রমিককে সে অংশ দিতে হবে। এ নীতি শ্রমিককে শোষণ থেকে বাঁচিয়েছে। রাসূল করীম (স.) বলেছেন, "শ্রমিককে তার কাজের যোগ্য অংশ দাও, কারণ আল্লাহর শ্রমিককে বঞ্চিত করা যাবে না।"[৭০]

(গ) **নিয়োগকর্তার সমমানে শ্রমিকের মৌলিক চাহিদা পূরণঃ** মজুরীর পরিমাণ ন্যূনপক্ষে শ্রমিকের মৌলিক চাহিদা পূরণের উপযোগী হবে। এই উপযোগিতার মান হবে নিয়োগকর্তার সমমানের। মহানবী (স.)-এর সময়ে ক্রীতদাসগণই শ্রমিকের কাজ করত। বর্তমানে এদেশে ক্রীতদাস প্রথা না থাকলেও ক্রীতদাসের কাজ আছে এবং দরিদ্র স্বাধীন লোকেরাই এই কাজ করে। একজন ক্রীতদাস তার মনিবের কাছ থেকে যে মজুরী পেতে পারে বর্তমানে একজন শ্রমিকও তার মালিকের কাছ থেকে তা পেতে পারে। ক্রীতদাসের মালিকগণকে লক্ষ্য করে মহানবী (স.) বলেন, "তারা (ক্রীতদাসগণ) তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। অতএব যার একজন দাস আছে সে যেন তাকে তাই খেতে দেয় যা সে খায় এবং সে যেন তাকে তাই পরিধান করতে দেয় যা সে পরিধান করে।"[৭১]

উল্লেখিত হাদীস থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, যে ব্যক্তি শ্রম দিবে তার মৌলিক চাহিদা যথা খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা মালিককে করতে হবে। এই চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ তাই হবে যা মালিকের এই দুটি চাহিদা পূরণের জন্য ব্যয় হয়, এর চেয়ে কম হবে না।

(ঘ) **কাজের পরিমাণ ও পরিবেশঃ** কাজের পরিমাণ ও ঝুঁকি প্রভৃতি এমন হতে হবে যে তা শ্রমিকের পক্ষে দুঃসাধ্য না হয় তা বোঝা না হয়। এই পরিমাণ শ্রমিকের সহ্য ক্ষমতার বাইরে হবে না, তার কাজের পরিবেশও অনুকূল হবে।

এই সবগুলো বিষয় বিবেচনার উপরই প্রকৃত মজুরী নির্ভর করে।

উপরে বলা হয়েছে যে, শ্রমিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ নিয়োগকর্তার গুণগত মানে হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে যেসব পরিবারের সদস্য এক নয়, সে ক্ষেত্রে মজুরী কিভাবে নির্ধারিত হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, দেশের পরিবারসমূহের গড় করে মজুরী নির্ধারিত হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, দেশের পরিবারসমূহের গড় করে মজুরী নির্ধারিত হতে পারে। কারো পরিবার যদি বড় হয় তবে ড. কে.টি. হোসেন ও ড. সাদেক মনে করেন যে, যাকাত তহবিল থেকে তাদেরকে বাড়তি সুবিধা প্রদান করা যায়।[৭২] ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে, নৈতিক অর্থনীতি; নীতির নিরপেক্ষ অর্থনীতি নয়। অতএব প্রচলিত অর্থনীতির কতকগুলো নীতি নিরপেক্ষ তত্ত্বের মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতি মজুরী নির্ধারণ করে না। ইসলাম কতগুলো মূলনীতি ঠিক করে দেয়া যায় আওতায় মালিক ও শ্রমিক মজুরী স্থির করবে। ইসলামের এই মূলনীতিগুলোই উপরে বর্ণিত হয়েছে। এ মূলনীতিগুলোর মূলে রয়েছে মানবীয় মর্যাদা, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়নিষ্ঠা।

---

৭০. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে অর্থনীতি, অপ্রকাশিত এমফিল থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ১৯৯৯, পৃ. ১২৫

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

৭২. মুহাম্মদ আবদুল খালেক, ইসলামী অর্থনীতি, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দৃষ্টিতে আন্তঃপেশায় মজুরী নির্ধারণ:

ইসলামে অর্থনৈতিক মূল্যবোধের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট হলো ন্যায় বিচার। আর এ কারণেই একই পেশায় নিয়োজিত বিভিন্ন কর্মচারীর মধ্যে শিক্ষা ও দক্ষতার পার্থক্যের কারণে তাদের মজুরীর মধ্যেও পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে।'[৭৩] অন্যত্র বলেন, "মানুষ তাই পায় যা সে করে।"[৭৪]

ওভারটাইম :

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইসলামী অর্থনীতি ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ শাস্ত্র মতে শ্রমিকদেরকে তাদের সাধ্য ও শক্তির বাইরে কোন কাজ করতে তাদেরকে বাধ্য করে না। একজন শ্রমিক সাধারণভাবে দৈনিক যে সময় পরিমাণ কাজ করতে পারে তাই হবে তার কার্যসময় এবং সে অনুযায়ী তাকে মজুরী প্রদান করা হবে। যদি মালিক কাজের সুবিধার্থে কোন শ্রমিক দ্বারা তার নির্ধারিত কর্মসময়ের অতিরিক্ত সময় কাজ করাতে হয়, তখন মালিককে অতিরিক্ত শ্রমের অতিরিক্ত মজুরী প্রদান করতে হবে। যাকে অফিস ব্যবস্থাপনায় (Over Time) বলে। আল-কুরআনে এ সংক্রান্ত যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা হলো, "আল্লাহ্ কাউকে তাদের সাধ্যের বাহিরে কাজ প্রদান করেন না।"[৭৫] মহানবী (স.) অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেন, "যদি তাদের উপর অধিক কাজ করার দায়িত্ব চাপাও, তবে সে হিসাবে বাড়তি মজুরী দিয়ে তাকে সাহায্য কর।"[৭৬]

শ্রমিকদের অধিকার আদায় ও সংরক্ষণে সরকারি দায়িত্ব :

ইসলাম মূলত এমন এক সমাজ কায়েম করতে চায় যেখানে সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্তব্য আদায় করে এবং একে-অপরের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে। এর জন্য ইসলাম ঈমান ও আমলে সালেহ দ্বারা এক পরিবেশ গঠন করে। যেখানে সৎ পথে চলা সকলের জন্যই অত্যন্ত সহজতর হয়ে উঠে। এ শুধু কতকগুলো কাল্পনিক আদর্শগত কথা নয় বরং ইসলাম খোলাফায়ে রাশেদার আমলে এর বাস্তবরূপ কায়েম করে জগতবাসীকে তার লোভ-লাভ প্রত্যক্ষ করে দেখিয়ে দিয়েছে। ইসলামের অভিপ্সিত পরিবেশ কায়েম করতে সচেষ্ট হলে আজকের পৃথিবীও এর বাস্তবরূপ প্রত্যক্ষ করতে পারত।

এমন এক পরিবেশে বাস করর পরও যদি এমন কেউ থেকে যায়, যার মধ্যে শয়তানিয়াত ও শোষণের মনোবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তখন একে সংশোধন করার জন্য তাকে সৎপথে চালিত করার জন্য ইসলাম একটা ন্যায়ানুগ প্রশাসন ব্যবস্থারও বন্দোবস্ত রেখেছে।

আমরা জানি, যেমনিভাবে নৈতিক আবেদন ব্যতীত শুধু প্রশাসন ব্যবস্থা দ্বারা কোন বিধান চলতে পারে না। তেমনিভাবে অনেক সময় নৈতিক নির্দেশাবলীই যথেষ্ট হয়না; বরং আইনের শাসনও কায়েম করতে হয়।

তাই ইসলাম শ্রমিকদের অধিকার শুধু মালিকদের নৈতিকতার উপর ছেড়ে দেয়নি, বরং তা সুষ্ঠুভাবে আদায় হচ্ছে কিনা, সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা এদিকেও নজর রাখা রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রকে দায়িত্বশীল হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

---

৭৩. মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং-৮২৫০

৭৪. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমাম, হাদীস নং-২৯

৭৫. কে.টি হোসেন, ইসলামী অর্থনীতি, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ১৮০

৭৬. আল-কুরআন, ৩৯:৯

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলপাক (স.) নিজে অনেক সময় ঐ সম্পর্কীয় দায়িত্বপালন করেছেন এবং অন্যকেও নির্দেশ দিয়েছেন। একদিন আবূ মাসউদ (রা.) তাঁর চাকরকে মারছিলেন, তখন পিছন হতে একটি আওয়াজ শ্রুত হলো-আবূ মাসউদ খবরদার! আবূ মাসউদ বলেন, রাগে আমার এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছিল যে, কে আওয়াজ করল তা বুঝতে পারিনি। হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি রাসূল (স.) বলছেন, "আবূ মাসউদ, খবরদার! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের চেয়েও বেশি শক্তি রাখেন।" তখন তিনি অনুতপ্ত হলে বললেন, একে আমি আযাদ করে দিলাম। নবী করীম (স.) বলেন, "যদি তা না করতে হবে জাহান্নামের আগুন তোমাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিত।"[৭৭]

হযরত উমর (রা.) প্রায়ই মদীনার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে লোকদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন এবং কোথাও কোন মজুর অথবা গোলামকে নির্যাতিত হতে দেখলে অথবা প্রাণান্তকর শ্রমে নিয়োজিত দেখলে এর প্রতিকার করতেন।[৭৮]

ইসলাম শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করার অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রকে দেয়। এ সম্পর্কে মাওলানা আব্দুর রহীম বলেন, "শ্রমিক ও কারখানা মালিকের মধ্যে কোন ব্যাপারে মত-বৈষম্য ও ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হইলে উহার মীমাংসার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার অধিকার রহিয়াছে। শুধু অধিকারই নয়, রাষ্ট্র সরকারের তাহা অন্যতম কর্তব্যও। মজুর-শ্রমিকের উপর কোন প্রকার অযথা বাড়াবাড়ি করা, মজুরী কম দেওয়া, অধিক কাজের চাপ দেওয়া, কিংবা শ্রমিকের কাজে ফাঁকি দেওয়া, দায়িত্বপালন না করা বা কম কাজ করিয়া বেশি মজুরী লওয়ার চেষ্টা করা প্রভৃতি যে সমস্যা হউক না কেন, ইসলামী রাষ্ট্র তাহাতে সরাসরিভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া বিবাদ-মীমাংসা করিয়া দিবে। কারণ ইসলামী রাষ্ট্র দর্শন অনুযায়ী লোকদের পারস্পরিক সকল প্রকার বিবাদ-মিমাংসা করার সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করা এবং প্রত্যেকেরই হক যথাযথরূপে আদায় করিয়া দেওয়াই হইতেছে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ও কর্তব্য।"[৭৯]

একজন সৎকর্মশীল ইসলামী প্রশাসক কতটুকু দায়িত্বশীল হয় তা আমরা খোলাফায়ে রাশেদার সামগ্রীক কার্যক্রম দ্বারা কিছুটা অনুমান করতে পারি। হযরত উমর (রা.) কেমন করে রাতের পর রাত প্রজা সাধারণের অবস্থা জানার জন্য ঘুরে বেড়াতেন তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এত করার পরও তিনি বলতেন, "যদি আমি জীবিত থাকি তবে ইনশাআল্লাহ্, রাত্রিকালীন সমস্ত দেশ এবং এলাকা জুড়ে বিচরণ করব। কারণ, আমি জানি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও অনেকেরই অনেক প্রয়োজন পূরণ হতে পারে না-তারা আমার কাছেও আসতে পারে না। আর কর্মচারীরাও হয়ত তাদের সকলের সংবাদ আমার কাছে পৌছায় না। তাই আমি দু'মাস মিসর, দু'মাস বসরা, এমনিভাবে কুফা ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকাও ঘুরে ঘুরে দেখব।"[৮০]

উমাইয়া খলিফা হযরত উমর ইবনু আবদিল আযীয (রা.) সারা রাত্র জায়নামাযে পড়ে পড়ে কাঁদতেন। তাঁর বেগম এত বিষণ্ন ও চিন্তিত হয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, "আমার অবস্থা এই যে, সাদা-কালো সমস্ত উম্মতে মুসলিমার অভিভাবক আমি। আমি ভাবি-অনেক দূর এলাকায় অনেক অসহায় মুসাফির অনেক দুর্গত অবস্থার জন্য হয়ত ধ্বংসের মুখে চলে যাচ্ছে।

---

৭৭. আল-কুরআন, ৫৩:৩৯

৭৮. আল-কুরআন, ২:২৮৬

৭৯. মুসলিম শরিফ, হাদীস নং-৩১৪০

৮০. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইবী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-৩১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

অনেক অভাবগ্রস্থ গরীবজন, মজুর, কয়েদী এবং অনেক নিঃস্বও আছেন। আমার বিশ্বাস আল্লাহ্পাক তাদের কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আর হুযুর (স.) নিশ্চয়ই তাদের পক্ষ হয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবেন, আমার ভয় হয় ঐদিন আমি কোন জবাবদিহি করতে পারব না-এই চিন্তায়ই আমি বিষণ্ন। আমি কাঁদি।"[৮১]

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে ইসলামে শ্রমিকের অধিকার আদায় ও সংরক্ষণে সরকারের কি ভূমিকা থাকা উচিত তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পে দুর্ঘটনা, প্রচলিত আইন ও ইসলাম:

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতায় একটি দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় উন্নয়ন অনেকাংশে শিল্পের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের ৭৫% এর অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী গার্মেন্টস শিল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে। প্রায় ২০ লাখ শ্রমিক এ খাতে কর্মরত, যাদের ৭০ শতাংশই নারী। উৎপাদন প্রকিয়ায় নারীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে নারীদের অর্থনৈতিক কাঠামো গঠনে অনুকূল প্রভাব ফেলেছে। সেদিক থেকে সামাজিক উন্নয়নেও এ খাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গার্মেন্টস শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে কর্মপোযোগী পরিবেশ, স্বাস্থ্য সেবা ও নিরাপত্তার দিকটি রয়েছে যথেষ্ট অবহেলিত। যার ফলে লঙ্ঘিত হচ্ছে মানবাধিকার। অথচ কর্মপোযোগী পরিবেশ এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা শ্রমিকদের একটি মৌলিক অধিকার। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন থেকে জাতীয় আইনে, বিশেষত ইসলামী আইনেও শ্রমিকদের অধিকার যথাযথভাবে সুরক্ষিত। বাংলাদেশের শ্রম আইনে শ্রমিকদের কর্মস্থলে নিরাপত্তা সংকান্ত নানা ধরণের আইন থাকা সত্ত্বেও গার্মেন্টস শিল্পে প্রায়ই মারাত্মক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। বেশিরভাগ দুর্ঘটনাই বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকান্ডের ফলে সংঘটিত হয়েছে। ফলে অসংখ্য নিরীহ শ্রমিকের মৃত্যু হচ্ছে। শ্রমিক এবং মালিকের ক্ষতির পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের কাছে দেশের ভাবমর্যাদাও নষ্ট হচ্ছে। এ ধরণের দুর্ঘটনার ফলে এ শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং তার প্রভাব সামগ্রিক অর্থনীতিতেও পড়ছে।

অথচ শিল্পায়নের সূচনা এবং শ্রমিকদের জীবন মানের উন্নয়নের প্রচেষ্টার ফলেই আধুনিক শ্রম আইনের জন্ম। কিন্তু শ্রমিকদের জীবনযাত্রা শতাব্দীকাল আগে যে পর্যায়ে ছিল আজও প্রায় সেখানেই রয়ে গেছে।[৮২] দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, উপনিবেশ শাসনামল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে শ্রম ও শিল্প আইন বিভিন্নভাবে উপেক্ষিত। মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক এবং শিল্পের দুরবস্থার মূলে শ্রম ও শিল্প আইনের ভুল ভ্রান্তি ও অসংলগ্নতাই বহুলাংশে দায়ী।

বাংলাদেশে বিদ্যমান শ্রম আইনের সংখ্যা ৫০টি। এর মধ্যে বৃটিশ আমলের ১৫টি, পাকিস্তান আমলের ২৩টি এবং অবশিষ্ট ১২টি বর্তমান আমলে প্রণীত হয়েছে। শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধসহ অন্যান্য বিষয় এই সকল আইনে বিধিবদ্ধ থাকলেও তা উন্নত বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে পশ্চাৎপদ ও অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল। তাই ২০০৬ সালের ১১ই অক্টোবর ৫০টি শ্রম আইনের সমন্বয়ে যুগোপযোগী করে 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬' পাস করা হয়। একই সাথে উক্ত আইনের ৩৫৩ ধারানুযায়ী পূর্ববর্তী ২৭টি শ্রম আইন বাতিল করা হয়।[৮৩]

---

৮১. ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ১২০

৮২. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ১২০

৮৩. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান 'বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন', দি এ্যানজেল পাবলিকেশন, ঢাকা, সপ্তম সংরক্ষণ, ১৯৯৯, পৃ. ৬৪৯

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্য ব্যবস্থা শুরু হয়েছে যা বাংলাদেশেও চালু আছে। তবে এক্ষেত্রে এদেশে যৌথ ব্যবস্থাপনায় যে কার্যক্রমগুলো আছে তাতে বিদেশী সংস্থাসমূহ এদেশের কাজ করলেও তারা দেশীয় আইন মেনে চলতে চায় না এবং কখনও কখনও দেশীয় আইনের অপব্যবহার হয়। অথচ শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন নির্ভর করে আইনের প্রতি উভয়পক্ষের শ্রদ্ধাবোধ এবং যথাযথভাবে নিয়ম ও বিধি বিধান অনুশীলনের উপর। তাই শ্রম ও শিল্প আইন শুধুমাত্র শিল্পের সাথে সম্পর্কিত মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর উন্নয়নেই ভূমিকা রাখে না সামগ্রিকভাবে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও নিশ্চিত করে। কিন্তু আমাদের দেশে আইন বলবৎ করার প্রক্রিয়ার অভাব এবং কিছু মালিক পক্ষের সদিচ্ছার অভাবের কারণে গার্মেন্টস কারখানার নিরাপত্তার বিষয়টি এখনও সমাধানহীন রয়ে গেছে। আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন না হলে আগামী দিনে এই ধরণের দুর্ঘটনার ফলে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে এবং বিদেশী ক্রেতাদের হারাতে হবে। তাই ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। মালিক পক্ষকে আইনের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এবং তাদের ফিল্ডিং ও কাঠামোগত ত্রুটির বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন, যা দুর্ঘটনা এড়াতে সাহায্য করবে। শ্রমিকদের জীবনের নিশ্চয়তার পাশাপাশি কোটি কোটি টাকার মালামালও রক্ষা পাবে এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এ শিল্প আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে দুর্ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র:

২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন অনেকাংশে পুরনো শ্রম আইনের একটি নতুন রূপমাত্র। দেশে শ্রম আইন থাকা সত্ত্বেও বেশির ভাগ গার্মেন্টস কারখানা সুষ্ঠু নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকার কারণে প্রায়ই অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। প্রতি বছর গার্মেন্টস কারখানাতে আগুন অথবা আগুনের আতঙ্কে পদপিষ্ট হয়ে বহু নারী ও পুরুষ শ্রমিক উৎপাদন কাজে নিয়োজিত থাকাকালে প্রাণ হারাচ্ছে। এ যাবত গার্মেন্টস কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার মধ্যে ৩০/০৬/২০০৫ সালে স্পেকট্রাম সুয়েটার কারখানার দুর্ঘটনাটি শুধুমাত্র ভবন ধসে হয়েছিল। এছাড়া বাকি সব দুর্ঘটনা বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট ও অগ্নিকাণ্ড থেকে সংঘটিত।

বিজিএমইএ কর্তৃক সম্পাদিত অগ্নি দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৯০ সাল থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৬ সাল পর্যন্ত মোট অগ্নি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় ১৩৩টি কারখানায়। ১৩৩টি কারখানায় অগ্নি দুর্ঘটনা হলেও ১৯টি কারখানায় ২২২ জন শ্রমিক নিহত হয়, বাকী কারখানাগুলোর শ্রমিক নিহত হয়নি শুধু আহত হয় এবং কারখানার কাঁচামাল ও যন্ত্রপাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৩৩টি কারখানায় আহত হয় মোট ৪৭৪ জন শ্রমিক।

সারনী-১:

গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে অগ্নি দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য:[৮৪]

সাল	কারখানার সংখ্যা	নিহত শ্রমিকের সংখ্যা
১৯৯০	০১টি	২৩ জন
১৯৯৫	০৩টি	১৪ জন

৮৪. এন. এ. এম. জসিম উদ্দিন "বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং প্রাসঙ্গিক শ্রম আইনসমূহ" সেন্ট্রাল ল বুক হাউজ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৭, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৬	০১টি	১৪ জন
১৯৯৭	০৬টি	৪১ জন
১৯৯৮	০৪টি	০১ জন
১৯৯৯	১৬টি	০২ জন
২০০০	১৯টি	১২ জন
২০০১	২৩টি	২১ জন
২০০২	০৯টি	০০ জন
২০০৩	১৫টি	০০ জন
২০০৪	১৬টি	০৭ জন
২০০৫	০৯টি	২২ জন
২০০৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত	১১টি	৬৭ জন

এ যাবত গার্মেন্টস কারখানায় দুর্ঘটনার নেপথ্যে সাধারণত যে সব কারণ দেখা যায় তা হল:

* কারখানায় সংকেতের মাধ্যমে সতর্কীকরণ ব্যবস্থার অভাব বা শ্রমিকদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ না থাকা।

* কারখানায় পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের অভাব বা অপ্রতুলতা।

* শ্রমিকদের অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ না থাকা।

* কারখানায় বিকল্প সিঁড়ি বা জরুরী নির্গমণ পথ না থাকা অথবা বিকল্প সিঁড়ি থাকলেও তার ব্যবহার উপযোগী না হওয়া।

* কারখানার প্রতিটি সিঁড়িতে বিকল্প বাতির ব্যবস্থা না থাকা।

* কারখানায় ত্রুটিপূর্ণ বিদ্যুৎ/গ্যাস লাইন ও ফিটিংসসমূহ।

* কারখানায় ফ্লোরকে মালামাল রাখার সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করা।

* সিঁড়ির হ্যান্ডরোল না থাকা এবং সিঁড়ি বা যাতায়াত পথে মালামাল রাখার ফলে স্বাভাবিক যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি।

* কলাপসিবল গেইট বন্ধ রাখা।

* আপদকালীন সময়ে কারখানা থেকে বের হওয়ার বিষয়ে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ না থাকা।

গার্মেন্টস শিল্পে দুর্ঘটনার পরবর্তীকালে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সহায়তায় গৃহীত কিছু পদক্ষেপ ও বাস্তবতা দেশকে শিল্পায়িত করার জন্য যথাযথ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অধিকার বাস্তবায়ন হওয়া প্রয়োজন। এই সমস্ত দরিদ্র শ্রমিকরা জীবন ধারণের সামান্য রুজির জন্য কারখানায় গিয়ে জীবন হারায়, তাদের জন্য মালিকপক্ষ ও সরকারের অর্থবহ ভূমিকা নেয়া জরুরী। তাই কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সরকার, বিজিএমইএ এবং মালিক ও শ্রমিকদের সমন্বিত ভূমিকার বিকল্প নেই। সরকার ও মালিকপক্ষ গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিকদের নিরাপদে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিম্নের কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:

বিজিএমই-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯৭ সালে ৬টি কারখানায় অগ্নি দুর্ঘটনায় ৪১ জন শ্রমিক নিহত এবং অসংখ্য শ্রমিক আহত হয়। ১৫/০৭/১৯৯৭ সালে মিরপুরের মাজার রোডে একসাথে তামান্না, রাব্বানী, ম্যাক্সবর্ণ ও রহমান এন্ড রহমান-এই চারটি গার্মেন্টস কারখানায় সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের ফলে এবং অগ্নিকাণ্ডের ভয়ে একসাথে বের হতে গিয়ে ধাক্কা-ধাক্কিতে পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে বহু শ্রমিক প্রাণ হারায়। এরপর গার্মেন্টস কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ও বিভিন্ন দুর্ঘটনা রোধকল্পে সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ করে। এই প্রণীত কার্যক্রমে অগ্নি প্রতিরোধে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা এবং দুর্ঘটনা পরবর্তী অনুসন্ধান ও প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়। এই কার্যক্রমের ফলে বর্তমানে প্রত্যেক গার্মেন্টস কারখানায় ওয়েলফেয়ার অফিসার, ফায়ার অফিসার এবং লেবার অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটি মনিটরিং-এর কাজ করছে।[৮৫]

Bangladesh Garments Manufactures and Exporters Association (BGMEA) এর গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:

BGMEA একটি গার্মেন্টস কারখানার মালিক এসোসিয়েশন যা মালিকদের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি শ্রমিকদের উন্নতির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। গার্মেন্টস কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে জানমালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিশেষ করে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের আস্থা সৃষ্টির জন্য বিজিএমইএ ২০০১ সালে Crash Program on Fire Prevention & Safe Exit শুরু করে। তিন মাস মেয়াদের এই Crash Program এর মাধ্যমে বিজিএমইএ কর্মক্ষেত্রে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহার এবং আপদকালীন সময়ে কারখানা হতে বের হওয়ার বিষয়ে ঢাকা, গাজীপুর, সাভার ও নারায়ণগঞ্জে বহু ট্রেনিং ও সেমিনারের আয়োজন করেছে। ফলে দেখা যায়, ২০০১ সালের পর বিভিন্ন কারখানায় অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটলেও পদপিষ্ট হয়ে কোন শ্রমিক নিহত হয়নি। পরবর্তীতে দ্বিতীয় পর্যায়ে বিজিএমইএ ঢাকা এবং চট্টগ্রামে ২০০৬ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত তিন মাস ব্যাপী Crash Program কার্যক্রম চালায়।[৮৬] এছাড়া ২০০৬ সালে দু'দফায় বিজিএমইএ বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় অগ্নি ও অন্যান্য দুর্ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সতর্কীকরণ প্রচার কার্যক্রম চালিয়েছেন।

গার্মেন্টস কারখানায় দুর্ঘটনা পরবর্তী আর্থ-সামাজিক অবস্থা:

বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে। প্রতি বছর নীট ও ওভেন সামগ্রী রফতানির মাধ্যমে বিপুল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। দেশের রফতানি আয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ আসে গার্মেন্টস কারখানা থেকে। বর্তমানে গার্মেন্টস শিল্প একটি প্রতিযোগিতামূলক সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিশ্ববাজারে ফিনিশড সামগ্রীর আকস্মিক মূল্য পতন সত্ত্বেও বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পখাত এখনও কৃতিত্বের চিহ্ন এঁকে যাচ্ছে। ২০০৫–২০০৬ অর্থ বছরে সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী রফতানি আয়ের পরিমাণ ছিল ১০.৫৩ বিলিয়ন ডলার। ২০০৫–২০০৬ অর্থ বছরে তৈরী পোশাক খাতে ওভেন এবঙ নিটের রফতানি বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১৩.৫ ও ৩৫.৪ শতাংশ। কিন্তু বিগত কয়েক বছর গার্মেন্টস কারখানা শিল্প অগ্নি দুর্ঘটনায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

---

৮৫. A News letter of Bangladesh Garment Manufactures & Export Association, April-May 2006, P. 3

৮৬. A News letter of Bangladesh Garment Manufactures & Export Association, April-May 2006, P. 9

Dhaka University Institutional Repository

গার্মেন্টস কারখানায় দুর্ঘটনা পরবর্তী নিম্নলিখিত যে সকল ক্ষতি প্রকটভাবে দেখা যায়:

* দুর্ঘটনা কবলিত কারখানার মেশিন ও যন্ত্রাংশ সমূহ নষ্ট হয়।

* ক্ষতিগ্রস্ত কারখানায় কাজ বন্ধ থাকে বিধায় শ্রমিকরা কাজের খোঁজে অন্য কারখানায় চলে যায়।

* কারখানায় মজুদকৃত কাঁচামালের ক্ষতি হয়।

* কখনও কখনও কারখানা ভবনের ক্ষতি হয়।

* দুর্ঘটনার ফলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি সঠিক সময়ে বায়ারদের অর্ডার ডেলিভারী দেত না পারা। অনেক সময় পরবর্তী অর্ডারও বন্ধ হয়ে যায়।

শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয়ে পূর্বের ও বর্তমান শ্রম আইন সমূহ-

জাতীয় আইন সমূহ:

২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন পাসের পূর্বের আইনসমূহ :

কারখানার শ্রমিকদের কাজের সুবিধা, নিরাপত্তা, উন্নততর কাজের পরিবেশ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের বিধান থাকলেও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষা সংক্রান্ত প্রধানত ১৯৬৫ সালের কারখানা আইন এবং ১৯৭৯ সালের কারখানা বিধিমালাসমূহ কার্যকর ছিল।

কারখানা আইন ১৯৬৫ (Factories Act 1965):

১৯৬৫ সালের কারখানা আইনে ৩, ৪ ও ৫ অধ্যায়ে ১২ ধারা থেকে ৪৮ ধারা পর্যন্ত বিধানাবলীতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি অতি গুরুত্ব সহকারে যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছিল। বিশেষ করে শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে ২২ ধারা থেকে ৪২ ধারা পর্যন্ত ২০টি গুরুত্বপূর্ণ ধারা ছিল।

কারখানার নিরাপত্তা ও কাজের উন্নত পরিবেশ এবং দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ বিষয়ে ১৯৬৫ সালের কারখানা আইনের পাশাপাশি ১৯৭৯ সালে কারখানা বিধিমালা প্রণীত হয়।[৮৭]

কারখানা বিধিমালা, ১৯৭৯ (Factories Rules 1979):

কারখানা আইনের বিধিমালায় ৩৭ বিধি থেকে ৫৩ বিধি পর্যন্ত নিরাপত্তামূলক বিধান সন্নিবেশিত ছিল।[৮৮] এছাড়া শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিষয়ে নিম্নের আইনসমূহ প্রচলিত ছিল:

মারাত্মক দুর্ঘটনা আইন ১৮৫৫ (The Fatal Accident Act 1855)

মালিকের দায়-দায়িত্ব আইন ১৯৩৮ (The Employers Liability Act 1938)

শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন ১৯২৩ (The Workmen's compensation Act 1923)

শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বিধিমালা ১৯২৪ (The Workmen's Compensation Rules 1924)

ফায়ার সার্ভিস অধ্যাদেশ ১৯৫৯ (The Fire Serives Ordinance 1959)

কিন্তু বাস্তবে এইসব আইন তেমন একটা কার্যকর বা সহায়ক ছিল না। এসকল আইনের কোনোটিতেই একজন মৃত শ্রমিকের যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিধান ছিল না।[৮৯]

---

৮৭. গাজী শামছুর রহমান 'শ্রম ও শিল্প আইন" আলিপুর প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, পৃ.২১১

৮৮. মোহাম্মদ ফারুক খান, "শ্রম ও শিল্প আইন" ডাইনামিক পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০২, পৃ. ২৬২

৮৯. A Rearche on "Globalization and recent economic debate: impact or the state of female garments workers of Bangladesh". Women's economic empowerment project: Bangladesh National Women Lawyers Association Support by the Asia foundation Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান শ্রম আইন :

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (Bangladesh Labour Law 2006) দেশে প্রচলিত সকল শ্রম আইন পর্যালোচনা পূর্বক এক যুগোপযোগী শ্রম আইন প্রণয়নের লক্ষে ১৯৯২ সালে গঠিত 'শ্রম আইন কমিশন' ৪৪টি শ্রম আইন পর্যালোচনা করে ২৭টি শ্রম সম্পর্কিত আইন রহিতকরণ সাপেক্ষে 'খসড়া লেবার কোড ১৯৯৪' সরকারের কাছে দাখিল করে। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে 'শ্রম আইন পুনর্বিন্যাস কমিটি' গঠন করে ৩৯টি সংশোধনী প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করে 'খসড়া শ্রম আইন ২০০১' তৈরি করা হয়। শ্রমিক নিয়োগ, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক, সর্বনিম্ন মজুরির হার নির্ধারণ, মজুরি, পরিশোধ, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, শিল্পবিরোধ উত্থাপন ও নিষ্পত্তি, শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কল্যাণ ও চাকরির অবস্থা ও পরিবেশ এবং শিক্ষাধীনতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে সকল আইনের সংশোধন করে একটি আইন করার জন্য এই খসড়া আইন তৈরি করা হয়।[৯০]

অবশেষে ২০০৬ সালের ১১ই অক্টোবর ২৭টি পৃথক আইনকে সমন্বয় করে সরকার 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬' পাস করেন। এই শ্রম আইনে শ্রমিকের চাকুরির শর্ত, শ্রমিকের শ্রেণী বিভাগ ও শিক্ষানবিশ কাল, নিয়োগপত্র, সার্ভিস বই, ছুটির পদ্ধতি, কাজ বন্ধ রাখা, প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা, মৃত্যুজনিত সুবিধা, শাস্তি পদ্ধতি, নিম্নতম মজুরী বোর্ডসহ ৩৫৪টি ধারা বিধিবদ্ধ হয়েছে। মোট ২১টি অধ্যায়ে এই ধারাগুলোকে সংযোজন করা হয়েছে। এই আইনের মাধ্যমে শ্রমিক মালিক সম্পর্কের উন্নতি সহজ হবে। কারখানায় দুর্ঘটনা ক্ষেত্রে শ্রমিকরা যথাযথ ক্ষতিপূরণ পাবে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আসবে।

কারখানার শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে বিধানসমূহ :

বাংলাদেশ শ্রম আইনে শ্রমিকের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে। এই আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৬১ ধারা থেকে ৭৮ ধারা পর্যন্ত কারখানার শ্রমিকদের নিরাপত্তামূলক বিধানসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এসকল বিধান পূর্ববর্তী শ্রম আইন অর্থাৎ ১৯৬৫ সালের কারখানা আইনের চতুর্থ অধ্যায়ের ২২ ধারা থেকে ৪২ ধারা এবং ১৯৭৯ সালের কারখানা বিধিমালার ৩৭ বিধি থেকে ৫৩ বিধিসমূহের সমন্বয়ে বিধিবদ্ধ হয়েছে। নিরাপত্তামূলক এসব বিধান কারখানা কর্তৃপক্ষের অবশ্য পালনীয়। এর কোন বিধান ভঙ্গ করা হলে বা পালন করা না হলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

ধারা ৬২: অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে সর্তকতা অবলম্বন (Precaution incase of fire):

১. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে বিধি ধারা নির্ধারিতভাবে অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রত্যেক তলার সাথে সংযোগ রক্ষাকারী অন্তত একটি বিকল্প সিঁড়িসহ বর্হিগমনের উপায় এবং অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. যদি কারখানা পরিদর্শক প্রত্যক্ষ করেন যে, কোন কারখানায় ১ উপ ধারা অনুযায়ী কার্যকর বহির্গমনের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়নি সেক্ষেত্রে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পন্থায় উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কারখানার ম্যানেজারকে লিখিত নির্দেশ প্রদান করতে পারেন।

৩. নিরাপত্তামূলক বিধানানুযায়ী প্রতিটি কারখানার কোনো ঘর থেকে বের হওয়ার দরজা তালাবদ্ধ বা শক্ত করে আটকানো যাবে না, যাতে কোন ঘরের মধ্যে কোন লোক থাকা পর্যন্ত দরজা যেন সহজে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে খোলা যায়। এসব দরজা স্লাইডিং ধরণের না হলে প্রত্যেক দরজা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে বাইরের দিকে খোলা যায় এবং দুটি

---

৯০. দৈনিক আমার দেশ পত্রিকা, ২৯/০৬/২০০৬, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

কামরার মধ্যবর্তী স্থানে হলে সে দরজা কাছাকাছি বের হওয়ার রাস্তার নিকটবর্তী জায়গা তৈরি করতে হবে এবং ঘরের কোনো দরজা ভিতরে কাজ চলার সময় তালাবদ্ধ করে রাখা যাবে না বা কোন প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারবে না।

৪. প্রত্যেক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের সময় শ্রমিক সহজে বের হতে পারে এমন জানালা-দরজা বা অন্য কোনো বর্হিগমন পথে অধিকাংশ শ্রমিকের বোধগম্য ভাষায় লাল কালিতে বড়ো আকারে লিখিত নিশানা বা অন্য কোনো বোধগম্য সঙ্কেত টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে।

৫. প্রত্যেক কারখানায় নিযুক্ত প্রতিটি শ্রমিকের অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে কার্যকর এবং সহজে গ্রহণযোগ্য উপায়ে হুশিঁয়ারি সঙ্কেত দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬. অগ্নিকাণ্ডের সময় গৃহীত উপায়সমূহ প্রত্যেক ঘরের শ্রমিকগণ যাতে ব্যবহার করতে পারেন সেজন্য একটি উপযুক্ত বর্হিগমনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭. যেসব কারখানায় নীচতলা ছাড়া অন্য কোন তলায় সাধারণত ১০ বা ততোধিক শ্রমিক কাজ করেন অথবা যেখানে বিস্ফোরক বা সহজ-দাহ্য পদার্থ ব্যবহৃত বা জমা করে রাখা হয় তার প্রত্যেকটিতে আগুন লাগলে আত্মরক্ষা বা পালানোর ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রমিকদের অবহিত করতে হবে বা অনুরূপ সময় আত্মরক্ষা সংক্রান্ত নিয়মিত পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮. পঞ্চাশ বা ততোধিক/কর্মচারী সম্বলিত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর অন্তত একবার অগ্নিনির্বাপক মহড়ার আয়োজন করতে হবে এবং এই বিষয়ে মালিক কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় একটি রেকর্ডবুক সংরক্ষণ করতে হবে।

এছাড়া এই আইনে বিপদজনক যন্ত্রে নিয়োগ এবং বিপদজনক গ্যাস, বিস্ফোরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে নিরাপত্তামূলক বিধান উল্লেখ আছে।

ধারা ৭৭: বিপদজনক ধোঁয়ার বিরুদ্ধে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (Precautions against dangerous fumes):

কোন কারখানার যেসকল ঘর, চৌবাচ্চা, জলাধারা, পাইপ, গর্ত বা অনুরূপ কোন স্থান হতে বিপদজনক ধোঁয়া নির্গত হয় সেখানে সুড়ঙ্গ পথ বা অনুরূপ কোন পথে তা নির্গমনের বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে অথবা উপযুক্ত ম্যানহোল সংযোজিত না থাকলে সেখানে কোন শ্রমিককে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট কারখানার অধিকাংশ শ্রমিককে উক্ত সরঞ্জামাদি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

ধারা ৭৮: বিস্ফোরক ও দাহ্য ধুলা গ্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে বিধান (Explosive or inflam mable dust, gas, etc.)

কোন কারখানায় বিশেষ ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হওয়ার কারণে যদি এমন ধরনের ধুলা বা গ্যাসের সৃষ্টি হয় যাতে আগুনের স্পর্শে সহজেই বিস্ফোরণ ঘটতে পারে সেক্ষেত্রে তা পরিহারের জন্য নিম্নোক্ত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

(১) উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত সকল যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ কার্যকরভাবে ঘেরা দিতে হবে;

(২) উৎপাদন প্রক্রিয়া হতে উৎক্ষিপ্ত ধুলা, গ্যাস ও ধোঁয়া অপসারণের কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে;

(৩) আগুনের স্পর্শে যাতে না আসতে পারে সেজন্য যাবতীয় উপায় বন্ধ ও প্রয়োজনীয় ঘেরা দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা বিষয়ে অতিরিক্ত একটি বিশেষ বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। এই আইনের সপ্তম অধ্যায়ে ৭৯ ধারা থেকে ৮৭ ধারা পর্যন্ত এসব বিধান বর্ণিত হয়েছে। এসকল বিধানে বিপজ্জনক চালনা, দুর্ঘটনা সম্পর্কে নোটিশ প্রদান, দুঘর্টনা বা ব্যাধি সম্পর্কে তদন্ত, কতিপয় বিপদের ক্ষেত্রে পরিদর্শকের ক্ষমতা, বিপদজ্জনক ভবন এবং যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ধারা ৭৯: বিপজ্জনক চালনা (Dangerous operations):

যে ক্ষেত্রে সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মরত কোন ব্যক্তির মারাত্মক শারীরিক জখম বা ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে সরকার বিধি দ্বারা উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে লিখিত বিধান প্রণয়ন করতে পারবে, যথা–

(ক) কোন কোন পরিচালনা ঝুঁকিপূর্ণ তা ঘোষণা করা;

(খ) মহিলা কিশোর ও শিশুদের উক্ত কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা;

(গ) উক্ত কাজে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তির নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং যারা উপযুক্ত বলে প্রত্যায়িত হয়নি এরকম ব্যক্তির নিয়োগ নিষিদ্ধ করা;

(ঘ) উক্ত কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের বা আশেপাশে কর্মরত ব্যক্তিগণের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা এবং কর্ম পরিচালনার ব্যাপারে বিশেষ কোন বস্তু বা পন্থা ব্যবহার করা;

(ঙ) ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ সম্পর্কে নোটিশ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা।

ধারা-৮০: দুর্ঘটনা সম্পর্কে নোটিশ প্রদান (Notice to be given of accidents)

কোন কারখানায় বিস্ফোরণ, অগ্নিকাণ্ড, গৃহ ধসে যাওয়া বা যন্ত্রপাতিতে গুরুতর দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে এবং তাতে কেউ ব্যক্তিগতভাবে আহত হোক বা না হোক, কারখানার ব্যবস্থাপক এ ধরনের দুর্ঘটনার সংবাদ পরবর্তী দুই কর্মদিবসের মধ্যে তৎসম্পর্কে নোটিশ মারফত অবহিত করবেন।

দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে:

২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইনের দ্বাদশ অধ্যায়ে ১৫০ ধারা থেকে ১৭৪ ধারা পর্যন্ত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ বিষয়ে বিভিন্ন বিধান বর্ণিত হয়েছে। ১৯২৩ সনের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের ৩ ধারা থেকে ১৭ ধারা, ১৯ ধারা, ২১ ও ২২ ধারা এবং ২৮ ধারা থেকে ৩০ ধারাসমূহ এই শ্রম আইনের এ অধ্যায়ে সমন্বয় করা হয়েছে।

ধারা-১৫৮: মারাত্মক দুর্ঘটনা সম্পর্কে মালিকের নিকট হতে বিবৃতি তলবের ক্ষমতা (Power to require from employers statements regarding fatal accidets):

যে ক্ষেত্রে যদি কোন শ্রম আদালত কোন সূত্র হতে এ খবর পায় যে কোন শ্রমিক তার চাকরি চলাকালে উদ্ভূত কোন দুর্ঘটনায় মারা গেছে সেক্ষেত্রে আদালত রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরিত নোটিশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের মালিককে নোটিশ জারীর ত্রিশ দিনের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে আদালতের নিকট একটি বিবৃতি পেশ করার জন্য নির্দেশ দিবে, যাতে শ্রমিকের মৃত্যুর কারণ ও তৎসম্পর্কিত পরিস্থিতি এবং মালিকের মতে উক্ত মৃত্যুর কারণে তিনি কোন ক্ষতিপূরণ জমা দিতে পারবেন কিনা সে সম্পর্কে বর্ণনা থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ১৫৯ : মারাত্মক দুর্ঘটনার রেকর্ড (Reports of fatal accident):

মালিক অথবা তার পক্ষে দুর্ঘটনায় মৃত্যু সম্পর্কে মৃত্যুর সাত দিনের মধ্যে মৃত্যুর কারণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বর্ণনা করে শ্রম আদালতে একটি রিপোর্ট পেশ করবেন।[৯১]

আন্তর্জাতিক আইনসমূহ:

আন্তর্জাতিক আইনে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বলতে শ্রমিকদের কেবল স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনাজনিত নিরাপত্তাকেই বুঝায় না বরং ব্যক্তিনিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তাকেও বুঝায়।

১৯৪৮ সনের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে বিভিন্ন ধারায় মানুষের নিরাপত্তার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। যেমন-

ধারা-৩: প্রত্যেকেরই জীবন ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। শ্রমিকের অধিকার মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার ২৩ অনুচ্ছেদে শ্রমিকের অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ধারা-২৩:

(ক) প্রত্যেকেরই কাজ করার, অবাধে চাকরি নির্বাচনের, কাজের জন্য ন্যায্য ও অনুকূল অবস্থা লাভের এবং বেকারত্ব থেকে মুক্ত হবার অধিকার রয়েছে।

(খ) প্রত্যেকেরই কোন বৈষম্য ব্যতিরেকে সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

(গ) প্রত্যেক কর্মীর তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম যেন ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক এবং প্রয়োজনবোধে সে সংগে সামাজিক সংরক্ষণের জন্য সংযোজিত ব্যবস্থাদি লাভের অধিকার রয়েছে।

(ঘ) প্রত্যেকেরই নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা: (আই.এল.ও) (International Labour Orgaizations, ILO) আই.এল.ও এর সদস্য হতে হলে প্রত্যেকটি দেশকে প্রাথমিক শর্ত হিসেবে অন্তত দুটি কনভেনশন অবশ্যই অনুমোদন করতে হবে তা হলো কনভেনশন ৮৭ এবং ৯৮।

আইএলও কনভেশন ৮৭: সংগঠন করার অধিকার ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার।

আই এল.ও. কনভেনশন ৯৮: সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা এবং সংগঠন করার অধিকার।

বাংলাদেশ উল্লেখিত দুটি কনভেনশনসহ ৩১টি আইএলও কনভেনশন অনুমোদন করেছে। আই.এল.ও কনভেনশনের C-155 এবং C-161 কনভেনশন দুটিতে যথাক্রমে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে বলা হয়েছে কিন্তু এ দুটি কনভেনশন বাংলাদেশে এখনও অনুমোদন করা হয়নি। বর্তমান বিভিন্ন জাতীয় আইন ও বিধির বাস্তবায়নের জন্য এই দুটি আই.এল.ও কনভেনশন গ্রহণ করা ভীষণ জরুরী। কারণ শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে দেশের বিদ্যমান আইন ও বিধির দ্বারা পরিদর্শন সম্ভব। কিন্তু মনিটরিংয়ের মাধ্যমে এসব বিষয়ে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন আই.এল.ও কনভেনশন দুটি অত্যাবশ্যক। শ্রমিকের মানবাধিকার সংরক্ষিত হলে তাদের নিরাপত্তাবোধ বৃদ্ধি পাবে এবং সাথে সাথে শ্রমিক-মালিক সৌহার্দ বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অবশ্যই অর্জিত হবে।[৯২]

---

৯১. এন.এ.এম. জসিম উদ্দিন 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং প্রাসাঙ্গিক শ্রম আইন সমূহ' সেন্ট্রাল ল বুক হাউজ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৭, পৃ. ১৯৪, ১৯৭, ২৪৯

৯২. Dr. Burhan Uddin Khan, "The ILO Convention on Forced labour: A legal review of its impact and implications in Bangladesh", Journal of the faculty of law, Vol. 14 (1), June, 2003, PP. 38, 39

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিকদের স্বার্থে শ্রম আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবতা শ্রম আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাস্তবতা:

শ্রম আইনের কারখানা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের বিধানসমূহ বাংলাদেশের অধিকাংশ গার্মেন্টস কারখানায় যথাযথভাবে প্রয়োগ দেখা যায় না। বিগত কয়েক বছরে গার্মেন্টস কারখানায় যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, সেখানে উপরোক্ত আইনগুলো পুরোপুরি কার্যকর থাকলে নিঃসন্দেহে দুর্ঘটনা সহজে এড়ানো সম্ভব হতো এবং প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও অনেক কম হতো। দুর্ঘটনা পরবর্তী পরিদর্শনকালে এবং বিভিন্ন জরিপ থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে দুর্ঘটনা কবলিত গার্মেন্টস কারখানাগুলো প্রচলিত আইনের বিধান উপেক্ষা করে অপ্রশস্ত গলির ভিতরে আবাসিক বাড়িগুলোতে গার্মেন্টস কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এ সমস্ত সংকীর্ণ গলির মধ্যে স্থাপিত গার্মেন্টস কারখানাতে অগ্নি দুর্ঘটনায় ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি প্রবেশ করতে পারেনা। এছাড়া অধিকাংশ গার্মেন্টস কারখানাতে যতোক্ষণ কাজ চলে ততোক্ষন কারখানা বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। আমাদের দেশের শিল্প উদ্যোক্তারা এভাবেই বিদ্যমান আইনগুলো ভঙ্গ করে চলেছেন। ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন যথাযথভাবে কার্যকর হলে এ সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর হতে পারে।

কারখানা আইন মোতাবেক প্রধান পরিদর্শক ও পরিদর্শকের দায়িত্বের ক্ষেত্রে বাস্তবতা:

বর্তমান কারখানা আইনে বর্ণিত নীতিমালা মালিকপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা তত্ত্বাবধানের একমাত্র দায়িত্ব চীফ্ ইন্সপেক্টরদের। আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে অভিযোগসমূহ একমাত্র ইন্সপেক্টরগণ নিষ্পত্তি করে থাকেন। কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনায় তাদের সংখ্যাল্পতার কারণে অনেক সময় তত্ত্বাবধানের কাজ বিঘ্নিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে ইন্সপেক্টরগণ ব্যতিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কারখানা আইনের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অভিযোগ নিরসনের বিধান না থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদেরকে আইনের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অভিযোগ নিসরনের বিধান না থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদেরকে আইনের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অভিযোগ নিয়ে বারবার ইন্সপেক্টরদের শরণাপন্ন হতে হয়। দি ডেইলী স্টারের এক রিপোর্টে বলা হয়-৫০ হাজার রেজিস্ট্রার্ড গার্মেন্টস কারখানা মনিটরিংয়ের জন্য মাত্র ২০ জন ইন্সপেক্টর কাজ করছেন। শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বিভাগের ৫ হাজার কারখানার জন্য পরিদর্শন বিভাগে ১২টি পরিদর্শক পদ বরাদ্দ আছে কিন্তু ৫টি পদ দীর্ঘদিন যাবত শূন্য পড়ে আছে। কিন্তু ইন্সপেক্টরদের সংখ্যাল্পতার কারণেই হোক বা তাদের কাজে নির্লিপ্ততার জন্য বা সংহতির অভাবেই হোক শ্রমিকেরা এ জাতীয় অভিযোগ নিয়ে ইন্সপেক্টরদের শরণাপন্ন হতে নিরুৎসাহিত বোধ করে। সেজন্য এ জাতীয় অভিযোগ শ্রম আদালতের এখতিয়ার ভুক্ত করলে অথবা পৃথক সেল গঠন করে দ্রুত তদন্ত ও বিচার নিস্পত্তির ব্যবস্থা করলে উক্ত আইনের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বাস্তবতা:

০৪/০৩/২০০৬ তারিখের দিক ডেইলি স্টারের 'অধিকার' নামক সংস্থার এক রিপোর্টে বলা হয় গার্মেন্টসের দুর্ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের অভিযোগ দায়েরের জন্য বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হতে হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে মৃত্যুর সার্টিফিকেট, ওয়ারিশ সার্টিফিকেট, ওয়ার্ড কমিশনার অথবা গ্রামের চেয়ারম্যান থেকে একটি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে অভিযোগ দায়ের করতে হয়। নিঃসন্দেহে গরীব কর্মজীবী মানুষদের পক্ষে এ সকল কাগজপত্র যোগাড় করা মোটেও সহজ বিষয় নয়। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই চরম প্রতিকূলতার মধ্যে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সপক্ষে সকল কাগজপত্র সংগ্রহ করে থাকে।[৯৩]

---

৯৩. Alok Sarker "Strict enforcement of law can contain garment dis-asters" The Daily Star" Law & our rights", 4 March 2006, P. 22

Dhaka University Institutional Repository

২৩/০২/২০০৬ তারিখের চট্টগ্রামে কে.টি.এস কারখানাতে সংঘটিত অগ্নি দুর্ঘটনায় যে ৬৫ জন শ্রমিক নিহত হয়েছিল তাদের মধ্যে ৩৫ জন শ্রমিক এমনভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল যে তাদের আর সনাক্ত করা যায়নি। প্রত্যেক শ্রমিকের সনাক্ত করার উপায় থাকা জরুরী। তা না হলে তাদের পরিবার যথাযথ ক্ষতিপূরণ পাবে না। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রমিকরা কাজ করতে আসে ফলে দুর্ঘটনার সাথে লাশ সনাক্ত করা তাদের আত্মীয়ের জন্য কঠিন হয়ে যায়। বাস্তবে দেখা যায় এই সমস্ত শ্রমিকদের বাড়িতে সংবাদপত্র বা প্রাইভেট টিভি চ্যানেল থাকে না। অগ্নিদগ্ধ শ্রমিকদের সনাক্ত করার জন্য মালিক পক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[৯৪] তবে ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইনে শ্রমিকদের নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, সার্ভিস বই, শ্রমিক রেজিস্ট্রার্ড ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিককে সনাক্ত করা সহজ হবে।

১১/০৪/২০০৫ তারিখে সংঘটিত স্পেকট্রা গার্মেন্টসের ৯ তলা ভবন ধসে দুর্ঘটনায় ৪০০ এর বেশি শ্রমিকের মৃত্যু হয় এবং আহত হয় ৩০০ এর বেশি শ্রমিক। যদিও এটি অগ্নি দুর্ঘটনা নয় তবে এই ধরনের ভবন ধ্বসে দুর্ঘটনায় একসাথে এত শ্রমিকের মৃত্যু বাংলাদেশে প্রথম। মালিকপক্ষ ভবন ধসের দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে কনট্রাকটরদের উপর বর্তালেও মালিক পক্ষকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বিচার কার্যক্রম চলছে।[৯৫]

গার্মেন্টস শিল্পের দুর্ঘটনা প্রতিরোধের কতিপয় প্রস্তাবনা:

গার্মেন্টস কারখানায় অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে মালিক পক্ষকে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে আরো সচেতন হতে হবে:

* কারখানায় বিপদসংকেত প্রদানের জন্য যথাযথভাবে বিপদসংকেত যন্ত্র স্থাপন করা। যেসব কারখানায় উক্ত যন্ত্র স্থাপিত আছে সেগুলো অবশ্যই সচল রাখা।

* কারখানায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা, সেগুলো নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করে কার্যকর রাখা এবং ঐগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে সকল শ্রমিককে অথবা দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা নেয়া।

* কারখানায় বিদ্যুৎ/গ্যাস লাইন ও ফিটিংসমূহ নিয়মিত পরীক্ষা করে ত্রুটিমুক্ত রাখা এবং সে বিষয়ে শ্রমিকদের অবগত করা।

* কারখানায় বিকল্প সিঁড়ি বা জরুরী নির্গমন পথের ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে ভবনের মালিকদের সাথে আলাপ-আলোচনা করা যেতে পারে।

* শ্রমিকদের আপদকালীন সময়ে বের হওয়ার মহড়া দেয়ার ব্যবস্থা রাখা।

* কারখানার প্রতি ফ্লোরে হাঁটাচলার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রাখা এবং ফ্লোরকে কোন অবস্থাতেই মালামাল রাখার স্টোর হিসেবে ব্যবহার না করা।

* কারখানার মেইন গেইট প্রশস্ত করে তৈরি করা যাতে সহজেই দুর্ঘটনার সময় একসাথে অনেক শ্রমিক বের হতে পারে। সিঁড়ি/বিকল্প সিঁড়ি বা জরুরী নির্গমন পথে কোন অবস্থাতেই মালামাল না রাখা যাতে সহজেই শ্রমিকরা যাতায়াত করতে পারে।

---

৯৪. Annie, Nasrin Siraj "Working dying in Garment factories: Some questions" Magazin of Meghbarta 14 March, 2006

৯৫. Salauddin, Sheikh "Collapse of Spectrum Sweateer Industries" The Daily Star "Law & our rights", June 6, 2006, P. 23

Dhaka University Institutional Repository

* জরুরী অবস্থায় কারখানায় বিপদসংকেত বাজানোর সাথে সাথে বর্হিগমনের জন্য ব্যবহৃত সিঁড়ি/বিকল্প সিঁড়ি, জরুরী নির্গমন পথের গেট উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা। এই সম্পর্কে কার্যরত নিরাপত্তা প্রহরীদেরকে স্থায়ী নির্দেশ প্রদান করা।

* কারখানার প্রতিটি সিঁড়িতে বিকল্প বাতির ব্যবস্থা করা। আপদকালীন সময়ে বের হওয়ার পথ ও সিঁড়িতে ব্যাটারি চালিত জরুরী বাতির ব্যবস্থা রাখা।

* সকল কারখানায় প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা সংরক্ষিত রাখা।

* ধুমপানের জন্য ঢাকনাসহ পিকদানী স্থাপন করা এবং ধুমপানে নিরুৎসাহিত করা।

* অল্প সময়ের মধ্যে যাতে কারখানা থেকে শ্রমিকগণ বের হতে পারে সে বিষয়ে মহড়ার/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

* দুর্ঘটনা পরবর্তী অনুসন্ধান ও প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা।

* আগুন নেভানোর জন্য ফায়ার হুক, গ্যাস মাস্ক, পানির ড্রাম, বালতি, হ্যান্ড গ্লাভস ইত্যাদি সংরক্ষণ করা।

অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধে শ্রমিকদের করণীয় কিছু প্রস্তাবনা:

* অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে শ্রমিকদের মধ্যে পোষ্টার, লিফলেট, প্রচার এবং সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

* শ্রমিকদের নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ক আইন জানাতে হবে।

* কারখানার নিয়ম নীতি মেনে চলতে হবে।

* কারখানায় ধুমপান ও রান্না বন্ধ করতে হবে।

* শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য শ্রমিকদের সংগঠিত হতে হবে।

দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সরকারের করণীয় কিছু প্রস্তাবনা:

* কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশের কারখানা আইনসহ প্রচলিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন বাস্তবায়নের মালিক পক্ষকে বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

* গার্মেন্টস শিল্পে যেন দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং এ ধরনের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকরা যাতে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা নেয়া।

* গার্মেন্টস কারখানাসমূহ ঢাকা মহানগরীর বাইরের স্থানান্তরের জন্য পৃথক পোশাক শিল্প পল্লী তৈরি করা। এতে পরিবেশ দূষণ রোধ ও যানজট কিছুটা হ্রাস পাবে।

* গার্মেন্টস মালিকরা যাতে শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক যৌথ বীমার ব্যবস্থা করেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

* গার্মেন্টস কারখানায় নিরাপদ বৈদ্যুতিক লাইন, চওড়া ও চলাচলযোগ্য সিঁড়ি, জরুরী বিকল্প সিঁড়ি, কার্যকর অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা, জরুরি পরিস্থিতিতে বাজানোর জন্য এলার্মের ব্যবস্থা, অগ্নিকাণ্ড হলে যাতে শ্রমিকরা নিরাপদে দ্রুত বেরিয়ে আসতে পারে সে জন্য নিয়মিত মহড়ার ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখা।

* কারখানায় আগুন নিভানো ও উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ফায়ার ব্রিগেড, হেলিকপ্টার সংরক্ষিত রাখা।

* কলকারখানার মালিক ও শ্রমিক নেতৃবর্গকে মানবাধিকার, সংবিধান ও শ্রমিকদের নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।[৯৬]

---

৯৬. আকরাম হোসেন চৌধুরী, "কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সরকার মালিক, শ্রমিক, আই.এলও এবং এনজিওদের করণীয়" একটি সেমিনার পেপার, বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, ঢাকা ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা ও বিধান:

ইসলামী আইন মানব জীবন ও মানব দেহের নিরাপদ হেফাজতের প্রতি অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে তার এই নিরাপত্তার বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সে বেকার না থেকে কর্মে নিয়োজিত হয়ে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ বাস্তবায়ন করছে। 'নামায সমাপ্ত হলে পর তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ'র অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধান করো এবং আল্লাহকে পর্যাপ্ত স্মরণ করে, যাতে তোমরা সাফল্য মন্ডিত হতে পারো।[৯৭] ইসলামী আইনে মানুষের যেরূপ উচ্চমর্যাদা রয়েছে অদ্রুপ তার শ্রমেরও অত্যধিক মর্যাদাও স্বীকৃত। মহানবী (স.) বলেন, 'মানুষের নিজ শ্রমে উপার্জিত আহার্য সামগ্রী তার জন্য সর্বোত্তম, তৃপ্তি দায়ক ও পবিত্র।[৯৮]

ইসলাম মালিক-শ্রমিক পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্কের জন্য মালিকদের উপর যেমন বিভিন্ন দায়িত্ব কর্তব্য ও বিধিনিষেধ আরোপ করেছে ঠিক সেভাবে শ্রমিকদের উপরও বিভিন্ন দায়িত্ব কর্তব্য আরোপ করেছে। একজন শ্রমিমকে কতটুকু সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে দেশের এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংগতির উপর। শ্রমিককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক এবং তা যথাসময়ে পরিশোধ করার জন্য রসূলুল্লাহ (স.) তাকিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'শ্রমিকদের দেহের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তোমরা তার পারিশ্রমিক দাও।'[৯৯]

শ্রমিকরা সুযোগ-সুবিধা প্রদান সম্পর্কে মহানবী (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের (সরকারি) কর্মচারী নিয়োজিত হবে তার স্ত্রী, বাসগৃহ ও বাহন না থাকলে আমরা তার ব্যবস্থা করবো।'[১০০] শ্রমিক নিয়োগ করে তার পারিশ্রমিক প্রদানে গড়িমসি করা বা তাকে ঠকানো মারাত্মক অন্যায়। মহানবী (স.) বলেন, 'সচ্ছল ব্যক্তির পাওনা পরিশোধে টালবাহানা করা জুলুম'।[১০১] মহানবী (স.) আরও বলেন, মহান আল্লাহতাআলা বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারী হব, তার মধ্যে একজন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে শ্রমিক নিয়োগ করল এবং তার নিকট থেকে সম্পূর্ণরূপে কাজ আদায় করল কিন্তু তার পূর্ণ পারিশ্রমিক পরিশোধ করলো না।[১০২]

শ্রমিকের দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ বিষয়ে ইসলামী আইনে সুস্পষ্ট মূলনীতি ও আইনের কয়েকটি অধ্যায় রয়েছে। তবে এই অধ্যায়গুলোর বিধান আজকের পাশ্চাত্য আইনের মত সুবিন্যস্ত নয়। কারণ শিল্প বিপ্লবের পর থেকে ইসলামী আইনে এসব অধ্যায় সম্পর্কে তেমন কোন গবেষণা হয়নি। শ্রমিকদের আহত বা নিহত হওয়া জনিত ক্ষতিপূরণ করার জন্য কিসাস অধ্যায়ের অধীন 'দিয়ত' 'আকিলা'-এর অধীন ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলামী আইনে কোন শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় দৈহিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে 'আকিলা' নীতির আওতায় স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী সমিতি ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্ব বহন করবে। ক্ষতিপূরণ প্রদানের সর্বশেষ সংস্থা হল দেশের সরকার। এ বিষয়ে বর্তমান আইন ব্যবস্থাকে সামনে রেখে ইসলামী আইনের গবেষণা হওয়া দরকার এবং প্রতিটি অধ্যায়ের বিধিবদ্ধ আকারে আইনের কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন।

---

৯৭. সূরা আল-জুমআ, আয়াত নং-১০

৯৮. ইবনে মাজা, তিজারাত, বাব ১, নং ২১৩৭; বুখারী বুয়ু, বাব ১০; তিরমিযী, আহকাম, বা ২২, নাসাঈ, বুয়ু, বাব ১ (আরও বহু স্থানে)

৯৯. ইবনে মাজা, আশুয়াবুর রাহন, বাব ৪, নং ২৪৪৩

১০০. আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ, বাব ৯, নং ২৯৪৫। অপর হাদীসে বাহনেরও উল্লেখ আছে।

১০১. বুখারী হাওয়াত, বাব ১ ও ২, নং ২২৮৭ ও ২২৮৮, আরও দ্র. মুসলিম (মুসকাত), আবু দাউদ (বুয়ূ), তিরমিযী (ঐ), নাসাঈ (ঐ), ইবনে মাজা (সাদাকাত)

১০২. বুখারী, কিতাবুল ইজারা, বাবা ১০ নং ২২৭০, আরও দ্র. কিতাবুল বুয়ু, বাব ১০৬ নং ২২৭

Dhaka University Institutional Repository

সর্বশেষে বলা যায় গার্মেন্টস শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। এ শিল্পকে জাতীয় প্রয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা জরুরী। একটি প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মচারীকে প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি বিধিমালা মেনে চলা আবশ্যক।

গার্মেন্টস কারখানায় মালিকপক্ষ মূলধন বিনিয়োগ করে থাকেন। ব্যবসায় ব্যবসায়িক সুনাম, পণ্যের যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণ ও সময়মতো মালামাল শীপমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে উৎপাদনে সম্পৃক্ত সকলকে মনোযোগী হতে ও সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। সমাজে একজনের কর্তব্যই অন্যজনের অধিকার নিশ্চিত করে। এক্ষেত্রে শ্রমিকের কর্তব্য হচ্ছে, সঠিক শ্রম প্রদানের মাধ্যমে কারখানার উৎপাদন লক্ষমাত্রা অর্জন করা অর্থাৎ মালিকের অধিকারকে নিশ্চিত করা। অন্যদিকে মালিকের কর্তব্য হচ্ছে শ্রমিকের সকল প্রকার নিরাপত্তা বিধানসহ তাদের ন্যায্য মজুরী ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা যা শ্রমিকের অধিকার তথা মানবাধিকার হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। কারখানায় মানবাধিকার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল শ্রমিকের নিরাপত্তা ও উৎপাদনের লক্ষমাত্রা অর্জন সম্ভব।[১০৩]

এছাড়া দুর্ঘটনাজনিত কারণে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ পাওয়া একটি স্বীকৃত মানবাধিকার। আমাদের বাংলাদেশের সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হবে মেহনতি মানুষকে কৃষক ও শ্রমিকের এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তিদান করা।' অতএব শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব সরকারেরও।[১০৪] বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত একটি দেশে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরকার, মালিক ও শ্রমিক এ তিন পক্ষের সমন্বিত ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় উন্নয়ন তাদের এ সমন্বিত প্রচেষ্টার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পাশাপাশি ইসলামের আদর্শে শ্রমের যথাযথ মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সকল মানুষের মধ্যে পূর্ণ সাম্য ও সমতা বজায় রাখতে হবে। তাবেই দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এ শিল্প আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

---

১০৩. Dr. Pratima Paul-Majumder, "Social Security Challenges in the Manufacturing Sector: A Gender Perspective: Human rights in Bangladesh 2004, Published by Ain O Salish Kendra (ASK), Dhaka First Published 2005, PP. 174, 176

১০৪. Farmin Islam, "Development of State Policy and labour legislation in Bangladesh : Implications for women in Industrial Employment", A Journal of women for women, Vol-7, 2000, Dhaka. P. 86

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ও সুপারিশমালা

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ও সুপারিশমালা:

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় ২৫ বছরের ক্রমাগত বৈষম্য,বঞ্চনা,উপেক্ষা,অবকাঠামোগত স্থবিরতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের অব্যাহত আঘাত নিয়ে ১৯৭১ সালে যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত, দারিদ্র্যপীড়িত, অনুন্নত ও প্রাকৃতিক সম্পদহীন এক স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছিল। সেই পটভূমিতে ৪০ বছর পর বাংলাদেশের অর্জন ও বর্তমান অবস্থান যেকোন নিরিখে বিস্ময়কর বলা যেতে পারে। হেনরি কিসিন্‌জারের সেই কুখ্যাত উক্তির 'তলাবিহীন ঝুড়ি' আজ বিশ্ব ব্যাংক কতৃক এশিয়ার উজ্জ্বলতম নক্ষত্র (বিশ্বব্যাংক জেন্ডার উন্নয়ন সিরিজ, ২০০৮) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশের সাধারন খেটে খাওয়া মানুষের নিরন্তর পরিশ্রম-প্রবণতা ও দারিদ্র্যকে জয় করার প্রত্যয় এবং সেই সঙ্গে সরকারের বহুমুখী ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণে বিশেষত বিংশ শতাব্দির নবক্ষইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশ আশাপ্রদ প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলে। মাথাপিছু এত নিম্ন আয়ের দেশ হয়েও প্রায় দুই দশক ধরে গড়ে ৫ থেকে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা বাংলাদেশের জন্য ছিল এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে বিশ্ব দরবারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বাংলাদেশের এই রূপান্তরের মূল শক্তি হিসেবে নারীর ভূমিকা যা সমমানের যেকোন উন্নয়নশীল দেশের জন্য হয়ে উঠে এক চমকপ্রদ উদাহরণ।

আমাদের উন্নয়ন নীতিতে বিভিন্ন নারীবান্ধব নীতি ও কৌশল সংশোধিত হওয়ায় নারীরা পুরুষের তুলনায় অধিক আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের সঙ্গে ভাগ্য পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়,যা দেড় দশক সময়ের মধ্যে একটি দরিদ্রতম দেশকে দক্ষিণ এশিয়ার উজ্জ্বল নক্ষত্রের সুনাম এনে দিয়েছে।

বাংলাদেশের নারীর নিরলস সংগ্রাম শুধু পরিবারের গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি ,ন্যূনতম সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সদৃঢ় প্রত্যয়ে আমাদের নারীরা নবতর উত্তরণের পথে এগিয়েছে। কঠোর পরিশ্রমও নিরলস সংগ্রামের মাধ্যমে নিজের কর্মক্ষেত্রের প্রসার ঘটিয়েছে।

নিংসন্দেহে বলা যায় ,কঠোর পশ্রিমী,শৃংখলাবদ্ধ ও তুলনামূলকভাবে সস্তা শ্রমিক হিসেবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ও মূল শক্তি হিসেবে নারী শ্রমিকের অবদান উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, তিন দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে স্থবিরতা দেখা না দেওয়ার যে মূল কারণ ছিল রপ্তানি শিল্প খাতের স্থিতিশীলতা,যা সিংহভাগ নারীর শ্রম নির্ভর। গত বছর শুধু বস্ত্র শিল্প রপ্তানি খাত থেকে বালাদেশ প্রায় ১২.৫ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে।[১]

বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে দাঁড় করানোর জন্য রপ্তানিমুখী বস্ত্র খাত বিশেষ অবদান রেখেছে। তৈরী পোশাক এখন অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। বিগত কয়েক দশক থেকে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বড় উৎস এ খাত রপ্তানি আয়ে ৭৫ শতাংশ অবদান রেখে চলেছে। পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বাদশ। এ খাতে প্রায় ১.৮ মিলিয়ন শ্রমিক কর্মে নিয়োজিত,[২] যার বিশাল অংশ (প্রায় ৮০ শতাংশই)

---

১. প্রতিমা পাল মজুমদার, পোশাক শিল্পে নারী, পৃ-৩৩

২. প্রতিমা পাল মজুমদার,প্রাগুক্ত,পৃ-২৯

Dhaka University Institutional Repository

নারী।[৩] বেশির ভাগ নারীর বয়স ১৬ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। অবিবাহিত মেয়েরা এখানে কাজ করে বাবা মায়ের সংসার চালায়।

বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোর মধ্যে পোশাক শিল্পের অগ্রগতি দ্রুততম। ১৯৭৬-৭৭ সালে এক জার্মান রপ্তানিকারকের সহযোগে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে মাত্র গুটি কয়েক কারখানা দিয়ে রপ্তানি ক্ষেত্রে এই শিল্পের গোড়া পত্তন হয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই শিল্পের কারখানা সংখ্যা দাড়িয়েছে বেড়েই চলেছে। ১৯৮৩ সালে গার্মেন্টস কারখানা ছিল ৫০ টি, ২০০১ সালে ৩৪০০টি, ২০০৭ সালে ৪০০০টি এবং ১লা সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে এর সংখ্যা ৪৭০৬টি। তার মধ্যে ঢাকায় ৪০০৬টি এবং চট্টগ্রামে ৭০০টি।[৪] এই দ্রুত অগ্রগতির পেছনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, এবংঅর্থনৈতিক কারণ থাকলেও অন্যতম প্রধান কারণটি হচ্ছে বাংলাদেশে শ্রমের সস্তা ও সহজ প্রাপ্যতা। যেহেতু পোশাক শিল্প হচ্ছে একটি অতি শ্রমঘন শিল্প। এই শিল্পের উৎপাদন খরচের সিংহ ভাগ জুড়েই রয়েছে শ্রম খরচ। তাই যেখানে তুলনামূলকভাবে সস্তা শ্রম পাওয়া যাবে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই এই শিল্প গড়ে উঠার সম্ভাবনা থাকবে।

বস্তুতপক্ষে পোশাক শিল্পের গোড়াপত্তন ঘটেছিল উন্নত দেশসমূহেই। কিন্তু অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে সে দেশগুলোতে শ্রমের মূল্য বেড়ে যায় কয়েকগুণ। ফলে পোশাক শিল্প থেকে মুনাফার অংক যায় অনেক কমে। কিন্তু এই শিল্প থেকে মুনাফার অংকটি সংরক্ষিত করে রাখার জন্য উন্নত দেশগুলি তাদের উৎপাদন উপকরণ নিয়ে স্বল্পমূল্যের শ্রমবাজার খুঁজে বেড়াতে থাকে। তারা অতি সহজেই খুঁজে পায় এশিয়ার সিংগাপুর,তাইওয়ান, হংকং এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সস্তা শ্রম বাজার। বিশেষ করে শ্রমকে কেন্দ্র করেই সেখানে গড়ে উঠে পোশাক শিল্প । এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণের বেশির ভাগই আসতে থাকল অন্য দেশ থেকে। পরবর্তীতে একই কারণে এই চারটি দেশের সাথে পোশাক উৎপাদনে যোগ দেয় শ্রীলংকা,পাকিস্তান,ফিলিপাইন এবং ভারত। সস্তা শ্রমের কারণে এ দেশগুলিতে উৎপাদিত পোশাক সহজেই উন্নত দেশের বাজার দখল করে নেয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত দেশসমূহের পোশাক শিল্প দারুণভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কারণ উচ্চ মূল্য শ্রমের জন্য সেখানে উৎপাদন খরচ অনেক বেশি হওয়ায় তারা স্বল্প মূল্যের শ্রমের দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারছিলনা। এরই ফলশ্রুতিতে মূলত: অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে পোশাক আমদানির উপর কোটা আরোপিত হয়। সিঙ্গাপুর,তাইওয়ান,দক্ষিণ কোরিয়া,হংকং এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলি তখন তাদের উৎপাদন, রপ্তানি ও মুনাফা ঠিক রাখার জন্য আরও সস্তা শ্রম বাজার অন্বেষণ করে। যাতে এসব দেশ থেকে উপ-চুক্তির মাধ্যমে অল্প খরচে পোশাক তৈরী করিয়ে নিয়ে অন্যত্র রপ্তানি করা যায়।

বাংলাদেশের শ্রম বিশেষ করে নারী শ্রম অত্যন্ত সস্তা। তাই স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের শ্রম বাজার তাদেরকে আকর্ষণ করল। তারা উপ-চুক্তির প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এল। বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা ও সস্তা শ্রমের কারণেই এ প্রস্তাব লুফে নেয় এবং পুরোপুরি শ্রমের উপর নির্ভর করে গড়ে তোলে একটির পর একটি পোশাক কারখানা। অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন কাপড়,সুতা,বোতাম ইত্যাদি প্রায় সম্পূর্ণরূপে আসতে লাগল বিদেশ থেকে। ফলে পোশাক তৈরীতে বাংলাদেশের ভূমিকা হয়ে দাঁড়াল একজন দর্জির।

---

৩. প্রতিমা পাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ.-২৯

৪. প্রতিমা পাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যাচ্ছে একমাত্র শ্রমকে পুঁজি করেই বাংলাদেশে পোশাক শিল্প গড়ে উঠেছে। এবং শ্রমের সহজ ও সুলভ প্রাপ্ততার জন্যই এই শিল্পের এত দ্রুত গতিতে বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু বিকাশের তিন দশক পেরিয়ে গেলে ও শ্রম পরিস্থিতির তেমন কোন উন্নতি নেই। অথচ মালিকদের সমিতি BGMEA নিয়মিতই বলছে যে,রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ঘটছে। ১৯৮৫ সালে যেখানে এই শিল্পের অর্জন ছিল রপ্তানি আয়ের ১২.৪৪ শতাংশ[৫] আড়াই দশক পর চলতি অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধির হার ৪২ শতাংশ। নতুন ও পুরনো বাজারে বাংলাদেশের তৈরী পোশাকের বর্ধিত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে চলতি অর্থ বছরেই এ খাত থেকে ১২.৫ বিলিয়ন ডলার থেকে ১৮ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত রপ্তানি আয়ের স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ[৬]। খুবই স্বল্প বেতনে,সংগঠিত হওয়ার অধিকার না দিয়ে,শ্রম আইনের কাছে জবাবদিহি না করে এ খাতে নারী শ্রমিকদের কাজ করানো হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এদেরই সস্তা এবং অনুগত শ্রমের জন্য বাংলাদেশের পোশাক শিল্প আজ এতটা প্রসার লাভ করতে পেরেছে। অথচ এই সত্যটি অনুধাবিত হয়েছে অতি সামান্যই। যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পোশাক শিল্পে নিয়োজিত হাজার হাজার দুস্থ মহিলা শ্রমিক তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

তবে যুগ যুগ ধরে যে মহিলারা সমাজের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত তারা অতি স্বাভাবিকভাবেই কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন অধিকার হতে বঞ্চিত হবে। তারা যে নিজের অধিকার আদায় করে নেবে তার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। যেহেতু স্বল্প শিক্ষার কারণে তারা জানেই না যে শ্রম আইনের আওতাধীনে তাদের কি কি প্রাপ্য। ফলে তাদেরকে ন্যূনতম মজুরি এবং কারখানার অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

এরপর ও আছে জীবন এবং মান সম্মানের নিরাপত্তাহীনতা। গত কয়েক বছরের খবরের কাগজ ঘাটলে এমন অসংখ্য ঘটনার বিবরণ পাওয়া যাবে। যেমন "দুবৃত্তদের হামলায় ১৭ জন গার্মেন্টস শ্রমিক আহত"(দৈনিক সংগ্রাম ১৪/১২/৮৮)"২০ জন মহিলা গার্মেন্টস কর্মী দুবৃত্তদের হামলায় আহত"(দৈনিক বাংলা ৩০/১০/৮৯) Garments Workers gang-raped(Bangladesh Observer 18/01/88) সারাকা গার্মেন্টসে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ২৪ জন শ্রমিক নিহত (সংবাদ ২৯/১২/৯০)। এছাড়া ২০০৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের কেটিএস টেকসটাইলে ৫২ জন শ্রমিক নিহত হয়,যার মধ্যে ৪৭ জনই ছিল নারী। সংবাদ পত্রের ইত্যাদি শিরোনাম থেকে সহজেই পোশাক শ্রমিকদের জীবন ও মানের ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতার চিত্র ফুটে ওঠে।

এই ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতার বোঝা বয়ে পোশাক শ্রমিকরা কাজ করে চলেছে দিনের পর দিন,মাসের পর মাস এবং বছর। ব্যস্ত সময়টিতে(সেপ্টেম্বর -জানুয়ারী)তারা সপ্তাহের ৭ দিনই ১২-১৫ ঘন্টা কাজ করে। কোন দিন তারা সারা রাত কাজ করে এবং নাম মাত্র বিশ্রাম করে পরের দিনের কাজে যোগ দেয়। কিন্তু পশুর মত এত খেটেও তারা তাদের জীবন ধারনের নূনতম চাহিদা কতটা মেটাতে পেরেছে তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ। দারিদ্র্য লাঘবের আশায় তারা গ্রাম থেকে ছুটে এসেছে এবং এক দরিদ্র্য থেকে আরেক নির্মম দারিদ্র্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

---

৫. আলতাফ পারভেজ,বাংলাদেশের নারী শ্রমজীবী, নাগরিক উদ্যোগ ও পার্টনারশিপ অব ওমেন ইন এ্যাকশন,লালমাটিয়া ঢাকা, মার্চ ২০০৭, পৃ.-১১

৬. Daily Star, ৮ মার্চ ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

তবে এটা অত্যন্ত সত্যি যে পোশাক কারখানায় কাজের ফলে যুগ যুগ ধরে গৃহবন্দী দরিদ্র মহিলারা ঘরের কোণ থেকে বেড়িয়ে এসে কিছু অর্থের যোগান পেয়েছে নিজের হাতে এবং এই অর্থ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তাছাড়া তারা আরো পেয়েছে ঘরের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ। যা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেক পরিবর্তন করবে এবং নিজের সম্বন্ধে সচেতন করবে। কিন্তু তাদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার অনেকখানি হয়তো বিসর্জন দিতে হয়েছে এর মূল্য হিসেবে। প্রাপ্ত তথ্য হতে ধারণা করা যায় প্রাপ্তির চাইতে এই মূল্য অনেক বেশি।তাই আবারও অনুমিত হয় হাজার হাজার হত দরিদ্র নারী শ্রমিক যারা দারিদ্র্য লাঘবের আশায় ছুটে এসেছিল প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে তারা হয়তো অতি সামান্যই সুযোগ পেয়েছে দারিদ্র্যকে অতিক্রম করার।

সারণী[৮]

শ্রমিকদের বিভিন্ন ক্যাটাগরী	গড় কর্মঘন্টা ২০০৪	গড় কর্মঘন্টা ২০০৫	৮ ঘন্টার বেশী নয় ২০০৪	৮ ঘন্টার বেশী নয় ২০০৫	৮ ঘন্টার বেশী ২০০৪	৮ ঘন্টার বেশী ২০০৫	১২ ঘন্টার বেশী ২০০৪	১২ ঘন্টার বেশী ২০০৫
সকল ধরনের গার্মেন্টস শ্রমিক	১১.৫	১১.০	১০.২	১৪.৪	৫৭.৭	৬০.০	৩২.১	২৪.৬
ইপিজেড-নীট	১১.৪	১০.০	১২.৫	৩৭.৫	৬২.৫	৬২.৫	২৫.০	-
ইপিজেড-ওভেন	১০.৫	১০.০	৮.৩	২৫.০	৮৩.৪	৬৬.৭	৮.৩	৮.৩
ইপিজেডের বাইরে-নীট	১১.৯	১১.২	১০.০	১৬.০	৫০.০	৫২.০	৪০.০	৩২.০
ইপিজেডের বাইরে - ওভেন	১১.৪	১১.০	১০.৩	১১.২	৫৮.০	৬২.৪	৩১.৭	২৬.৪

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৮৬ শতাংশ গার্মেন্টস শ্রমিক নিয়োগপত্র পায় না। ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ কারখানায় এখনো সাপ্তাহিক ছুটি দেয়া হয় না। দৈনিক গড়ে ১২ ঘন্টা কাজ করতে হয় এই খাতের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রমিককে। গার্মেন্টস খাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধির এসবই হলো মূল রহস্য। সার্বক্ষনিক কর্মচ্যুতির আশংকাতাড়িত এই নারী শ্রমিকরাই আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎস এখন।

---

৭. প্রতিমা পাল মজুমদার,প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৫

৮. প্রতিমা পাল মজুমদার,প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৬

Dhaka University Institutional Repository

পোশাক শিল্প কারখানাগুলোর পরিবেশ বিষয়টি দেখার দায়িত্ব সরকারি 'কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর'-এর। কিন্তু জনবল ও আইনগত দিক থেকে সরকারিভাবে তাকে খুবই দুর্বল করে রাখা হয়েছে। গড়ে প্রতি হাজার কারখানার জন্য সরকার পরিদর্শক রেখেছে এক জন করে। যা কারখানার পরিবেশ উন্নয়নে সরকারের অনাগ্রহই স্পষ্ট করে। শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের এক অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রায় ১৫০০ পোশাক কারখানা রয়েছে যেগুলো একেবারেই পরিবেশসম্মত নয়।[৯] এরকম কারখানাগুলোর পরিবেশ উন্নয়নে সরকারি কোন উদ্যোগ ও চাপ পরিলক্ষিত হয়নি কখনো।

পোশাক শিল্প আজ বাংলাদেশের অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই শিল্প কেবল দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহ ভাগই উপার্জন করছেনা। নিয়োগ দান করেছে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে। যার অধিকাংশই নারী এবং এই পোশাক শিল্পে নিয়োগ পেয়ে নারী শ্রমিকরা তাদের ভাগ্যোন্নয়নে সমর্থ হয়েছে। কেবল ভাগ্যোন্নয়নই নয় বহু ক্ষেত্রে তাদের সামাজিক মান মর্যাদাও উন্নত করেছে। অথচ এই বিরাট অবদানের পরেও পেশাক শিল্প আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। যা প্রায়ই দেশের সংবাদ মাধ্যম গুলোর শিরোনাম দখল করে রেখেছে। গত কয়েক মাসের সংবাদপত্র ঘাটলে চোখে পড়বে অসংখ্য অভিযোগ যার মধ্যে আছে পোশাক কারখানা কতৃক শ্রম আইনের লংঘনের অভিযোগ, শ্রমিকের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ। এমনকি শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ পর্যন্ত।

এই অভিযোগগুলি বিশেষ করে নারী শ্রমিকের নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগগুলি সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে দারুণভাবে। কেননা নারী শ্রমিকের নিরাপত্তাহীনতার ব্যাপ্তির উপরই বহুলাংশে নির্ভর করছে নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ সম্পর্কিত জাতীয় নীতির সফলতা। তাছাড়া নারী শ্রমিকেতর ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতা পোশাক শিল্পের উন্নতিও ব্যাহত করবে দারুণভাবে।[১০]

সমাজে নারী শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার ব্যাপ্তি বিচার বিশ্লেষণ করে যে সত্য উন্মোচিত হয় তা হল পোশাক শ্রমিকরা যে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে তা বহু কারণ প্রসূত। লক্ষ্য করা গেছে নারী শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার জন্য মূলতঃ দায়ী হচ্ছে নারী শ্রমিকের তরুণ বয়স, তাদের বিস্তৃত গ্রামীণ ভীত, তাদের অবিবাহিত বৈবাহিক অবস্থা এবং তাদের স্বল্প শিক্ষা। দেশে বিদ্যমান সমাজ কাঠামোতে নারী শ্রমিক তার এই সামাজিক বৈশিষ্টগুলির জন্য অতি সহজেই নানাবিধ সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয়। তাছাড়া দেশে বিদ্যমান আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতিও এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। ঢাকা শহরের রাস্তায় সংঘটিত ছিনতাই, রাহাজানি, খুন, জখম ইত্যাদি ঘটনার হিসাব নিলে দেখা যাবে শহরে ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতা বিদ্যমান। পোশাক শিল্পে শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা এই ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতারই একটি অংশ মাত্র।[১১]

সমাজে ব্যাপক ধারণা ছিল পোশাক শ্রমিকরা বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা অতি নিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারের সদস্য। এবং আরও ধারণা করা হত তার পরিবারের সদস্যদের পেশা হল হয় রিক্সা চালনা, নয়তো কোন দিন মজুরের অথবা বাসার গৃহপরিচারিকার পেশা। কেননা সমাজে পোশাক কারখানায় মহিলাদের কাজ করা সম্বন্ধে খারাপ ধারণা থাকায় ভাল পরিবারের মহিলাদের এই কারখানায় কাজ গ্রহণের সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। অথচ জরিপে এই ধারণার কোন সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

---

৯. Daily Star, 8 March, 2006

১০. Ibid.

১১. প্রতিমা পাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

জরিপে দেখা যায় যে কারখানা হতে শ্রমিকের বাসস্থানের দূরত্ব, এই দূরত্ব অতিক্রম করার মাধ্যম সমূহের প্রকৃতি, এবং কারখানা ভবনটির কাঠামোগত প্রকৃতির উপরও নারী শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপ্তি দারুণভাবে নির্ভরশীল। লক্ষ্য করা গেছে কারখানার মধ্যকার নিরাপত্তাহীনতা বহুলাংশে কারখানার কাঠামোগত ত্রুটি বিচ্যুতির কারণেই উত্থিত হয়। বাংলাদেশে পোশাক শিল্পটি যেহেতু অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই গড়ে উঠেছে সেহেতু এই শিল্পভুক্ত কারখানাগুলো স্থাপনের স্থান নির্বাচন এবং কারখানাগুলোর কাঠামো কোনটিই পরিকল্পিত নয়। দুই চারটি কারখানা ছাড়া প্রতিটি কারখানাই স্থাপিত হয়েছে পূর্বে নির্মিত কোন ভবনে। যার জন্য কারখানা ভবনে যে সব সুবিধা থাকা উচিত তা প্রায় প্রতিটি কারখানাতেই অবর্তমান। আর এ জন্যই পোশাক কারখানাগুলিতে শ্রমিকের জন্য স্থান সংকুলান অত্যন্ত অল্প এবং পরিবেশ বদ্ধ। লক্ষ্য করা গেছে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তাহীনতার অধিকাংশই এই বদ্ধ পরিবেশ থেকেই উত্থিত হয়। তাছাড়া পোশাক কারখানায় অগ্নিকান্ড এবং অগ্নিদগ্ধ হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু ও এই কাঠামোগত দোষ ত্রুটির কারণে সংঘটিত হয়।

কারখানায় অধিক রাত পর্যন্ত অবস্থানের কারণে তরুণ বয়সের নারী শ্রমিকদেও মান ইজ্জত এবং শস্নীলতাহানি হয় বলে সমাজে ব্যাপক ধারণা রয়েছে। বস্তুতপক্ষে জরিপেরা তথ্য হতে এই ধারণা সামান্যই সত্যি বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। বরং এর বিপরীতে দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই কারখানার মধ্যে অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশ বিরাজ করছে। কেননা জরিপের তথ্য থেকে দেখা যায় শতকরা ৩৬ জন নারী শ্রমিকই আত্মীয় পরিবৃত হয়ে কারখানায় কাজ করে। শতকরা ৭০ জনেরই বন্ধু কিংবা প্রতিবেশী রয়েছে কারখানার মধ্যে। যাদের মধ্যে রয়েছে শক্ত নিরাপত্তা বেষ্টনী। যা নারী শ্রমিকের সকল প্রকার ইজ্জতহানিকর ঘটনার বিরুদ্ধে প্রহরা হিসেবে কাজ করে।[১২]

অবশ্য দেখা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে অধিকাংশ নারী শ্রমিকই কারখানায় কাজ করার সময়ে কোন না কোন ভয়ে আতঙ্কিত থাকে। তার মধ্যে অবশ্য কাজে ভুল হওয়ার ভয়টিই প্রধান। তার পরেই আসে সুপারভাইজার কতৃক প্রহার, বকুনি কিংবা চাকুরিচ্যুত হওয়ার ভয়। তবে লক্ষ্য করা গেছে চাকুরির স্থায়িত্বকাল যত বৃদ্ধি পেয়েছে ততই ভয়ের পরিধি কমেছে। আর অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার পরিধিও কমেছে।

কারখানার বয়সের সঙ্গে শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিও একটি ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। কারখানার বয়স যত বৃদ্ধি পায় ততই কারখানার আয়তন এবং পরিসর বৃদ্ধি পায় এবং কারখানাগুলি পরিকল্পিত এলাকায় পরিকল্পিতভাবে তৈরী ভবনে স্থানান্তরিত হয়। যার ফলে সেসব কারখানাগুলোতে কাঠামোগত দোষের কারণে যেসব নিরাপত্তাহীনতা উত্থিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তা দূরীভূত হয়। তাছাড়া দেখা যায় পুরনো কারখানাগুলোতে শ্রমিক-শ্রমিক এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। যার জন্য কারখানার ভেতরে নারী শ্রমিকের নিরাপত্তাহীনতা উত্থিত হওয়ার অত্যন্ত ক্ষীণ।

তাই পোশাক শিল্পকে সময়ের হাতে ছেড়ে দিলে হয়তো এক সময়ে আপনা থেকেই শ্রমিকের নিরাপত্তাহীনতা জনিত সমস্যাগুলির সমাধান হবে। তবে বেশ কিছু সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ এই সমস্যাগুলির সমাধানকে ত্বরান্বিত করবে। তার মধ্যে শ্রমিকের বাসস্থান এবং যাতায়াত সুবিধা প্রধানের পদক্ষেপটি অন্যতম। লক্ষ্য করা গেছে নারী শ্রমিক যতই কারখানার কাছাকাছি বাস করছে ততই তার

---

১২. প্রতিমা পাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

কারখানায় আসা যাওয়ার পথের নিরাপত্তাহীনতা কমে গেছে। শ্রমিক যতই কারখানা সংলগ্ন স্থানে বাস করছে ততই তার কারখানায় উপস্থিতিতে নিয়মানুবর্তিতা বেড়েছে এবয় ততই সে নিরাপদভাবে অতিরিক্ত শ্রম প্রদান করতে সমর্থ হয়েছে।[১৩]

তাছাড়া শ্রমিকের আসা যাওয়ার পথে যে সময় ব্যয় হয় তাও বেঁচে যাবে এবং এ সময়টি নারী শ্রমিকের বিশ্রামের সঙ্গে যুক্ত হলে তার মানসিক এবং শারীরিক উভয় স্বাস্থ্যেরই উন্নতি হবে। তবে কারখানায় আসা যাওয়ার পথে নারী শ্রমিকরা সময় ছাড়া অর্থ এবং শ্রম ও ব্যয় ব্যয় করে।অধিকাংশ শ্রমিক শারীরিক শ্রম ব্যয় কওে পায়ে হেঁটে কারখানায় আসা যাওয়া করে। তাই কারখানার কাছাকাছি বাসা হলে শ্রমিকের অর্থ ও শ্রম দুইই বেঁচে যাবে। কারখানা সংলগ্ন বাসস্থান হলে শ্রমিক আরও যে সুবিধা ভোগ করে তা হলো বাড়িতে গিয়ে দুপুরের খাবার খাওয়ার সুবিধা। এছাড়া এ সময়টিতে বিবাহিত নারী শ্রমিকরা গৃহস্থালী এবং সন্তান পালন তদারকী করার ও সুযোগ পায়। তাই শ্রমিকদের বাসস্থান কারখানান সংলগ্ন হলে তাদের আরও নানাবিধ সমস্যার সমাধান হবে ।

আর এই বাসস্থান যদি কারখানা কতৃপক্ষ বা সরকার কতৃক প্রদত্ত হয় তবে শ্রমিকের অতিরিক্ত আরও কিছু সমস্যার সমাধান হবে। দেখা গেছে নগরে বিদ্যমান তীব্র গৃহ সমস্যানর মুখে স্বল্প মজুরির পোশাক শ্রমিকদের আশ্রয় নিতে হয় বিভিন্ন বস্তি বা বস্তি এলাকায়। যেখানে নানাবিধ সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা তরুণ বয়সের নারী শ্রমিকদের জন্য প্রায় প্রতিদিনের সঙ্গী। তাছাড়া নগরের তীব্র গৃহ সমস্যার জন্য অতি নিম্ন মানের গৃহের জন্য তাদের কে ভাড়া দিতে হয় সর্বনিম্ন ১০০০ থেকে ২৫০০ টাকা পর্যন্ত যা তাদেও স্বল্প মজুরির উপর এক বিরাট বোঝা। মালিকদের কাছ থেকে জানা যায় শ্রমিককে বাসস্থান সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে তারা চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন। কিছু কিছু কারখানা কতৃপক্ষ নারী শ্রমিকদের জন্য গৃহের ব্যবস্থা করেছেন। যেখানে নারী শ্রমিকরা মেস করে থাকে। এভাবে প্রতিটি কারখানা তৎপরতা নিলে শ্রমিকের বাসস্থান সমস্যার সমাধান হবে। যার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তাহীনতারও সিংহভাগ দূরীভূত হবে। তবে এ ব্যবস্থা করা কারখানা কতৃপক্ষের পক্ষে একা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সরকারী সহযোগিতা অতি জরুরি। যতদিন না পুরোপুরি বাসস্থান এর ব্যবস্থা করা যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত নারী শ্রমিকদেও কারখানায় আসা যাওয়ার ব্যাপারে কারখানা কতৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা চালু করা উচিত। কারখানা বাস চালু করে এ ব্যাবস্থাটি গ্রহণ করা যেতে পারে।[১৪]

পোশাক শ্রমিকের বিশেষ করে নারী পোশাক শ্রমিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা নিরূপণ করতে গিয়ে দেখা যায় অধিকাংশ নারী শ্রমিকই ন্যূনতম মজুরি বোর্ড কতৃক সুপারিশকৃত মজুরির নীচে মজুরি গ্রহণ করছে। আরেকটি যে চরম সত্য তথ্য পাওয়া যায় তা হলো নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে ব্যাপক মজুরি বৈষম্য রয়েছে। এটা সত্যি যে পোশাক কারখানার উচ্চ মজুরির পদগুলো পুরুষ শ্রমিকরাই দখল করে রাখে বলে মজুরিতে এই বিরাট পার্থক্য হয়েছে। মালিক পক্ষের কাছ থেকে জানা যায় নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে দক্ষতা পার্থক্যের জন্যই মজুরিতে এই পার্থক্য হয়। তবে মজার ব্যাপার হলো পোশাক কারখানায় একজন শ্রমিকের দক্ষতা নিরূপণ কঠিন ব্যাপার যেহেতু পোশাক তৈরীর কাজ হল দলীয় কাজ। যেখানে একটি পোশাক সম্পূর্ণ সেলাই করতে প্রয়োজন হয় ন্যূনতম ৫০ জনের সাহায্য। যাদের সাহায্যের প্রকৃতিও ভিন্ন। এক্ষেত্রে একজন শ্রমিকের দক্ষতা নিরূপণ করা কঠিন। এখানে অদক্ষতার অজুহাতে নারী শ্রমিককে স্বল্প মজুরি প্রদান করলে তার বিরূদ্ধে নালিশ করার উপায় নেই।[১৫]

---

১৩. মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের উন্নয়নে সুপারিশমালা, কোটামুক্ত বিশ্বে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প, সাম্প্রতিক প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জ, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, ঢাকা-২০০৮, পৃ. ১৭০

১৪. প্রতিমা পাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

Dhaka University Institutional Repository

মূলতঃ নারী এবং পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে ব্যাপক মজুরি পার্থক্যের জন্য দক্ষতা পার্থক্য অংশত দায়ী হলেও লিঙ্গ বৈষম্যই প্রধানত দায়ী। নারী শ্রমিকরা পুরুষ শ্রমিকের চাইতে অদক্ষ মালিক পক্ষের এই উক্তি একটি অজুহাত মাত্র। অবশ্য এই উক্তির পর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় নারী শ্রমিকরা পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে অদক্ষ জেনেও কেন আপনারা দলে দলে নারী শ্রমিক নিয়োগ করেন। দেশে সীমাহীন বেকারত্বের ফলে পুরুষ শ্রমিকের সরবরাহতো কম নয়? এ প্রশ্নের জবাবে তারা এক বাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে নারী শ্রমিকের আনুগত্যের জন্যই তারা পুরুষ শ্রমিকের চাইতে নারী শ্রমিক নিয়োগ করতে পছন্দ করেন। অর্থাৎ আনুগত্য পোশাক উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। লক্ষ্য করা গেছে শ্রমিকদের আনুগত্যের কারণেই পোশাক তৈরীর আদেশগুলো সময়মত সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব হয়। তাদের আনুগত্যের কারণেই উৎপাদন ব্যাহত না হয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস প্রতিনিয়ত চলতে থাকে। তারা যদি অনুগত না হত তবে নানা দাবীতে ধর্মঘট কর্মবিরতি লেগেই থাকত। আনুগত্যের জন্য নারী শ্রমিকরা মূল্য পেলে অতি সহজভাবেই তাদের মজুরি পুরুষ শ্রমিকদের মজুরির সমান হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে বেশিও হতে পারে।

নিম্ন মজুরি এবং মজুরি বৈষম্য ছাড়া অন্য যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতাগুলো নারী শ্রমিককে প্রতিনিয়ত পিষ্ট করছে তার মধ্যে মজুরি প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা এবং চাকুরির অনিশ্চয়তা প্রধান। শ্রমিককে তার মজুরি পেতে ৭ দিন থেকে একমাস সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। প্রতিটি কারখানাতেই শ্রমিকের একমাসের মজুরি আটকে রাখা হয়। শ্রমিক যাতে এক কারখানা থেকে অন্য কারখানায় যেতে না পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা। মজুরি প্রাপ্তির অনিশ্চয়তাই হচ্ছে নারী শ্রমিকের সবচাইতে বড় অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা। তারা এই নিরাপত্তাহীনতা কাটিয়ে উঠার জন্যই এক কারখানা থেকে অন্য কারখানায় ছুটে বেড়ায়। এবং যেখানেই এই নিরাপত্তা পেয়েছে সেখানেই থেকে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। নিয়মিত মজুরি পাওয়া যে তাদের জন্য কত পরম পাওয়া তা বুঝা যায় যখন দেখা যায় যে নিয়মিত মজুরি প্রাপ্তিকেই তারা চাকুরিতে সন্তুষ্টির একটি অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে।[১৬]

পোশাক শ্রমিকের চাকুরির অনিশ্চয়তা আরো তীব্র। নিয়োগ পদ্ধতি, চাকুরির ধরণ ও প্রকৃতি, চাকুরিচ্যুতির নিয়ম কানুন, পদোন্নতি এবং মজুরি বৃদ্ধিও গতি প্রকৃতি ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি বিষয়েই পোশাক শ্রমিকরা নিরাপত্তাহীরনতায় ভোগে। তবে পূর্বাপর এ ক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিকের চাইতে নারী শ্রমিকের ভোগান্তিই বেশী। দেখা গেছে কোন কোন কারখানায় শ্রমিককে নিয়োগপত্রই দেয়া হয়না। যদিও বেশ কিছু কারখানায় শ্রমিককে পরিচয়পত্র দেয়া হয় যাতে কেবল নিয়োগের স্বীকৃতি থাকে। কোন শর্তাবলী থাকেনা। দেখা গেছে বছরের পর বছর চাকুরি করলেও শ্রমিকের নিয়োগ স্থায়ী হয়না অথবা কোন বেতন বৃদ্ধি বা পদোন্নতিও হয়না।

এই প্রতিবেদনে পোশাক শ্রমিকের অথনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার যে পরিচয় পাওয়া গেছে তার জন্য দেশে বিদ্যমান অর্থ ব্যবস্থা, মালিকের মুনাফা লোভ, শ্রমিকের অদক্ষতা, অনভিজ্ঞতা, অসচেতনতা ইত্যাদি দায়ী। দেশে বিদ্যমান আর্থ-ব্যবস্থায় পোশাক শিল্পটি তার কাঁচামালের জন্য পুরোপুরিভাবে আমদানির উপর নির্ভরশীল। যার জন্য মালিককে সর্বদাই এক বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাতে হয়।[১৭] যার অংশ বিশেষ শ্রমিকদের উপর স্থানান্তরিত হওয়া অতি স্বাভাবিক। আমদানিকৃত কাঁচামাল কারখানার দোড়গোড়ায় পৌছাতে সময় লাগে প্রায় ১০০ দিন। মালিকের কাছ থেকে জানা যায় আমদানি উৎস থেকে কারখানার দোড়গোড়ায় পৌছা পর্যন্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়াটি বিরাট লম্বা। এই প্রক্রিয়াটি তাড়াতাড়ি

১৬. মোঃ আশিক ইকবাল, প্রমুখ, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পঃ কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

সম্পন্ন করতে মালিককে অবৈধভাবে বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়। যার বোঝা স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকের কাঁধে স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মালিককে উচ্চমূল্যেও কাঁচামাল ক্রয় করতে হয়। ফলে মালিকের মুনাফার অংক কমে যায় দারুণভাবে। মালিক তার মুনাফার অংক ঠিক রাখার জন্য অনিবার্যভাবেই এই খরচের বোঝাটি শ্রমিকের কাঁধে স্থানান্তরিত করবে। যার ফলে শ্রমিকের নিরাপত্তাহীনতা বেড়েই যাবে।

দেখা গেছে শ্রমিকের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার সিংহভাগই উত্থিত হয় অতিরিক্ত শ্রম হতে। এই সমস্যাটি সমাধানকল্পে দুই দফায় দুই দল শ্রমিক নিয়ে কাজ করানোর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এই প্রেক্ষিতে মনে রাখতে হবে দুই দফায় দুই দল শ্রমিকের মাধ্যমে পোশাক তৈরীর কাজ সম্পন্ন করলে কেবল অতিরিক্ত শ্রমোত্থিত সমস্যাগুলিরই সমাধান হবে না, শ্রমিকের দক্ষতাও বৃদ্ধি পাবে এবং পোশাক শিল্পে নিয়োগের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে প্রায় দেড় গুণ। যদি দক্ষ শ্রমিকের অভাবই এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হয় তবে এই অভাব পূরণ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন বিজিএমইএ বেশ কিছু প্রশিক্ষন কেন্দ্র খুলতে পারে। তবে একথা মনে রাখতে হবে অতিরিক্ত শ্রম প্রদান যেন সম্পূর্ণরূপে শ্রমিকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক হয়।

এই প্রতিবেদনে যে সত্যটি তীব্রভাবে উপলব্ধি হয়েছে তা হলো পোশাক শ্রমিক বিশেষ করে নারী পোশাক শ্রমিকের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হলো তাদের শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা। তাই নারী শ্রমিকের অবস্থার উন্নতির জন্য সবচাইতে কার্যকর পন্থা হবে তাদের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণ করা। কোন কোন মালিক ইতিমধ্যেই এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন । কারণ তারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে শ্রমিকের শিক্ষা বৃদ্ধি পেলে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ৫ম শ্রেণীর নিচে যাদের শিক্ষাস্তর তাদেরকে দিনের কোন একটি সময়ে শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি তারা চিন্তা ভাবনা করছেন। এই ব্যবস্থা চালু হলে শিশু শ্রমিকরাও শিক্ষার সুযোগ পাবে। যার ফলে শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিয়ে অভিযোগের তীব্রতা কমে আসবে। শিক্ষা কেবল শ্রমিকের দক্ষতাই বৃদ্ধি করবেনা তাদের সচেতনতাও বৃদ্ধি করবে। যার ফলে শ্রমিকের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে।

মালিকদেও সঙ্গে আলাপ আলোচনায় জানা যায় তাদেও মধ্যে অনেকেই শ্রমিকদেও মধ্যে সংগঠন তৈরী করার জন্য আগ্রহী। কেননা তারা অনুভব করছেন কোন শ্রমিক প্রতিনিধির অভাবে শ্রমিকদেও সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা কঠিন কাজ। তাছাড়া সময় সাপেক্ষও বটে। তাই তারা চান শ্রমিকদেও মাঝে সংগঠন। তবে এই সংগঠন ট্রেড ইউনিয়নে রূপ নিক তা তারা চান না। কেননা তাদেও মত হলেও ট্রেড ইউনিয়নকে বাইরের রাজনৈতিক দলগুলোতাদেও নিজেদেও স্বার্থে ব্যবহার কওে থাকে। শ্রমিকরা যেহেতু অতি অল্প শিক্ষিত সেহেতু তারা নিজেদের ভাল মন্দ বিচার করতে পারেনা । তাই অতি সহজেই তারা বাইরের লোকের প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়।

পোশাক শ্রমিকদের উপর পাড়ার মাস্তানদেরও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। যার জন্য অনেক মালিককে মাস্তানদেরও সন্তুষ্ট রাখতে হয়। তারা সময় অসময়ই কারখানার মধ্যে চড়াও হয় বিভিন্ন দাবীতে। দাবী না মিটালে তারা শ্রমিককে উসকাতে থাকে কাজ বন্ধ করে দিতে। এই অবস্থায় মালিকদেও অভিমত হল ট্রেড ইউনিয়ন বর্তমান পোশাক কারখানার উন্নয়ন স্তরে প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া শ্রমিকদের সচেতনতা স্তরও অতি নিম্ন। তাই ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব শ্রমিকগোষ্ঠী ব্যতীত বহির্ভূত অন্য কারো কাছে চলে যাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।[১৮]

---

১৮. প্রতিমা পাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

Dhaka University Institutional Repository

এসব কিছু বিবেচনা করে শ্রমিক এবং মালিক উভয়ের স্বার্থেই ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প কোন সংগঠন তৈরীর চিন্তা ভাবনা করতে হবে। তবে যত দিন পর্যন্ত না শ্রমিকদেও মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন অথবা অন্য কোন বিকল্প সংগঠন গড়ার অবস্থা সৃষ্টি হবে ততদিন পর্যন্ত শ্রমিকের সুবিধা অসুবিধাগুলি জানার জন্য এবং তাদেও অভিযোগ শোনার জন্য এবং পক্ষান্তওে মালিক পক্ষের সুবিধা অসুবিধা গুলিও শ্রমিককে জানানোর জন্য প্রতিটি কারখানায় ঘন ঘন শ্রমিক মালিক সভার আয়োজন করতে হবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে কিছু নীতিনির্ধারণমূলক সুপারিশ পেশ করা হলো:

প্রথমত: বিভিন্ন সমীক্ষা হতে দেখা গেছে বাংলাদেশে স্বনিয়োজিত মহিলাদের সংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছে, বিশেষত পল্লী এলাকাতে এটা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেসব প্রতিষ্ঠানের জন্যে এটা সম্ভব হচ্ছে সেসবের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন এনজিও। তাদের উদ্যোগ, কৌশল ও সহযোগিতার ফলেই এটা সম্ভব হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এসব প্রতিষ্ঠান এদেশের মহিলাদের কর্মসংস্থান ও উপার্জনের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পল্লী এলাকায় মহিলাদের বেকারত্বের হার কমে আসছে। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে এসব প্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু সমালোচনা করা হয়ে থাকে। সবচেয়ে কঠোর যে সমালোচনা করা হয় তাহলো প্রচলিত সনাতন অর্থ লগ্নীকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মতোই এই নতুন প্রতিষ্ঠানগুলিও ইসলাম কর্তৃক নিষিদ্ধ সুদকে ভিত্তি করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

এসব এনজিও'র সুদের হারও খুব চড়া। উদাহরণস্বরূপ, দরিদ্রের এবং শুধুমাত্র দরিদ্রদের জন্যেই প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংকের চার্জকৃত সুদের হার ২০% + গ্রুপ ফান্ডের নামে বাধ্যতামূলক কেটে রাখা ৫% = ২৫% । যদি সাপ্তাহিক কিস্তির কথা বিবেচনা করা হয়, তাহলে এক্ষেত্রে কার্যকর সুদের হার দাঁড়ায় ৩৩.৫%। একে অনেকে আল-কুরআনে উল্লেখিত রিবার প্রকৃষ্ট নজির হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন। এই অভিযোগ অস্বীকার করার উপায় গ্রামীণ ব্যাংকের নেই। ব্যাংক বরং বলতে পারে সে ব্যবসা করছে এবং সুদের হার এর চেয়ে কম হলে টিকে থাকতে পারবে না। আরও দাবী করতে পারে যে, গ্রাহকদের যে ধরনের সেবা ব্যাংক দেয় তাতে উঁচু হারের সুদের চার্জ পুষিয়ে যায়।[১৯]

ব্যাংকিং অধ্যায়ে ইসলামী অর্থনীতির অনেকগুলি বিকল্প বিনিয়োগ পদ্ধতির আলোচনা করা হয়েছে। এসব পদ্ধতি দীর্ঘদিনের প্রচলিত সনাতন প্রথা অর্থাৎ সুদের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর এবং ফলপ্রসূ। এখন প্রয়োজন সুদের পরিবর্তে এসব ইসলামী ফাইন্যান্সিং পদ্ধতি ব্যবহারের সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ।

দ্বিতীয়ত: উপরের বিশ্লেষণ হতে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। তাহলো বাংলাদেশে লক্ষণীয়ভাবেই মহিলা কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রধানত শহর এলাকাতেই তৈরি পোশাক প্রসারের ফলেই এটা ঘটছে। এই তথ্যে যেমন আনন্দের দিক রয়েছে তেমনি রয়েছে উদ্বেগের দিক। আনন্দের এজন্যেই যে, পল্লী এলাকা ও শহরতলী দরিদ্র সহায়-সম্বলহীন মহিলাদের জীবিকা অর্জনের একটা পথ হয়েছে। দেশের শিল্পায়নেও তারা প্রত্যক্ষভাবে অবদান রাখছে। কিন্তু এর ভিন্ন একটি তাৎপর্য রয়েছে যেজন্যে ইসলামী অর্থনীতিবিদরা ছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ইউনুসের ভাষায়, 'সামাজিক-সচেতনতা তাড়িত' নীতিনির্ধারকরাও উদ্বেগ পোষণ করেছেন।[২০] আলোচনা সুবিধার জন্যে তৈরি পোশাক শিল্পে মহিলাদের নিয়োগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যেতে পারে।

---

১৯. M.A. Hannan, Thoughts on Islamic Economics, Islamic Economics Research Bareu, Dhaka-1950, P. 240

২০. Ibid, P. 241.

Dhaka University Institutional Repository

"মহিলাদের নিয়োগ পুরুষদের নিয়োগকে বহুগুণ ছাড়িয়ে গেছে। কর্মজীবীকার ৩০% পাঁচ হতে দশ বছর পর্যন্ত স্কুলে গিয়েছে এবং ২০% কর্মজীবী মাধ্যমিক বা তার চেয়ে বেশিদূর পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। প্রায় সকল মহিলা কর্মজীবীই অবিবাহিতা এবং সকলেরই বয়স ত্রিশের নিচে।..... এদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পল্লী এলাকা হতে সদ্য আগত।..... এসব মেয়ে একত্রে মেস করে থাকে কিন্তু তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। প্রায়ই তাদের বাসা বদলাতে হয় কারণ বাড়িওয়ালারা এসব মেয়েদের ভাড়াটে হিসাবে রাখতে অনিচ্ছুক। ..... খুব কম কারখানাই পোশাক শিল্পের উপযোগী করে তৈরি বলে অধিকাংশগুলিতে শ্রমিকদের জন্যে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই। অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুরও বহু সংবাদ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শিল্পখাতে নিয়োগের ক্ষেত্রে, বিশেষত যাদের কর্মস্থল হতে বাড়ি যেতে ও আসতে হয় অথবা পল্লী এলাকায় পরিবার পরিজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যেতে হয় সেসব কর্মজীবী মহিলার বিশেষ করে তরুণীদের নিরাপত্তা বিধান একটা বড় ধরণের উদ্বেগের বিষয়। এক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন ব্যাপারটা প্রকটভাবে ধরা পড়ে ইয়াসমীন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা হতে। এরকম আরও বহু ঘটনা রয়েছে যা রিপোর্ট হয়নি।"[২১]

এ প্রসঙ্গে ইসলামী শরীয়াহ বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগের কথা বাদ দিলেও 'সামাজিক সচেতনতা তাড়িত' নীতি নির্ধারকরা কি পোশাক শিল্পে মহিলাদের কর্মসংস্থান সম্পর্কে উপরে যে বৈশিষ্ট্যসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন? নিশ্চয়ই নয়। বরং অনেকে রয়েছেন যারা বিদ্যমান অবস্থায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তরুণীদের কাজ করতে না দেওয়ারই পরমার্শ দেবেন। এরূপ সুপারিশ যদিও খুব শক্তিশালী কিন্তু তা বাস্তবায়িত হলে যত সমস্যার সমাধান হবে তার চেয়ে বেশি সমস্যার সৃষ্টি হবে। সুতরাং, এক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ হলো এমন এক 'মহিলা জগৎ' তৈরি করা যেখানে মহিলারা কোন রকম লজ্জা ছাড়াই কাজ করতে পারবে। এজন্যে মহিলাদের কাজের উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামোন, নিরাপত্তা ইত্যাদি সম্পর্কে কয়েকটি সুপারিশ পেশ করা হলো।

তৈরি পোশাক শিল্পে অবিবাহিত তরুণী মেয়েদের আবাসন এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এটা বিশেষ করে তাদের জন্যে আরও বেশি যাদের শহর এলাকায় কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। 'সামাজিক-সচেতনতা-তাড়িত' এনজিওগুলির ও সরকারের সাথে মহিলা কর্মজীবীদের জন্যে স্বল্পব্যয়ে গৃহনির্মাণে এগিয়ে আসা উচিত। মনে রাখা দরকার, ঢাকায় তৈরি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল এসব মহিলার জন্যে নয়। তাই এদের জন্যে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে। উপরন্তু কারখানার পরিবেশও উন্নত হতে হবে। কাজের পরিবেশ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং অসমাজিক কার্যকলাপ মুক্ত হতে হবে।

কারখানা ও তার বাইরে প্রতিটি নারী-শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নারীশ্রমিকের জন্যে বিদ্যমান আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ও সংস্কার-সাধন জরুরী। এদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে ফ্যাক্টরী আইন ১৯৬৫, মাতৃত্ব সুবিধা আইন ১৯৩৯ এবং শিশু আইন ১৯৯৩ প্রভৃতি আইন থাকলেও এগুলি নানা অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতার শিকার। এসব আইনের যেমন প্রয়োজনীয় সংস্কার দরকার তেমনি দরকার যথাযথ মনিটরিং, যা আদৌ হচ্ছেনা। উপরন্তু কিছু সংরক্ষণমূলক আইন যেমন রাতে মহিলাদের কারখানায় কাজ করা নিষিদ্ধ করাকে কারখানার প্রয়োজন এবং কাজের পরিবেশের প্রেক্ষিতেই পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

যখন প্রাতিষ্ঠানিক কাজের প্রকৃতি ও কাঠামো ডিজাইন করা হবে তখন অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের শারীরিক ও মানসিক গঠন সম্পূর্ণ পৃথক।

---

২১. নাসরিন খন্দকার, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ৪২০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়তঃ পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে মজুরীর যে বিরাট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়েছে তার প্রতিবিধান গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবী রাখে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের নীতি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, "পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।"[২২] অন্য কথায়, মজুরী বা পারিশ্রমিক নির্ধারণের সময়ে পুরুষ ও মহিলাদের সমান চোখে দেখতে হবে। তারা যদি একই ধরনের কাজ একই সময় ধরে করে তাহলে তাদের মজুরীও সমান হতে হবে। নারীরা যেন তাদের প্রাপ্য মজুরী হতে বঞ্চিত না হয় তা দেখা সরকারেরও দায়িত্ব।

চতুর্থতঃ বাংলাদেশে মহিলাদের কর্মসংস্থানের প্রকৃতি ও পরিধি বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় যে, যদিও মহিলাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সংজ্ঞা অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে তবুও এখন পর্যন্ত মহিলাদের অংশগ্রহণ (৫৮%) পুরুষদের চেয়ে (৮০%) তুলনামূলকভাবে কম।[২৩] বহু পরিবারে উপার্জনকারী পুরুষ সদস্য না থাকায় এবং মহিলাদের উপার্জন খুব কম হওয়ায় তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুবই খারাপ। সমাজে এই ধরণের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা শুধু মানবতাবিরোধী নয় বরং ইসলামী চিন্তা- চেতনারও বিরোধী। সুতরাং, পুরুষদের পাশাপাশি তাদের অংশ গ্রহণের হারও বৃদ্ধি করা বাঞ্চনীয়।

পঞ্চমত: মহিলাদের সুবিধার্থে চাকরিবিধি সংশোধন করা দরকার। বিশেষত বিধবা মহিলাদের জন্যে বিশেষ সুযোগ থাকা দরকার। এদের ক্ষেত্রে কোন বয়স সীমা না রেখে, কিন্তু অন্যান্য অপরিহার্য শর্ত অপরিবর্তিত রেখে (যেমন: শিক্ষাগত যোগ্যতা) সরকারী কাজে যোগদানের চাকরিবিধি সংশোধন করা যেতে পারে।

ষষ্ঠত: এবং শেষত সকল কর্মজীবী মহিলাকে আল-কুরআন ও সুন্নাহ্ মুতাবিক পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানের জন্যে উৎসাহিত করা উচিত।

---

২২. আল-কুরআন, ৪:৩২

২৩. এম, এ হামিদ, ইসলামী অর্থনীতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২, পৃ. ৩৩১

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

১. আল-কুরআনুল কারীম।

২. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, মুসনাদু আহমাদ, দারুল মায়ারিফ, বায়রূত, ১৪০৯ হিজরী।

৩. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল সহীহ আল-বুখারী, কুতুবখানা রশিদিয়া, দিল্লী, হিজরী-১৪০৯,কিতাবুল বুয়্যু।

৪. মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ ইবন মাজাহ, সুনান ইবনু মাজাহ, কুতুবখানা রশিদিয়্যা, দিল্লী, কিতাবুত তিজারাত।

৫. আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আশআছ, সুনান আবী দাউদ, কুতুবখানা রশিদিয়্যা, দিল্লী, কিতাবুয যাকাত।

৬. মুসলিম আল-হাজ্জাজ আল কুশাইরী, সহীহ আল-মুসলিম, কুতুবখানা রশিদিয়্যা, দিল্লী-১৪০৮ হিজরী।

৭. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত তিরমিযি, সুনান আত তিরমিযী, কুতুবখানা রশিদিয়্যা, দিল্লী, ১৪০৯ হিজরী।

৮. মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযিদ, সুনানু ইবন মাজাহ, কুতুবখানা রশিদিয়্যা, দিল্লী।

৯. বস্ত্র ও পরিচ্ছদ: ব্যবহারিক শিল্পকলা।

১০. বাংলাপিডিয়া, ৪র্থ খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৪

১১. বাংলাপিডিয়া, ৫ম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৪

১২. বাংলাপিডিয়া, ৯ম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৪

১৩. বাংলাপিডিয়া, ৮ম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৪

১৪. শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩১৯ বাংলা, প্রথম খ.

১৫. হাকীম হাবীবুর রহমান, ঢাকা পঞ্চাশ বছর আগে।

১৬. আইন-ই-আকবরী, ইংরেজী অনুবাদ, ফ্রান্সিস গ্লাডউইন, লন্ডন, ১৮০০।

১৭. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বাংলায় খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৯৬

১৮. কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, কুমিল্লা জেলা পরিষদ, ১৯৮৪।

১৯. সুভাষ জেংচাম, বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৯৪

২০. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস বুলেটিন, ৫ম সংখ্যা, মে-২০০৬

২১. অবলা, কর্মজীবী নারী,৩/৬ সেগুনবাগিচা ঢাকা,আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং,অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০০৬

২২. ড.খালেদা সালাহউদ্দিন, একুশ শতকে বাংলাদেশের নারী,পালক পাবলিশার্স ঢাকা-২০০৬

২৩. রঞ্জন কর্মকার সম্পাদিত বাংলাদেশের রপ্তানীমুখী গার্মেন্টস সেক্টরে শ্রম পরিবেশ ও শ্রমিক অধিকার, উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, লালমাটিয়া ঢাকা-১২০৭,দশম সংখ্যা,অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

২৪. বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২৫. অবলা কর্মজীবী নারী, ৩/৬ সেগুনবাগিচা ঢাকা-১০০০,আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিসিং কোং,অক্টোবর-ডিসেম্বও ২০০৬

২৬. প্রতিমা পাল মজুমদার, পোশাক শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, একতা পাবলিকেশন্স-ঢাকা-১৯৯৪

২৭. আলতাফ পারভেজ, বাংলাদেশের নারী শ্রমজীবী,নাগরিক উদ্যোগ ও পার্টনারশিপ অব ওমেন ইন এ্যাকশন,লালমাটিয়া ঢাকা, মার্চ ২০০৭।

২৮. আবুল কাসেম হায়দার ও মিজানুল করীম, তৈরী পোশাক শিল্প : একটি মূল্যায়ন, শিল্পায়ন ও উন্নয়ন, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, প্যানোরমা পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯৭

২৯. চিররঞ্জন সরকার, নারী ও দারিদ্র্য, স্টেপ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ২০০৭

৩০. হোসেন জিল্লুর রহমান, গ্রামীণ দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা, কিছু পুর্ণভবনা, দারিদ্র ও উন্নয়ন : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, বিআইডিএস, ঢাকা-১৯৯৮

৩১. শ্রমশক্তি জরিপ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা।

৩২. উজ্জীবক, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, সেপ্টেম্বর-২০০৫

৩৩. এনজিও কোয়ালিশন অন বেইজিং প্রসেস, ২০০৫

৩৪. মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল প্রতিবেদন, ২০০৫

৩৫. প্রতিমা পাল মজুমদার প্রমুখ, বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, একতা পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ১৯৯৪

৩৬. তাহমিনা সেলিম, জাতীয় উন্নয়নে পোশাক শিল্প, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-২০০৪

৩৭. হান্নানা বেগম, মানব সম্পদ: বাংলাদেশের নারী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২০০২

৩৮. আলতাফ পারভেজ,বাংলাদেশের নারী শ্রমজীবী, নাগরিক উদ্যোগ ও পার্টনারশিপ অব ওমেন ইন এ্যাকশন,লালমাটিয়া ঢাকা, মার্চ ২০০৭

৩৯. মুহাম্মদ ফেরদৌস কোরেশী, 'ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কিত ধারণা' মাসিক পৃথিবী, আগষ্ট-১৯৮৮

৪০. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৩

৪১. ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, ইসলামে শ্রমিকের অবদান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৮

৪২. সাইয়িদ আলা-মওদুদী, ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ (অনু. মাওলানা আব্দুর রহীম), আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৩

৪৩. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৮

৪৪. কবির আহমদ মজুমদার, ইসলামী শ্রমনীতি কি? মজদুর প্রকাশনী, ঢাকা।

৪৫. এন.এ.এম. জসিম উদ্দিন 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং প্রাসঙ্গিক শ্রম আইন সমূহ' সেন্ট্রাল ল বুক হাউজ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. এমএ হামিদ, ইসলামী অর্থনীতি: একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ, রাজশাহী, ১৯৯১

৪৭. গাজী শামছুর রহমান 'শ্রম ও শিল্প আইন" আলিপুর প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

৪৮. মোহাম্মদ ফারুক খান, "শ্রম ও শিল্প আইন" ডাইনামিক পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০২

৪৯. সংকলন, কোটামুক্ত বিশ্বে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প, সাম্প্রতিক প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জ, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, ঢাকা-২০০৮

৫০. আতাউর রহমান, 'ইসলামী শ্রমনীতির রূপরেখা' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকার, সংখ্যা-৪৬, জুন-১৯৯৩

৫১. কবির আহমদ মজমুদার, ইসলামের শ্রমনীতি ও ট্রেড ইউনিয়ন, মজদুর প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯১

৫২. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, লাহুর, পাকিস্তান।

৫৩. মোঃ আব্দুল খালেক, ইসলামী অর্থনীতি, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

৫৪. নাহিদ ফেরদৌসী, 'গার্মেন্টস শিল্পে দুর্ঘটনা, প্রচলিত আইন ও বাস্তবতা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার, সংখ্যা: ১০, এপ্রিল-জুন ২০০৭, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, ঢাকা।

৫৫. গাজী শামছুর রহমান, 'শ্রম ও শিল্প আইন', আলীপুর প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭

৫৬. এন.এ.এম. জসিম উদ্দীন, 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং প্রাসঙ্গিক শ্রম আইনসমূহ', সেন্ট্রাল ল বুক হাউজ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০০৭

৫৭. এন.এ.এম. জসিম উদ্দীন, 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং প্রাসঙ্গিক শ্রম আইনসমূহ', সেন্ট্রাল ল বুক হাউজ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০০৭

৫৮. তানজিলা রহমান 'বাংলাদেশে শ্রমিক আইন ও নারী শ্রমিকের অদিকার', দৈনিক সংগ্রাম, ১ মে-২০০৭

৫৯. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, 'ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার' প্রকাশকাল: পঞ্চম প্রকাশ জানুয়ারী-২০০৩

৬০. শামসুল আলম 'ইসলামী রাষ্ট্র' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশকাল-১৯৮৬

৬১. 'দৈনন্দিক জীবনে ইসলাম', ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০০

৬২. ড. সাইদুল্লাহ কারী, 'রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আদর্শের আলোকে শ্রম ও শ্রমিক', মাসিক মদীনা সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা, জুন-২০০২

৬৩. 'ফাতাওয়া ও মাসাইল ৬ষ্ঠ খন্ড' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল জুন, ২০০১

৬৪. ড. খালিক দাদ, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং শ্রমজীবিদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা' মাসিক মদীনা, মে. ২০০৬

৬৫. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, প্রাগুক্ত, পৃ. কিতাবুল আহকাম।

৬৬. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে অর্থনীতি, অপ্রকাশিত এমফিল থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ১৯৯৯।

৬৭. মুহাম্মদ আবদুল খালেক, ইসলামী অর্থনীতি, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

৬৮. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ১২০

৬৯. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান 'বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন', দি এ্যানভেল পাবলিকেশন, ঢাকা, সপ্তম সংরক্ষণ, ১৯৯৯

৭০. এন. এ. এম. জসিম উদ্দিন "বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং প্রাসঙ্গিক শ্রম আইনসমূহ" সেন্ট্রাল ল বুক হাউজ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৭

৭১. আকরাম হোসেন চৌধুরী, "কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সরকার মালিক, শ্রমিক, আই.এলও এবং এনজিওদের করণীয়" একটি সেমিনার পেপার, বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, ঢাকা ১৯৯৭

৭২. সৈয়দ লুত্ফুল হক, মসলিনের ইতিকথা, দৈনিক আমার দেশ ঢাকা, ১৫ নভেম্বর ২০১০

৭৩. দৈনিক প্রথম আলো, গাজিউল হক, ১৯ সেপ্টেম্বর-২০০৯, কুমিল্লা, ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল কুমিল্লার খাদি।

৭৪. আফলাহ্ হোসেন রাইতা, **আদি ঐতিহ্য খাদি, দৈনিক জনকণ্ঠ**,শুক্রবার, ২৮ জানুয়ারী ২০১১

৭৫. প্রথম আলো,৭ এপ্রিল-২০১১

৭৬. প্রথম আলো, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৬

৭৭. প্রথম আলো, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৬

৭৮. রোকেয়া কবীর,শতবর্ষে নারী দিবস, ইতিহাস তবুও প্রাসঙ্গিক, জনকণ্ঠ ৮ মার্চ-২০১০

৭৯. কাওসার সোহেলী, এখনও অর্জিত হয়নি নারীর অধিকার, যুগান্তর ৮ মার্চ-২০১০

৮০. কুন্তল রায়, যুগে যুগে নারী মুক্তি আন্দোলন, জনকণ্ঠ, ৮ মার্চ-২০১০

৮১. দৈনিক আমার দেশ, ২৮ এপ্রিল-২০১১

৮২. ১লা মে ২০১১, দৈনিক জনকণ্ঠ।

৮৩. সিমীন মাহমুদ, গার্মেন্টসে নারী শ্রমিকদেও অধিকার, নারী দিবস সংখ্যা, প্রথম আলো, ৮ মার্চ-২০১০

৮৪. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৪

৮৫. শ্রমশক্তি জরিপ, ২০০৪, বিবিএস.।

৮৬. উন্নয়ন পদক্ষেপ, মে-২০০৬

৮৭. শ্রমশক্তি জরীপ, ২০০৩

৮৮. দৈনিক সমকাল, ২৫ এপ্রিল, ২০০৬

৮৯. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৫

৯০. দৈনিক প্রথম আলো, ১১ ডিসেম্বর, ২০০৫

৯১. দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৯ অক্টোবর, ২০০৫

৯২. দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৪ অক্টোবর, ২০০৫

৯৩. দৈনিক আজকের কাগজ, ১লা অক্টোবর, ২০০৫

৯৪. দৈনিক সংবাদ, ১ মে, ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

৯৫. জাতিসংঘ বার্তা, মার্চ-২০০৪

৯৬. আইএলও বুলেটিন, আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর, ঢাকা-১৯৮৬, ধারা-২

৯৭. উন্নয়ন পদক্ষেপ, দ্বাদশ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০০৬

৯৮. Daily Star,সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন,৭ মে ২০০৪

৯৯. The Financial Times, 26th March.

১০০. The Daily New Age, 8th October, 2005

১০১. The Daily Star, 16th October, 2005

১০২. The Daily Star, 9, February, 2006

১০৩. James Tailor, Topography od Dacca, Calcutta, 1840

১০৪. Pratima Paul-Majumder,Anwara Begum,The Gender Imbalances in the Export Orinted Garments Industry in Bangladesh,policy Research Report,Series-12,The World Bank Research Group,June 2000

১০৫. Syeda Sarmin Absar,Living condition of woman workers in RMG sector in Bangladesh,National Centre for Development Studies(NCDS),Canberra Australia.

১০৬. N Nahar,R N Ali and F Begum,Occupational Health Hazards in Garments Sector,Department of Rural Sociology,BAU,Mymensingh,17 Februry 2010

১০৭. Syeda Sharmin Absar,Problem Sorrounding Wages:The Readymade Garments Sector in Bangladesh,Asia Pacific Press 2001,volume 2,number 7.

১০৮. James Tailor, A Descriptive and Historical Account of cotton manufacturing of Dacca, 1987.

১০৯. Nasreen Khundakar, A Review of Bangladesh Development, Centre for Policy Dialogue, Univesity Press Limited, Dhaka-1996

১১০. UNICEF, 1998, Situation Analysis of Children and Women in Bangladesh.

১১১. M.R. Kanwar, Lecture on Economic Development and planning New Academic Publishing Company, Jullandhar, 1993

১১২. Labour force survey, 1999-2000

১১৩. Dr. Burhan Uddin Khan, "The ILO Convention on Forced labour: A legal review of its impact and implications in Bangladesh", Journal of the faculty of law, Vol. 14 (1), June, 2003

১১৪. Gray Dessler, Personal Management, Reston Publishing Company, Virginia, 1978

১১৫. Alok Sarker "Strict enforcement of law can contain garment dis-asters" The Daily Star" Law & our rights", 4 March 2006

১১৬. Annie, Nasrin Siraj "Working dying in Garment factories: Some questions" Magazin of Meghbarta 14 March, 2006

Dhaka University Institutional Repository

১১৭. Salauddin, Sheikh "Collapse of Spectrum Sweateer Industries" The Daily Star "Law & our rights", June 6, 2006

১১৮. The Daily New Ages, 13, January, 2005

১১৯. Rushedur Islam Rahman, The Wage Employment market for Rural Women in Bangladesh, Research Monograph, 6 BIDS, Dhaka-1992

১২০. Shamim Hamid, Gender Diminshion of poverty in Bangladesh: A case study, Bangladesh-A National Strategy for Economic Groth, Poverty Reduction and Social Development, Economic relation Division-Ministry of Finance, 1995

১২১. Hannan Shah, Thought on Islmic Economic, Islamic Economics Research, Bareau, 1980

১২২. A News letter of Bangladesh Garment Manufactures & Export Association, April-May 2006

১২৩. A News letter of Bangladesh Garment Manufactures & Export Association, April-May 2006

১২৪. A news letter of Bangladesh Garment Manufacture & Export Associatio, April, May, 2006

১২৫. Dr. Pratima Paul-Majumder, 'Social Security Challenges in the Manufacturing Sector: A Gender Perspective' Human Rights in Bangladesh-2004, Published by Ain O Salish Kendra (ASK), First Published-2005, Dhaka.

১২৬. A Rearche on "Globalization and recent economic debate: impact or the state of female garments workers of Bangladesh". Women's economic empowerment project: Bangladesh National Women Lawyers Association Support by the Asia foundation Dhaka.

১২৭. Dr. Pratima Paul-Majumder, "Social Security Challenges in the Manufacturing Sector: A Gender Perspective: Human rights in Bangladesh 2004, Published by Ain O Salish Kendra (ASK), Dhaka First Published 2005

১২৮. Farmin Islam, "Development of State Policy and labour legislation in Bangladesh : Implications for women in Industrial Employment", A Journal of women for women, Vol-7, 2000, Dhaka.